শেষ বিচার

ন্যুরেমবার্গ দিনলিপি

বিংশ শতাব্দী

প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দী, ৭৫/সি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

সোভিয়েত গ্রন্থ—The Final Reckoning-এর বাংলা সংস্করণ

অনুবাদ : বিংশ শতাব্দী

মুদ্রণ : বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স', ৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

সূচী

পৃষ্ঠা

পাঠককে কয়েকটি কথা :

পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন বিচার এমন আন্তর্জাতিকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেনি, যেমনটি করেছিল—ন্যুরেমবার্গ বিচার—ফ্যাসিস্ট-চোস্ট-নাজীদের অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যারা প্রধান যুদ্ধোপরাধী—তাদের বিচার।

ফ্যাসীবাদ মানবজাতির বিরুদ্ধে যে অদৃষ্টপূর্ব বর্বর নৃশংস আচরণ করে, যে বর্বর নৃশংসতার সমস্ত দিক, এই বিচার চলার সময় সারা পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত ও উন্মোচিত হয়, কেবল তাই এই বিচারের প্রতি সারা পৃথিবীর মনোযোগের কারণ নয়। এর প্রধান কারণ এই যে, ইতিহাসে এই প্রথম যে সমস্ত জাতি নাজী সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে, তারা এই যুদ্ধের উসকানি দাতা ও হোতা, পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক আগ্রাসী দেশের নেতাদের আসামীর কাঠগড়ায় তোলে। এই আগ্রাসী পুঁজিবাদী দেশের নাজী আদর্শবাদ যা সাম্রাজ্যবাদী ধারণা ও আদর্শের নির্যাস তথা সারাৎসার, কার্যতঃ এই বিচারে তাকেই অভিযুক্ত করা যায়। নাজী নেতাদের যে সমুচিৎ শাস্তি প্রাপ্য, আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের রায়ে, তাদের সেই শাস্তি দেওয়া হয়। এবং পরিশেষে, সমস্ত মানবজাতির পক্ষের কালান্তক যমের মত যে আশংকা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে এসেছিল, যে মৃত্যুর হাত থেকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর অমর আত্মদান পৃথিবী ও মানবজাতিকে রক্ষা করেছিল, এই বিচার তা-ও দেখায়।

ন্যুরেমবার্গ বিচার নিয়ে প্রচুর সাহিত্য-গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই সব রচনার মধ্যে সোভিয়েত গ্রন্থকারদের লেখা অজস্র বইও আছে, যার মধ্যে আমি বিশেষভাবে আরকাদি পোলেতোরাক-এর *দ ন্যুরেমবার্গ এপিলগ* এর অন্যতম মূল ও প্রধান গ্রন্থ বলে উল্লেখ করবো। তিনি ছিলেন এই বিচারে প্রেরিত সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতা এবং যথেষ্ট পরিমাণে মালমশলা তাঁর কাছে ছিল যা তাঁর রচনাকে অসাধারণভাবে মূল্যবান করেছে।

সম্প্রতি, পাশ্চাত্য দেশে কিছু কিছু বই প্রকাশিত হচ্ছে যার লেখকেরা, আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের রায় এর সুবিচার সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং এমন ঘোষণাও করেছেন যে ঐ বিচার এক ঐতিহাসিক ভুল। এই সমস্ত লেখকের মধ্যে আছেন পাশ্চাত্যের অনেক সাংবাদিক, অর্থাৎ অভিযুক্তদের আইনজীবী এবং অভিযুক্তরা নিজেরাও— যে সব অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাদণ্ড ভোগ করার পর আবার ফেডারেল জার্মানীর শ্রদ্ধেয় নাগরিক হিসেবে বসবাস করছে। আর এতে আদৌ অবাক হবার কিছু নেই যে আন্তর্জাতিক আইনসমূহ, যা প্রথম ন্যুরেমবার্গে প্রযুক্ত হয়, সেই সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন সব রকম আগ্রাসী অভিযান, গণ-হত্যার সব রকম পদ্ধতি, শান্তিপূর্ণ নগর ও গ্রামের ওপর বোমাবর্ষণ, রাসায়নিক নানা ক্ষতিকারক দ্রব্যের ব্যবহার, নাপাম বোমা, পেলেট বোমা অন্যকথায়, আমেরিকানরা ভিয়েতনামে যা কিছু ব্যবহার ও প্রয়োগ করেছে, তার সব কিছুই, ন্যুরেমবার্গে প্রযুক্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আইন-বিরুদ্ধ। পরদেশী রাজ্যের কোন অঞ্চলকে অধিকার করে রাখা যেমন আরব দেশের অঞ্চলসমূহে ইজরায়েলের অভিযান গভীরতম অপরাধ ও গণ-হত্যাকে এই আইন নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেছে। পরিশেষে নাজীবাদের যে কোন চেহারা যার মধ্যে আবার নতুন করে এক চেহারা যা সক্রিয়ভাবে পশ্চিম জার্মানীতে ফের জাগিয়ে তোলা হচ্ছে, তা এই আইন ও বিচার নিষিদ্ধ করে।

এই সব কারণেই, বিচার শেষ হওয়ার কুড়ি বছর পরে আমায় কলম ধরতে বাধ্য করেছে। বিচারের সময় আমি *প্রাভদার* একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি ছিলাম, আর আপনি এ বইয়ে যা কিছু পড়বেন, তা সেই সময় ছোট ছোট করে টুকে রাখা। প্রকাশনার জন্য সেগুলি একত্র করেছি, আমি তো আধুনিক করার জন্য পুনরায় কিছু লিখিনি। আমি কেবল চেষ্টা করেছি সেগুলিকে সাহিত্যে রূপ দেবার ; বিচার চলাকালীন যে আবহাওয়া ছিল সেই আবহাওয়াকে যথাসাধ্য ধরে রাখতে আর তখন যে ভাবে সেই ঘটনাগুলিকে অনুভব করেছিলাম, তা বজায় রাখতে।

প্রিয় পাঠক, আমি কতদূর তা পেরেছি তা বিচারের ভার আপনাদের দিলাম।

প্রথম পর্ব

অপরাধ

১। একটি পরিকল্পনা ভেস্তে গেল

যদিও ইতিমধ্যে অনেক কিছু আমার দেখা ও শেখা হয়েছে, আমি কিন্তু কখনও অনুভব বা উপলব্ধি করিনি যে আর এক দেশের লোকেরা আমাদের, অর্থাৎ রুশদের জন্য এমন উষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন আর তারা, ভাষায়, স্বভাবে, এমনকি জীবনযাপন পদ্ধতিতে অনেকটাই আমাদের সগোত্র। আমরা প্রতিবেশী নই, কেন না, এই দেশের লোকেরা থাকে, অনেক দূরে— ইউরোপের দক্ষিণভাগে। যখন ছোট ছিলাম, তখন অবশ্যই ইভান ভাজোভের কীর্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম—আর সেই মহান কমিউনিস্ট জর্জি দিমিত্রভের তৎকালীন ফ্যাসিবাদী গুহা লিপজিগে যুদ্ধের খবর, সংবাদপত্রে, সোৎসাহে পড়তাম। সোফিয়াতে মাটির তলায় আর রোডোপ পর্বতমালায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে বালগেরীয় পার্টিজানদের সংগ্রামের সংবাদ ছোট ছোট খবরের আকারে সংবাদপত্রে আসত। এক বছরের সামান্য কিছু আগে শুনেছি বালগেরীয় কৃষকরা আমাদের সৈন্যদের বালগেরিয়ার গ্রামগুলির উপকণ্ঠে 'ভাই' বলে অভ্যর্থনা করছে। 'ভাই' শব্দ রুশ ভাষার মত একই রকম শুনতে। সে যাইহোক, এখন বালগেরিয়ায় ঘুরে বেড়ানোর পর, রোডোপের পার্বত্য অধিবাসীদের দেখে, গ্রাম এবং গণ্ডগ্রামে বসবাস করার পর, এই আত্মীয়তা কতদূর বিস্তৃত তা উপলব্ধি করতে পারলাম।

এক মাসের ওপর, আমার মোটর গাড়ির চালক ভেসেলিনকে নিয়ে আমি দেশটার চারিদিকে বেড়িয়ে ফিরলাম। ভেসেলিন সেই ধরনের

লোক, যে বক বক করতে অনিচ্ছুক, পাশ থেকে দেখতে তার মুখ যে কোন গোলগাল মাথা লোকের, আর যদিও আমি এক বর্ণও বালগেরীয় ভাষা বলতে পারতাম না, সেও পারত না রুশ ভাষা বলতে, তবু আমরা পরস্পরকে দিব্যি বুঝতাম। সে একজন কমিউনিস্ট আর কিছুদিন আগেও ছিল একজন পার্টিজান যে কোন একটি বীর বাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করেছিল। আমাদের বোঝাপড়াটা ভালই ছিল। একমাত্র মুশকিল ছিল এই, যে, যখন ও আমার সঙ্গে একমত হত না, সে ওর ঘাড় নাড়ত আর যখন ও আমার সঙ্গে একমত হত, তখন জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাত, যেন সে আপত্তি জানাচ্ছে।

যুদ্ধের শেষের দিকে আর যুদ্ধ পরবর্তী প্রথম কয়েক মাসে আমার প্রচণ্ড কাজকর্মের পুরস্কারস্বরূপ, আমার সম্পাদকীয় দপ্তর আমাকে এই বালগেরিয়া ভ্রমণের সুযোগ দেয়। সেই দেশে ঘুরে বেড়ানোর সময়, যে বইটি লেখার কথা আমি চিন্তা করছি, তার মালমশলা আমায় সংগ্রহ করতে হবে আর সেই সঙ্গে আশা করছি *প্রাভদা*-র জন্য বিশেষ রচনা পাঠাবো। অর্থাৎ এই ভ্রমণের ব্যাপারটা প্রথমে এই রকমই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এমনি ঝোড়ো সময়ে আমরা বাস করছি, যে আমার সদিচ্ছা অনুযায়ী কিছুই হল না। বালগেরিয়ায় তখন নির্বাচন হবো হবো করছে আর এক প্রাক নির্বাচনী লড়াই এতদূর গড়িয়ে গিয়েছিল যে তাতে জড়িত না হওয়া অসম্ভব ছিল।

"আমাদের নির্বাচন তো কেবল সংসদের জন্য নির্বাচন নয়। আমাদের দেশ ও জনসাধারণ যে পথ অনুসরণ করবে, ওরা স্থির করবে," বললেন জর্জি দিমিত্রভ, যিনি সম্প্রতি বালগেরিয়াতে ফিরেছেন। সোফিয়ার এক নিরিবিলি রাস্তায় তাব ছোট ও অতি সাধারণ বাড়িতে তিনি আমায় অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর পরণে ছিল নীল ফ্লানেলের এক সাধারণ স্যুট। আমি আশা করি না যে তাঁর এই ছিমছাম আসবাবে সাজানো বাড়িতে কোন পড়ার ঘর থাকবে। কেননা আমরা একটা ছোট খাবার ঘরে বসে কথা বলছিলাম। একটা অমসৃণ কাপড়ে ঢাকা টেবিলের ওপর রাখা ছিল মদ রাখার রেকাব, কিছু মাটির পেয়ালা, একটা ঝুড়ি ভর্তী ধূসর পাঁউরুটির বড় বড় টুকরো, চীজ, আর বাড়িতে রান্না দারুণ সুস্বাদু এক ধরনের মাছ। আমার মনোযোগ অবশ্য সুনিশ্চিত ভাবে

নিবদ্ধ ছিল গৃহকর্তার ওপর, যাঁর সম্পর্কে আমার মুগ্ধতা কমসোমোলের একজন অল্পবয়সী সভ্য থাকার সময় থেকেই। বাড়ির সব কিছুই আমার কাছে দারুণ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল, আর তাই পকেট থেকে আমি আমার নোটবই বার করেছিলাম, কিন্তু দিমিত্রভ সেটাকে ধীরে ধীরে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "কমরেড পোলেভয়, কোন সহজ নির্বাচন এটা নয়। কঠিন আর তীব্র সংগ্রাম সামনে অপেক্ষা করে আছে। তুমি যেমন ভাবছো, ব্যাপারটা মোটেই তেমন সরল আর সহজ নয়।"

তিনি একটা কমফোরি চেয়ারে বসেছিলেন আর ধীরে ধীরে মাঝে মাঝে ওষুধের মত লাল মদে চুক চুক করে চুমুক দিচ্ছিলেন, রুটি আর চীজ খাচ্ছিলেন, ঠিক একজন লাঙলটানা ক্লান্ত কৃষকের মত।

"তোমরা দারুণ এক জয়লাভ করার পর, তোমরা সোভিয়েতের লোকেরা খুব আশাবাদী হয়ে পড়েছো। অবশ্য, সেটাই স্বাভাবিক, আর তোমাদের সে অধিকারও আছে। কিন্তু বুঝে দেখো, আমরা যারা বালগেরীয় কমিউনিস্ট, এখনো আমাদের স্তালিনগ্রাদের লড়াই জিততে হবে। আর বেশী কি বলবো, সে যুদ্ধ জিততে হবে একটাও গুলি না ছুঁড়ে।" উনি ওনার পেয়ালা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। "কিন্তু ইতিমধ্যেই তো কিছু কিছু বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে। জানো তো এরকম রটনা করা হচ্ছে যে কমিউনিস্টরা যদি জেতে তাহলে সোফিয়ার ওপর আমেরিকানরা আণবিক বোমা ফেলবে। অবশ্য তা হবে না, কেননা, আমেরিকানরা এতটা বোকা নয়। কিন্তু এই সমস্ত রটনা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে প্রতিক্রিয়াশীলরা কোন কিছুতেই থামবে না।"

এই আলাপের কিছুদিন পরেই দিমিত্রভের কথার সত্যতা আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম।

গভীর প্রোথিত সোভিয়েত-বালগেরীয় বন্ধুত্বের ওপর আমার বই লেখার পরিকল্পনাকে দিমিত্রভ অনুমোদন করলেন ও আমায় নির্বাচনের জন্যে প্লেভেন-এ যেতে বললেন। একদা তুর্কীদের বিরুদ্ধে রুশ সৈন্য এবং বালগেরীয় গৃহরক্ষী বাহিনী যে বিখ্যাত প্লেভেন যুদ্ধ লড়েছিল, আমি সেই স্থান দেখলাম। সেই যুদ্ধের স্মারক হিসেবে এটা এখন একটা পার্ক, যার সীমানা তুর্কীদের কাছ থেকে অধিকৃত বন্দুক দিয়ে ঘেরা, আর আত্মরক্ষামূলক জায়গায় তুর্কিদের পুরোন সব কামান রয়েছে। সেখানে আরও

একটি স্মৃতিকক্ষ আছে, যেখানে মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা সোনালি শিখার মাঝে যুদ্ধে নিহত রুশ সৈন্যের দেহাবশেষ, নিশান, আর সেই যুদ্ধের নানা সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন—সেই কক্ষে আলোর মধ্যে জ্বল জ্বল করে। এখানের সব কিছুই লোকগাথায় রূপকথার গল্পের মত হয়ে গেছে এবং পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমরা সোভিয়েত সৈন্যরা এক বছর আগে যখন রাজতন্ত্রীর ফ্যাসিবাদীদের দখলীকৃত বালগেরিয়ায় কুচকাওয়াজ করে প্রবেশ করলাম তখন প্রতিটি গ্রামের উপকণ্ঠে বিজয়ানন্দে উল্লসিত ঘণ্টা নিনাদ করে আর মধুর 'ভাই' সম্বোধনে কেন আমাদের সানন্দ অভ্যর্থনা করেছিল।

আমার নোটবই রোজই লেখায় ফুলতে লাগল। আমি ইতিমধ্যে মনে মনে বইটা কেমন হবে ছকে নিয়েছিলাম আর বইটার নামও ভেবে রেখেছিলাম "ভাই ভাই"। নামটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। একবার নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে আমি প্লেভেন থেকে আমার প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেব মনস্থ করলাম, আর প্লেভেন, যেখানে এই ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ হয়েছিল. সেখানে বসেই নির্বাচনের পরেই বইটি লিখে ফেলব ঠিক করলাম।

একদিন সকালে, হলো কি, একজন বালগেরীয় অফিসার এই শহরের সেনাধ্যক্ষকে পাঠান সোভিয়েত দূতাবাসের এক তারবার্তা আমায় এনে দেখান, যাতে লেখা, '*প্রাভদার* সাংবাদিক প্রতিনিধি পোলেভয়কে অনুগ্রহ করে খুঁজে বার করুন ও তাকে সোফিয়ায় যেতে সাহায্য করুন।" এসব কি ব্যাপার? আমায় কেন এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে, আর সেটা এত জরুরীই বা কেন? যাই হোক না কেন, এটা নির্বাচনের সময়। আর নির্বাচন লড়াই নিয়ে আমার অবশ্যই বিবরণ সহ সংবাদ পাঠানো উচিৎ কেন না নির্বাচনের তীব্র লড়াই এখানে তুঙ্গে। কেবল এই জন্যেই অনেক পশ্চিমা সাংবাদিক প্রতিনিধি এখানে এসে হাজির হয়েছে, ইতিমধ্যেই কিছু গুলি-গোলা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে এবং অনুমান করা হচ্ছে নতুন কিছু আরও হবে। তথাপি, আমার ড্রাইভারকে গাড়ি তৈরী করতে বলে আমি ভোট দেবার জায়গাতে আর এক চক্কর ঘুরে আসতে গেলাম।

চারপাশের সব কিছু দেখে, পপুলার ফ্রন্ট-এর চূড়ান্ত বিজয় সুনিশ্চিত মনে হল। ছুটির দিনের সাজ-পোশাকে লোকেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখানে ওখানে সমবেত গান শোনা যাচ্ছিল। গীর্জার সামনে

স্কোয়ারে হাতে হাত দিয়ে লম্বা সারি করে অপেশাদার এক দলের অর্কেস্ট্রার তালে তালে লোকনৃত্য করছিল। তারা সমগ্র স্থান জুড়ে সহজভাবে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছিল। আমি, বরং বলা ভালো, আমার সোভিয়েত সামরিক উর্দি সোল্লাস হর্ষধ্বনিতে অভ্যর্থিত হল। এই ছন্দোভাবে দুলে দুলে বৃত্তাকার নৃত্যে আমায় প্রায় জোর করে টেনে নামানো হল আর আমি এবড়ো-খেবড়ো পা ফেলে ওদের মত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি আগে কখনো নাচিনি। লোকেদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ দেখে অভিভূত হতে হয়।

বেশী দিনের কথা নয়, *প্রাভদার* সাংবাদিক প্রতিনিধি ভাদিম কোঝেভনিকভ এবং বোরিস গোরবাতভসহ, যুদ্ধের সাংবাদিকদের নিয়ে একটা লরী কিভাবে গত বছর সোফিয়াতে পৌঁছে গিয়েছিল, আর তা করতে গিয়ে সেই লরী কিভাবে লাল ফৌজের অগ্রগামী বাহিনীকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল, তা শুনে আমরা বিস্মিত হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ওদের ওপর আমাদের রীতিমত হিংসে হয়েছিল। কিন্তু ওদের ওই বৃত্তাকার নাচে যোগ দিয়ে আমার সেই বিস্মিত হবার অনুভূতি আমার আর হল না। এ হল রুশ সৈনিকদের জন্য বহু যুগের সম্ভ্রম বোধ, যা ইউরোপের জনগণের মুক্তি আনার পর লাল ফৌজের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল আর সেই গৌরবই সাংবাদিকদের লরী ভিতরে যাবার জন্যে অব্যবহার্য অন্য রাস্তা খুলে দিয়েছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এখান থেকে কাগজের জন্য একটা ভালো বিবরণ সম্বলিত ঘটনা জানাবো, আর একই শিরোনাম দেবো সেই রচনার "ভাই-ভাই"। কিন্তু তবু আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কেন আমায় ডেকে পাঠানো হল এবং তা এত জরুরীই বা কেন?

হোটেলের লবিতে অভ্যর্থনাকারী একটি টেলিফোনবার্তা যা সে লিখে নিয়েছিল, আমার হাতে তুলে দিল। "তুমি কি নির্দেশ পেয়েছো? এখুনি যাত্রা করো। ওখানে পৌঁছে বিস্তারিত জানতে পারবে।" এই বার্তা আমাদের দূতাবাসের প্রথম সচিবের স্বাক্ষরিত। সেই মুহূর্তে বিপর্যস্তের-মত-দেখতে ভেসেলিন ছুটতে ছুটতে ওপরে এলো। কোন শূয়ারের বাচ্চা আমাদের মারসিডিজ গাড়ির চারটি চাকাকেই এমনভাবে ফালা ফালা করেছে যে কোনভাবে তাপ্পি-তাপ্পা দিয়েও কোন ফল হবে না। বালগেরীয় ভাষায় গালাগাল আমাদের রুশ ভাষার মতোই। আর আমার সঙ্গী যে সাধারণত খুব শান্ত, সংযত সে এই সমস্ত

অনিষ্টকারীদের উদ্দেশ্যে যত কিছু উদ্‌গীরণ করল তা আমি বেশ উপভোগ করলাম। আমি তাকে তারবার্তাটা পড়ে শোনালাম আর সে এমনভাবে কুঁচকে গেল যেন তার দাঁতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। তারপর অবশ্যই কোন কিছু চিন্তা করে, সে অদৃশ্য হল। আসলে সত্যি আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না। এইরকম সব ঘটনা আগেও কিছু কিছু ঘটেছে। আগের দিন এক বিশাল প্রাক-নির্বাচনী সভায় কোন একজন দুর্গন্ধময় কিছু তরল পদার্থ আমার মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। আমার মুখের নাগাল তারা পায় নি, কিন্তু আমার টিউনিকের পিছন দিকটা সাইপ্রাসের মানচিত্রের মত দেখতে হয়েছিল। কিন্তু গোল্লায় যাক, আমার টিউনিক অর্থাৎ ভিতরের জামা, যদি খুব খারাপ কিছু হয় ওভারকোট গায়ে দিলেই হবে. কিন্তু এই রকম সময় আমার যাতায়াতের গাড়িটি থেকে আমাকে বঞ্চিত করা…আমাদের রুশদের যারা নাচে যোগ দিতে ডেকেছিল, তাদের মধ্যে আমাদের শুভার্থী ছাড়া অবশ্যই অন্য লোকজনও ছিল……

হোটেলের লবিতে আমি হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থাকলাম. আর আমার পশ্চিমা সহকর্মীরা একের পর এক গাড়ি ছুটিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে গেল। আমার পাশের দরজার বাসিন্দা প্রতিবেশী একজন মোটাসোটা আমেরিকান ফটোগ্রাফার, ঠিক যেন ঘণ্টাবভারে অবনত সামানের মত ক্যামেরার ভারে বাঁ কে তখনো শেষ না হওয়া চপটার বাকী অংশ মুখে ঠেসে দিয়ে. হরবর করে খুব দ্রুত বের হয়ে গেল। সে যাবার সময় দরজার দিকে হাত নেড়ে আমায় বিদায় জানাল।

তারপর আমি আবার "ভাই-ভাই" শব্দের অর্থ অনুভব করলাম। ওই শিরোনামে আমার সংবাদ বিবরণ লেখার জন্যে আমার ঘরে সবে বসেছি, তখনও প্রথম বাক্যটিও শেষ পর্যন্ত লেখা হয় নি, এমন সময় নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল আর ভিতরে এসে দাঁড়াল ভেসেলিন। আমি অবাক হলাম ভেবে এমন কি অঘটন ঘটতে পারে. তার কারণ যে মানুষটা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার মাথার টুপি কোঁচকানো. সেটা তার মাথার পিছন দিকে অদ্ভুতভাবে দাঁড় করানো. আর তার হাত তেলে জবজবে। তবু তার মুখ দীপ্ত।

"চলুন, আমরা রওয়ানা হই।" সে রুশ ভাষায় বলল।

তার একই কথা আবার বলবার কোন দরকারই ছিল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হয় ভেসেলিন সাহায্যের জন্যে চিৎকার করেছিল আর প্লেভেন-এর গাড়ি চালকেরা. আমি জানি না কে বা কারা, নিজেদের ধাবমান গাড়ি থামিয়ে চাকা খুলে আধ ঘন্টা'র মধ্যে আমাদের থুবড়ে পড়া মারসিডিজ-এ লাগিয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বর জানেন সমস্ত ব্যাপারটা কে সংগঠিত করল আর খরচ খরচাই বা কে দিল. কেন না দাম তো অবশ্যই বেশ লেগেছে। যাই হোক প্রকৃত ঘটনা হল, ক মিনিটের মধ্যে আমরা শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে গতি বাড়িয়ে চলেছি সোফিয়ার দিকে। আমরা সোফিয়ার দিকে চলেছি উপত্যকার মধ্য দিয়ে. যেখানে অতীতকালে একদিন তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের শোণিত ঝরিয়ে বালগেরীয় মানুষদের অন্তরে ভ্রাতৃত্বের বীজ বুনেছিল।

সুন্দর সব গ্রামের মধ্য দিয়ে. ছবির মত লাল ছাদের বাড়ির পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ঘর বাড়ির চত্বরে শুকোতে দেওয়া গোছাগোছা সোনালী, বাদামী, উজ্জ্বল সব ডাঁই করা শস্য, পতাকায় সাজানো নানা ভোট কেন্দ্র. সবুজ মালা এবং শস্যের শিষ, চেয়ে দেখার মত ঝকমকে জাতীয় পোশাকে সজ্জিত বালক বালিকারা—এই সবের পাশ দিয়ে আমরা দ্রুত এগিয়ে চললাম। আমি তখনো নিজের কাছেই জানতে চাইছি যে এই জরুরী তলবের অর্থ কি হতে পারে। ভেবেই পা'চ্ছলাম না বাড়িতে কিছু হয়েছে কিনা, নাকি এখানকার জটিল পরিস্থিতির বিবরণ পাঠাতে গিয়ে আমি কিছু ভুলক্রমে বাদ দিয়ে ফেলেছি।

সমতল ভূমিতে পৌঁছোনো মাত্র ভেসেলিন গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল আর আমরা ঘন্টায় ১০০-১১০ কিলোমিটার বেগে গাঁক গাঁক করে উড়ে চললাম। মাঝামাঝি পথ এসে আমরা সেই আমেরিকান জীপ গাড়িটিকে ছাড়িয়ে গেলাম যেটি হাওয়ার ঝাপটায় জমে যাওয়া সাংবাদিক প্রতিনিধিতে ঠাসা। তারপর আমরা পার্বত্য অঞ্চলে পড়লাম যেখানে পথ স্টারা প্লানিনা পাহাড়ের তুষার ঢাকা এলাকার ওপর উঠে গেছে। পথের অ্যাসফাল্ট সেখানে পিচ্ছল। রিনিঠিনি ঘন্টা লাগান একটা হাল্কা ধরনের দু'চাকার গাড়িকে আমরা পার হয়ে গেলাম। সেই গাড়িটার ওপর ভেড়ার চামড়ার ওপর ছুঁচের কাজের নক্সা করা কোট পরে কয়েকজন ধীর স্থির স্থানীয় লোক একটা ভোটের বাক্স নিয়ে যাচ্ছে, বিয়ের কনেকে ঢাকা দিয়ে

নিয়ে যাওয়ার মত। হঠাৎ আমাদের গাড়িটা হড়কে অ্যাসফাল্ট থেকে সরে গিয়ে একদিকে হেলে পড়ার মত হল আর একেবারে শেষ মুহূর্তে, খাড়া পাহাড়ের কিনারে গড়িয়ে পড়ার হাত থেকে, ভেসেলিন কোন মতে গাড়িটাকে থামাল। বেচারা বিবর্ণ হয়ে গতি কমিয়ে ফেলল আর সেই তুষারাবৃত পার্বত্য-পথের পাক দেওয়া প্রাকৃতিক ফাঁসে আমরা শম্বুক গতিতে এগিয়ে চললাম। এখানেই সেই আমেরিকান জীপ তার বদলা নিল, আর যদিও সেই মোটা ফটোগ্রাফার পিছনের আসনে বসে জমে গিয়েছিল—কেন না ওতো নিজেকে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে ফেলেছিল—ও কিন্তু একটি দড়ির শেষ ভাগটা নাড়ার সুযোগ হাত ছাড়া করল না, যেন বলতে চাইল, "কি হে জ্যাক! কি হল। তাড়াতাড়ি করো বাপু। জলদি।"

ভেসলিন সোজা গাড়ি ঢোকাল দূতাবাসের প্রবেশ পথে। কর্তব্যরত অফিসার জানালেন যে বেশ ক'দিন ধরে তাঁরা আমার অপেক্ষায় আছেন। আমাদের রাষ্ট্রদূত তখনো দপ্তরে ছিলেন ও ভৎর্সনা সূচক সম্বোধনে আমায় বললেন, "আচ্ছা মশাই, এভাবে কি কাজকর্ম চলতে পারে? আপনি একজন সামরিক লোক, কোথায় কোথায় ভ্রমণ করবেন সে সম্পর্কে কোন সূচী না জানিয়েই আপনি জটিল মুহূর্তে বেপাত্তা। মস্কো একের পর এক তারবার্তা পাঠাচ্ছে আর আপনি যে কোথায় আছেন, তা পর্যন্ত আমরা জানি না। আপনি কাজের জায়গায় ঝামেলায় পড়বেন। এটা পড়ুন।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমায় তিনটি তারবার্তা দিলেন। "পাওয়া মাত্র বিমানে সোজা মস্কো চলে এসো। জরুরী কাজ। জেনারেল গ্যালাকতিওনভ।" "পোলেভয় কেন যাত্রা করেনি জানাও। সিভোলোবভ মুখ্য সচিব, *প্রাভদা*।" "সম্পাদকীয় পর্ষদের সিদ্ধান্তে, ন্যুরেমবার্গ আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে সিনিয়র সাংবাদিক প্রতিনিধি নিযুক্ত। প্রথম বিমানে এসো। কাগজপত্র তৈরী। অভিনন্দনসহ। পসপেলভ সম্পাদক।"

প্রথম বিমান। দূতাবাসের একজন পদস্থ কর্মচারী ইতিমধ্যেই লাল পেনসিলে এই কথাগুলি দাগিয়ে একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন। রাষ্ট্রদূত তখন ব্যাখ্যা করলেন, "বিমানে যাত্রার ব্যাপারে আমায় আপনাকে সাহায্য করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই আবহাওয়ায় বিমান ছাড়ছে না। বিমান বন্দর কুয়াসায় ঘেরা। এখানকার বিমান বন্দর কেমন, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

আমি নিশ্চয়ই জানতাম। আমার বিবেচনায় সারা ইউরোপে এটিই ছিল সব চেয়ে প্রতারণাপূর্ণ হাওয়াই আড্ডা, ছোট, কোঁকড়ানো, আর বেশী কি, অর্ধবৃত্তাকৃতি পর্বতমালায় ঘেরা। আমাদের দু'জন বাছাই বৈমানিক এর আগেই এর ওপর তাদের ডানা আছড়েছে।

"আপনি কি ট্রেনে যাওয়ার কথা ভাবছেন?"

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার ব্যাপারে অব্যাহতি পেতে চান, যাতে তিনি মস্কোকে জানাতে পারেন। তিনটি ইউরোপীয় দেশ, যেগুলো যুদ্ধের ধাক্কা এখনো পুরো সামলে উঠতে পারেনি, সেই তিন দেশের মধ্যে দিয়ে ট্রেনে যাওয়া মানে নিজেকে হিঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া, তা আমি কল্পনায় বুঝে নিলাম। না, নিজেকে এরকম একটা আপ্যায়ন জানাতে আমি রাজী ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা এক মত হলাম যে বিমান বন্দর চালু হলেই প্রথম বিমানে আমায় পাঠানো হবে।

তাই আমি রাজপ্রাসাদের বিপরীত দিকে বালগেরিয়া হোটেলের এক মস্ত বিলাস-বহুল ঘরে তিন দিন থাকলাম। প্রাসাদটা ছিল ছোট, একটা সবুজ পার্ক-এর মধ্যে পুরো ঢাকা লুকোন। আর এখানেই, নয় বছরের রাজা সিমেওন আর তাঁর সুন্দরী ইটালীয় জননী জিওভান্না, এই প্রাসাদেরই কোন প্রাদেশিক ঐতিহ্যানুসারী স্বর্ণখচিত অলংকরণে বিস্তৃতভাবে অলংকৃত কোন কক্ষে, তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবার জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রাসাদের শাসনভারপ্রাপ্ত একজন, টোডোর পাভলভ, যে আমাদের সোভিয়েত জনগণের কাছে মজার দার্শনিক দোসেভ নামে খ্যাত ছিল, তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি প্রাসাদে গেলাম। আমি সেই—কালো-চুলো-মাথা, সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ—বালক রাজাকে দেখলাম। টেনিস খেলার মাঠে সে আর একটি কুকুর পরস্পর পরস্পরকে তাড়া করছিল। আমি যখন সেই ছোট চঞ্চল আনন্দোজ্জ্বল বালককে স্থির ভাবে দেখছিলাম, তখন আমি না ভেবে পারলাম না যে কতই না তার মন্দ ভাগ্য যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সে হাস্যকর ও অর্থহীন রাজার পেশা নেবার জন্যে তাকে জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। ও, বড় হয়ে একজন চমৎকার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত, কৃষিবিশারদ অথবা চিকিৎসক হতে পারত কিন্তু এখন এই উঁচু পরিবার আড়ালে ও বসে আছে, স্কোয়ার থেকে আসা বজ্রের মত গর্জন মনোযোগ দিয়ে শুনছে আর ধারণাতীত ভাবে

বিরাট ও সম্ভবতঃ ভাতিপ্রদ খেলায় ছোট্ট দাবার বোড়ের মত নিজেকে অনুভব করছে।

আমার ঘর থেকে স্কোয়ারে অর্কেস্ট্রার বাজনা আমি শুনতে পেতাম, যেখানে উপকণ্ঠ থেকে আসা শ্রমিকেরা, আর ভেড়ার চামড়ার ওপর কাজ করা কোট গায়ে, আর ফুলের অলঙ্কারে টুপি সাজিয়ে কৃষকেরা এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। পপুলার ফ্রন্টের বিজয় উৎসব হচ্ছে। বেশ ছাপ ফেলার মত ব্যাপার। আহা, এই সব কিছু নিয়ে কি দারুণ একটা বই না আমি লিখতে পারতাম। একটা ভালো বই, যার নাম 'ভাই ভাই"! কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই হল সাংবাদিকের জীবন। তরঙ্গের মত ঘটনা আছড়ে পড়ে, বয়ে যায়, আর প্রত্যেকটি ঢেউ, কার্যতঃ, আগেরটির সব চিহ্ন মুছে দিয়ে যায়। সব মিলিয়ে কি কঠিন, আর ধন্যবাদ প্রাপ্তিহীন, সাংবাদিকের জীবন। কিন্তু এখনও, যখন আমার শেষ পরিকল্পনা ভেস্তে গেল, তখনও তা বদলে দেবার স্বপ্ন আমি দেখি নি।

২। লিপজিগ থেকে ন্যুরেমবার্গ

অবসর সময়ে দিনলিপি লিখতাম বলে যুদ্ধের সময়, আমার সাংবাদিক সহকর্মীরা নাক গলিয়ে কত মজাই না করতো আমাকে নিয়ে। সোফিয়াতে যখন আমি খারাপ আবহাওয়ার জন্যে আটকা পড়েছিলাম, আর *প্রাভদার* জন্যে যখন আর কিছুই লেখার ছিল না, তখন আমি আবার দিনলিপি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম।

যদিও আমার সে দিনটা আমি নষ্ট করিনি। আমি আবার ব্যবস্থা করে জর্জি দিমিত্রভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম ও ভবিষ্যতের ভাঁড়ারে আমার জন্যে কি তোলা আছে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু মজার কথাবার্তা হয়েছিল। আমি সাক্ষাতকার প্রার্থনা করেছিলাম তাঁকে বিদায়-নমস্কার জানানোর জন্য এবং তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। এইবার আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু আমার ভেতরের জামা অর্থাৎ টিউনিক, গায়ে আমার যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। সত্যিই

তো, ওই গর্তটার জন্যে আমার দোষ দেবার কিছু নেই, তবে নিজের জামার ছাঁদা নিয়ে কারো দেমাক করার কিছু নেই। দূতাবাসে কর্তব্যরত কমরেডরা আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। সামরিক এটাশে, যাঁর সামরিক পদ আমারই মত, আমায় তাঁর টিউনিক ধার দিলেন। সেটা অবশ্য হ্যাঙ্গারে ঝোলান কোটের মত আমার গায়ে ঝুলঝুল করতে লাগল। তাঁর দপ্তরে কমরেড দিমিত্রভ, ঘরের থেকে একেবারে অন্য মানুষ। তাঁকে যেন আরও লম্বা ও বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হচ্ছিল। মুখ সামান্য ক্লান্ত কিন্তু স্থির ও শান্ত, দৃঢ়তর, বয়স যেন অপেক্ষাকৃত কম, তিনি আগের মতই জোরে ও সোৎসাহে হাত মেলালেন। একটা খাটো-পায়ার টেবিলের পাশে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসতে বলে, উল্টো দিকে বসলেন আর কাটা-কাঁচের সিগারেট বাক্স আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "সিগারেট খাও—তামাকটা ভালো। এটা বালগেরীয়। আমার মনে হয় এটা পৃথিবীর মধ্যে সেরা।"

আমি তাঁকে পপুলার ফ্রন্টের বিশাল ও প্রভাবশালী জয়ের জন্য অভিনন্দন জানালাম। প্লেভেন-এ নির্বাচন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলেন ও তারপর আলোচ্য বিষয় বদলে দিলেন।

"আমি শুনেছি যে ন্যুরেমবার্গ বিচারের ব্যাপারে তোমায় পাঠানো হচ্ছে। তার মানে তুমি আমার পুরান বন্ধু হেরমান গোয়েরিং-এর বিচার দেখবে। হিটলার রেইখ-এর নাজী নং ২, কেমন ব্যবহার করে, তা দেখার ব্যাপার বটে।"

"লিপজিগ-এ আপনিই তো তার প্রথম বিচারক, তাই না? আমার মনে আছে যে আমরা কমসোমোল-এর সভ্যরা অভিযুক্তদের সঙ্গে সাগ্রহে বক্তৃতা আর সংযোজনী ও মামলার বিবরণী শুনতাম। যখন ফ্যাসিস্টদের গুহায় আপনি ওই মোটা শূয়োরকে চিৎ-পটাং করে শুইয়ে ফেললেন তখন আমরা মনে মনে আপনাকে সরব প্রশংসা করেছি।"

এক ধরনের খুবই সুরভিত কফি এল। ছোট, ভঙ্গুর, খোলার মত পেয়ালাটা যেন দিমিত্রভের চওড়া মজবুত হাতের মধ্যে হারিয়ে গেল। তিনি তার ক্লান্ত চোখ কিছুক্ষণ বুজে চিন্তিতভাবে বললেন, "কিন্তু জানো তো, ন্যুরেমবার্গ, লিপজিগ নয়। লিখে নাও, এ বিচার হবে খুবই কঠিন। ভালো কথা, আমার পরামর্শ হল আমাদের শত্রুদের সম্পর্কে তোমার কমসোমোল ভাবনা চিন্তা তুমি ভুলে যাও। এটা ওইরকম সোজা সরল কিছু

নয়। গোয়েরিং শূয়োর ঠিকই, কিন্তু কখনোই বোকা নয়। তুমি নিশ্চয়ই মানবে যদি আমি লিপজিগ-এ একটা ছড়ি দিয়ে কেবল একটা "বোকা জানোয়ারকে মারতাম, তাহলে সেটা আমার পক্ষে কিছু সম্মানের হতো না। তুমি যদি প্রতিবাদীদের বোকা শূয়োর' আর মানসিক "ব্যাধিগ্রস্ত উন্মাদ বলে বর্ণনা 'কর, তাহলে তোমাদের জনসাধারণ ও 'লাল ফৌজের' বিজয় যে মাত্রা কত বড ও মহান তা তুমি ঠিক ঠিক দেখাতে পারবে না।"

ছোট্ট পেয়ালাটা এক চুমুকে শেষ করে তিনি স্বাভাবিক সৌষ্ঠবে হাল্কা-ভাবে পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন যে তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল তিনি বাড়িতে সেই মাটির তৈরি মদের পাত্র কেমন অন্যভাবে ভাসা-ভাসা হাতে ধরে ছিলেন। এই চমৎকার মানুষটি যে কত বিচিত্র. মনে মনে এ কথা না ভেবে আমি পারলাম না।

"আমরা কমিউনিস্ট প্রচারবিদরা আমাদের বিরোধীদের সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যঙ্গ-কৌতুক করে কখনো কখনো মস্ত ভুল করি। নাজীবাদ হল সাম্রাজ্যবাদের উৎপন্ন করা ভয়ঙ্করতম শিশু, যেমন বিভীষিকার জন্ম সাম্রাজ্যবাদ আগে কখনো দেখনি," তিনি বলে চললেন, "সবচেয়ে ভয়ঙ্কর; কিন্তু বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে, বোধ হয়, সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত আর মানানসই। আর খুব কম করে আগামী হাজার বছরের জন্যে সারা পৃথিবী জুড়ে নাজী সাম্রাজ্য কায়েম করার হিটলারী স্বপ্নকে একজন উন্মাদের ক্রোধোন্মত্ততা বলে ভেবো না। একটা সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে সাম্রাজ্য-বাদীদের এটাই হয়ত সব চেয়ে লালিত স্বপ্ন। এই পৃথিবীর অনেক জটিল সামাজিক জাতীয় ও নৈতিক সমস্যার সমাধান কেমন সহজ হয়ে যায় যখন তুমি খেলার তাসের মত জাতিগুলোকে বারবার তছনচ করে দিতে পারো আর যারা তোমার সঙ্গে চিতা জ্বালাতে রাজী হবে না, তাদেরকেও পুড়িয়ে দাও।

দিমিত্রভ রুশ ভাষা বলতেন গড গড় করে। বলতে পারি, খুব চমৎকার-ভাবে। তাঁর উচ্চারণে যে বালগেরীয় ঝোঁক তা তাঁর শব্দক্ষেপণে এক বিশেষ চমৎকারিত্ব যোগ করতো।

"দেখো, এই বিচারের প্রস্তুতি যেভাবে করা হয়েছে বা হচ্ছে তা আমি ঠিক ঠিক বোঝার চেষ্টা করেছি। বিশ্বাস করতে পারো, গোটা ব্যাপারটা বেশ কঠিন হবে, আর সবার ওপরে বলতে হয়। যে পৃথিবীতে এই ধরনের বিচার এই প্রথম। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ যুদ্ধ তৈরী করেছে।

কিন্তু কেবল দুইবার সে আক্রমণকারীদের তুলেছে বিচারের কাঠ-গড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেপোলিয়নের কথাই ধরো, কত অসংখ্যক লোককেই না সে হত্যা করেছিল! ফ্রান্স দেশে তাকে বলা হত "খৃষ্ট-বিরোধী", গীর্জা থেকে দৈব অভিশাপ দিয়ে তাকে সম্প্রদায়চ্যুত করার আদেশও দেওয়া হয়েছিল। ভিয়েনা তাকে শাস্তি দেবার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু কি হল? সেই 'খৃষ্ট-বিরোধী'কে কার্যতঃ উপহার দেওয়া হল এলবা দ্বীপ। আর তোমরা রুশরা ঠিকই বল 'স্মৃতিকথা লেখার' জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।" তিনি উঠে পড়লেন আর আমিও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, কেননা যে দশ মিনিট সময় তিনি বরাদ্দ করেছিলেন, তা অনেক আগেই শেষ হয়েছে। "উঁহু, যেখানে ছিলে, বোস। আমি যা বলছিলাম, তা শেষ করি। ১৯১৮ সনে আঁতাত ২য় উইলহেলম-এর বিচার করবে স্থির করেছিল কিন্তু আসলে বিমানে করে তার হল্যাণ্ডে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, যেখানে সে তার বাকী জীবনটা রাজার মত বিলাসে কাটাল। কিন্তু এমন ঘটলো কেন? কারণ আঁতাত ভুক্ত দেশগুলো উইলহেলমকে যদি দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিত, তাহলে পররাজ্য গ্রাস করার ধারণাই প্রতিপন্ন হত বে-আইনী আর তার ফলে আঁতাত ভুক্ত দেশের যে পররাজ্য আক্রমণ ও অধিকারের স্বপ্ন তা-ও খারিজ করতে হত। একটা অনুসরণীয় পূর্ব দৃষ্টান্ত তৈরী করতে তারা ভয় পেয়েছিল। বুঝে দেখো, ইতিহাস কেমন করে এটার ব্যাখ্যা করছে।"

তিনি যুবকের মত টেবিলে সোজা হয়ে বসলেন।

"তা ছাড়াও বুঝে দেখো, কত জটিল সমস্যার মুখোমুখি এই বিচারকে হতে হবে। একটা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যে কোন ধরনের আক্রমণ অভিযানকে বে-আইনী করতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। এ সমস্ত ব্যাপার তুমি, আমি এবং প্রতিটি কমিউনিস্টের কাছে জলের মত পরিষ্কার, কিন্তু মনে রেখো সোভিয়েতের ন্যায়পরায়ণতা আর বিচারবোধ, চারটির মধ্যে কেবল একটি কণ্ঠ। তোমাদের আইনজীবীদের প্রচুর ও কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। যদি বিচার শেষ হয়, আগ্রাসী আক্রমণকারীরা দোষী সাব্যস্ত হয়, আন্তর্জাতিক আইন যদি পররাজ্য আক্রমণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ও সে ঘোষণা যদি কার্যকরী হয়, তাহলে রাইখস্ট্যাগ, অর্থাৎ জার্মান সাম্রাজ্যের

ব্যবস্থা পরিষদের ওপর লাল পতাকা ওড়ানোর পর এটাই হবে তোমাদের দ্বিতীয় বৈজয়ন্তী।" তারপর তিনি প্রশান্ত, আত্মবিশ্বাসী স্বরে বললেন, "আমার দেখার খুব ইচ্ছে যে নাজীরা কেমন ব্যবহার করে, কিভাবে তারা তাদের আদর্শবাদের পক্ষ সমর্থন করে।" তিনি তাঁর হাত ঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন, "দুঃখিত। তোমায় অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, ভালো হোক।"

আটকে রেখেছেন! অভাবিতভাবে আমার অপরিচিত যে কাজের সুযোগ আমায় দেওয়া হয়েছে; বোঝার জন্যে তাঁর এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আমার কাছে চাবিকাঠির মত। তিনি আমায় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন, হাসলেন ও এক সার মজবুত ঝকঝকে দাঁত আভাসিত হল। "এই টিউনিকটা তোমার পক্ষে বেশ বড় হয়ে গেছে", তিনি বললেন, "শোন, যেসব লোক তোমার গাড়ির চাকার টায়ার নষ্ট করেছে তারা ধরা পড়ে আটক আছে। নীরেট গোঁড়া ফ্যাসিবাদী সব......তাহলে তোমার টিউনিকও বদলা নিল।"

আমি ভোরবেলার বিমানে জার্মানী গেলাম। মস্কো থেকে জার্মানী যাওয়ার পথে, ঠাশুায় তেল চবচবে নানা বাক্সের মধ্যে গাদাগাদি করে বসে, আর যুদ্ধের সময় শত্রুর সৈন্য সমাবেশের পিছনে প্যারাসুটে করে যেমনভাবে নামাতাম, অনেকটা সেইরকম অসুবিধাজনক বিমানাবতরণ, এই সবের ফলে আমাকে বোধ হয় হাঁদার মত দেখাচ্ছিল। যেহেতু আমার টিউনিক ছিল না, আমাকে আমার পুরো সামরিক উর্দি পরতে হয়েছিল, যেটার কলার ও হাতায় সোনালী বিনুনি করা। আমার রীতিমত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছিল। জামাটা ছোট, আঁটো, আর রোজকার কাজের জন্যে একেবারেই অচল। আর মাথার ওপর মুকুটের মত, কোমরে একটা রূপোর কোমর বন্ধনী বাঁধা। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমার ভ্রাতৃপ্রতিম লেখকরা এই বেঢপ পোশাকের জন্য কত মজার মজার মন্তব্যই না উৎসাহভরে করবে। আর সবাই জানে, ওদের এমন টুকটাক মন্তব্য করতে ওদের সবটুকুও সময় লাগে না। নতুন যে একটা করবো তারও সময় নেই। আমার স্ত্রী, মা, ছেলে আর ছোট্ট মেয়ে, যারা যুদ্ধের পর আমাকে ছাড়াই বড়ো হচ্ছিল তাদের বিদায়-চুম্বন দেবার সময়টুকু পেলাম কি পেলাম না, আমার সম্পাদকীয়-দপ্তর আমার থুতনি ধরে মস্কোর বাইরে পাঠিয়ে দিল। বিচার ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে আর বিপুল পরিমাণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বিচারের খবর পরিবেশন করার জন্য সংবাদপত্রে স্তম্ভের পর স্তম্ভ আলাদা করে রাখা।

বিমানে যেতে যেতে আমি ন্যুরেমবার্গ সম্পর্কে সামান্য যা জানতাম তাই আবার ভাবছিলাম। ভ্রমণ-সহায়ক বইগুলোতে যে চোখ বুলিয়ে নেবো, তার সময়ও পাই নি। শহরটির বিষয়ে আমি কি জানতাম? প্রথমতঃ জার্মানীর দক্ষিণ দিকে এক ক্যানালের ধারে এক শিল্পনগরী। মধ্যযুগে খৃস্টীয় ক্যাথলিক ধর্মীয় মতবাদ-এর কেন্দ্র। সুখ্যাত চিত্রকর আলব্রেখট ডুয়েরার এবং বিখ্যাত কবি ও ১৪-১৬ শতাব্দীতে জার্মানীর একজন পল্লী কবি ও গায়ক বিশেষ হ্যানস স্চ্যাস-এর সমাধিক্ষেত্র। আমায় ভাসা ভাসাভাবে আরও মনে পড়ল এখানেই কিছুদিন আগে কেউ একজন পৃথিবীর প্রথম পকেট ঘড়ি আবিষ্কার করে আরও মনে পড়ল যে একজন ফ্রেডরিক এক সময় বাস করতো ওখানে, ঠিক মনে নেই কোন ফ্রেডরিক, তবে তার ডাক নাম ছিল বারবারোসসা, যে স্বপ্ন দেখতো পৃথিবী বিজয়ের; আর বোধ হয় এই কারণেই এ্যাডলফ স্চিকলগ্রুবার, তার মানে হিটলার, তাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতো। আমি অবশ্যই জানতাম যে এই মধ্য-যুগীয় শহর পরিণত হয়েছিল নাজীবাদের সূতিকাগৃহ তথা দোলনায়। ড্রামের তালেতালে আর বাঁশির একঘেয়ে আওয়াজের সঙ্গে এর রাস্তায় রাস্তায় পদচারণা করত অগণিত মশালবাহী মিছিল। আর যারা ওই জাতীয় লোক নয়, তাদেরকে জনসমক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী বা বিশ্বাসঘাতক বা ওইরকম কিছু প্রতিপন্ন করার জন্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নিয়ে কুশপুত্তলিকা দাহ করে বহ্নুৎসব হত শহরের চতুষ্কোণ জায়গায় চারদিকে। জানতাম যে যুদ্ধের শেষে আমাদের পশ্চিমা মিত্রবাহিনীর বোমারু আক্রমণ শহরটাকে এমনভাবে ভেঙে সমতল করে দিয়েছে যে, শহরটা এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। জ্যাকব ভ্যাসার ম্যান-এর লেখা সেই ব্যাভারীয় রূপ কথার গল্প—ন্যুরেমবার্গের এক আপাপবিদ্ধ বালক সে জনবসতি রহিত মানুষ জন জাড়া এক জায়গায় বড় হয়ে উঠল, তারপর ক্রমশঃ এর দোষগুলিকে আত্মসাৎ করে নষ্ট হয়ে গেল—সেই গল্পটিকে নিয়ে তিনি বেশ জমানো এক উপন্যাস লিখেছিলেন, সে গল্পও আমি জানতাম। কিন্তু আমার পাঠানো সংবাদের জন্য এই বালক বোধ হয় আদৌ আমার কোন কাজ লাগবে না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে ন্যুরেমবার্গ-এর অন্যান্য "বালক"

তাদের আসল সত্তা তথা চেহারা অনেকখানিই যে খুলে দেখিয়ে ফেলেছে।

হ্যাঁ, আমি খুবই কম জানতাম, আর আমাকে পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকরা যারা তাদের কাজকে সূক্ষ্ম শিল্প পর্যায়ে উন্নীত করে ফেলেছে, তাদের সঙ্গে আমায় পাল্লা দিতে হবে। বড় কথা হল, বিচার ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের অন্যান্যরা এক নানা সত্য ঘটনার সংগে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে গেছে, কাজ শুরু করে দিয়েছে, নিজস্ব ভঙ্গী পেয়ে গেছে, আর চমৎকার সব কাজ করছে।

শ্যোয়ানেফেল্ড বিমান বন্দর, যেখানে আমাদের বিমান নামতো সেখানে সীমান্ত যুদ্ধে আমার পুরোন সঙ্গী, সামরিক বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও আমার *প্রাভদার* সহকর্মী ইভান জোলিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র আমার হাতে তুলে দেওয়ার পর সে আমায় বার্লিনে টেমপেলহোফ বিমান বন্দরে নিয়ে গেল। তারপর আমি এক আমেরিকান বিমানে চড়ে বসলাম ও অচিরে এ্যলুমিনিয়ামের পাত লাগানো নুরেমবার্গ বিমান বন্দরের বিমান ক্ষেত্রে উপনীত হলাম। একটা চমৎকার বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল আমার জন্যে। একদল লোক, যাদের প্রায় সকলেই সোভিয়েত সামরিক পোশাক পরা, বিমানটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। একমাত্র আমিই সোভিয়েত ব্যক্তি বিমানে ওরা কি সত্যি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? নিশ্চয়ই ওইতো আমার পুরোন বন্ধু, ক্যাপ্টেন ক্রুসিনস্কি *কমসোমোলস্কায়া প্রাভদার* যুদ্ধক্ষেত্রের সাংবাদিক প্রতিনিধি যে সব সময় সবচেয়ে বিস্ফারক জায়গায় বিস্ফোরক সময়ে উপস্থিত থাকত। ওই মানানসই ওভার কোট পরণে আর একটু উঁচু করে তোলা টুপি মাথায় ছোটখাটো লেফটানেন্ট কর্ণেল য়ুরি কোরোলকভ। আর আরও আছে, একটু পিছন দিকে সামরিক নৌবাহিনীর কালো পোশাক পরা, *ভয়েননো-মরসকয়* ফ্লুট (নৌবাহীর এক নৌ-বহর)-এর দ্বিতীয় পদমর্যাদার ক্যাপ্টেন লানিন, আর সুদর্শন লেফটানেন্ট কর্ণেল প্যাভেল ত্রোয়ানোভস্কি যে মেয়ে-তারপ্রেরণকারিণীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল তাই আমাদের আর সকলের চেয়ে ওর পাঠানো প্রতিবেদন চলে যেত দ্রুত। দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে, তাঁর চওড়া শিষ্ঠ মুখের সবখান হাসি ছড়িয়ে, মেজর তারাদানকিন বিমানটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁদের

মধ্যে অসামরিক লোক ছিলেন মাত্র একজন—কৃষ্ণকায়, কোঁকড়া চুল, পুশকিনের মত…আর দুনিয়ার সব কিছুকে হিংসা করা ভেঙচি কাটা হাসি মুখ, সেই প্রিয় মিখালাই গুস।……চমৎকার লোক এরা সবাই। দারুণ সব যুদ্ধ সাংবাদিক যারা রীতিমত খবরের বোমা ফাটায়। কেবল এদের সঙ্গে থাকার সময় তোমায় সাবধানে থাকতে হবে বাপু। তুমি যদি একবারও অন্যমনস্ক হও, তাহলেই রগড় করে তোমায় বেহাল করে ছাড়বে। আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যে ওরা কেউ কেউ তাদের কামড় দেওয়া ব্যঙ্গ কৌতুক করা ক্ষমতা, আর হাতে-কলমে মসকরা করার জন্যে বিখ্যাত ছিল। আমি সেইজন্যে যাতে ওরা আমার কোটের ওপর সোনালি বিনুনি দেখতে না পায় তার জন্যে আমার ওভার কোটটা টেনে চেপে নিলাম।

"অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা, আমাকে এভাবে নিতে আসার জন্যে আমার সত্যি কিন্তু অস্বস্তি লাগছে…"

"তোমার জন্যে আসিনি হে, আমাদের পার্সেলগুলো নিতে এসেছি", আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রুশিনস্কি।

ব্যাপার হল, যুদ্ধের সময় থেকে আমরা সাংবাদিকরা যে নিয়ম মেনে আসছি সেই অনুসারে আমি যাত্রা করার আগে, আমার স্ত্রী অন্য সাংবাদিকদের পরিবারবর্গকে ফোন করে, আর আমি তাই তাদের জন্যে এক বস্তা উপহার আর চিঠি নিয়ে এসেছি।

"এঃ হে, তুমি অমন ভোঁতা করে কথাটা বললে কেন? হাঁ খানিকটা তোমার জন্যও আমরা এখানে এসেছি," য়ুরি কোরোলকভ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল।

শৌখীন এক 'ফাদার ক্রীসমাস'-এর মতো চটপট পার্শেল আর চিঠিগুলো দিয়ে দিলাম। আমরা বিমান বন্দর ছাড়লাম। আমায় ঠেলে এক ডিলাক্স সেলুন কারে তুলে দেওয়া হল। আইন-বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত আমাদেরই একজনের কাছ থেকে এই উপলক্ষে গাড়িটা ধার করে এনেছে সেরগেই ক্রুশিনস্কি। ফ্রন্টের আমার পুরোন বন্ধু, সেই চিত্রশিল্পী ঝুকভ আমার পাশে বসল। তার পদবী ও পিতৃপুরুষের নামানুসারে নাম হল নিকোলাই নিকোলায়েভিচ। তার বন্ধুরা ডাকে কোলিয়া বলে। কিন্তু পশ্চিমা সাংবাদিক প্রতিনিধিদের মাঝে সাতদিন কাটাতে কাটাতেই সে একটা পশ্চিমা ডাক নাম পেয়ে গেল, 'কোকা-কোলা'। আমি এমন আর একজনও চিত্রশিল্পীকে

জানি না যে যদি মডেলের চাহনি তার পছন্দ হয়ে যায় তাহলে সেই মডেলকে নিয়ে তখুনি মগ্ন হয়ে কাজ শুরু করতে পারে। এর মধ্যেই গাড়িতে বসেই খুলে ফেলেছে তার চামড়া-বাঁধানো ছবি আঁকার খাতা, আর যেন নিশানা ঠিক করছে, এমনভাবে তার ছোট কিন্তু বাজপাখির মত চোখ কুঁচকে, আমাদের গাড়ি চালাচ্ছে যে সোভিয়েত সৈনিক তার মুখাবয়বের রেখাঙ্কন শুরু করে দিয়েছে।

"তারপর বন্ধুরা, সব কিছু চলছে কেমন? মজাদার তো? কাজ করার পরিস্থিতি সব কেমন?"

"পরে, পরে", নিজের ছবি আঁকা না থামিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ঝুকভ, "তুমি আমাদের কাছে মস্কোর গল্প করো।"

"আমি তো ওখানে ছিলাম না। আমি বাড়িতে মাত্র এক রাত কাটিয়েছি। আমায় কোথায় তুলবে ঠিক করেছো?"

"সেটা নির্ভর করছে তুমি কি হতে চাও তার ওপর, একজন বিগ উইগ না খালডেইয়ান।"

"একজন কি?"

"এক মিনিট দাঁড়াও হে", এই বলে দক্ষ কুশলী হাতে সৈনিকটির টুপির ফাঁক দিয়ে নেমে আসা ও লটকে থাকা হাল্কা বাদামী কেশ গুচ্ছ এঁকে ফেলল ঝুকভ, মোছামুছি করার জন্য রাবারের যেসব দাগ হয়েছিল সেগুলো তুলে ফেলল, আবার চোখ কুঁচকে দেখে ছবিটা তারিফ করে খুব তৃপ্তি সহকারে ছবি আঁকার খাতা পকেটে রেখে বলল, "এইবার, আমি তোমায় ব্যাপারটা নিয়ে বলবো।"

৩। বিগ উইগস ও খালডেইয়ানরা

বিচার যেখানে হচ্ছে সেখানে পৌঁছানোর জন্য আমার মাত্র ছ'দিন দেরী হয়েছিল, কিন্তু এতেই যে কত ক্ষতি হয়েছে তা মোটর গাড়িতে বসেই বুঝতে পারলাম। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্ত থেকেই তিনশোর বেশী খবরের কাগজের সংবাদদাতা, ফটোগ্রাফার, ক্যামেরাম্যান এবং চিত্রকর এসে, সকলে এখানে এক বিন্দুতে মিলেছে। তারা ইতিমধ্যেই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত

হয়েছে, বিচারের জায়গায় অস্বাভাবিক ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে ও নিজের নিজের সংবাদপত্রের জন্য প্রথম কিস্তির লেখা, ফটোগ্রাফ, হাতে আঁকা ছবি এইসব পাঠানোর সময় করে নিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনও তার নিজস্ব পথে স্থির হয়েছে। আর দেখে শুনে মনে হল সোভিয়েত সাংবাদিকরা অঞ্চলগতভাবে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়েছে, বিগ উইগস আর খালডেইয়ান।

আমাদের বিখ্যাত লেখক আর চিত্রকররা, যেমন ইলিয়া এরেনবুরগ, কনস্তানতিন ফেদিন, লিওনিদ লিওনভ, য়ুরি ইয়ানোভস্কি, সেমিওন কিরসানভ, ভ্‌সেভোলদ ভিশনেভসকি. কুকরিনিক্‌সি ও বোরিস ইয়েফিমভ পেশাদার সাংবাদিকদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সমাদর ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এইসব প্রসিদ্ধ বিখ্যাতদের বিলাসবহুল কিন্তু আধা ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্র্যাণ্ড হোটেলে রাখা হয়েছে. যেখানে আইন বিভাগীয় স্টাফেরাও কিছু-কালের জন্য আছেন। আমেরিকান সামরিক পরিচালন গোষ্ঠী, 'পেনসিল কিং' জোহান ফাবের-এর বিশাল অট্টালিকা সাংবাদিকদের জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন, যেখানে একটি প্রেস ক্যাম্পও ছিল, যা আমার বিবেচনায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্যকর। সোভিয়েত বেতার ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এই প্রাসাদে থাকতে দেওয়া হয়েছিল—প্রাসাদের কাছাকাছি ও চৌহদ্দির মধ্যে নানা বাড়তে। যেমন যে কোন ভৌগোলিক বিভাগের একটা যুৎসই নাম দরকার, তেমনি গ্র্যাণ্ড হোটেল, যেখানে মাতব্বর (বিগ উইগস) গোছের লোকেরা ছিলেন, সাংবাদিকরা সেটির নাম দিয়েছিলেন "বিগ উইগারি"। লেখকেরা কিন্তু ব্যাপারটা চুপ-চাপ হজম করলেন না, আর তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে ইয়েভগেনি খালডেই নামে একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সাংবাদিকদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন তারা প্রেস ক্যাম্পের নাম দিলেন "খালডেইয়ান ক্লাব"। আর সেই ক্লাবের সব সভ্য হল খালডেইয়ান।

"কিন্তু তোমরা আছো কোথায় ?"

"কেন, আমরা খালডেইয়ান", ঝুকভ উত্তর দিল। আর তার উত্তর দেওয়ার ধরনে মনে হল যে আমার প্রশ্নটাই তার আপত্তিকর মনে হয়েছে।

"তোমাদের ক্যাম্পে কি এখনো জায়গা আছে ?"

"আমি তো ইতিমধ্যেই তোমার ব্যবস্থা করেছি" ক্রুশিনস্কি পেশাদারী

ভঙ্গীতে আমায় জানাল। "আমরা একটা আলাদা বাড়িতে আছি যেটাকে আমেরিকানরা বলে 'রুশ প্রাসাদ'। বাড়িটা ফাবের-এর অট্টালিকার মূল বাড়ির বাইরে আর অনেকটা এবড়ো-খেবড়ো গর্তের মতন। আমাদের ঘরে চার জন আছে। তুমি হবে পাঁচ নম্বর। এতে কি তোমার চলবে না?"

"খুব চলবে, খুব। কিন্তু আজ কি আমরা বিচারের জায়গায় যেতে পারবো?" যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, বিচারালয়ের ভিতরে যাবার জন্যে, আর মিত্রজোট যাকে আখ্যাত করেছে "জনগণের বিচার" তা নিজের চোখে দেখার জন্যে খুব ইচ্ছা করছিল, আর হয়তো ভাবছিলাম যে যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তাহলে এখুনি একটা ছোট রিপোর্ট মস্কোতে পাঠিয়ে দোব। আমি বিস্মৃত চালককে সরাসরি বিচারের জায়গায় নিয়ে যেতে বললাম।

সংবাদদাতাদের জন্যে যে প্রবেশপত্র আছে তা আমি সেদিন জোগাড় করতে পারি নি। আমেরিকান কর্ণেল অ্যানড্রুস, যিনি কোর্ট এর সামরিক কম্যাণ্ডান্ট তাঁর দপ্তর ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার সোনালি কারুকার্য করা উর্দি, যেমনটি আর আগে কখনো দেখা যায় নি, একটু ছাপ ফেলে থাকবে। কর্ণেলের ব্যবহার খুবই সৌজন্যপূর্ণ। তিনি আমাদের কেবল চিনি মাখান বাদাম আর সিগারেটই দিলেন না, নিজে আমাদের সঙ্গে করে দর্শকদের গ্যালারীতে নিয়ে গেলেন, যেখান থেকে বিচারকক্ষ দেখা যায়। দর্শকদের গ্যালারী মান্যগণ্য ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলায় পরিপূর্ণ। আমাদের তিনি প্রথম সারিতে, আমেরিকান সামরিক উর্দি পরা মাঝবয়সী অতীব সুন্দরী এক মহিলার পাশে বসিয়ে দিলেন। মহিলার মুখ চেনা চেনা মনে হয়েছিল। আমাদের কাছ থেকে চলে যাবার আগে কর্ণেল জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার বাইনাকুলার চাই কিনা। তাছাড়া তিনি স্মারক হিসেবে আমায় বিচারকক্ষের একটি নকশাও দিয়ে গেলেন।

"ভালোমত জুতসই পোশাক করতে জানলে এমনি হয়," ক্রুশিনস্কি কথাটা পিছন থেকে ছুঁড়ে দিল। আমায় সঙ্গ দেবার জন্যে দর্শক গ্যালারীতে, পিছন দিকে ও বসেছিল।

আমি নীচু হয়ে স্থির দৃষ্টিতে বিচারকক্ষের দিকে তাকালাম আর দেখলাম সোভিয়েত, বৃটেন, আমেরিকান ও ফরাসী পতাকার নীচে এক

আয়ত টেবিলের পাশে বিচারকেরা বসে আছেন। ঘরের অন্য প্রান্তে ওককাঠের চতুষ্কোণ তক্তা দেওয়া আসামীর কাঠগড়ায় প্রতিবাদীরা। মৃত্যুর মত ভয়ংকর সবুজাভ আলো থই থই করছে। আমি দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, যুদ্ধের গোটা সময়টা আমরা লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী—যুদ্ধের গোড়ার দিকে ও শেষের দিকে—যে প্রিয় স্বপ্নকে বুকে স্থাপন করেছি, আমি কেমন সেই স্বপ্নের সত্য হওয়া চাক্ষুষ করছি। হঠাৎই আমার মনের চোখে একটা ছবি ঝলসে উঠল। ১৯৪২ সালে স্তালিনগ্রাদে ভোলগার ওপর সুতীব্র শীতের তীক্ষ্ণতা। কম্যাণ্ডার আলেকজাণ্ডার রোদিমতসেভের ১৩ নং গার্ডস ডিভিসনের সামরিক ঘাঁটি। আলেকজাণ্ডার রোদিমতসেভ ও তার বাহিনীর কয়েকজন নতুন বছরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। সেদিন ছিল হাড-কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা। ছুঁচ ফোটানো বাতাস, ভোলগার বরফ-টিলার ওপর দিয়ে শুকনো তুষার বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বাতাস। রেলের জন্যে নির্মিত বাঁধের গায়ে জলনিকাশী পাথুরে পাইপের মধ্যে যে অস্থায়ী আশ্রয় বা ট্রেঞ্চ, তার কাঠের দরজার বাতাসের ধাক্কায় ঘরঘর শব্দ হচ্ছিল। ফাটলের মধ্য দিয়ে বাতাসে বয়ে আসা তুষার যাচ্ছিল আর টেবিল হিসাবে ব্যবহার হয় সেই লম্বা প্রস্তর খণ্ডের ওপর রাখা মোমবাতির শিখাগুলো দপদপ করছিল। সেই টেবিলের ওপর চকোলেটের কয়েকটা লম্বা টুকরো আর কতকগুলো টিনের মগ রাখা ছিল। গর্জনকারী বাতাসে ভেসে আসছিল গোলা বিনিময়ের ক্রমাগত গুরু গুরু শব্দ। রণাঙ্গন খুবই নিকটেই। নিরাবরণ বাঁধ, যা ডিভিসনের সৈন্যরা রক্ষা করছিল তার প্রতিটি অংশ রাইফেলের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল।

আমরা টেবিলে বসে দেখছিলাম বিধ্বস্ত বিমান থেকে পাওয়া একটা ঘড়ির জলজ্বলে কাঁটা ধীরে ধীরে বারোটার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা নতুন বছর উপলক্ষে মদ্যপানের সময় কার স্বাস্থ্য প্রথম পান করবো তাই নিয়ে তর্ক শুরু করলাম।

"স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে তারা চরম পরাজিত হোক, এ সময় তার জন্য পান করি।"

"হেঃ, স্তালিনগ্রাদের লড়াই তো ঝোলার মধ্যে চলেই এসেছে। যারা আমাদের দেশ থেকে তাড়া খেয়ে বার্লিন পর্যন্ত পালিয়েছে, তার জন্য স্বাস্থ্য পান করি," কর্কশ গলায় একজন কর্নেল বলল যার ত্রিকোণ পাণ্ডুবর্ণ

পেশী হঠাৎইও দ্রুত সংকুচিত হচ্ছিল। তিনি সম্প্রতি নিকটে গোলা ফাটার শব্দে শক পেয়েছেন। "হিটলার, গোয়েরিং আর হিমলারদের ধরা হয়েছে আর তাদের ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের সামনে দাঁড় করান হয়েছে। এসো আমরা তাদের সকলের স্বাস্থ্য পান করি।"

"ফায়ারিং স্কোয়ার্ড ওদের পক্ষে খুব ভালো কিছু হয়ে যাবে। ওদেরকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো, সেটাই ঠিক হবে।" এ কথা বললেন আমরা যার অতিথি, তিনি। হালকা ফারে ছাওয়া ছোট্ট ওভারকোট গায়ে মানুষটিকে দেখে খুবই অল্প বয়সী মনে হয়, যদিও স্পেনে যুদ্ধ লড়ে আসার মতো যথেষ্ট বয়স তার হয়েছে। তিনি তাঁর মদভর্তী মগটি তুললেন যার মধ্যে তুষারকণা মিশে আছে।

আমাদের চোখ ঘড়ির ওপর। শীতার্ত, আমাদের সবুজ হাতগুলি পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল। আমরা, স্তালিনগ্রাদ রক্ষাকারী সৈনিকেরা, আমাদের স্যাম্পেন. সেই মেঘাচ্ছন্ন, তুষার মিশ্রিত মদ ঝাঁকাতে লাগলাম ও কোনক্রমে টিনের থেকে আস্তে আস্তে বার করলাম। আমি হঠাৎ চারপাশের নীরবতা, যা অনুভব করা যাচ্ছিল তার দ্বারা আচ্ছন্ন হলাম। নদীর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের হু হু শব্দ পাচ্ছিলাম। এখানে নীরবতা ছিল ভয়ঙ্কর। তার মানে একটা দারুণ ঝড় ঘনিয়ে উঠবে। ঘড়ির মিনিটের কাঁটা তখনও বারোর ঘরে, যখন এক শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হল। আমরা সকলে লাফ দিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়লাম আর খুব দ্রুত তৈরী হয়ে নিলাম। ১৯৪৩ সন সদ্য আগত—ভবিষ্যৎ অজানা।

আমার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনী আমায় ইংরাজীতে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তার সুরেলা গলা আমাকে সেই সুতীক্ষ্ণ শীতের রাত্রের অস্থায়ী আশ্রয় থেকে আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণকারী মহান লড়াইয়ের দিনগুলির থেকে আমাকে সবুজ মর্মর আর ওক কাঠের তক্তা দেওয়া এই বিশাল ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এল যেখানে অপরাধীরা, যারা যুদ্ধ শুরু করেছিল ও সারা পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বইয়েছিল তারা, আসামীর কাঠগোড়ায় নত হয়ে বসে আছে আর শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছে। আমার পার্শ্ববর্তিনী আমি কেন চুপ করে আছি বুঝতে না পেরে তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। আর তার উত্তরে একটিমাত্র ইংরাজী বাক্য যা আমার জানা ছিল আমি তাই বললাম, "আমি ইংরাজী জানি না।"

সোভিয়েত জনসাধারণের স্বপ্ন সত্য হয়েছে। সেখানে, ভল্গার তীরে ফ্যাসিবাদী জানোয়ারদের শিরদাঁড়া সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়েছে, বার্লিন পৌঁছেচে এবং ফ্যাসিবাদের দুর্গের ওপর নিজেদের পতাকা উড্ডীন করেছে। নাৎসী নেতারা ধরা পড়েছে ও কর্মফলের জন্য অপেক্ষা করছে।

"বলতে কি হিটলারের সরকারের সকলেই এখানে বিচারাধীন", পিছন থেকে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ক্রুশিনস্কি বলল।

হ্যাঁ, সে ঠিকই বলেছিল। এখানে নুরেমবার্গে, অখ্যাত *পারটেই টাগস্*-এ সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলে হয়ত একেবারে ঠিক ঐসব জায়গাতেই তারা বসত। কেবল হিটলার, হিমলার আর গোয়েবলস্‌কে ধরা যায় নি। আমাকে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছিল যে, বিচারের একেবারে শুরুর থেকে প্রতিবাদীরা তাদের পক্ষের আইন উপদেষ্টারা তৃতীয় রাইখের আমলে অনুষ্ঠিত জঘন্য সব অপরাধের দায় ঐ অনুপস্থিত তিনজনের উপর চাপানোর চেষ্টা করেছে।

যেহেতু ইতিপূর্বেই হয়ত আমি সংবাদপত্রের ব্যঙ্গ চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম আমার হঠাৎ মনে হল কতই না নিরীহ, বরং আমার বলা উচিত কতই না ভদ্র ওইসব আসামী প্রতিবাদীদের দেখাচ্ছিল। ভয় পাওয়ার মতো বা বিতাড়িত করার মতো কিছুই ছিল না। নানা বয়সের কয়েকজন ভদ্রলোক দুটি সারিতে বসে মনোযোগ দিয়ে কিছু শুনছিলেন, অথবা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, তাদের সামনে রাখা ডেস্কের কাগজের ওপর টুকটাক কিছু লিখছিলেন কিংবা বেড়ার ওপারে একটু নীচে বসা তাদের আইন উপদেষ্টাদের হাতে কাগজের ওপর মন্তব্য লিখে দিচ্ছিলেন। যাই হোক, প্রথম সারির ডানদিকে ধূসর স-লোম চামড়ার উর্দি পরা চমৎকার দেখতে মোটা লোকটি আর কেউ নয়, জার্মানীর নাৎসী নম্বর দুই, হেরম্যান গোয়েরিং, যে রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। অস্ট্রিয়া এবং চেকস্লোভাকিয়াকে গ্রাস করে জার্মানীর আয়তন করেছিল, লণ্ডন, লেনিনগ্রাদ আর মস্কোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার হুমকি দিয়েছিল। ঐ রোগা লোকটি যার মুখের গড়ন খুলির মত সে হল রুডলফ হেস, নাৎসী পার্টিতে হিটলারের ডান হাত। আর ভীষণ পৈশাচিক *মেইন ক্যামফ*-এর সহরচয়িতা। ঐ লম্বা মাননীয় ভদ্রলোকটি হল জোয়াচিম ভন রিবেনট্রপ, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সৃষ্টির 'মগজ'। ঐ লম্বা অফিসার যার মুখ

অনমনীয়, চৌকাকৃতি, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান সে হল ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম কেইটেল, হিটলারের পররাজ্যগ্রাসী পরিকল্পনার সহ রচয়িতা। তুমি কেবল তাদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবে না যে তারা হল, সেই সমস্ত ভয়ানক শয়তান যাদের রক্তাক্ত অপরাধ সারা পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ধরে বিভীষিকা আর দৌরাত্ম্য ছড়িয়েছে। বিচার কক্ষে যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশী অবাক করেছিল তা হল এইসব অপরাধী প্রতিবাদীদের শান্তিপূর্ণ আর সাধারণ চেহারা।

তারপর আইনের সাহায্যে প্রতিবিধানের ব্যবস্থাদি পদ্ধতি অনুসারে চলতে লাগল। সেদিন সাক্ষীদের এজাহার শোনা হচ্ছিল তাদের মধ্যে দুজন বন্দী-শিবিরের বর্ণনা দিচ্ছিল এবং বলছিল কিভাবে, কি উপায়ে মানুষদের বন্দী-শিবিরে হত্যা করা হয়েছে; শুনতে শুনতে আমার মনে হল যে কেবল এই অপরাধগুলির জন্যেই সমস্ত অপরাধী প্রতিবাদীকে নিয়ে আর বিন্দুমাত্র হৈ-চৈ না করে এখুনি ফাঁসি কাঠে পাঠানো উচিত। বিচারকদের সভাপতি মহামান্য স্যার গিওফ্রে লরেন্স, আঁটো সাঁটো গড়ন, বয়স্ক মানুষ, বড় মাথা আর কপালে চকচকে টাক, তাদেরকে আস্তে আস্তে এগিয়ে দিলেন এবং পক্ষ সমর্থনের জন্যে সাক্ষীদেরকে ছোটখাটো পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপারে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে যদি এইভাবে বিচার চলতে থাকে তাহলে আমি এই জায়গায় বেশ কিছুদিনের জন্যে আটকে যাব, আর তখুনি মস্কোতে আমার ভালবাসার জনদের কাছে ফিরে যাবার জন্যে আমার খুব ইচ্ছে করতে লাগল।

আর তাছাড়া সেই পাণ্ডুর এমনকি খানিকটা নিপীড়নকারী আলো, যা সব কিছুতেই মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর সবুজাভ রঙ ছড়িয়ে দিয়েছিল, তাতো ছিলই। আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অপরাধীদের কথা বলতে গিয়ে, আমাদের নতুন পরিচিত কর্ণেল এ্যানড্রুজ সাংবাদিকদের স্পষ্টই বলেছিলেন, "আমি দেখব যেন ওদের মধ্যে একজনও আর সূর্যের আলো আবার না দেখে।" বন্দীরা যে বাড়িতে বিচারকক্ষ সেই 'প্যালেস অব জাস্টিস' বাড়িটিতেই ছোট ছোট কক্ষে থাকত। সেই সমস্ত কক্ষেও কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা ছিল আর বন্দীদের কারাগার থেকে বিচারকক্ষে আনার সময় নিয়ে আসা হত বিশেষভাবে তৈরী এক সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে, যেখান থেকে পালাবার কথা একেবারে ধারণাও করা যায় না।

প্রথম দিন বিচার দেখে যে ভাসা ভাসা ধারণা আমি লাভ করেছিলাম এই হল তার সার কথা। এ আদৌ যথেষ্ট নয়, কেননা এর থেকে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন তৈরীও সম্ভব নয় বিশেষতঃ আমাকে যেখানে এরেনবুর্গ, লিওনভ এবং ফেদিনের মতো ডাকসাইটে সাংবাদিক আর লেখকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

বিরতির সময় নীচে নেমে সোভিয়েত প্রেস কেন্দ্রে যাব বা অন্ততপক্ষে 'প্রেস বক্সে', সে আশা আমার মিটল না। আমেরিকান সৈন্যরা যারা সামরিক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে প্রবেশপত্র খুঁটিয়ে দেখছিল—তাগরাই, লালচে গালের লোকগুলো ঝকঝকে হেলমেট আর পায়ের নীচের দিকে সাদা গাটার জড়িয়ে—তারা তাদের উর্ধতন অফিসার যেমন করেছিলেন তেমন কিছুই করল না। অর্থাৎ আমার পোশাক সম্পর্কে তারা কোন কৌতূহল বা সম্ভ্রম কিছুই দেখালো না. হাসল, কিন্তু গোঁয়ারের মতো আমার পথ আটকে থাকল। আমার সাংবাদিক বন্ধুরা, যারা দেখতে পেয়েছিল যে আমি দর্শক গ্যালারিতে আটকা পড়ে গেছি তারা পথ করে ওপরে উঠে এল, আর আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম, ঠিক যেমন কালিনিন, ব্রিয়ানস্ক, স্তালিনগ্রাদ, প্রথম অথবা দ্বিতীয় ইউক্রেনিয়ান ফ্রন্টে দেখা হওয়ার সময় আমরা পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি। বিদেশীরা, যারা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল তারা আমাদের এই আলিঙ্গন বিস্মিত চোখে দেখছিল। তারপর আমার বন্ধুরা সবাই মিলে আমাকে টানতে টানতে ঝিকিমিকি মার্বল পাথর আর নিকেলের ঝকঝকে পানশালায় নিয়ে গেল। যেখানে লম্বা পায়ের সুন্দরী মেয়েরা যাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ থেকে উঠে লাফ দিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছে. তারা অতিথিদের কফি, ফলের রস এবং অবশ্যই কোকা-কোলা, যা কিনা আমেরিকানদের জীবনযাপন পদ্ধতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেছে, পরিবেশন করছিল।

ঘটনাচক্রে পানশালায় এক জনতার ঠিক মধ্যিখানে আমি আমার প্রতিবেশিনী মনোহারিনী সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পেলাম। তিনি উষ্ণ হাসি এবং বদান্যতার সঙ্গে লেখার প্যাড, ভিজিটিং কার্ড এমন কি হোটেলের মেনুর কাগজে নিজের সই দিচ্ছিলেন।

"উনি কে ?" আমি *প্রাভদার* একজন ফটোগ্রাফার ভিক্টর তিওমিনকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"একি তুমি জানো না !" সে আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "উনি মেরলিন দিয়েত্রিক।"

যখন বিচার সভা আবার শুরু হল আমি ফিরে গিয়ে আবার প্রথম সারিতে আমার বিখ্যাত প্রতিবেশীনির ঠিক পাশে নিজেকে দেখতে পেলাম। তাঁর কানে লাগানো বেতার যন্ত্রটি ছাড়াই তিনি বসে ছিলেন, ক্লান্তভাবে বিচারকক্ষের দিকে তাকিয়ে। তারপর তিনি তাঁর ঝোলা থেকে "ফ্রুট ড্রপ" বার করে একটি নিজের মুখে ফেলে দিলেন আর কিছু আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি একটি নিলাম এবং বেশ সাহস করে নুরেমবারগে এসে যে দ্বিতীয় ইংরেজী বাক্যটি আমি ইতিমধ্যে কোনক্রমে শিখেছিলাম সেটি বললাম, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ"। আমি জানি যে আমার উচ্চারণ অদ্ভুত হয়েছিলো, কিন্তু এই ভেবে আমি খুবই তৃপ্ত ছিলাম যে এই সুবিখ্যাত অভিনেত্রীর সামনে আমি হাঁদার মতো আচরণ করি নি।

সেদিনের মত বিচার মুলতুবি হওয়ার পর, দিনের শেষে, একটা সামরিক ভ্যান গাড়ির, যে গাড়িটা বিচার বিভাগীয় কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও প্রেসের লোকজনদের তাঁদের নিজেদের ঘরে পেঁ াছে দিচ্ছিল, কাছে বাকী অন্যান্য সোভিয়েত সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। যাঁরা আমার সঙ্গে বিমান বন্দরে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন '*কমসোমলসকায়া প্রাভদার*' কৌতুকবিদ সদাশয়, চিন্তাশীল ও বিষণ্ণ অপদেবতা সদৃশ সেমিওন নারিনইয়ানি, '*তাস*'-এর সংবাদদাতা বোরিস আফা-নাসিয়েভ, আর ডানিল ক্রামিনভ, *ইজভেসতিয়ার* লোক মিখাইল ভলগো-পোলভ এবং অন্যান্য সব সংবাদপত্রের আরও অনেক কমরেড যাঁদের সঙ্গে আমার আগে সাক্ষাৎ হয় নি। সোনালি কারুকার্য করা আমার পোশাক নিয়ে অনেক হাসি তামাশার পর আমরা সেই বিরাট ভ্যানে চড়ে বসলাম। সেদিন গোয়েরিংকে কেমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল সেই নিয়ে তারা তখুনি কথা বলতে আরম্ভ করল—ঘুমপাড়ানি মাদক বোধ হয় আবার তার কাছে চোরা পথে পেঁ াছে দেওয়া হয়েছে। সাগ্রহ আন্তরিকতায় সেমিওন নারিনইয়ানি বলল।

"ফাঁসিকাঠে যখন ঝুলবে, তখন ওকে আরও ভাল দেখাবে !"

সন্ধ্যায়, রাতের খাওয়ার পর, স্থানীয় অলিখিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি আমার ভ্রাতৃপ্রতিম সাংবাদিক বন্ধুদের পানশালায় নিয়ে গেলাম। একটা নতুন কাজের জায়গায় যাবার সময় মস্কো ছাড়ার আগে, আমি সব সময় এক বোতল ভোদকা সঙ্গে নিতাম। আমার কিটব্যাগের এক কোণে আনডারওয়ার আর, রুমাল ইত্যাদির সঙ্গে থাকত সেই চমৎকার "একোয়া ভিটেই," অবধারিতভাবেই এই বস্তুটি অবশ্যই কেনা হত, যদিও দোকানে এর দাম ছিল খুব চড়া। কিন্তু এখন, যখন স্বর্ণভিত্তিক জীবিকায় আমাদের পকেট মারকে ঠাসা তখন আমার সহকর্মীদের সঙ্গে পান না করার কি যুক্তি থাকতে পারে? আমরা বসে পান করলাম আর স্যাণ্ডউইচ আর কেক খেলাম। বিদেশী সাংবাদিকরা কৌতূহলী হয়ে ওপাশ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখল কিভাবে আমরা আমাদের জাতীয় সেই তরল অগ্নি শেষ করলাম, কেন না জিন আর হুইসকিও এখানে খুব সাবধানে খাওয়া হয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে আর প্রচুর বরফ দিয়ে।

স্থানীয় এই পানশালাটি যুদ্ধের লোকদের পরিচালিত এবং খুব সম্ভবতঃ ডেভিড নামে সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসিখুসি এক আমেরিকান এর মালিক, যে ফৌজী উর্দি পরে—ডোরাকাটা এন-সি-ও লেখা দেখা যায়—সরাইখানার পিছনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল।

পানীয় মিশিয়ে ককটেল করা—এইসব ডেভিড এমন চোস্তভাবে করছিল, দেখে মনে হচ্ছিল যে বোতল, মদের গ্লাস আর মগগুলো যেন তার তৎপর হাতে নাচছে। তার পিছনে ছিল এক লম্বা পোস্টার যাতে সব ককটেলের নাম লেখা। দারুণ দারুণ সব নাম, "ব্লাক ক্যাট", "মানহাটান," ব্লাডি মেরী", এবং এই রকম আরও অনেক। তালিকার একেবারে শেষে, আমাকে যেমন বোঝানো হয়েছিল, লাল অক্ষরে দাগানো একটা নতুন ককটেলের নাম ছিল, যেটি শ্রীযুক্ত ডেভিড বিশেষ তৃপ্তি সহকারে সুপারিশ করলেন। ককটেলটার মনে হল যেন রুশীয় নাম, যার শেষ অক্ষরগুলি হল... 'ওভকা' খুব সম্ভবতঃ আমার সহকর্মীদের পদবী থেকে এটি এসেছে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

আমরা যখন আমাদের ডেরায় ফিরে এলাম তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। আমিতো আগেই উল্লেখ করেছি যে সোভিয়েত প্রেসের লোকেরা প্রধান অট্টালিকা ভবনের বাইরে ছিল একটা খুব সাধারণ ছোট্ট চটির মত ঘরে,

যেখানে একদা কবছর পেনসিল কারখানার শ্রমিক আর কেরানীরা ঘন ঘন যাতায়াত করত। নীচের দিকের অর্ধেক জায়গায় এক ধরনের আমেরিকান সামরিক পরিচালন দপ্তরের দখলে, আর ওপরের ছোট ঘরগুলোকে সোভিয়েত সাংবাদিকদের আবাসে পরিণত করা হয়েছে। ফেরার পথে খালডেইয়ানরা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলল কিভাবে রুশীয় সারল্য তথা ছলাকলাহীনতা আর আমেরিকান উদ্যোগের সম্মানে ককটেলটির এমন একটি অদ্ভুত নাম দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপার হল প্রেসের সম্মানে এক সান্ধ্য অভ্যর্থনা সভায় আমাদের সহকর্মী কোস্তিয়া. টি. বোধহয় খুব আমোদ পেয়েছিল আর তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই পরদিন সকালে সে খুব তৃষ্ণায় ভুগছিল। সেই সেদিন প্রথম প্রাসাদে এল এবং তখন পানশালায় আর কেউ ছিল না। শ্রীযুক্ত ডেভিডকে নানারঙের লেবেল আঁটা প্রলুব্ধকারী বোতলগুলির মাঝে খুবই বিরক্ত দেখাচ্ছিল, আর কোস্তিয়া ঠিক করল যে শ্রীযুক্ত ডেভিডের সঙ্গে একটু মজা করতে হবে।

"একটা ককটেল দিন, দয়া করে।"

"কোন ককটেল?"

"আপনি এখনো সেটা জানেন না।"

"আমি পৃথিবীর সব ককটেল জানি"

"এইটা জানেন না। এটার একটা বিশেষ পারিবারিক উপাদান আছে যা আমি আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।"

তারপর সে এলোপাথারিভাবে বিশেষ করে চড়াধাতের উপাদান চালাতে লাগল। যখন সে ঝাঁকানি-পাত্রে সেগুলি ঢালছে তখন বাড়তি আগ্রহ নিয়ে শ্রীযুক্ত ডেভিড, খুব মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে লাগল আর পরিশেষে সংক্ষেপে লিখে নিতে আরম্ভ করল। একেবারে শেষ উপাদান হিসাবে কোসতিয়া ঝাঁকানি-পাত্রে একটা জলপাই দেবার হুকুম করল আর পুরো এক চামচ সরষে তার মধ্যে ছুঁড়ে দিল। সমস্ত উপাদান লেখা হয়ে গেলে পর পানীয় পরিবেশক খুব তাড়াতাড়ি সেইসব একসঙ্গে ঝাঁকাতে লাগল আর তারপর সেই থকথকে বাদামী মিশ্রণকে একটা গামলায় ঢেলে ফেলল। কিন্তু সে হাল ছেড়ে দিল না। দেখে মনে হল বস্তুটা পান করা যায়। সে এক চুমুকে সেই ভীতিপ্রদ মিশ্রণ গলায় ঢেকে দিল এবং গামলাটিকে নিভিয়ে আবার টেবিলের ওপর রেখে দিল। উৎফুল্ল পানীয় পরিবেশক জানতে চাইল,

"মাফ করবেন, মহাশয়, আপনার নাম কি ?"

আমাদের বন্ধু নিজের নাম বললেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় আদৌ জানতেন না যে এই কৌতুক থেকে কি বার হয়ে আসবে। সেদিনই সন্ধ্যায় ককটেলের তালিকার শেষে লাল অক্ষরে "...ভডকা" হাজির। উপস্থিত রসিকেরা তৎক্ষণাৎ এর যথার্থ প্রাপ্য প্রশংসা দিয়ে বস্তুটির তারিফ করলেন আর বস্তুটি খুব "জনপ্রিয়" হল। আমরাও এটা খেয়ে দেখলাম : সত্যি কথা বলতে কি, তেমন কিছু দুর ছাই নয়। একমাত্র লেখক যে এই জিনিসটির প্রস্তুতকারী সেই বস্তুটিকে দুচোখে দেখতে পারত না কেন না তার আবিষ্কারের খ্যাতি গ্র্যাণ্ড হোটেলেও পৌঁছেছিল আর কৌতূহলী হয়ে 'বিগ উইগ'রা প্রেস ক্যাম্পে ঘুরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করল। কৌতুক যেন উড়ে বেড়াতে লাগল। খ্যাতির ভার আবিষ্কারকের ওপর বেশ ভারী হয়ে চেপে বসল।

ক্রুশিনস্কির ঘরে আমি হলাম পঞ্চম ব্যক্তি। একজন ঘুমের ঘোরে তার নাক ডাকার জন্যে মাফ চাইল আর জানতে চাইল যে আমার অসুবিধে হবে কিনা। আমি আমার ঘরের অন্য আবাসিকদের এই বলে আশ্বস্ত করলাম যে নাক ডাকায় আমি একা তাদের সকলকে হারিয়ে দিতে পারি, তারপর নিজের শরীরে কম্বল চাপা দিলাম। ক্রুসিনস্কি তার টাইপরাইটারটা তুলে নিয়ে বাইরে বারান্দায় গেল আর অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেলাম যে সে টাইপ করেই চলেছে। এইভাবে ন্যুরেমবার্গে, যেখানে জনগণের মহান বিচার চলছে সেখানে আমার প্রথম দিন কাটল। ন্যুরেমবার্গ শহরটিও আমি ঘুরে দেখতে পারি নি। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ, এখনো পর্যন্ত আমার পাঠানো প্রথম বিবরণের জন্য একটাও আনকোরা মৌলিক সত্য ঘটনা জোগাড় করতেও পারি নি।

৪। সেই অদৃশ্য সাক্ষী

পরদিন খুব সকালে, ফেবার প্রাসাদের গ্র্যাণ্ড-হলে আমরা প্রাতরাশ খেতে যাবার আগে, যেখানে 'পেন্সিল কিং' হিটলার ও তার অনুগামীদের নৈশভোজে আপ্যায়ন করতেন—এরকম বলা হয়েছিল, আমাদের

ঘরের বারান্দায় নিকোলাইঝুকভ তার নিজের কাজের এক ধরনের প্রদর্শনী সাজিয়ে রেখেছিল। সে ছিল খুব দিলখোলা লোক এবং নিজের উল্লেখযোগ্য কাজ আর আনন্দ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে উপভোগ করত। সেদিন সে মেঝের ওপর তার প্রায় তিন ডজন স্কেচ আর ছবি সাজিয়ে রেখেছিল—আর আমাদের আহ্বান করল সেগুলি একবার দেখতে।

এই অপূর্ব শিল্পীকে আমি যুদ্ধের শুরুর থেকে জানতাম—যখন কালিনিন-এর কাছে তুষার ঢাকা জঙ্গলে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি তার জীবন তৃষ্ণাকে জানতাম এবং জানতাম তার চির-পিপাসিত শৈল্পিক তাগিদকে যার জন্য সে তার ছবি আঁকার খাতা এমন এমন সময় বার করত যে মুহূর্তগুলিকে মনে হত নিতান্তই অনুপযুক্ত—খাওয়ার টেবিলে, সামরিক কম্যাণ্ডের সঙ্গে কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে, এমন কি পার্টির সভা চলাকালীন সময়েও। বিষয়বস্তুর ভিতর থেকে মানবিক নির্যাস টেনে সেটি প্রকাশিত করার তার অসাধারণ প্রতিভার কথাও আমি জানতাম—যদিও তার পরিবেশনায় ভিত্তিগত বা মূল বিষয়ের সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতাকে সে ধরে রাখত, কখন কখন একজন লোকের গভীরে যা লুকোন আছে তাই ফুটে উঠত তার ছবিতে, যদিও যার ছবি, সেই পুরুষ বা মহিলা, নিজেই সেই দিকটি সম্পর্কে অবগতই ছিল না।

তার আঁকা অপরাধী প্রতিবাদীদের যে সমস্ত স্কেচ সেদিন সে আমাদের দেখাল, তাতেই বুঝলাম যে সে পথ করে করে কেমন তার বিষয়ের গভীরে যেতে পারে। ওই সমস্ত অপরাধী প্রতিবাদী, যাদের দেখে আমার প্রথম ধারণা হয়েছিল একদল শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক, তারা শিল্পীর সৃষ্টিশীল তুলির ছোঁয়ায় নিজেদের ভিতরের আসল রঙ খুলে দেখাচ্ছিল। সার সার দুর্বৃত্ত, নৈতিকভাবে দুশ্চরিত্র ও উন্মাদদের এ এক চিত্রশালা, যারা এক সময় অপরিসীম ক্ষমতা হাতে পেয়েছিল আর কোন রকম দ্বিধা না করে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল, ধ্বংস করেছিল ভেবে চিন্তে, মাথা ঘামিয়ে নানা রকম পন্থা বার করে। আর কেবলই ক্রমাগতভাবে এইসব করে যাচ্ছিল বিলকুল ঠাণ্ডা মাথায়। ঝুকভ তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক করে নি। সে কেবল তার রেখায় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিয়েছিল, আর স্বাভাবিকভাবেই তাদের শয়তানী প্রকৃতি তাদের মুখে ফুটিয়ে দিয়েছিল।

যাই হোক, একজন শিল্পীর কাজকে কথায় বর্ণনা করে পৌঁছে দেওযার প্রয়াসের মতো বৃথা চেষ্টা আর কিছু নেই। সেগুলি নিজের চোখে দেখা দরকার আমি আশা করি একদিন এই স্কেচগুলির অ্যালবাম প্রকাশিত হবে, আর জনসাধারণ যারা শান্তিপূর্ণ সুখের সময়ে বসবাস করছে তারা দেখতে পাবে, যেমন বিষযবস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর চোখে আমরা দেখেছি সেই সমস্ত মানুষকে যারা একদিন ইউরোপে—পৃথিবীর সব চেয়ে ঘনবসতি-পূর্ণ এবং সুসভ্য অঞ্চলে—রক্ত ঝরিযেছে। আমার দিক থেকে ভবিষ্যতের দর্শকদের কাছে আমি এই কথা বলতে পারি যে আমি যখন আবার ট্রাইবুনাল বিচার-কক্ষে, প্রেস-বক্সের ডানদিকে কাঠগড়া থেকে কয়েক গজ দূরে আমার জন্য নির্দিষ্ট আসনে ফিরে গেলাম, আমি শিল্পীর চোখে অপরাধী প্রতিবাদীদেব দেখতে পেলাম, তখন তাদের বাহ্যিক ভদ্র ভদ্র চেহারা আর আমায ফাঁকি দিতে পারল না।

ন্যুরেমবার্গ বিচারে

নিকোলাই ঝুকভ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হল তখন আমার বযস তেত্রিশ। *"মার্কস ও এঙ্গেলস-এর পূর্বস্মৃতি"* এই গ্রন্থের চিত্রাযন—আমার জীবনের প্রথম বড কাজ—আমি তখন সদ্য শেষ করেছি। কাজটা করে আমি নিজেকে বেশ উন্নত আর সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে পূর্ণ বলে বোধ করছি। যুদ্ধ আমাকে আমার কাজ করার সুখ আর আমাব দক্ষতা বাডানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল, আর আমাকে ছুঁডে দিল বিভীষিকা আব মানবিক দুর্ভাগ্যের জগতে।

যুদ্ধের শুরুতে আমি মোলোডেচনোতে* ছিলাম। ফ্যাসিস্তদের পররাজ্য আক্রমণের প্রথম অধ্যায ও আমাদের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ আমি প্রত্যক্ষ করলাম। মোলোডেচনো থেকে মস্কোর উপকণ্ঠ পর্যন্ত সারাটা পথ আমি সেনাদলের সঙ্গে ছিলাম, আর সত্য সত্যই বলতে পারি যে পশ্চাদপসরণের তিক্ততার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা

* বাইলোরাশিয়াতে একটি শহর।

আমার আছে। শত্রুর মর্টার, গোলন্দাজ বাহিনীর কামান, শিলা-বৃষ্টির মত গোলা আর আদিম-বর্বর-হিংস্র বোমাবর্ষণের মধ্যে আমি অনেকবার ছিলাম আর কখনোই অবশ্য ভাবিনি যে আমি বেঁচে থাকব বা আমার প্রিয় কাজে ফিরে আসতে পারবো। যদি তখন আমাকে বলা হতো যে ন্যুরেমবার্গ বিচারে অন্যদের মধ্যে আমিও একজন '*প্রাভদা*'র প্রতিনিধি হবো, গত যুদ্ধে মানুষের অসহ্য দুঃখ কষ্টের জন্যে যারা দায়ী তাদের প্রতিকৃতি আঁকার কাজে আমায় নিয়োগ করা হবে, তাহলে আমি তা বিশ্বাস করতাম না।

আমি এখন আবার নতুন করে এইসব কথা মনে করছি কেবল সাগ্রহে, তীক্ষ্ণভাবে আমার সগর্ব আনন্দ আর চূড়ান্ত জয়ের অনুভূতির অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যা আমার হল, যখন আমি ন্যুরেমবার্গ বিচার দেখতে বসে আবার হাতে পেনসিল তুলে নিলাম। এটা সেই পেনসিল নয় যা দিয়ে আমি মার্কস, এঙ্গেলস আর রাশিয়ার শান্তিময় নিসর্গ চিত্র এঁকেছি। এটা সেই পেনসিল যা আমি যুদ্ধের চার বছর ব্যবহার করেছি আর সেই কারণেই এটা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান কেবল একজন শিল্পী হিসেবেই নয় বরং প্রথম ও প্রধানতঃ একজন সৈনিক হিসেবে, লক্ষ লক্ষ যুদ্ধের বলির প্রতিনিধি হিসেবে। আমার সুতীব্র ঘৃণা আর ক্রোধের অনুভূতি আমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম, যা আমার সমস্ত স্বদেশবাসী ফ্যাসিবাদের প্রতি ও তার হোতা ও উস্কানিদাতাদের সম্পর্কে পোষণ করে।

আমি ক্যাপ্টেনের উর্দি পরে ন্যুরেমবার্গে উড়ে গেলাম আর আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের বিচার-কক্ষের কাঠগড়া থেকে মাত্র কয় ফুট দূরে যখন নিজেকে দেখতে পেলাম, তখন কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্ব, মনে হল অপরিসীম। বিচার-কক্ষে আরও অনেক চিত্রশিল্পী ছিল, কিন্তু আমার মনে হল যে আমার ক্যাপ্টেনের পদের সম্মান ও শিল্পীর সম্মান, এই দুটোকেই, আমার চারপাশের মানুষদের মাঝে তুলে ধরতে হবে।

প্রথমদিন, অধিবেশনের প্রথম অর্ধে, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা অর্থাৎ সাময়িক বিরতি পর্যন্ত আমি দর্শকদের মধ্যে বসেছিলাম, অবাক

বিস্ময়ে চোখের সামনে দেখছিলাম, আর আমার মনের মধ্যে বিগত যুদ্ধের নানা ঘটনা ঘুরে ফিরে আসছিল—বিগত দশকগুলির ইতিহাসের নানা অধ্যায়, হিটলারের চক্রী ঘোঁটের দ্বারা ইউরোপীয় দেশসমূহ লুণ্ঠন, আগ্রাসন ও পরিশেষে, সোভিয়েত ভূখণ্ডের ওপর ফ্যাসিবাদী বড় দলের হানা, আর যুদ্ধক্ষেত্রের সীমা রেখা যেখানে আমি লড়াই করেছি, নিজের চোখে সব কিছু দেখেছি, সেখানের শত শত হাজার হাজার ব্যক্তিগত স্মৃতি।

প্রথম দিন এই সব নিয়ে কেবলই ভাবছিলাম বলে পেনসিল বার করে ছবি আঁকা শুরু করতে আমার ভয় হচ্ছিল। কোথায় খুঁজে পাবো আমার প্রকাশ করার শক্তি, আমি যা কিছু অনুভব করেছি, আমার আঁকা বাস্তব ছবি কি তার সবটুকু ফুটিয়ে তোলার জন্যে যথেষ্ট? এই যুদ্ধ-অপরাধীদের মুখোস খুলে আসল চেহারা দেখানোর কাজ আমি ঠিক ঠিক পারবো কি? প্রথম দিন, বিচার-কক্ষে প্রেস বক্সের প্রথম সারিতে বামপ্রান্তে আমি বসেছিলাম। গোয়েরিং, যে আমার থেকে মাত্র দশ ফুট মত দূরে বসেছিল, আর দুর্ভাগ্যবশতঃ কাঠগড়ার ওপর অন্য সব আসামীকে আমার চোখের থেকে আড়াল করেছিল (কাঠগড়া প্রেস বক্সের সমকোণে বসান ছিল), সে আমাকে 'বিপথেচালিত' করেছিল। যেহেতু, প্রত্যেক আসামীকে দেখার জন্যে আমাকে বিচার-কক্ষের ডানদিকে বসতে হয়েছিল, আর তাই কাঠগড়া থেকে আমি প্রায় কুড়ি মিটার দূরে সরে গেলাম। এত দূর থেকে খোলা চোখে দেখে ছবি আঁকা অসম্ভব। সুতরাং বিরতির সময় আমি কয়েকটা বাইনাকুলার যোগাড় করলাম, যার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য বস্তু আটগুণ বড় দেখায়, আর তার সাহায্যে দেখে আমার প্রথম রেখা চিত্রগুলো এঁকে ফেললাম। আমি যা চেয়েছিলাম আমার গোড়ার দিকে আঁকা ছবিগুলো তার ধারে কাছেও গেল না। আমার লজ্জা করতে লাগল, খুব সাবধানে আমি ছবিগুলো লুকিয়ে ফেললাম। আমি অচিরে টের পেলাম যে প্রেস-বক্সের প্রথম সারিতে বসে কাজ করা কোন কাজের কথা না, কেননা তুলনামূলকভাবে কাজের সুবিধার জায়গাটা বড় খোলামেলা। যখনই আমি আমার বাইনাকুলারকে একজন অপরাধীর ওপর নিবদ্ধ

করছি, সে সঙ্গে সঙ্গে তা টের পেয়ে যাচ্ছে, আর হয় মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে, কিংবা খবরের কাগজ বা কোন পত্রিকা দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলছে। আমি তৃতীয় আর চতুর্থ সারিতে সরে গেলাম। সেখানে আমি আমার 'মডেল'দের কাছ থেকে নিজেকে অনেকটাই লুকিয়ে রাখতে পারলাম কিন্তু আরও নানা অসুবিধা কারণ হয়ে দাঁড়াল। আমার সামনে বসে থাকা লোকজনের কাঁধের ওপর দিয়ে আমি প্রত্যেককে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সমস্যা হল আমার সামনের লোকেদের কাঁধ, মাথা এই সবের ফাঁক ও পাশ দিয়ে আমার যে 'দৃষ্টিফোকর', তা কেবলই বদলাতে লাগল। এ তো হবেই, কেন না সামনে যারা বসেছিল, তাদের ওপর সামনের ঘটনার প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল, তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল, আর তাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্তে আমাকে প্রায়ই ছবি আঁকা বন্ধ রাখতে হচ্ছিল। তার কারণ এই নয় যে আমার 'মডেল' নড়াচড়া করে জায়গা বদল করেছে; আসলে সে আমার দৃষ্টি থেকে আমার সামনের সারিতে বসা লোকেদের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। অগত্যা পরিতাপের কথা, এই অবস্থায় সরে গিয়ে আমাকে আর একজন মডেলের ওপর কাজ শুরু করতে হল, আর যে ছবিটা আঁকতে আঁকতে থেমেছি সেটা আবার কোন যুতসই সময়ে শুরু করার জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হল। যাতে সময় নষ্ট না হয়, আমি প্রায়ই একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি বা তিনটি ছবি এঁকেছি। কখনো কখনো কোন একজনের মুখের বিস্তৃত অভিব্যক্তির বিশেষত্ব তৎক্ষণাৎ মূর্ত করতে হবে, যে অবস্থায় প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য। পরিস্থিতির কঠিন চাপ আমার স্নায়ুর ওপর প্রতিক্রিয়া আনত, কেননা একই সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে আমায় বাইনাকুলার ধরতে হত, ডান হাতে ছবি আঁকা, কাগজ ধরা, পেন্সিল বদলানো, 'ইয়ার ফোন' ঠিক জায়গায় বসানো—আর সে কাজটা ছিল রীতিমত কঠিন,—আমার পাশের লোকের গায়ে যাতে কনুইয়ের গুঁতো না লাগে, তার জন্য আমি চেষ্টা করতাম। কখনো কখনো দুর্ঘটনাবশতঃ আমার কাগজ পড়ে যেত, কিংবা আরো খারাপ ব্যাপার আমার পেন্সিল রাখার বাক্সটাই যেত পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের সবাই আমার দিকে তাকাত, কখনো কখনো চটে মটে তাকাত।

আর আমি আমার জেবড়া-জোবড়া অবস্থা নিয়ে বড়ই বিপর্যস্ত বোধ করতাম। আর এইসব আমার স্নায়ুর ওপর আরো চাপ সৃষ্টি করত, আর অবশ্যই, আমার কাজে বাধা দিত।

যে কোন শিল্পীর মত, আমিও চাইতাম আমার কাজ সবচেয়ে ভালো করতে, সবচেয়ে ভালো ফল পেতে। আমি যতদূর সম্ভব কঠিন পরিশ্রম করতাম আর সেই সঙ্গে জানতে চাইতাম অন্যেরা (ইংরেজ, ফরাসী, নরওয়ে এবং পোল্যাণ্ডের চিত্রকররা) কি ও কেমন ছবি আঁকছে। আমি তাদের ড্রইং প্যাডের দিকে কৌতূহল ভরে এক-পলক দেখে নিতাম। যাইহোক, অতি শীঘ্র আমার বোধগম্য হল যে প্রতিটি মিনিট মূল্যবান এবং কিছুতেই আমার ঢিলে দেওয়া চলবে না।

আমি ইতিমধ্যে কাঠগড়া অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিলাম এবং স্কেচ করেছিলাম কিভাবে আলাদা আলাদা করে প্রতিটি যুদ্ধ-অপরাধীর বৈশিষ্ট্য চিত্রে বাঙ্ময় করা যাবে সে সম্পর্কে ভাল ধারণা করে নিয়ে উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বিচারকক্ষ যেখানে নানা দেশের প্রতিনিধি, নানা কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা, দর্শক, সাক্ষী, কৌঁসুলি, বিচারকগণ, অভিযোক্তারা, সেক্রেটারী, আর প্রহরীরা একত্রিত হয়েছিল, সেই বিচার-কক্ষের ছবি আঁকাই ছিল সবার বেশী আকর্ষণের বিষয়। প্রত্যেকের ব্যবহার আর চোখের চাউনি ছিল স্বতন্ত্র। এর সব কিছুই ছিল আমার কাছে অভাবনীয় আর নতুন। ফলে এইসব স্বাভাবিকভাবেই আমার বোধশক্তিকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছিল। আমার ইয়ার-ফোনের মাধ্যমে বিচার সভার কাজকর্মের যে বিবরণ রুশ ভাষায় আমি শুনছিলাম—তার সবই নির্ভেজাল, এই সব ঘটনা আমাকে তৎক্ষণাৎ বুঝতে সাহায্য করছিল। বিচারকক্ষে কি হচ্ছে, এরপর কি হতে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম, আর কখন, কোথায় একটা জটিল পরিস্থিতি ঘটতে পারে তাও জানতে পারছিলাম। বিচার সভা চলাকালীন কোন কোন ব্যাপার, ফিরে জেরা করার সময় কয়েকজন সাক্ষীর অভাবিত আবির্ভাব জটিল মুহূর্ত ও উত্তেজনা টেনে আনছিল। সুতরাং সেই বিচার-কক্ষে কাজ করা আমার কাছে সব সময়েই ছিল বেশ আকর্ষণীয়।

আমি ন্যুরেমবার্গে চল্লিশ দিন ছিলাম, আর সেই সময়েই আমি সমস্ত যুদ্ধ-অপরাধী, কৌসুলি, বিচারক, সোভিয়েত অভিযোক্তার পক্ষের সাক্ষী, এঁদের ছবি—বিচার-কক্ষে, যেখানে 'ট্রাইবুনাল' চলছিল যেখানে বসে এঁকেছিলাম, আর যে সব মাল-মশলা আমি সংগ্রহ করেছিলাম তার ভিত্তিতে কি আঁকবো, তা স্থির করেছিলাম।

কাজ শেষ হয়ে যাবার পর আমার আর সেখানে একদিনও থাকার ইচ্ছে ছিল না। একথা সত্য যে এখন, যখন আমি আমার আঁকা ছবিগুলি দেখি, তখন বুঝতে পারি যে আমি আরও বেশী কাজ করতে পারতাম ও আরও ভালো ফল পেতে পারতাম। কিন্তু সবাই তো সব সময় এই রকমই ভেবে থাকে।

যে সমস্ত প্রতিকৃতি আমি এঁকেছি, তার মধ্যে ন্যুরেমবার্গ বিচারের কাজে যে সময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক কাজ করছিলেন এবং যে সব যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার সেখানে হচ্ছিল, তাদের বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই।

বিশেষভাবে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের অনেক সদস্যকেই আমার পরিষ্কার মনে আছে। তাঁদের প্রতিকৃতি অঙ্কন সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যাপারে আমি যাব না (তাতে প্রচুর জায়গা লাগবে) কিন্তু আমি এ কথা বলতে চাই যে কনস্তানতিন, ফেদিন, ভ্‌সেভোলদ ভিশনেভস্কি, বোরিস পোলভয়, য়ুরী ইয়ানোভস্কি ও আরও অনেকে এদের প্রতিনিয়ত সাহায্য ও সমর্থন আমাকে এক ধরনের গর্ব আর দায়িত্ববোধ, আর শিল্পী হিসেবে আমার কর্তব্য করার জন্য আমাকে অতিরিক্ত উৎসাহ দিয়েছিল।

ট্রাইবুনালের বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি স্যার গ্রিওফ্রে লরেন্স সম্পর্কে আমি সামান্য কটি কথা বলবো। সকলেই একমত যে পদটির জন্য তিনি ছিলেন খুবই মানানসই। বিচারকমণ্ডলীর আসনের মাঝখানে বসা তাঁর সসম্ভ্রম উপস্থিতি মনে ছাপ রাখত। তাঁকে দেখলে মনে হত তিনি যেন ডিকেনসের গল্পের নায়ক। তাঁর অচঞ্চল, প্রশান্ত মেজাজ, সঠিক ও উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ বা অনুরূপ ভঙ্গী, আর প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর অখণ্ড মনোযোগ ও সশ্রদ্ধ মনোভাব, তা লক্ষ্য করার

মতন। যে বিষয়ে বিচার-কক্ষে আলোচনা চলছে সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে তা তাঁর মুখ, তাঁর বাক্যের বিভিন্ন শব্দ যোজনা, স্বরভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গী দেখে বিন্দুবিসর্গ বোঝা যেত না। বিচারকের গুণাবলী ছিল তাঁর জন্মগত—ব্যক্তিত্বের মনোহারিত্ব, মহত্ত্ব, বিচার পদ্ধতির মত জটিল যন্ত্রকে শান্ত, অনুত্তেজিতভাবে পরিচালনা করার দক্ষতা এই সবই সুসংহতভাবে যেন তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল।

যখন আমি বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি, স্যার গিওফ্রে লরেন্সের দিক থেকে কাঠগড়ার দিকে তাকাতাম, তখন আমি অপরাধীদের শয়তানী প্রকৃতি বিশেষভাবে বুঝতে পারতাম। তারা তখন কয়েদীর পোশাকে নেই; ঠিক আর পাঁচজনের মত তারাও সুট, টাই পরে বসে আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নীতি ফ্যাসিবাদী পরিষ্কার তাদের চোখে মুখে ফুটে আছে দেখতে পাওয়া যেত। হয়তো ধরে নেওয়া হবে যে আমি পক্ষপাতদুষ্ট, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এক্ষেত্রে মুখোস খুলে দিয়ে ভিতরের ভাব সঠিক ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে একটি সত্য ও যথার্থ স্কেচ যেমন করা যায়, ব্যঙ্গ চিত্রে তা করা যায় না। ব্যঙ্গ চিত্রে শারীরিক কোন খুঁতকে ফুলিয়ে ঢোল করে আঁকা হয়, যাতে ছবিগুলো হয় কৌতুককর। তাতে কিন্তু কতটা সত্য আর কতটাই বা কল্পনা সৃষ্ট, তা পরিমাপ করা যায় না। বাইরে থেকে অপরাধীদের এমনই দেখাচ্ছিল যে একটি হুবহু রেখাচিত্র প্রতিবিম্বিত করছিল তাদের নক্কারজনক এবং নীচ স্বভাব, হুবহু না করে কোন অংশকে বাড়িয়ে দেখানো ছিল নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় আর তা হত প্রতারণাপূর্ণ। অন্যান্যদের মধ্যে আমি যখন কালটেনব্রুনার, স্ট্রেইচার ও হেসসকে লক্ষ্য করতাম, তখন আমি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম।

অনেক সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিনিধি, আমিও, ন্যুরেমবার্গের উপকণ্ঠে 'পেন্সিল কিং' ফেবারের জমিদারীতে থাকতাম। আমাদের খাবার-ঘর ছিল অন্য এক অট্টালিকায় যেটিতে জার্মান জাঁকজমকের অনেক নিদর্শন ছিল। এখানে এসে যেদিন প্রথম এই অট্টালিকায় এলাম, দেখলাম সামনে মর্মর প্রস্তরের সিঁড়ির ধাপগুলি এক বিশাল আয়নার দিকে উঠে গেছে। সাংবাদিক, নানান দেশের

প্রতিনিধি ও লোকজনেরা সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠা নামা করছে। আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আয়নার প্রায় কাছে গিয়ে তাকিয়েছি, তখন দেখলাম আমার পিছনে কি আছে, যা আমি আগে লক্ষ্য করি নি। দেখলাম প্রবেশপথের ধারে সুদর্শন কিন্তু ম্লান, বিবর্ণ এক জার্মান যুবক দারোয়ানের পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন তার নীচে নামানো চোখে শূন্যতার দিকে পলকহীন নেত্রে চেয়ে আছে; কিন্তু আমরা তার উত্তেজনায় কঠিন কপাল আর কুলুপ আঁটা ঠোঁট দেখতে পাচ্ছিলাম। যে তার বাঁ হাত দিয়ে দরজা খোলা আর বন্ধ করছিল। তার ডান হাত ছিল না—সম্ভবতঃ সে তার ডান হাত কুরস্ক বালজ্-এ হারিয়েছিল, তার ডান হাতের শূন্য জামার হাতা গোঁজা ছিল তার কোমর বন্ধনীতে। স্রোতের মত আসা সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের জন্যে, ফেবার প্রাসাদের বড় হল ঘরে দাঁড়িয়ে দরজা খুলছে এই যে জার্মান যুবক তার ভাগ্যের মধ্যে আমি গোটা জার্মান জাতির পরম দুঃখজনক, বিয়োগান্ত দুর্ভাগ্য দেখতে পেলাম যার জন্যে সব দায়—একমাত্র ফ্যাসিবাদের।

ন্যুরেমবার্গ বিচার এবং সেখানে আমার সব দেখা ও শোনার ওপর এই দৃশ্য, যেন আমার কাছে একরকম পাথরের ওপরের খোদাই করা লিপি। আরও কি আমি যখন 'প্যালেস অফ জাসটিস'-এ পা দিলাম তখন সেটার মেরামতি, ঝাঁড়পোঁছ আর রঙ করার কাজ চলছে। এটা একটা শুভ পূর্বলক্ষণ। এই নতুন আয়োজন, এই নতুন সাজানোর আমি একটি ছবি আঁকলাম, আর সেই ছবির নাম দিলাম, "জীবনের নতুন ইজারা।" এই তো চেয়েছিল সারা পৃথিবী, আর যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদে বিপর্যস্ত জার্মান জনসাধারণ, এর জন্যই তো কঠোর সংগ্রাম করেছে।

নতুন কোন যুদ্ধ আর তার মতলবী হোতাদের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে প্রচার অভিযানে ন্যুরেমবার্গের দলিল চিরকাল কাজে লাগান উচিত।

'প্রেস' কিভাবে কাজ করে, তা যদি কেউ বোঝে তবে তা আমেরিকানরা। আর যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়া উচিৎ। বিচারের কাজের

ব্যাপারে সমাগত ৩:৫ জন সংবাদপত্র প্রতিনিধির জীবনযাত্রার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা যা করা সম্ভব, তারা সবই করেছিল। সাক্ষীদের যে জায়গা তার ঠিক উল্টো দিকে, বিচারকমণ্ডলী ও অপরাধী প্রতিবাদীদের খুব কাছে আমাদের আরামপ্রদ আসন দেওয়া হয়েছিল। সাক্ষীদের দাঁড়াবার বা সাক্ষ্য-দানের জায়গার ঠিক পিছনে ছিল একটা কাঁচের আড়াল যার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে অনুবাদকেরা তাদের অস্থায়ী দপ্তরে বসে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে যাচ্ছে। একই সময় ভাষান্তর বা অনুবাদের কাজ চলছিল নানা ভাষায়। বিচারকেরা, অভিযোক্তারা, সাক্ষীরা, প্রতিবাদীরা কে কি বলছে তা ইয়ারফোন কানে লাগিয়ে রুশ, ইংরেজী, ফরাসী, আর জার্মান ভাষায় আমরা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। বিচার-কক্ষেই ছিল টেলিগ্রাফ পাঠাবার পশ্চিমা এজেন্সী, যার মাধ্যমে প্রতিনিধিরা বিচার-কক্ষ থেকে সরাসরি নিজের নিজের ঠিকানায় বিবরণ পাঠাতে পারত, এর জন্য এমনকি উঠে দাঁড়াবার দরকারও হত না। একজন হয়ত কয়েক পাতা লিখে হাত তুলল, তাহলেই কর্তব্যরত একজন সৈনিক তার কাছে এসে, তার কাছ থেকে রিপোর্টের কাগজপত্র নিয়ে টেলিগ্রাফ দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে এল। একটা আলাদা ঘরই ছিল প্রেসের জন্যে, যেখানে বসে আমরা প্রতিনিধিরা আমাদের টাইপ-রাইটার রাখতে পারতাম ও আমাদের হাতে লেখা কাগজ টাইপ করে নিতে পারতাম। কিন্তু সেই ঘরে সব সময় এমন কানে তালা লাগানো শব্দ হত যে আমরা ঘরটিকে কদাচ ব্যবহার করতাম। সেই বিরাট অট্টালিকার ডান দিকের ডানায় আমাদের কয়েকটি নিরিবিলি ঘর দেওয়া হয়েছিল সেখানে আমাদের মধ্যে যারা টাইপ করতে পারতো না তাদের জন্যে অন্য কয়েকজন টাইপ করার কাজ করে দিত। অদূরেই ছিল আমাদের ও বার্লিন এবং মস্কোতে সংযোগরক্ষাকরী ফৌজী-টেলিগ্রাফের-তার, যার মাধ্যমে আমার রিপোর্ট দেড়ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যেত সম্পাদকের টেবিলে।

অল্প কথায়, ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। কিন্তু যে সমস্ত মাল-মশলা বা ব্যাপার-স্যাপার আমাদের সামলাতে হত, তাতেই একজনের হামাগুড়ি দেওয়ার হাল। যদিও আমি বিচারের জায়গায় দেরিতে পৌঁছেছি আর আমার চেয়ে অধিকতর ভাগ্যবান আমার সহকর্মীরা "দুধের থেকে মাখন"টি তুলে নিয়ে তাদের পাঠকদের কাছে—"প্যালেস অফ জাসটিসের" আনাচকানাচের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা, বিচার-কক্ষ আর বিচার-কক্ষের মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর কৃত্রিম

আলো, বিচারকদের শীতল নিরপেক্ষতা আর প্রতিবাদীদের চেহারা—সব পাঠিয়ে দিয়েছে, তবু আমি লেখার মত অনেক জিনিস খুঁজে পেলাম। জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত গুরুতর সব বিষয় বিশেষতঃ যেগুলি ভয়ংকর—কেননা এমন এর পূর্বে আগে কখনও হয়নি—বন্যার জলের মত আসছে। সেদিনের অধিবেশন, আমার সহকর্মীরা জানালেন তুলনামূলকভাবে শান্ত। আমেরিকার পক্ষে প্রধান অভিযোগকারী যিনি বিচারক রবার্ট জাকসনের সহকারীর কাজ করছিলেন, তিনি কিছু প্রমাণপত্র তথা প্রামাণিক দলিল পড়ে শোনাচ্ছিলেন। অধিকৃত দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে কিভাবে তাদের জার্মানীতে পাঠাতো, হিটলারের কলে-কারখানায় আর খামারে কেমন ভাবে তাদের ক্রীতদাসের মত খাটতে হত, কিভাবে এই সব মানুষ পরিণত হত ভারবাহী পশুতে, সেই সব লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য সেই প্রামাণিক দলিলে লেখা ছিল।

ছোটখাটো কোন অংকের উল্লেখমাত্র ছিল না। সবই দশ লাখের হিসেব। যাইহোক *অসটারবাইটার*-এর সমস্ত সাধারণ মানুষের কপালে যা ঘটেছিল, আমার কাছে তা একটি রক্ত মাংসের মূর্তির মধ্যে মূর্ত হয়েছিল—সে হল মারিয়া এম. একটি রুশ-বালিকা, ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে শত্রুর কবল থেকে খারকভ নগর মুক্ত হওয়ার ঠিক পর, যখন আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল তখন খারকভ শহরে যার সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম।

মারিয়ার বয়স তখন উনিশ, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন তার বয়স চল্লিশ। তার কালো চুলের মাঝে মাঝেই পলিত কেশের ছিটে, কোন বুড়ী মানুষের মত তার ঝুলে পড়া ঠোঁটের চারদিকে বলিরেখা আর মুখের ওপর একটা জায়গা কেবলই থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেদিন বিচার-কক্ষে আমেরিকার মুখ্য অভিযোগকারী যখন তাঁর পরিষ্কার দৃঢ় গলায় বিচারের জন্য, শাস্তি-বিধানের জন্য এই ভয়াবহ দলিল পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন মারিয়া, তাকে যেমন দেখেছিলাম, সে যেন অদৃশ্যভাবে বিচার-কক্ষে প্রবেশ করে আমেরিকান অভিযোক্তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

আমি কোনদিন ভুলবো না মারিয়ার সেই কাঁপা কাঁপা গলা, নিঃশ্বাস রোধ করে যখন সে বলছিল—কিভাবে এস-এস-র সৈন্যেরা একটা রাস্তা ঘিরে ফেলে তাকে জোর করে বন্দী করে, খারকভের অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কিভাবে তাকে একটা মাল-টানা গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে

দেওয়া হয়; আর টানা দশ দিন ধরে সেই চারদিক বন্ধ করা দমবন্ধ হয়ে আসা পুঁতিগন্ধময় গাড়িতে কিভাবে তাদের চালান দেওয়া হয়। তারপর পূর্ব প্রুসিয়ায় এক ক্রীতদাসের বাজারে, বিভিন্ন দেশ থেকে বলপূর্বক ধরে আনা মহিলাদের সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়, আর *গ্রসবআউরেন*-রা কিভাবে সেই সব সারির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মেয়েদের মাংসপেশী ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে আর মুখের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বুঝে নেয় দাঁতের কোন রোগের জন্য তাদের দাঁত পড়ে গেছে কিনা। তারপর এক মস্ত জমিদারীর ক্ষেতে খামারে কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে নারী প্রহরিণীদের হাতে ছিল চামড়ার চাবুক। স্থানীয় ফালতু আনাজের ঝোল ছাড়া তাদের আর কোন খাওয়া জুটত না। নিয়ম ভাঙ্গার জন্যে বিশেষ মাত্রায় জুটতো দৈহিক পীড়নের শাস্তি যা অসটারবাইটার—রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের জন্য ছিল এক রকম অর ওয়েস্টারবাইটার—ফরাসী বেলজিয়ান আর ডাচদের জন্য ছিল আর এক রকম।

মারিয়া যখন আমাদের এই সব কথা বলছিল তখন তার জীবনে যত কিছু খারাপ হতে পারে, সবই হয়ে গেছে। সে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে তার নিজের শহরে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল, তবু তার মুখের মাংসপেশী থেকে থেকে বেঁকে উঠছিল আর সে তার কাঁধের ওপর দিয়ে যেন প্রবৃত্তির বশে তাকাচ্ছিলো। নিজেকে ক্রীতদাসীর জীবন থেকে বাঁচাবার জন্যে মারিয়া জার্মানীতে এক ভূষি-কাটার যন্ত্রে নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর তার তিনটি আঙ্গুল কাটা গিয়েছিল। পরিদর্শক যিনি ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে এটা একটা দুর্ঘটনা এবং তাকে গেসটাপোদের হাত তুলে দেননি। অন্যান্যরা যারা পালাবার বা কাজে অন্তর্ঘাত করার চেষ্টা করতো তাদের তিনি তাই করতেন। মারিয়ার চিকিৎসা করানো হল। সে আর খামারে কাজ করতে পারতো না। একজন জার্মান মহিলার *বাঁদী* করে পাঠানো হল মারিয়াকে, যে মহিলার স্বামী ছিলেন পূর্ব রণাঙ্গনের একজন এস-এস অফিসার। তার মালিকান ছিল বদমেজাজী আর বিদ্বেষপূর্ণ। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মানীতে যখন তিন দিনের শোক পালন করা হয় তখন সেই মহিলা মারিয়ার মুখে জুতো মারেন। মরীয়া হয়ে সেই বালিকা ফুটন্ত কাপড-চোপড়ের পাত্র

নিজের গায়ে উল্টে দেয়। তবু সে নিজেকে হত্যা করতে পারে না, কিন্তু ফুটন্ত জলে পোড়া তার পা দুটির ব্যবহার হারিয়ে ফেলে।

একমাত্র এই উপায়ে মারিয়া হিটলারের যন্ত্র—যা লক্ষ লক্ষ বিদেশী শ্রমিকের ঘাম আর রক্ত শুষেছে, আর যতটা সম্ভব শোষণ করে বাতিল নষ্ট জিনিসের মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—থেকে পালাতে পারে।

আমেরিকান অভিযোক্তা যখন গম্ভীর পুরুষালি কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমি আমার ইয়ার ফোনের মাধ্যমে রুশ দোভাষী বালিকার উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। ডেসকের ওপর মুখোমুখি করে রাখা ক্রীতদাস শ্রমিক সংক্রান্ত প্রমাণ পত্রের স্তূপ। আলফ্রেড রোসেনবার্গ, অধিকৃত পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলির রাইখ—মন্ত্রী ও নাৎসী আদর্শবাদী —সেই রোসেনবার্গের মার্জিত মুখের দিকে আমি তাকালাম। ফ্রিৎজ সকেল, এস-এস ওবেনগ্রুপেফুয়েরার যিনি ছিলেন লোকবল মহাধ্যক্ষ এবং এখন যে তার খরমুজের মত মাথা কাঠগড়ার ধারে ন্যস্ত করেছে, এই দুই শয়তান যারা মারিয়া এম.-এর জীবন ধ্বংস করেছে, আর এখন সাক্ষ্যের ভয়ানক চাপে কুঁকড়ে আছে; আমি তাদের দিকে তাকালাম। যখন আমি ইয়ার ফোন-এ দোভাষী বালিকাটির কথা মন দিয়ে শুনছিলাম, ঠিক তখনই আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম, সেই পলিত কেশ বালিকা মারিয়ার বিপন্ন কণ্ঠ আমার কানে কানে ফিস ফিস করে চাপাস্বরে বলছে, "পৃথিবীতে কি সত্য আছে? তারা, তার.........." মানুষের অভিধানে যত শব্দ আছে, তার প্রতি নাৎসিদের ধারাবাহিক অত্যাচারের সঠিক বর্ণনার জন্য যুৎসই শব্দ যেন যে থেমে থেমে হাতরে ফিরছিল, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিল না। "ওরা, তারা, ওরা সকলে কি কোনদিন আমার জন্যে, আমাদের সকলের জন্যে জবাবদিহি করবে না?"

এখানে তা-ই ঘটছিল। সেই অল্পবয়সী বালিকা যার মুখাবয়ব হয়েছিল বুড়ীর মত, তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। ওই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেইসব লোক, যারা তাকে তার যৌবন থেকে বঞ্চিত করেছে, যারা স্লাভ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিণত করেছিল ভারবাহী বোবা পশুতে আর তাদের জীবনে প্রকৃতির আশীর্বাদের মত যা কিছু ছিল যা মানুষকে মানুষ করে, তার সব কিছু তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল, ওই লোকেরা।

কিন্তু ভোলগা থেকে এলবি এবং স্প্রী পর্যন্ত কতবার লড়তে হয়েছে লাল ফৌজকে, কতগুলো বড় আর ছোট যুদ্ধ জিততে হয়েছে লাল ফৌজকে, সেইসব মানুষকে, যারা মারিয়ার জীবন ধ্বংস করেছে, তাদের দৌড় শেষ করে এখানে এই কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্যে স্বদেশে আর বিদেশের মাটিতে আমাদের কত শত সৈনিক তাদের জীবন হারিয়েছে! আন্তর্জাতিক বিচারকে এখন প্রমাণ করতে হবে যে পৃথিবীতে সত্য আছে এবং আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে তাকে সমর্থন ও বলবৎ করতে হবে। এর থেকে কি বার হয়ে আসে তা দেখার জন্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে। বিচার সবেমাত্র শুরু হয়েছিল কিন্তু রোসেনবার্গ, সকেল, গোয়েরিং আর যাকে দেখে মনে হচ্ছিল একেবারে পাথর হয়ে গেছে সেই ফিল্ড মারশাল উইলহেলম কেইটেল—এইসব শয়তান যারা রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক নেতা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে খেলা করেছে—ইতিমধ্যেই অগণিত মানুষের অফুরন্ত তথ্য অশেষ তালিকা শুনছিল, যাদেরকে তারা শ্রম-শিবিরে নিঃশেষ করে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই দলের মধ্যে বসে থাকা হেস্‌সই একমাত্র লোক যাকে উদাসীন দেখাচ্ছিল। সে তার ইয়ার ফোন পর্যন্ত কানে লাগায় নি। যেন স্মৃতি লুপ্ত হয়েছে এমন এক ছদ্মবেশ ধারণ করে সে পড়ছিল গোয়েন্দা গল্প। নিশ্চয়ই সে এমন অনুমান করেছিল যে যুদ্ধের শুরুর দিকে বিমানে ইংল্যাণ্ড গিয়ে সে কয়েকজন দুঃসাহসী ইংরেজ অভিজাতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বলে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যা কিছু ঘটেছিল, তার জন্য তাকে দায়ী করা হবে না...

অসটারবাইটার-এর (শ্রম-শিবিরের লোক) যে কোন বাসিন্দার প্রতি কেমন আচরণ বা ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে হিমলারের আদেশ পড়ে শোনান হল। একদিন মারিয়া যা চোখের জলে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে বর্ণনা করেছিল এই প্রামাণিক দলিলের শেষ বাক্যগুলিতে তার সবগুলিই ছিল—"অবসর সময় বলে কিছু নেই।" "আদেশ আর নিয়মকানুন যা আছে তার প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলতে হবে।" "সাময়িক বিরতি বা ছুটির সময়, অথবা খামার, ব্যারাক, ডরমেটারি বন্ধ থাকার সময় কারখানার সীমানা ত্যাগ করা নিষিদ্ধ।" "এইসব আইন যারা অমান্য করবে যুদ্ধকালীন সামরিক আইন ও জার্মান সাম্রাজ্যের আইন অনুসারে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।"

"এমনকি প্রাচীন মিশরের দাসপ্রথার যুগেও, দাসদেরও সূর্য দেখা, টাটকা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া অথবা তাদের পাশাপাশি একই লোকেদের সঙ্গে কথা বলা থেকে বঞ্চিত করা হত না", একথা বলল মস্কো বেতারের প্রতিনিধি, মিখাইল গুস। আমাদের মধ্যে মিখাইল সুপরিচিত ছিল একজন সুপণ্ডিত "চলমান বিশ্বকোষ" হিসেবে। তার কাছ থেকে ইতিহাস, সাহিত্য এমনকি আইন বিষয়েও যেকোন তথ্য জানা যেত। "কিন্তু এখানে, দেখতেই পাচ্ছো এই সমস্ত কুৎসিত আইন যদি কেউ লঙ্ঘন করত, তাহলে পরিদর্শক এবং দাস দুজনেই শাস্তি পেত; আর দাসেরা একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা বলার অধিকার পর্যন্ত হারাত।"

আমি কি করে তোমায় বোঝাই, মারিয়া, আমার যে কত ইচ্ছে করছিল যে তুমি কেবল আমার মনশ্চক্ষে নয়; সত্যি সত্যিই এই বিচারের ঘরে বসে তোমারই মত আরো লক্ষ লক্ষ জনের সঙ্গে, যাদেরকে লাল ফৌজ মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে নিজের চোখে সব কিছু যদি দেখতে! তাহলে তোমরা সবাই দেখতে পেতে কেমন করে আরও এবং আরও, কেবলই অজস্র সাক্ষ্য প্রমাণ টেবিলের ওপর চুড়ো হয়ে উঠছে, যা দেখে রোসেনবার্গের ভ্রূ কুঁচকে গেল কাঠগড়ার ধার থেকে সকেল তার খরমুজের মত মাথাটা কেমন করে তুলে নিল, আর উদ্বিগ্নভাবে বিচার সভার দিকে তাকাল, আর রাইখ মন্ত্রিসভার সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরবরাহ বিভাগীয় মন্ত্রী হিটলারের স্নেহভাজন প্রিয়পাত্র আলবার্ট স্পীর-এর ছলনাপূর্ণ আপাত সসম্ভ্রম মুখ, চূড়ান্ত চাপের মুখে কেমনভাবে শক্ত হতে হতে জমাট আর আড়ষ্ট হয়ে গেল। এমনকি হেস্‌স যে বিচারের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে যেন স্মৃতি বিলুপিত এমান ছদ্মবেশ ধারণ করে বসেছিল, সেও অনেক আগে বন্ধ করে দিয়েছিল গোয়েন্দা গল্প পড়া, আর মনে হচ্ছিল হেস্‌সও যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, যদিও সে তার কানে ইয়ার ফোন লাগায় নি।

কোথায় তুমি, মারিয়া? আমি যে চাই ন্যুরেমবার্গের বিচারের সব কিছু সবিস্তারে তুমি জানো আর বিশ্বাস করো যে এই বিচারের ফল থেকে তোমার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ চারতার্থ বোধ করবে।

সংবাদ পাঠানোর জন্য আমার সবকিছু তৈরী হয়ে গিয়েছিল। অধিবেশন শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে, আমি তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরে চলে

গেলাম আর একটানা আমার প্রথম প্রতিবেদন লিখে ফেললাম। তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে আমি আমার পেন্সিলের 'শিস' ভেঙে ফেললাম আর নিজের কাজে এতই বুঁদ হয়েছিলাম যে আমার সহকর্মীরা আমার পোশাক নিয়ে যেসব মজামারা কথা বলছিল, আমাকে রেস্তোরায় নিয়ে দুপুরের খাবার খাওয়ানোর যে সব লোভনীয় প্রস্তাব দিচ্ছিল, সে সব যেন ছুঁতেই পারছিল না আমায়। যে মেয়েটি টেলিগ্রাম পাঠায় তার জন্যে আমি দপ্তরে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল যে পরের দিনের সংবাদপত্রেই আমার প্রতিবেদন থাকা দরকার ; আর অন্য একটা আলাদা টেলিগ্রামে আমি একথা জানিয়ে দিলাম *প্রাভদা* সম্পাদকীয় দপ্তরের সচিব মিখাইল সিভোলোবভকে।

দিনের শেষে, ভাগ্য আমার প্রতি সত্যিই সুপ্রসন্ন হল। সোভিয়েত প্রধান অভিযোগকারী রোমান রুদেনকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগ করে নিলাম। তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন ও আমাদের সাংবাদিকদের বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিলেন না। কিন্তু আমার কাছে তুরুপের তাস ছিল। আমি তাঁকে জর্জি দিমিত্রভ-এর প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা পৌঁছে দিলাম। তিনি আগ্রহী হয়ে বসলেন ও আমাকেও বসার জন্যে আহ্বান করলেন। তারপর তিনি আমার কাছে এই বিচার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিমিত্রভের মতামত শুনতে চাইলেন। তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর সাদা মাথা নাড়ছিলেন।

"আচ্ছা, এই সমস্ত যুদ্ধ-অপরাধী যে এই রকম আশা করে, কিংবা বলা চলে এই রকম আশায় আশায় আছে যে এই বিচার চলাকালীন বিজয়ী জাতিগুলির মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে, সমস্ত বিচারটাই একটা হচপচে বিশৃঙ্খলায় পরিণত হবে আর তারা বেবাক খালাস পেয়ে যাবে, সে ব্যাপারটা কি? এখানে এই ব্যাপার নিয়ে প্রচুর কথা বলা হচ্ছে আর দিমিত্রভ এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর পূর্বানুমান জানিয়েছেন।"

অভিযোগকারী একবার তাঁর কপাল মুছে নিলেন।

"এখন যা বলছি তা নিশ্চয়ই নথিভুক্ত হবে না ; তবে এরকম একটা সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন দেখা যায় যে অভাবিত সব পরিবর্তন ঘটে। তবে এই বিচার যেভাবে এগিয়ে চলেছে বিশ্লেষণ করে দেখে, সেই ধরনের কোন কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। অজস্র লক্ষণ দেখেই একথা বলছি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর

ছয় মাসের কিছু বেশী সময় চলে গেছে, ঠিক? এই সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনালের ঘোষণাপত্র আর নিয়মকানুন পদ্ধতি ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে, ঠিক? চারটি শক্তি বা দেশ মিলিতভাবে চেষ্টা করে অনুসন্ধান চালিয়ে বিচারের জন্যে সমস্ত প্রধান সাক্ষ্যগুলিকে সংগ্রহ করেছে ও সংগঠিত করেছে। তাই নয় কি? আর সবার শেষে, চারটি দেশের বিচার বিভাগকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ আর রীতিমত জটিল যন্ত্রকে সংহতিপূর্ণ করে চালু করে কাজ শুরু করা হয়েছে, ঠিক তো?" তারপর তিনি যেন আদালতে কথা বলছেন এমনভাবে বললেন, "এক কথায় ভবিষ্যতই বলে দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী পারস্পরিত বিশ্বস্ততার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে আর আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মতি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের যে সাগ্রহ অভিলাষ তার দ্বারা আমরা এখনও একতাবদ্ধ।"

"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে বিচার চলছে খুব ঢিমেতালে আর অনুপস্থিত বরম্যান সমেত প্রত্যেকটি আসামীকে দায়ী করার জন্য আজ সারাদিনে কেবল যথেষ্টরও বেশী নিদর্শন পড়া হয়েছে?"

"এটা হল প্রথম আন্তর্জাতিক বিচার, তাই নয় কি? সুতরাং আমরা কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত বা অভিজ্ঞতা ছাড়া কাজ করছি। তুমি বুঝে দেখো, আন্তর্জাতিক আইনের যে ভিত্তি সেগুলোই এখানে স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো, আমার বিশ্বাস নতুন কোন বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিহত করতে সম্ভবতঃ সাহায্য করবে। তুমি একজন সাংবাদিক, একজন সোভিয়েত সাংবাদিক, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা আর তাণ্ডব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যাওয়ার একটা প্রবণতা পাশ্চাত্যের আছে। আমরা সোভিয়েত কমিউনিস্টরা আর শান্তিকামী প্রগতিবাদী পৃথিবীর সকল মানুষ নাৎসীবাদের গভীরতম আত্যন্তিক প্রদেশের গোপন সব কিছু, যতদূর সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নাৎসী অপরাধের গোটা কাঠামোর ছবি, পৃথিবীর কাছে মেলে ধরতে বিশেষভাবে উৎসুক ও আগ্রহী। পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যজাতিকে লাল ফৌজ কোন বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আসল ধাক্কাও সব জায়গায় লাল ফৌজ কিভাবে মোকাবিলা করেছে তা প্রকাশ করতে চাই। আর তাই, আদালতে কাজকর্মের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়। তুমি তো এখনো

ট্রেইননিন-র সঙ্গে দেখা করো নি। ইতিহাস আর আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপারে, সেই হল সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ, সে তোমায় ব্যাখ্যা করে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেবে।"

"এখনো কি আদালতে আরও অনেক নতুন উপাদান বা ব্যাপার ফাঁস করা হবে?"

"আমরা যারা আইনজীবী তাদের আগাম কোন ঘটনা জানানো বারণ আছে। আর আমার মনে হয় তোমাদের সাংবাদিকদেরও এমন কিছু করা উচিৎ। আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী আমেরিকার পক্ষে প্রধান অভিযোগকারী জ্যাজ জ্যাকসন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, 'আমাদের দাখিল করা প্রমাণসমূহ এমনই নিদারুণ বিরক্তিকর হবে যে তা আপনাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে'। তিনি ঠিক বলেছিলেন।"

আমি পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে প্রেস ক্যাম্পে ফিরে গেলাম, সারাটা দিন কাজে লেগেছে, নষ্ট হয়নি এ কথা মনে হলে সকলেরই যেমন হয়ে থাকে। আমি মস্কোতে প্রতিবেদন পাঠিয়েছি, সোভিয়েত প্রধান অভিযোক্তার সঙ্গে কথা বলেছি। আর আমার ইউনিফরম পরে কুচকাওয়াজ করে বেড়ানোর দরকার নেই। আমার ওপর করুণা করে সেরগেই ক্রুশিনস্কি তার ফিল্ড সার্টটা পরার জন্য আমায় ধার দিয়েছিল। জামাটা নতুন ছিল না, ক্ষমা ঘেন্না করে বলতে হয় জামাটায় কাদার ছোপও ছিল। কিন্তু প্রেস ক্যাম্পে বিশেষ মেরামতির ব্যবস্থা ছিল যা রাতারাতি সাফাই, রিপু ইত্যাদি সুনিশ্চিতভাবে করে দিত।

আমার মাথা তখন পরিষ্কার, আর তখন আমার ঘুমোতে আদৌ ইচ্ছে করছিল না। প্রেস ক্যাম্পের লাউঞ্জের আলোগুলো তখনো জ্বলছিল আর খোলা জানালা দিয়ে জ্যাজ্ বাজনার রেশ আর সিগারেটের ধোঁয়া ভেসে আসছিল। কিন্তু আমি নিঃসঙ্গতা বোধ করছিলাম এবং ব্যাভারিয়ার মৃদু শীতের বাতাসে চক্কোর দিতে ইচ্ছে করছিল। দিনের বেলায় তুষারপাত হয়েছিল। বড় স্যাঁতসেঁতে তুষারের কণা, আর ছোট ছোট ফলক, বছরের এই সময়টায় মস্কোর রাস্তায় যেমন কোঁচকান মচমচে, চাবুকের মত শুকনো তুষার, পথচলতি লোকের মুখে হুল ফুটিয়ে দেয়, এ তুষার তেমন নয়। গাছের শাখাগুলো আর গাছের আচ্ছাদিত দিক তুলোর নরম কেঁসোর মত বরফে ঢাকা, আর পথে যেন আলগা ঝুরঝুরে নরম কার্পেট বিছানো। আহা

সেই পুরোন পার্ক কি চমৎকারই না ছিল! সেই অদলিত তুষার মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম, আর শেয়ালের মত আকারের একটা জানোয়ার, হয়তো সত্যিই একটা শেয়াল, রাস্তা পার হয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। হঠাৎই মেরিসিয়েভ বা মারেসিয়েভ নামে একজন বিমান-চালক, যার পা ছিল না, তার গল্প আমার মনে পড়ে গেল। ওরেল-কুরসক বালজে, এক রণাঙ্গনের বিমান ক্ষেত্রে বসে আমি গল্প শুনেছিলাম। এই গল্পটা যা আমি কোনক্রমে লিখে ফেলতে পেরেছিলাম, মনে হয়েছিল তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সচরাচর অন্যান্য গল্পে থাকে না। গোটা যুদ্ধের সময় আমি একটা নোটবই বয়ে বেড়িয়েছিলাম যেটার নাম ছিল, "৩য় স্কোয়াড্রনের উড্ডয়ন ক্যালেণ্ডার," যার মধ্যে আমি সেই বৈমানিকের গল্প লিখে রেখে দিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল যে যা লিখেছি, একদিন তা সাজিয়ে গুছিয়ে একটা বই লিখবো। সেই নোটবই আর তার যুদ্ধ-বিমানের সঙ্গে সেই বৈমানিকের ছবি দুইই তখনো আমার কাছে। আদালতের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে যখন আমি পরিচিত আর সরগর হয়ে গেছি, তখন এই ব্যাপারটা নিয়েও কেন আমি ন্যুরেমবার্গের ওপর লেখার সময় লিখবো না? কোনদিন যে আমার "ভাইসব" শীর্ষক বই সত্যি বাস্তবায়িত হবে এমন সম্ভাবনা ছিল খুবই সুদূর পরাহত। আমার সেইসব "ভাই" তখন অনেক, অনেক দূরে। এখানে কাজ করার পরিবেশ ও পরিস্থিতি খুবই অনুকূল। গতকাল রাতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ক্রুশিনস্কি যে টাইপ করছিল পরে জানা গেল যে শ্লোভাকদের জাগরণ ও উত্থান সম্পর্কে সে একটা উপন্যাস লিখছে। আমার নতুন বন্ধু ডানিইল ক্রামিনভ যে যুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীতে ছিল, সে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিষয়ে একটি বই লিখছে। আমি, আমারও কি শুরু করা উচিৎ নয়?

আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের থাকার জায়গায় ফিরে এলাম। একই ঘরের বাসিন্দা আমার বাকী চারজন বন্ধুর একজনও তখনো ঘরে ফিরে আসেনি। আমি একতাড়া কাগজ বার করে প্রথম পাতার ওপর বড় বড় অক্ষরে গল্পের নাম লিখলাম—"এ স্টোরি এ্যাবাউট এ রিয়েল ম্যান।" আমি লিখতে আরম্ভ করলাম ও তারপর থেমে গেলাম। এই লেখা আমি কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব? এই লেখাটি কি হবে—একটা রচনা, একটা গল্প, নাকি

সম্ভব হলে উপন্যাস? মনস্থির করতে না পেরে আমি ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া স্থির করলাম ও কাপুরুষের মত গুটিগুটি বিছানায় এলিয়ে পড়লাম।

৫। উত্তেজনা—নম্বর এক

যথারীতি দিন শুরু হয়ে গেল। আমরা একটু আগেই পৌঁছে গেলাম। আদালত কক্ষ তখনো খালি। সেই মৃত্যুর মত ভয়ংকর কৃত্রিম আলো কিন্তু ইতিমধ্যে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিচার-কক্ষ ক্রমশঃ ভরে যেতে লাগল। দেখা গেল পূর্ব চিন্তায় নিমগ্ন ভ্‌সেভোলোদ ভিশনেভস্কি বিভিন্ন ভাষায় সাক্ষ্য প্রমাণের এক ফাইল নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। তিনি নিজের জায়গায় বসে পেশাদারী ভঙ্গীতে সেগুলিকে আলাদা আলাদা করে বেছে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। সুপুরুষ কনস্তানতিন ফেদিন, পাইপ হাতে নিজের জায়গায় বসে আছেন আর সৌজন্যপূর্ণ হাসির সঙ্গে মাঝে মাঝে এপাশে ওপাশে সামান্য মাথা ঝোঁকাচ্ছেন। আদালত কক্ষে ধূমপান ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। ফেদিনের পাইপে কোন আগুন ছিল না, কিন্তু ফিল্ড মারশালদের ব্যাটন হাতে রাখার মত তাঁর অভ্যাসই ছিল হাতে পাইপ ধরে থাকা। হাঁফাতে হাঁফাতে ও ঠোঁটের আগায় অস্পষ্টভাবে কিছু বলতে বলতে ভ্‌সেভোলোদ আইভানভ বসে পড়লেন। ইলিয়া এরেনবুরগ এসে তার সহকর্মীদের দিকে হাসিমাখা মুখে তাকালেন আর বিদেশীদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাই হয়েছিল তাঁর বিপদ। তিনি যদি ধীরে হাঁটতেন, তাহলে অচিরে এক ঝাঁক বিদেশী তাঁকে ঘিরে জটলা পাকিয়ে নিজের নিজের দেশীয় ভাষায় তাঁকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করতো। কয়েকজন সাংবাদিক প্রতিনিধির, বুঝে দেখো, এমন ধারণা ছিল যে ইলিয়া এরেনবুরগ একজন বহুভাষাবিদ ও আকাশের সূর্যের তলায় যে কটি ভাষা বলা হয় সবই তিনি বলতে পারেন ও দোভাষী ছাড়াই চমৎকার কাজ চালাতে পারেন। যখনই এইরকম হত তখনই তিনি কচ্ছপের মত কাঁধের উপর মাথা গুঁজে হাসতেন। য়ুরি ইয়ানোভস্কি, যাঁকে বলা চলতে পারে সবচেয়ে সদয় ও বিবেচক মানুষ, তিনি

এলেন ও সকলের দিকে সৌজন্যপূর্ণভাবে মাথা নোয়ালেন। এবং পরিশেষে সেই তিনজন কুক্রিনিক্সি* একে অন্যের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন, যেমন সব সময় একজন অন্যজনের পিছনে চলতেন, এইভাবে সেই তিনজন এলেন। ছোটখাটো চঞ্চল পোরফিরি ক্রিলভ সবার আগে, তাঁর পিছনে কোঁকড়ান চুল, নীল চোখ, মাঝারি সাধারণ উচ্চতার নিকোলাই সোকোলভ, আর তারপর লম্বা, অবিচল মিখাইল কুপরিয়ানভ, যিনি উটের মত ঘাড় তুলে হাঁটতেন। তাদের সকলের সঙ্গেই ছিল ছবি আঁকার জন্যে ভাঁজ করা ক্যানভাস, যেগুলি সবই একরকম কিন্তু ক্রিলভের ক্যানভাসটা দেখাত মস্ত ঢাউস মতন আর কুপরিয়ানভেরটা দেখাত ক্ষুদে ক্ষুদে।

সেমিওন কিরসানভ যখন দৌড়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌঁছুল একেবারে শেষ মুহূর্তে তখন বিচারকরা তাঁদের আসনে বসে পড়েছেন, আর অপরাধী প্রতিবাদীরা, কাঠগড়ায় যার যে আসন নির্দিষ্ট করা আছে, যথাযথভাবে সেই ক্রম অনুসারে কাঠগড়ায় আসীন, ঠিক তখনই গোয়েরিং তার পায়ের ওপর একটা ফৌজী কম্বল জড়াচ্ছিল আর হেসস, আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে, যে কোন কারণেই হোক তার গোয়েন্দা বইটি না খুলে, সামনে নিয়ে বসে আছে। যদিও খুব প্রাণবন্ত আর উৎসাহে টগবগে কিরসানভ কিন্তু সব সময়েই সব কিছুতেই কেমন করে যেন একটু দেরী করে হাজির হত। সে ঠেলাঠেলি করে ঢুকে, সবচেয়ে কাছের খালি আসনটিতে বসে নিজের নোটবই খুলে ধরল।

বিচারকের আসন থেকে লর্ড লরেন্স উঠে দাঁড়ালেন ও তাঁর শান্ত, নিরপেক্ষ, মার্জিত ইংরেজী উচ্চারণে ঘোষণা করলেন যে সেদিনের অধিবেশন হবে গোপনে এবং দর্শকদের অনুরোধ করলেন তৎক্ষণাৎ বিচার-কক্ষ ছেড়ে বাইরে যেতে।

আমরা স্থান ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলাম। অধীরভাবে ভিশনেভস্কি তার কাগজপত্র তড়িঘড়ি গুছিয়ে নিল আর 'কুক্রিনিক্সিরা'—যাদের বন্ধুরা ওদের ডাক নাম দিয়েছিল 'কুক্রি'—তাদের কাগজপত্র ইত্যাদি বেঁধে নিয়ে, একজন একজন করে স্বচ্ছন্দ অবাধগতিতে বের হয়ে গেল। আমি কোথায় যাবো?

* তিনজন চিত্রশিল্পী—মিখাইল কুপরিনিয়ানভ, পোরফিরি ক্রিলভ ও নিকোলাই সোকোলভ—এই তিনজন একসঙ্গে 'কুক্রিনিক্সি' নামে পরিচিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের বসার ঘরে গিয়ে টাইপ রাইটারের তুমুল খটাখট শব্দের মাঝখানে বসে সেই বস্তাপচা একঘেয়ে গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে না। পানশালায় গিয়ে মদ্যপান কিংবা ক্যানটিনে গিয়ে খাবার খাওয়া, কোনটাই আমার ইচ্ছে করছিল না। আমি ঠিক করলাম যে এসবের বদলে আমি ল' লাইব্রেরীতে যাব, যে সম্পর্কে আমি আমাদের প্রধান অভিযোক্তার কাছ থেকে শুনেছিলাম আমাদের আইন সংক্রান্ত কর্মচারীরা এই সব পুস্তক তাদের সঙ্গে এনেছিলেন। তৃতীয় রাইখের উত্থানের সূচনাকাল থেকে বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ সকল বিষয়ের ওপর বই ও বিবরণ ও বিষয়গতভাবে আলাদা আলাদা বিষয়ের সাজানো সারাংশ সবই এই লাইব্রেরীতে ছিল। আমি যখন সবেমাত্র একটা বই-এর মধ্যে ডুবে গেছি তখন তিনটে অদ্ভুত, দ্রুত ও ঘন ঘন, গুন গুন করা গুঞ্জনের মত আওয়াজ কড়ি-বরগার ওপর কোন জায়গা থেকে ভেসে আসতে লাগল। কেন এমন হচ্ছে? আবার সেই শব্দগুলো বেজে উঠল। আমি বারান্দায় অনেকের ছুটে চলার শব্দ শুনতে পেলাম। আসলে কি ঘটেছে তা না বুঝতে পেরে, আমি অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃ ছুটে চলা লোকেদের সঙ্গে যোগ দিলাম। সেই তিনটে গুন গুন করা শব্দ আবার ভেসে আসতে লাগল। পায়ের বন্ধন ঠিক করতে করতে একজন আমেরিকান আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে কি বলছিল—যে শব্দটা দোভাষী ছাড়াই আমি বুঝতে পারলাম—উত্তেজনা।

বিচার-কক্ষের দরজা, যেখানে ভেতরে যাবার জন্যে সাংবাদিকরা ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি শুরু করে দিয়েছিল, সেখানে ইয়ারোস্লাভ গালান, একজন উক্রাইনীয় লেখক আমায় বুঝিয়ে বললেন যে "প্যালেস অফ জাসটিস"-এর বিভিন্ন ঘরে যদি একটা ঘন্টা বা সংকেত বাজে, তাহলে বুঝতে হবে যে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, দুটো সংকেত ধ্বনির মানে হল যা ঘটছে তা বিশেষ মনোযোগের দাবী করে আর তিনটে সংকেত ধ্বনির তাৎপর্য হল, উত্তেজনাকর কিছু ব্যাপার হচ্ছে। এই বিচার চলাকালীন এই প্রথম তিনটে সংকেত দেওয়া হল আর তাই জড়ো হওয়া সাংবাদিকদের ভিড়, সত্যি কথা বলতে কি, উত্তেজিত হয়ে দরজার কাছে সান্ত্রীদের পরীক্ষা করার জায়গা প্রায় টপকে তারা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল।

শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের জায়গা পেলাম। সব বিচারকই ইতিমধ্যে তাঁদের টেবিলে চলে গিয়েছেন। প্রতিবাদী আর উকীলরা খুবই উত্তেজিতভাবে কথা বলছিল। সেই এক শান্ত কণ্ঠে, যে কণ্ঠ বোধ হয় ভূমিকম্প হলেও পরিবর্তিত হবে না, লর্ড লরেন্স ঘোষণা করলেন যে প্রতিবাদী রুডলফ হেস্‌স বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক বিবৃতি দেবেন।

হেস্‌স জার্মানীর নাজী নং ৩ এবং ফুয়েরারের সিংহাসনের একজন সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী বিচার শুরু হবার মুখেই জানিয়েছিল যে, সে সম্পূর্ণ স্মৃতি বিলুপ্তিতে ভুগছে। এই রকম সমাবেশের সামনে নিজেকে বড় বা শক্তিশালী বলে ভাবার বাতিক নিয়ে ভাণ করা সম্ভব নয়, আবার নিজেকে পাগল ঘোষণা করলেও নিতান্ত খেলো অজুহাতে অতি সাধারণ হতে হয়। অথচ ইতিহাসে যা কিছু ঘটেছে, তাতে তার কাজের খতিয়ান খুব নিরীহ গোছের আর তা-ই সে ছাড়া পাবেই, এরকম একটা ধারণা সে কিছুতেই ছাড়তে পারছিল না। তাই সে এমন একটা রোগ বেছে নিয়েছিল, যার গাল ভরা নাম—'স্মৃতিবিলুপ্তি'। ইংলণ্ডে অন্তরীণ থাকার সময়ই, যে মুহূর্তে স্তালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের প্রথম খবর তার কাছে পৌঁছাল সে নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিল আর রোগগ্রস্ত হওয়ার 'ভাণ' শুরু করল। এক ছবিতে রাইখস্ট্যাগে একটা গম্বুজের ওপর সোভিয়েত পতাকা দেখে নাকি তার এই রোগের দ্বিতীয় আক্রমণ হয়। কিন্তু আসলে এগুলো তো সবই ছিল অভিনয়ের মহড়া। আসলে নিজের হিসেব করে তৈরী সাজানো ছকের মাধ্যমে কৌশল করে বিচারের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তখনো তার আরও অনেক কিছু মনে করার দরকার ছিল। যখন এটাও ভেস্তে গেল আর প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল, সে তৃতীয়বাবের জন্য আর সম্ভবতঃ শেষবারের জন্য তার 'স্মৃতি বেবাক হারিয়ে ফেলল'। তাই জন্যই সে আদালত ঘরে 'ইয়ারফোন' না লাগিয়েই বসেছিল। আর সেই কারণেই সে হাতে গোয়েন্দা গল্প নিয়ে বসে থাকত, শুধু এই ব্যাপারটার ওপর জোর দেওয়ার জন্যেই যে বিচারের ব্যাপারে তার একেবারে কিছুই করার নেই।

সোভিয়েতের বিখ্যাত মনোরোগ বিজ্ঞানী ক্রাসনুশকিন সহ পৃথিবীর প্রখ্যাত সব মনোরোগ বিজ্ঞানী তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। এই সমস্ত

বিশেষজ্ঞ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে হেসস আর কিছু নয়, স্রেফ একজন ভণ্ড, একজন চতুর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরিষ্কার মাথার ভণ্ড। সুতরাং...

হেসস্ উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল আর তার পাতলা চুল ঠিক করছিল। এই সময় তার সামনে মাইক্রোফোন দেওয়া হল। তারপর এক কর্কশ ও ফ্যাঁসফেঁসে অপ্রীতিকর গলায় সে ঠাণ্ডাভাবে ঘোষণা করল।

"এখন থেকে আমার স্মৃতি আবার জাগ্রত হল। স্মৃতি হারানোর যে ভান করা হয়েছিল, তার কারণ ছিল কৌশলগত," এই বলে সে তার রোগাটে মুখ দুমড়ে বসে পড়ল।

আমাদের পাশ্চাত্য সহকর্মীরা নিজেদেরকে আসন থেকে ঠেলে একে অপরকে ধাক্কা মেরে টেলিফোন আর টেলিটাইপ যন্ত্রের কাছে ছুটল এই উত্তেজনা, উত্তেজনা—নম্বর এক, তৎক্ষণাৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। আমাদের কোন তাড়া ছিল না। কেননা আমাদের কাছে এটা ছিল যুদ্ধ-অপরাধীদের চরিত্রের চেহারার আর একটি দৃষ্টান্ত।

"কি, শয়তান. নোংরা. নীচ বেজন্মা এরা !"

"এইসব নিদারুণ বিরক্তিকর ফ্যাসিবাদী রাক্ষসদের কাছ থেকে তুমি কি আশা করো ?...মানুষের মধ্যে এইসব ভয়ঙ্কর রাক্ষসদেব কাছ থেকে ?" ভিশনেভস্কি বিড় বিড় করে বলল।

হেসস্‌কে যখন স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য করান হল তখন হেসস-এর চেহারা তিনজন 'কুক্‌রিনিসকি' প্রত্যেকে নিজের মত করে এঁকে রাখার চেষ্টা করছিল।

হেসস-এর এই ঘটনা, আমরা পরে আমাদের ঘরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম। এই নিজের মুখোস নিজে খুলে ফেলার ফলে এই সব যুদ্ধ-অপরাধীদের ওপর শ্রদ্ধাশীলতার যে শেষ কৃত্রিম খোলসটুকু ছিল, তাও খসে গেল। নাজীবাদের ইতিহাসে হেসস একজন গুরুত্বপূর্ণ আর দারুণ ক্ষতিকারক লোক। ও ছিল হিটলারের অনুগামী একজন অফিসার, সেই সময় ও পরিচিত ছিল এ্যাডলফ শ্‌চিকল্‌গ্রুবার নামে, তৎকালীন এক বৈমানিক, যে গোয়েরিং-এর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ শহরে বোমা ফেলার অভিযানে যেত। হিটলারের প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-সমাজতান্ত্রিক দলের সে একজন প্রথম দিকের সভ্য। ১৯২৮ সালে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর হিটলার ও তাকে জেলে পোরা

হয়। ছাড়া পাওয়ার পর সে হিটলারকে তার বিখ্যাত বই *মেইন ক্যাম্পফ* যে বই দশ বছর পরে নাজীদের বাইবেলে পরিণত হয়েছিল, তা লিখতে প্রচুর সাহায্য করে। বৃটেনে উড়ে যাবার আগে হেসস ছিল, হিটলারের নাজী দলে দ্বিতীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি, আর হিটলার সম্ভবতঃ তাকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল যে হেসস্ ব্রিটিশদের সঙ্গে আলাদা করে একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের কথা শুরু করে আসবে, আর পাশ্চাত্যের দিক থেকে বা পশ্চিমী শক্তিগুলোর সম্ভাব্য মোকাবিলার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হিটলার তার সমস্ত সামরিক শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংহত করবে। হেসস্ বিশ্বাস করতো, এই 'বিশেষ কর্তব্য' সম্পাদন করার ফলে গোয়েরিংকে টপকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে আর ফ্যাসীবাদী ক্ষমতার বিন্যাসের সিঁড়িতে তাকে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠিয়ে দেবে।

"তুমি জানো কি, কি করে ওঁরা শেষ পর্যন্ত হেসস্‌কে ধরে ফেললেন?" জিজ্ঞাসা করল য়ুরি কোরোলকভ, বিচারকদের সঙ্গে যে ভালো যোগাযোগ রাখতো। "একটা ছবি দেখাতে দেখাতে। অধ্যাপক ক্রাসনুশকিন-এর নির্দেশে হেসস্‌কে একটা খালি ঘরে *প্যারটেইট্যাগ* সভা সমাবেশগুলোর ছবি দেখানো হয়। যুদ্ধের আগে, ন্যুরেমবার্গের ঐ জায়গায় প্রচুর হৈ-চৈ আর গানবাজনার পশ্চাৎপটে ছবিগুলো নেওয়া হয়। এই ছবিগুলিতে ফুয়েরারের সঙ্গে তাকে সর্বত্র দেখা যায়।

"এইসব তথ্য চিত্রগুলি যার মধ্যে তার অতীত ক্ষমতা আর গৌরব মূর্ত হয়ে আছে, হেসস্ সেইগুলি দেখে। সে হাসতে থাকে কারণ সে বুঝতেই পারে নি যে তার এই ছবি দেখার ছবিও ক্যামেরায় তুলে নেওয়া হচ্ছে। যখন এই নতুন ছবি তৈরী হয়ে গেল, সেটা হেসসকে দেখানো হল আর তখনই তার স্মৃতি ভ্রংশ হয়ে থাকার ভাণের বাধ্যতামূলক ইতি ঘটল।"

"তুমি এসব জানলে কি করে?"

"অধ্যাপক ক্রাসনুশকিন নিজে আমায় বলেছেন—মনস্তাত্ত্বিক ফরেনসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কমিশনে তিনিই আমাদের প্রতিনিধি।"

এই তিন নম্বর নাজী যে একজন ফালতু সস্তাশ্রেণীর ভণ্ড বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেল, সে এখন কেমন ব্যবহার করে তাই লক্ষ্য করে দেখার।

আমার কাছে কিছু সুখবর ছিল। জোলিন, বার্লিনে *প্রাভদার* নিজস্ব

সংবাদদাতা আমায় একটা মোটর গাড়ি পাঠিয়েছিল। গাড়িটা চালাত ভিশনেভস্কির সোফার, একজন আমুদে নাবিক এবং খাস ওডেসার লোক। যাই হোক, আমি এখানে একজন রুশ মোটর চালক পেলাম না, তাই আমেরিকান সামরিক কর্তৃপক্ষ যারা ট্রাইবুনালের তদারকি করছিল, তাদের কাছে গেলাম। মোটর পরিবহণ সংক্রান্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ওদের বিভাগীয় অফিসার বেশ আকর্ণ হাসি হেসে বললেন, "ঠিক আছে। আপনি একজন সোফার পাবেন।" তিনি আমার উর্দির হাতায় সোনালি ব্যাণ্ডগুলো হাতে করে ছুঁয়ে জানতে চাইলেন, "এ কথা কি সত্যি যে সোভিয়েত এস-এস ইউনিটের আপনি একজন কর্ণেল?"

তিনি অনুগ্রহ করে ওই দিন 'প্যালেস অফ জ্যাসটিস'-এ টেলিফোন করে আমাকে একটি টেলিফোন বার্তা শোনালেন—"কাল সকাল ৮টায় আপনার রুশ প্রাসাদে মোটর গাড়ির চালক যাবে। নাম—উলফ স্তাভিনস্কি। শিক্ষিত, রুশ ভাষা জানে……"। আমেরিকানরা নিশ্চয়ই দক্ষ আর উপকারেচ্ছু। ওদের সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে।

৬। দোলনা ও কবর

সুতরাং পোশাক-আসাকের সমস্যা মিটে গেল। আমার সেই মন্দভাগ্য ইউনিফরম যেটি আমাকে একজন রুশ এস-এস-এর সুখ্যাতি এনে দিয়েছিল সেটিকে আলমারিতে সরিয়ে রাখা হল, আর তার জায়গায় এল সেরগেই ক্রুশিনস্কির পুরানো সেই ইউনিফরম যেটিকে শুধু পরিষ্কারই করা হয়নি, রীতিমত যার আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটর গাড়ির ড্রাইভারের ব্যাপারটা আমায় শেষ পর্যন্ত অজস্র ঝামেলায় ফেলল। যদিও মোটর পরিবহণের দায়িত্বে ছিলেন যে আমেরিকান অফিসার তিনি তো বেশ পরোপকারী লোক। বরং বলা চলে যে তাঁর পরোপকার করার ইচ্ছাটা বড়ই বেশী। তিনি যেমন কথা দিয়েছিলেন, ড্রাইভার আমার কাছে এলো রবিবার সকালে—লম্বা, হাল্কা সোনালি চুল, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, পরণে চামড়ার প্যান্ট, জ্যাকেট আর পায়ের নীচের দিকে মানানসই গার্টার। সাধারণ কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ভঙ্গীতে সে নিজের পরিচয় দিল। এমনকি করমর্দনের জন্যে হাত পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল।

"আমি রুশ ভাষা জানি," সে বলল এক অদ্ভুত বাচনভঙ্গীতে, জার্মানদের মত নয়।

"তুমি কোথায় এ ভাষা শিখলে?"

"আমার আত্মীয়-স্বজন থাকতো রিগাতে"

"তুমি কি ভক্‌সওয়াগেনস গাড়ি চালিয়েছ?"

"আমি জার্মানদের তৈরী সব রকম গাড়ির সঙ্গেই পরিচিত।"

সাধারণভাবে তার চাউনি আমার ভাল লাগল। আমার দোভাষীকে আমি গ্যারেজে ফোন করতে বললাম। আমি ড্রাইভারকে বললাম গাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে রুশ প্রাসাদেব দরজায় সকাল নটায় আসতে।

"ঠিক আছে, তাই হবে।"

সেই পরোপকারী আমেরিকান অফিসারকে ফোনে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে দুপুরের আহারের নিমন্ত্রণ জানানোর কথা আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল যে রবিবার দিনটা এখানে খুব কড়াকড়ি ভাবে বিশ্রামের দিন হিসেবে পালিত হয়, সুতরাং অফিসে সম্ভবতঃ কেউ নেই। এই ইচ্ছাটা পরের দিন পর্যন্ত মুলতুবি রাখতে হল। যথা সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি এসে গেল। আমি ইতিমধ্যেই এক দল বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পাঠাগারে বিভিন্ন ভ্রমণ-নির্দেশিকা সংক্রান্ত বইপত্তর থেকে আমি শহরটা সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছিলাম, তাতে বোধ হয়েছিল যে এই শহরে দেখার মত অনেক কিছু আছে। ক্রুশিনস্কি আর ঝুকভও সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে রাজী হয়ে গেল।

পুরোন সব গীর্জা, মধ্যযুগীয় ঝর্ণা, প্রথম পকেট ঘড়ি, আর এখানে আবিষ্কৃত প্রথম ক্লারিওনেট, অথবা এমনকি বিখ্যাত শিল্পী আলব্রেখট ডুয়েরার কুটির, এসব দেখার আমাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। প্রথম প্রধান আগ্রহ ছিল নাৎসীবাদের উত্থানের সঙ্গে যুক্ত যে কোন জিনিস দেখার। অস্ট্রিয়ান এ্যাডলফ শিচকলগ্রুবার-এর নাম যখন শোনাও যায় নি তখন স্থানীয় 'বীয়ার-হল-এ প্রথম ঝটিকা বাহিনী চিৎকার করত তাদের *সেইগ হেইল!* বলে। এখানেই স্থানীয় বক্তৃতা মঞ্চ থেকে হিটলার, গোয়েবল্‌স্, গোয়েরিং আর স্ট্রেইচার তাদের বক্তৃতায় শপথ করেছে "খুব কম করে আগামী হাজার বছরের জন্যে" গোটা পৃথিবীকে তৃতীয় রাইখের সঙ্গে ফ্যাসিবাদীদের অন্তহীন অগুনতি সব মশাল-মিছিল পরিক্রমা করেছে

এখানকার পথে পথে, অপরিসর অলি-গলিতে যেখানে মধ্যযুগীয় স্মারকগুলি বর্তমানের দিকে অপলক চেয়ে আছে।

একদা বর্ধিষ্ণু এই মধ্যযুগীয় শহর, যেটি সমৃদ্ধ হয়েছে 'দানিয়ুব' আর 'মেইন' জার্মানীর দুই প্রধান নদীকে খাল দিয়ে যোগ করার ফলে, এই শহরের ইতিহাসের লজ্জাকর অধ্যায় সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিচার চলাকালীন সময়ে আমরা প্রচুর শুনেছিলাম। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম নিজের চোখে দেখে সব কিছু মিলিয়ে নিতে, সত্যি কথা বলতে কি, ন্যুরেমবার্গ শহরকে সরাসরি জানতে।

আমাদের গাড়ির চালক দেখা গেল বেশ অনেক কিছু জানে। 'বীয়ার-হল', যেখান থেকে হিটলার বক্তৃতা দিত? হ্যাঁ, সে জানে সেটা কোথায়। সত্য বটে যে তা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, কিন্তু তাতে কি, এখনো কিছুতো অবশিষ্ট আছে। আমাদের ভলকসওয়াগেন এক বাড়ির সামনে পৌঁছাল, যার জানলাগুলি কাঠ দিয়ে মারা। ঘরের কোন দরজা ছিল না এখানে ওখানে কুলুঙ্গীগুলো ভেঙ্গে চুড়ে দাঁড়িয়েছিল আর তার সামনে একটি মরচে ধরা ধাতব হাতলে একটা মস্তো বড় বীয়ার-মা, একদল আমেরিকান অফিসার বীয়ার হলের ভেতরে ছিল, যেখানে আলগা ঝুরা ঝুরা প্লাস্টার ছড়িয়ে ছিল। দেওয়াল ভর্তি রঙ দিয়ে করা ছবি—পুরোন ব্যাভারিয়ান জীবনধারার নানা আলেখ্য। সেগুলি অমার্জিত। যত দূর পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে তত দূর পর্যন্ত দেওয়ালে আঁকা সব চিত্রই ছিন্নভিন্ন। আমরা দেখলাম যে একজন আমেরিকান লেফটেন্যান্ট একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে তার মস্ত ছুরিটা দিয়ে দেওয়াল চিত্রের একটা অংশ কুরে কুরে চেঁচে তুলে নিচ্ছে। সে যখন আমাদের লক্ষ্য করল, তখন খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে লাফ দিয়ে নেমে, নিজের ছুরি লুকিয়ে ফেলল।

আমেরিকান অফিসারটি যে কি করছে তা আমরা প্রথমে বুঝতে পারি নি। কিন্তু আমাদের সবজান্তা গাড়ি-চালক বুঝিয়ে বলল যে আমেরিকানরা স্মারক-রাখতে ভালবাসে—যে বিয়ার-হলে দাঁড়িয়ে হিটলার স্বয়ং বক্তৃতা করেছে সেখানকার একটা স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করতে চায় ওই অফিসার। স্মারক-সংগ্রহে আমাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তাই বিষাক্ত ফ্যাসিবাদ যেখানে প্রথম বহু ভাবে বিস্তৃত হয় সে জায়গাটি ঘুরে দেখে, আমাদের

অভিনন্দন জানিয়ে আমরা চলে এলাম। দেওয়ালে আঁকা চিত্র থেকে স্মারক চেঁচে তোলার জন্য পিছনে পড়ে রইল আমেরিকানরা।

আমরা শহরের কেন্দ্রস্থলে সটান গাড়ি চালিয়ে গেলাম। 'গাড়ি চালিয়ে গেলাম' বলাটা ঠিক হল না, ধ্বংসস্তূপের মাঝখান দিয়ে পথ খুঁজে বার করে করে আমরা গেলাম। কেন না সেই শহর, তার যা কিছু দিয়ে ভ্রমণ নির্দেশিকা সোচ্চার সেই শহরের আর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাদের শেষ বিমান হানায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমান বাহিনী এত চমৎকার কাজ করেছে যে ন্যুরেমবার্গ শহরের গোটা পুরোন অংশ এখন এক বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত। যুদ্ধের পর মাত্র কয় মাসে জার্মানরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে কোনক্রমে যানবাহন আর লোকজনদের পথ চলার জায়গা করেছে। যা ঘটেছে, তার সম্পূর্ণ পরিমাপ করা একেবারেই অসম্ভব। যে সমস্ত কারখানা সৈন্যবাহিনীর ট্যাংক, অস্ত্রশস্ত্র আর বিমান চালানোর ইঞ্জিন তৈরী করে যোগান দিয়েছে সেই সমস্ত কারখানার গায়ে আঁচও লাগে নি, যেমনকার তেমন আছে; শহরের উচ্চ শ্রেণীর উপকণ্ঠ, যেখানে ধনী লোকের ও এইসব কারখানা, যেগুলি যুদ্ধের গোটা সময়টা যুদ্ধের জন্যই কাজ করেছে—সেইসব কারখানার মালিকদের বসতি অঞ্চলও চমৎকার অবস্থায় রয়েছে। এমনকি কাঁচের জানলাগুলোও ছোঁওয়া হয় নি। শহরের পুরোন অংশ কিন্তু মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পথ করে, কখনো গাড়িতে এমনকি পায়ে হেঁটেও আমরা চললাম। ছোটখাটো এক ভদ্রলোক, তাঁর মাথার টুপিতে একটা পালক গোঁজা, পরণে শিকারীর জ্যাকেট, খাটো ঢলঢলে সুয়েডের প্যান্টের তলা দিয়ে দুটো ঠাণ্ডা আর নীলচে হাঁটু দেখা যায়, তিনি আমাদের 'গাইড' হতে চাইলেন। এক প্যাকেট সিগারেট ? ওহ, এতে কি দারুণ হবে! সেই লোকটি বহু বহুদিন সত্যিকারের সিগারেটের ধূম পান করে নি। আমাদের ক্রমশঃ দৃঢ় ধারণা হল যে আমাদের ড্রাইভার তার আর কোন বিকল্প নেই। আমাদের কাছে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা সেই গাইড যা কিছু বলছিল, আমাদের ড্রাইভার গরগর করে তার সব কিছু তর্জমা করে দিচ্ছিল যখন আমরা ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে একমাত্র সরু রাস্তা ধরে সার বেঁধে এগোচ্ছিলাম, কোন কোন জায়গায় যেন দৈবানুগ্রহে পুরোন বড় রাস্তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল—খুবই বিস্ময়করভাবে একটা পাঁচিল

এখনো দাঁড়িয়ে আছে, ফটকগুলো দিয়ে কোথাও যাওয়া যায় না অথবা পাথর কুচির মধ্যে একটা নীল রঙের পথ চলার সংকেত দেখা যাচ্ছে।

যে মুহূর্তে আমরা উত্তরদিকের প্রবেশপথের ধনুকাকৃতি খিলানগুলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমরা সত্যিকারের রহস্যোদ্ঘাটন মূলক ধ্বংসক্রিয়া বলতে যা বোঝায়, তার আবহাওয়া উপলব্ধি করলাম। আমাদের চারপাশে ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো পুরোন চিহ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা ভ্রমণ-নির্দেশিকা বই নিয়েও, এই পুরোন এবং নিঃসন্দেহে খুব সুন্দর শহর কেমন দেখতে ছিল তা মনে মনে ভেবে ঠিক করাও ছিল খুবই কঠিন। পুরোন হপটমারকট স্কোয়ার পরে যেটার নতুন নামকরণ হয় এ্যাডলফ-হিটলারপ্লাটজ যে জায়গা তার জমকাল গোথিক স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, সেখানের কেবল একটি ফোয়ারা অক্ষত আছে। বিখ্যাত ফ্রয়েনকিরকে যা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিল্পকলার কারিগরি দক্ষতার অন্যতম প্রধান নিদর্শন, সেটিকে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে, আর এখন সেটিকে দেখলে মনে হয় যেন এক পুরোন, জীর্ণ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার বাতাস তাড়িত থিয়েটারের পিছনে ঝোলান দৃশ্য যেন।

চারদিকে কেবল ধ্বংসাবশেষ। আলটেনব্রুকে সেই ধনুকের মত বাঁকানো সেতু যা পেগনিৎজ উপনদীর ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে যা এখন এক থাক ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে অন্য আর এক থাক ধ্বংসাবশেষের যোগসূত্র, সেই সেতুও বিস্ময়করভাবে অক্ষত আছে। বয়সের ভারে জীর্ণ 'সিটি হল' অট্টালিকার বহির্ভাগ হাড়জিরজিরে ঠেকনোর মত দাঁড়িয়ে আছে। ছয়'শ বছর আগে, এখানেই, আজকের যুদ্ধ-অপরাধীদের আত্মিক পিতারা তাদের রচিত জাতিবিদ্বেষী প্রভুত্বপরায়ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার দলিল অনুমোদন করেছিল। ডাঁই করা ইঁটের টুকরোর দুটি ঢালের মাঝখান দিয়ে আমরা সেই প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললাম, আর সেই ভাঙা ইঁটের মধ্যে পড়ে থাকা নীল রঙের পথ-সংকেত দেখে বুঝতে পারলাম যে আমরা 'বারগস্ট্রাসী'র দিকে চলেছি। সেই প্রাচীন, বিশাল ধূসর প্রাসাদ উঁচু দুরারোহ পাহাড় চূড়ায় অস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। এই প্রাসাদটির ওপরও আঘাত হানা হয়েছে—এর পাঁচিলগুলো ফাটা, আর অন্যতম একটা গম্বুজ একপাশে ভারসাম্যহীন অবস্থায় রয়েছে।

"আপনাদের যে সমস্ত নিজের শহর ধ্বংস হয়েছে তার বদলা হিসেবে

মিত্রশক্তির বাহিনী জার্মানদের ওপর কিরকম প্রতিশোধ নিয়েছে, তা দেখে নিশ্চয়ই আপনাদের আনন্দ হচ্ছে," আমাদের ড্রাইভার বলল, ও তারপর যোগ করল, "কথায় বলে, শত্রুর শবদেহের গন্ধ নাকে মিষ্টি ঠেকে।"

আমরা তিনজন অবাক হয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

আনন্দ? হ্যাঁ, আমরা সবাই আমাদের নিজের শহর কালিনিনের অঙ্গচ্ছেদ হয়ে কাঁটা ছেঁড়া বিকলাঙ্গ হওয়া দেখছি, স্তালিনগ্রাদের ধ্বংসস্তূপ, কিয়েভ শহরে বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দেওয়া গীর্জা আর মিনস্ক-এর পাথুরে কংকাল আমরা দেখেছি, যা এ্যাডলফ হিটলার বিমানে বসে ওপর থেকে নীচের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে আগ্রহ ভরে চেয়ে দেখছে। কিন্তু এই প্রাচীন, সুন্দর জার্মান নগরের বর্বোরচিত ধ্বংস দেখে কে সুখী বোধ করতে পারে? নাজীরা কোন সামরিক কারণ ছাড়াই কিয়েভ-এর বিখ্যাত গীর্জা ফ্রাউয়েনকিরচে যে উড়িয়ে দিয়েছিল তার জ্বলে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ দেখার মতই এই সব দেখাও বেদনাজনক। যুদ্ধোপকরণ তৈরীর কারখানা মালিকদের আর মশাল মিছিলের নেতাদের বসতবাড়িগুলো বিধ্বস্ত করলেই বোধহয় উচিৎ কাজ হতো। কিন্তু, আমি আবার বলি, যে নগরের উপকণ্ঠ, যেখানে উচ্চবিত্তশ্রেণীর বসবাস, সেখানে আর যুদ্ধোপকরণ তৈরীর কারখানাগুলোর গায়ে আঁচড়ও লাগেনি। এটা প্রমাণিত হয়নি বটে তবে গুজব ছিল যে এই সমস্ত কারখানার মালিকানা অংশের অনেকটাই ছিল বিভিন্ন আমেরিকান কোম্পানীর।

"ইয়াংকিরা পারত, কিন্তু তারা এই সব অক্ষত রেখেই চলে গেছে," ড্রাইভার তাড়াতাড়ি বলল। বেশ বোঝা গেল যে সে তার আগের বলা কথায় আমাদের প্রতিক্রিয়া ধরে ফেলেছে; এখন আমার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নীচু করে বলল, "হাজার হোক আমেরিকানরা তো সুসভ্য বর্বর।"

আমার যুদ্ধ অভিজ্ঞতা আমায় একটি বা দুটি জিনিস শিখিয়েছে। আমি যখন চাপাস্বরে বলা এই কথাগুলো শুনলাম, আমি যেন সহজাত প্রবৃত্তিবশে সাবধান হয়ে গেলাম ও আমাদের এই নবপরিচিত সম্পর্কে সজ্ঞানে খেয়াল রাখতে লাগলাম। সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর অভিযান শেষ হল। আমাদের জার্মান প্রদর্শককে কয়েক প্যাকেট চেস্টারফিল্ড সিগারেট দিলাম। সে খুবই আশ্চর্য হয়ে তার নিজস্ব ভাষায় অনেক কথা বলে আমাদের প্রাণভরে ধন্যবাদ দিল।

"আপনাদের এতটা উদার হওয়া ঠিক হয়নি," আমাদের মোটর গাড়ির

চালক মন্তব্য করল। "এটা খুব যুক্তিযুক্ত হল না। এক প্যাকেট দিলেই ওর পক্ষে যথেষ্ট হত।" তারপর সে খাটো গলায় কেবল আমাকে শুনিয়ে বলল, "জানেন ইয়াংকিরা ভীষণ নীচ। আপনি কি জানেন যে তখন তাদের একজন সৈন্য একজন জার্মান মেয়েকে ভোগ করে, যখন মেয়েটাকে কেবল এক পাটি মোজা দেয়। জোড়ার অন্য মোজাটা মেয়েটাকে অন্যদিন উপার্জন করতে হয় আর নয়তো সেদিন সেই একই জায়গায় সৈনিকের সঙ্গীর কাছ থেকে উপার্জন করতে হয়! ওরা জার্মানদের নষ্ট করে না।"

না শুনতে পাওয়ার ভান করে আমি বললাম, "তুমি কি জানো সেই *পারটেইটাগসগেলানডে* কোথায়? যেখানে তুমি জানোকি, যে স্টেডিয়ামে হিটলার তার জনসভা করতেন?

"ও, হ্যাঁ '*জাওল, জাওল*" সে প্রাণবন্ত হাসিখুশীতে চীৎকার করে বলে উঠল।

সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে বার হয়ে গাড়ি ছুটে চলল উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অক্ষত বসতি এলাকার এক রাস্তা দিয়ে, আর এগিয়ে চলল নগরের বাহিরের দিকে, আর বিশাল খেলার জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা দৈত্যাকার থামগুলোর সাদা কৌণিক বহিঃরেখার দিকে স্ট্রাহোভে বিখ্যাত সোকোল স্টেডিয়াম, যেখানে আমি একবার একটা বিমান মাটিতে নামিয়েছিলাম এর তুলনায় মনে হল যেন ভলিবল খেলার ছোট মাঠ। এইখানেই হিটলার তার অশুভ সমাবেশ করত যাতে জার্মানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে অংশগ্রহণ করত অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ নাজী।

খেলাধূলোর জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। ফুয়েরার এবং বর্তমান বিচারাধীন যুদ্ধ অপরাধীরা, এখানে সভা সমাবেশের সময় দর্শক আসনের গ্যালারীর মাঝখানে, উঁচু করে বসানো এক সাদা মঞ্চের ওপর দাঁড়াতো। এইখান থেকেই হিটলার তার তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বক্তৃতা দিত। সেই বক্তৃতা, যাতে সে বলেছিল যে জার্মান ঈগল ইতিমধ্যেই তার ডানা ইউরোপের ওপর বিছিয়ে দিয়েছে ও খুব শীঘ্র এশিয়ার ওপরও তা ছড়িয়ে পড়বে—দর্শক আসনের দিকের সেই ঈগলকে আগেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে এখন কয়েকজন লাল-মুখো আমেরিকান নাবিক নিজেদের মধ্যে হাসি তামাশা করছে, হা হা করে হাসছে আর ঠিক যেখান থেকে ফুয়েরার তার ক্ষ্যাপামি, ক্রোধমত্ততা প্রকাশ করত, ঠিক সেইখানটিতে

দাঁড়িয়ে একে অপরের ছবি তুলছে। এ ছাড়া, দেখার মত আর কিছুই বাকী ছিল না। সুতরাং সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

এতো বড় অদ্ভুত। গোটা নগরটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বোমা ফেলে অথচ নানা স্ট্যাচু, যেমন নানা সময়ের সম্রাট কাইজার, নাবিক, আবিষ্কারক আর কবিদের, ধ্বংস হয়নি, আর সেগুলো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবিক্ষিপ্ত আছে। ব্রোনজ-এ তৈরী এক পাঁজা বই-এর ওপরে বসে থাকা হ্যানস্ স্যাচস্-এর মূর্তি, দেখে মনে হয় যেন তার হাত দিয়ে এক অসহায় মুদ্রা করে আছে, যেন কি ঘটে থাকতে পারে তা-ই সে একটুও বুঝে উঠতে পারিনি। এই প্রাচীন নগরীতে নগরবাসীরা বংশপরম্পরায় শান্তিতে বাস করেছে, সসেজ আর সায়রক্রট খেয়েছে, তাদের পানশালায় বীয়ার পানের চত্বরে দাঁড়িয়ে সমগ্র মানুষ জাতির মধ্যে ও তাদের ওপর জার্মান রক্তের শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিৎকার করে বলেছে ও আগ্রাসী অভিযানের পন্থা খুঁজেছে। তারপর এই নগর বাসীদেরই উত্তর পুরুষেরা *পারটেইটাগসগেলানডে* তৈরী করেছে, যা আমরা এই মাত্র দেখে এলাম, তারাই জার্মান সাম্রাজ্যকে পাঁচটি মহাদেশে বিস্তার করার কথা গলা তুলে বলেছে, সাজানো গোছানো সবুজ ছাপ, কাচের জানালা লাগান পানশালায় বীয়ার পানের জটলার মধ্যেই নয়, বলেছে খোলা বাস্তাঘের তলায় দাঁড়িয়েও, আর যে কেউ তাদের প্রতিবন্ধক হবে, তাকে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিয়েছে। এই সমস্ত হিংস্র স্বপ্নের উত্তরে সাড়া দিয়ে সাময়িক ভাবে উন্মত্ত জনতা চীৎকার করেছে *সেইগ হেইল*.! এবং *হোচ*! —এই সব বলে।

বিংশ শতাব্দীর এই সব আদিম বর্বরদের বড় বড় দল শান্তিপূর্ণ ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। যে দেশগুলো একটার পর একটা এই সমস্ত *প্যানজারদের* আগুনে কবলিত হল। অবিশ্রান্ত ধারায় রক্ত বয়ে গেল, সাংস্কৃতিক সৌধের ওপর হিস্ হিস্ করে শীস দিতে দিতে ফেটে পড়ল বোমা। শহর ভাঙচুর করে এই অসভ্য বর্বরেরা এমন ভাবে লুটপাট আর ধ্বংস করল যে তাদের চিন্তাধারার অগ্রসূরী এবং পূর্বপুরুষ, ফ্রেডরিক বারবারোসসা,—যার অট্টালিকা দৈত্যাকৃতি গ্রানাইট পাথরের ন্যুরেমবার্গ শহরের প্রায় দুরারোহ চূড়ার ওপর এখনো দাঁড়িয়ে আছে—তার

স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেল। আরও এবং আরও সামরিক উন্মাদগ্রস্ত হয়ে তারা এই শহরের পথে পথে *সেইগ হেইল*! বলে বারবার উন্মত্ত চিৎকার করেছিল। এবং সেইসব দিনে যখন অন্তহীন মশাল মিছিল এখানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াত, স্বস্তিকা চিহ্নিত পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হত জানালায় জানালায় তখন এই রণোন্মাদ নগরবাসীদের কবি ও "অগ্নিময় জার্মান শোণিতের" চারণ হ্যানস স্যাচস তার প্রাপ্য অংশের মালা আর পুষ্প স্তবক নিত হাত বাড়িয়ে।

সুতরাং এখানে জীবন চলল হিটলারের অধীনে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পাগলামির বদ্ধ ধারণা নিয়ে, আর তার বদ্ধমূল ধারণামত অজেয় বিরাট যাযাবর বাহিনীকে উড়িয়ে নিয়ে এলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। আর তখনই তার ভাগ্যের চরম অসৎ, জঘন্য চাকা দ্রুত ঘুরে গেল। জার্মান বাহিনীকে বিখ্যাত শীতকালীন লড়াই-এ পরাস্ত করে এবং তাদেরকে মস্কো অঞ্চল থেকে হঠিয়ে দিয়ে, লাল ফৌজ, এককভাবে, স্তালিনগ্রাদের ভয়ংকর লড়াই-এ এই নাজী বন্য পশুদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিল। তারপর লাল ফৌজ শত্রুর ওপর একের পর এক আঘাত হানতে লাগল কুরস্ক বালজ-এ, নীপারে, আর তারপর তাড়া করে সোভিয়েত ভূখণ্ড থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করে অন্যান্য দেশের অধিকৃত ভূখণ্ড মুক্ত করতে লাগল। তারপর সম্মিলিত মিত্র বাহিনী সেই যুদ্ধে যোগ দিল ও যেটুকু বাকী ছিল, তাও সাধিত হল। হাওয়াতে বীজ ছড়িয়ে ছিল যে, ঘূর্ণিঝড়ের ফসল সে-ই তুলে নিয়েছে। এ কথা সত্য কিংবা সত্য নয়, সময় তা দেখিয়ে দেবে। আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনাল, ক্রীড়াবিদদের ভাষায় বলা যায়, সবেমাত্র গতি নিতে আরম্ভ করেছে। আমাদের এখনো দেখার বাকী আছে।

ইতিমধ্যে ব্রোনজের হ্যানস্ স্যাচস তার গোটানো পুঁথি আর বইপত্তরের ওপরে দানবাকৃতি ধ্বংসস্তূপ পরিবৃত হয়ে বসে বসে তার হাতের অসহায় মুদ্রায় যেন এই কথা বলতে চাইছে, "আমার ধারণা, বাইবেলে এইসব কথা আগেই বলা হয়েছে—'তুমি যেমন বীজ বপণ করবে বা ছড়াবে, ফসলও পাবে তুমি ঠিক সেইমত'..."

একদা প্রচুর সম্পদশালী ও সুন্দরী এই নগরীতে এখন জীবন বড়ই কঠিন। শহরের মাঝখানে বাক্স, কাঠের পাটা আর দরজার তৈরী, বোমা থেকে বাঁচাবার জন্যে আশ্রয়ে, মাটি খোঁড়া গর্তের মধ্যে, যেমন তেমন করে তৈরী

করা চালায় তারা গাদাগাদি করে থাকতো। লোহার পাইপ থেকে বায়ু-তাড়িত ধূম ডাঁইকরা পাথরকুচি থেকে সম্প্রসারিত হয়ে বাইরের দিকে খাড়া ঢুকে যেত। দাঁড়াবামাত্রই যে কেউ দেখতে পেত শীর্ণকায়, গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখ শিশুদের, যাদের অবশ্য ধুয়ে পরিষ্কার করে, নিপুণভাবে তাপ্পিমারা পরিষ্কার জামা কাপড় পরানো হয়েছে। তারা তাদের হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইতো না। ঈশ্বর মার্জনা করুন, তারা নীরবে দাঁড়িয়ে, বাঙ্ময় চোখের ভাষায় প্রার্থনা করতো, আর আমাদের মনে পড়ে যেতো স্তালিনগ্রাদ, খারখভ, আর পোলতাভার সেইসব শিশুদের। আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে যা কিছু মুদ্রা ছিল সেই শিশুদের মধ্যে বিলি করে দিলাম।

সেই ড্রাইভার আবার মন্তব্য করল, "আপনারা রুশরা বড় বেশী উদার। আমাদের ফ্যাসীবাদীদের জন্য আপনারা যে ভীষণ কষ্ট করেছেন তারপর আপনাদের এই ব্যবহার দেখে, বড় অবাক লাগছে, জানেন। আর ওই ইয়াংকিরা......"

"তুমি সত্যি ওদের পছন্দ করো না, না?" আমি মাঝপথে বাধা দিয়ে খুব জোরে জিজ্ঞাসা করলাম যাতে উপস্থিত সবাই শুনতে পায়। সে আমার সঙ্গীদের দিকে ভয় পাওয়া চোখে তাকাল।

"কে? আমি? আমি কেবল বলতে চেয়েছিলাম যে তারা আপনাদের থেকে একেবারেই আলাদা।"

আমি এই লোকটির সম্পর্কে যেন প্রকৃতিগতভাবে অধিকতর সতর্ক ও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লাম, যদিও সে গাড়ি চালাচ্ছিল খুব চমৎকার, মোটা-মুটি ভালভাবেই রুশ ভাষা বলছিল আর লোকটি এতই বিবেচক যে যখনই আমরা বাইরে যেতে চাইছিলাম, সে লাফ দিয়ে এসে বদান্যতা সহকারে গাড়ির দরজা খুলে ধরছিল। আমরা যখন উত্তর দিকের ফটক পার হয়ে শহরের অক্ষত অংশে প্রবেশ করলাম, তখন একটা ছোট ঘটনার পর, তার প্রতি আমার বিদ্বেষভাব বিশেষভাবে তীব্র হয়ে পড়ল। সেখানে রাস্তার ওপর ট্রাম লাইন আর কয়েকটা গাড়ি ছিল। আমরা সেখানে বেশ তাগড়াই চেহারার পুরোন আমলের কিছু ছাদ খোলা চারচাকার ঘোড়ার গাড়ি আর এমন কি এক জোড়া ছোট ঘোড়ায় টানা কোচও দেখলাম। এক সময় এই গাড়িগুলো ব্যবহার হতো বিদেশী ভ্রমণকারীদের শহর দেখানোর কাজে ;

কিন্তু পেট্রোলের ঘাটতির জন্যে—আর পেট্রোল তো তখন জার্মানরা সংগ্রহ করত অবৈধভাবে—এইসব ভ্রমণকারীর জন্য নির্দিষ্ট গাড়ি এখন অন্য কাজ করছিল, বলা চলে মালবাহী মোটর গাড়ির জায়গা নিচ্ছিল।

এই সু-সংরক্ষিত জেলায়, একটি বিজ্ঞাপনের থামে আমরা একটা প্রাচীর-পত্রে দেখলাম সোনালী চুলের নৃত্যরতা একটি মেয়েকে জন্মদিনের পোশাকে। নৈশ ক্যাবারে! অঢেল আমোদ। কেবল মাত্র মিত্রবাহিনীর সৈনিকদের জন্য! আমরা নিজেদের মধ্যে এই বলে হাসি-তামাশা করলাম যে ছাপাখানার প্রতিনিধিদের নিয়ে আমাদের একটি অভিযানের আয়োজন করা উচিৎ, আর সেই ড্রাইভার, যে আমাদের হাসি-তামাশা আড়ি পেতে বা হঠাৎ শুনে ফেলেছে ও সত্যি মনে করেছে, সে জানান দিল যে সে সেইদিনই আমাদের সঙ্গে যুবতী ও সুন্দরী চমৎকার সব মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে, আর, অধিক কি এ সবই হবে বিনা খরচে, "রাশিয়ার বীর অফিসারদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ।" আমোদের জন্যও তেমন বেশী কোন খরচা নেই। আর খরচা যা কিছু তার জন্যে নগদ টাকাকড়িতেই হতে হবে এমন কিছু নয়, বরং বিনিময়ে জিনিস পত্তর দিলেই ভালো হয়।

"তারা সত্যি দারুণ, একেবারে প্রথম শ্রেণীর বিনোদিনী।"

"এমন একটি মরদকে তুমি পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে ধরে আনলে?" ক্রুশিনস্কি বেশ জোরে জিজ্ঞাসা করলো।

উত্তর দেবার মত সময় আমার হাতে ছিল না। আমরা গাড়িতে প্রেস-ক্যাম্প পর্যন্ত যাচ্ছিলাম। আমার বন্ধুদের নামিয়ে দেওয়ার পর, আমি তাকে 'প্যালেস অফ জাসটিস'-এ গাড়ি নিয়ে যেতে বললাম। তার-বার্তা অফিসে, আগের দিনের বিশেষ প্রতিবেদন আমার পাঠাবার ছিল। যখন কেবল আমরা দুজন, চালকটি জানতে চাইল যে তার গাড়ি চালানোয় আমি খুশী হয়েছি কিনা।

"হ্যাঁ, তুমি বেশ ভালোই চালাও।"

তারপর সে হঠাৎই আমার প্রতি পরম আস্থায় বা বিশ্বাসে গুপ্ত কথা বলার মত বলল, "হের অবেরস্ট, আমেরিকানদের আমি ঘৃণা করি। তারা কুৎসিত, অশিক্ষিত আর অমার্জিত। তাদের কাছাকাছি এলে আমরা ইউরোপীয়রা অসুস্থ বোধ করি। রুশরা একেবারে পুরোপুরি আলাদা। আমার আপনাকে খুবই ভালো লেগেছে, আর আমি আপনার কাজে

লাগতে পারি। আমি এই শহরটাকে ভালোভাবে জানি, এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে যারা খুবই কাজে লাগতে পারে……আমি তাদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতে পারি।

সে নিশ্চয়ই দাগের বাইরে অনেকদূর পা বাড়িয়েছিল, পোকার খেলায় যাকে 'আবক্ষ উন্মোচন' বলে, সেইরকম সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া ব্যাপার। আমি তাকে কিছুটা রূঢ়ভাবে বাধা দিলাম এবং এর আগেও যা তাকে জিজ্ঞাসা করেছি ভুলে গিয়ে জানতে চাইলাম, "তুমি রুশ ভাষা এত ভালোভাবে শিখলে কি করে ?"

"আমি তো আপনাকে বলেছি যে আমি একজন বাল্টিক জার্মান," একটু বিপর্যস্তভাবে উত্তর দিল সেই মোটর-চালক। "রুশ দেশের অনেক ভাল ভাল মানুষ সেখানে থাকতো, আমার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ছিল। হের অবেরস্ট দয়া করে এমন ভাববেন না যে আমি রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। 'টোডট' বাহিনীতেও আমি কাজ করেছি, আমি রাস্তা তৈরী করেছি, সুরক্ষার কাজ করেছি, হাওয়াই আড্ডা বানিয়েছি। আমি বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করে বলতে পারি যে আপনার সহযোদ্ধাদের দিকে আমি কখনও গুলি ছুঁড়িনি।

ঠিক তখন আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। আসন থেকে লাফিয়ে নেমে সেই চালক, গাড়িটা ঘুরে, দরজা খুলে দিল।

"আগামী কাল কখন এবং কোথায় ?"

"প্রতি মাসে তুমি কত উপার্জন করতে চাও ?"

"এখানে চলতি দর হল দুশো মারক," সে উত্তর দিল। আসলে সে যা বলল, তা হাস্যকরভাবে কম পরিমাণ।

"আজকের দিনের কাজের জন্যে এই নাও পনেরো। গাড়ি গ্যারাজে নিয়ে যাও আর তারপর তোমায় বরখাস্ত করা হল।"

"*ওয়ারাম ?*" সে জার্মান ভাষায় জানতে চাইল।

"*আয়ুফ উইডেরসেহেন*", আমি জবাব দিলাম। এর একটু পরেই আমি আমাদের দোভাষী, সেই ছোটখাটো মেয়ে, মায়াকে, দেখতে পেলাম জুনিয়র লেফটেন্যান্ট-এর পোশাকে। একে আমরা ডাকতাম লিট্‌ল টিন সোলজার বলে। তাকে বললাম মোটর পরিবহণের দায়িত্বে যে আমেরিকান ক্যাপ্টেন আছেন, তাঁর সঙ্গে আমার টেলিফোনে যোগাযোগ করে দিতে।

"ক্যাপ্টেন টেলিফোন ধরে আছেন", মায়া একটু পরেই বলল, "উনি জানতে চাইছেন, যে মোটর চালক উনি পাঠিয়েছিলেন তাকে আপনার কেমন লাগল, সে কি ভালো ড্রাইভার ?"

"ওঁকে বলে দাও, যা বলছি তার যতটা সম্ভব সঠিক অনুবাদ করে বলবে, লোকটি গাড়ি চালায় ভালো, কিন্তু লোকজনের প্রতি ও ভালো নয়।" দোভাষী আশ্চর্য হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। "হ্যাঁ, এইভাবে ভাষান্তর করো। ক্যাপ্টেনকে বলো যে ও সত্যি গাড়ি চালায় খুব ভালো, ভালো ড্রাইভার, কিন্তু খুব খেলো, বাজে অভিনেতা...ওইটা বলো... অভিনেতা। তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পেরেছো। আরও বলো যে তাঁর সদয় সাহায্যের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু খুবই আন্তরিকভাবে তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছি যে তিনি যেন এই রকম বেজন্মাদের আবার কাজে না লাগান।"

"ক্যাপ্টেন জানতে চাইছেন, কে আপনার গাড়ি চালাবে।"

"ওঁকে বলে দাও যে আপাততঃ আমি পায়ে হেঁটে যাব। এই বলে নম্রভাবে, যতদূর সম্ভব ওঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।"

মায়া টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল।

"শুনুন, আমার মনে হয়, ওই ক্যাপ্টেন খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে।"

"তাইতো হওয়া উচিৎ মনে করি। আমি নিশ্চয় হয়েছি।"

সুতরাং, আমি আর একবার মোটর গাড়িওয়ালা সাংবাদিক প্রতিনিধিদের সম্মানীয় ভ্রাতৃত্ব ত্যাগ করে, আবার ভ্রমণরত সাংবাদিক প্রতিনিধি হলাম।

৭। রুম নং ১৫৮

একথা বলা হয় যে মানুষ যে কোন কিছুতে অভ্যস্থ হয়ে যেতে পারে। আমিও অপ্রশস্ত, ধীর গতি আইন যন্ত্রের ভয়ঙ্কর, অভূতপূর্ব, স্রোতের মত আসা সব উপাদান প্রতিদিন হজম করার সঙ্গে ক্রমশঃ অভ্যস্থ হয়ে গেলাম। তখন ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়। চমৎকার সব দিনে বসন্তের সুবাসে আমাদের মন ছুটে উধাও হত, কেন না আমাদের নিজভূমি রাশিয়ার কালিনিনে—যদিও সেখানে বসন্তকাল বাভারিয়ার চেয়ে একটু পরে শুরু হত—বসন্ত ঋতুর স্মৃতি ভেসে ভেসে ভীড় করে আসত মনে, যে বসন্ত এমনিই মনোহারী ও তীব্র চিত্তচাঞ্চল্যকারী, সঞ্চারী। এমন সব দিনে আদালত ঘরে চুপচাপ বসে থাকাই কঠিন ছিল, আদালত কক্ষ ইতিমধ্যেই

আমাদের স্নায়ুর ওপর খেলা করতে আরম্ভ করেছিল। সেই কৃত্রিম আলো অনেককেই দিয়েছিল চোখের যন্ত্রণা, আর আইনবিষয়ক কর্মচারী, সংবাদ প্রতিনিধি, আর প্রতিবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ কালো চশমা পরতে আরম্ভ করেছিল। বিচার অধিবেশন চলাকালীন সংবাদ প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট জায়গা লক্ষণীয়ভাবে পাতলা হয়ে যাচ্ছিল, আর অন্যদিকে, পানশালা হয়ে যাচ্ছিল একেবারে মানুষজনে ঠাসা।

এই পানশালাতেই আমি আমার এক পুরোন পরিচিতকে পেয়ে গেলাম, যার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ প্রাগ-এ, যখন সেতু অধিকার করার জন্য সৈন্যরা তখনো লড়াই করে চলেছে, আর রাজধানীর বহিঃসীমায় সোভিয়েত ট্যাংক বাহিনী ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। মস্কোতে বিজয় অভিনন্দনের পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লড়াইয়ে শেষ বিবরণ দেবার জন্যে আমি এমনই উন্মুখ ছিলাম যে মার্শাল আই. এস. কোনেভের কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত বিমান, আর খুবই অভিজ্ঞ একজন পাইলট যে আমাকে সৈন্যবাহিনীর সহায়তার জন্য তার দিকে আগুয়ান সারিবদ্ধ সোভিয়েত সাঁজোয়া বাহিনীকে অতিক্রম করে নিয়ে যেতে পারে, তা জোগাড় করে নিলাম। উদ্দেশ্য ছিল রাজধানী শহরের কাছাকাছি কোথাও মাটিতে নামা আর লেলিউশেনকো ও রিবালকোর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রথম সাঁজোয়া বাহিনীর মিলন বর্ণনা করা। মারশাল এই সাংবাদিক প্রতিনিধির সমস্যা খুব ভালো বুঝতে পেরেছিলেন। আমাকে একটি বিমান দেওয়া হল। আর ভোর হবার আগেই ড্রেসডেন-এর কাছাকাছি এক বিমান ক্ষেত্র থেকে উড়ে দক্ষিণদিকে, প্রাগ-এর দিকে চললাম। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণের দিকে আমি এখানে যাবো না। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে স্ট্রাহোভ-এ সোকোল স্টেডিয়াম-এ আমরা নিরাপদে পৌঁছলাম আর প্রতিরোধকারী সৈন্যেরা আমাদের শহরের কেন্দ্রে নিয়ে গেল। যেখানে 'সিটি হল'-এর দগ্ধ ধ্বংসাবশেষের পাশে আমার সেই লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, যাকে সেদিন 'প্যালেস অফ জাসটিস'-এ আবার দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললাম।

শহরের ওল্ড টাউন স্কোয়ারের বাড়িগুলোর জানলায় জানলায় এস এস বাহিনী মেসিনগান নিয়ে তৈরী হয়েছিল। তারা আগুন নিভে যেতে দিচ্ছিল না, আর যখনই কোন সৈন্য গুপ্ত স্থান থেকে সেখানে আসত, কর্কশ বুলেটের ঝাঁকে ঝাঁঝরা হয়ে যেত মাটি। যে

মানুষটির কথা বলা হচ্ছে, তিনি হলুদ রঙের এক বৈমানিকের পোশাকে, জাতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত রিবণ লাগানো, ভয়ে গুটি গুটি হয়ে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরছিলেন আর টেলিস্কোপ লেনস লাগানো ক্যামেরায় এস এস-এর ছবি তোলার চেষ্টা করছিলেন। মেসিনগানের গোলাগুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লুকিয়ে গেলেন আর তার ক্যামেরা নিবদ্ধ করলেন পর্যবেক্ষণার্থ-কুঠুরির চিলেকোঠার দিকে যখন সেটি নিঃশব্দে পড়ে গেল।

আমার বিমান চালক ও আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি চারদিকে তাকালেন ও সোভিয়েত সামরিক পোশাকে অফিসারদের দেখে ছুটে আমাদের কাছে এলেন। কিন্তু হাতে হাত মেলানোর আগে তিনি উবু হয়ে বসলেন, ক্যামেরায় আরো কটি ছবি নিলেন আর তারপরই নিজের পরিচয় দিলেন।

"কারেল হাজেক, একজন ফটোগ্রাফার।"

"এবং একজন প্রতিরোধ সংগ্রামে সৈনিক?"

"কিন্তু, প্রথম পরিচয় ফটোগ্রাফার।"

এইভাবে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সোভিয়েত সামরিক বাহিনী শহরে ঢুকে শহরটিকে আগুয়ান জার্মান বাহিনীর হাত থেকে বাঁচাতে সশস্ত্র সামরিক ব্যবস্থায় ঘিরে ফেলার পর তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন, তাঁর চমৎকার স্ত্রী, যিনি সঙ্গীতবহুল মিলনান্তক নাটকের একজন শিল্পী, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর তাঁর তোলা ছবির এ্যালবাম আমাদের দেখালেন। জানা গেল যে জন্তু-জানোয়ারের ছবি নেওয়ার ব্যাপারে তিনি একজন পৃথিবী বিখ্যাত ফটোগ্রাফার।

এবং এখন প্রেস ক্যাম্প-এর পানশালায় আমি তার দিকে ছুটে গেলাম। আমরা কফির হুকুম করে গল্প আরম্ভ করলাম সেই পুরোন অশান্ত কারেইল আছে—বড়োসড়ো, সুন্দর স্বভাব, হাসিখুসী। যেন এক রাস বেড়ে যাওয়া শিশু যে কোনমতে এক পাশ্চাত্য ধরনের সামরিক পোশাকের ভেতরে জোর করে ঢুকে পরেছে। সব সময়ই সে নানা ধারণা আর পরিকল্পনার বুদবুদ কাটত আর ইতিমধ্যে যা কিছু করতে পেরেছে সে সবের ওপর তাকিয়ে হেলান দিয়ে বসার মত আনন্দ পেত যা কিছু করবে বলে আশা করে তা নিয়ে গর্ববোধ করতো। তার বাসনা হল সে ন্যুরেমবার্গ বিচারের

ওপর একটা এ্যালবাম করবে যার মধ্যে থাকবে যুদ্ধ-অপরাধীদের অতীত এবং বর্তমান, তাদের অপরাধ আর এই বিচারের ছবি।

"তুমি কি তাহলে এখানে এই মাত্র এসে পৌঁছলে? তোমার সহকর্মীরা আমাদের ঠিক পরেই বসে রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই ভিনসেণ্ট নেকাস ও জান ডরডার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছি।

"না, আমি একেবারে শুরু থেকে এখানে আছি। আমি কাঠগড়ার ঠিক উল্টো দিকে বসি ওখানে কাঁচের প্যানেলের পিছন থেকে ওদের ওপর ক্যামেরা তাক করে বসে থাকি, ওদের মুখের সঠিক অভিব্যক্তি আমার মনে হয়, জন্তু-জানোয়ারের ছবি তোলার চেয়ে এটা আরও অনেক মজাদার ব্যাপার। এতদিন পর্যন্ত যা কিছু তৈরি করেছি, তা যদি তোমাকে দেখাই, দেখবে?"

সে কোথাও চলে গেল। তারপর ফিরল হাতে একটা ফোলডার নিয়ে। মুচকি হাসতে হাসতে, খুব স্বাচ্ছন্দে আর অনায়াসে ঝানু সাংবাদিকের মত জানলার কোলের কাছ থেকে কয়েকজন ইংরেজকে সরালো আর তারপর সেই জানলার কোলের ওপর তার তোলা ছবিগুলো রাখল। কতকগুলি ঐতিহাসিক মুহূর্ত এমন অভিব্যক্তি সহ ধরা হয়েছে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম…ন্যুরেমবার্গ-এর একটা রাস্তা সাজানো হয়েছে পতাকায়, ঝটিকা-বাহিনীর অন্তহীন সারি, যারা পতাকা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, আর বন্য উৎসাহী জনতা, ফুটপাথের ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে চলেছে এবং হ্যানস্ স্যাচস্-এর মূর্তির সর্বাঙ্গে কষ্ট করে উঠছে। সেই একই রাস্তায় একই কোণ থেকে তোলা আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে রাস্তা ধ্বংসস্তূপ আর পাথর কুচিতে পরিকীর্ণ আর তার পশ্চাৎপটে ধ্বংসের মধ্য থেকে হ্যানস্ স্যানস্ উঠে আছে—ঠিক যেমনটি তাকে আমরা সম্প্রতি দেখে এলাম। আবর্জনা বোঝাই একটা গাড়ি, একদল মানুষ টানছে।

ক্যামেরায় তোলা আর একটা ছবি—*পারটেইটাগসগেলানডে* স্টেডিয়াম—যেখানে গোলগাল চেহারার সুন্দর চুলের আর একই রঙের ব্লাউজ ও কালো স্কার্ট পরা মেয়েতে পরিপূর্ণ। সেই বালিকাদের হাত নাজী জঙ্গী অভিবাদনের ভঙ্গীতে তোলা আর মুখে চিৎকার করে অভিবাদন জানাচ্ছে। উদ্যত হাতের সমুদ্র, আর চিৎকারের হাঁ-করা সারির পর সারি বিকৃত মুখ। দূরে সাদা মঞ্চের ওপর হিটলারের ছোট্ট চেহারা। সেই

একই কোণ থেকে আর একটি ছবি—সেই *পারটেইটাগসগেলানডে* স্টেডিয়াম। বিশাল মঞ্চ শূন্য। পাঁচের ওপর দিয়ে ক্ষুধার্ত এক কুকুর ছুটে যাচ্ছে। ছবির সামনের দিকে আমেরিকান সার্জেন্টের পোশাকে এক নিগ্রো তাকে জড়িয়ে থাকা সোনালি চুলের এক মেয়েকে নির্বিবাদে আলিঙ্গন করে আছে...

কোন কোন ছবিতে পদক শোভিত পুরো নাজী ইউনিফর্মে গোয়েরিং এবং হেসস। আর সেই দুজনই কাঠগড়ার ওপর পাশাপাশি বসে আছে। রিবেনট্রপের দুটো ছবি। একটায় এক কূটনৈতিক সংবর্ধনায় যে একটি কোট পরে আছে, কোমরবন্ধনীতে রিবন লাগানো, হাতের স্যাম্পেনের গ্লাস তুলে ধরার সময় চোখ মুখ চকচক করছে। আর একটা ছবিতে আবার সেই রিবেনট্রপ বন্দী, একটা তোবড়ানো টিনের থালা থেকে লবসি খাচ্ছে। এক বিশাল ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ, জার্মান সাবমেরিনের টরপেডোর আঘাতে ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রে, আর শত শত লোক লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে জাহাজের ওপর দিকে। মালবাহী গাড়িতে চেপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর আগেই নিহতদের মৃতদেহ আঁকশি দিয়ে টেনে টেনে বার করছে কয়েকজন যুদ্ধ বন্দী। মৃতদেহের পাহাড় অপেক্ষা করে আছে, ফারনেসের হাঁ মুখের মধ্যে দগ্ধ হবে বলে। এইসব একেবারে দান্তের ইনফারনোর একটি দৃশ্য বলে হয়।

বৈপরীত্যের দিক থেকে দুটো ছবি ছিল খুবই লক্ষণীয়—একটা ছবিতে *পারটেইটাগ*-এর ওপর প্রিসিডিয়ামে হিটলারের সরকারের অধিবেশন, যার নেতা ফুয়েরার স্বয়ং, ফ্রিক, রিববেনট্রপ, গোয়েরিং, হিটলার, রোসেনবার্গ এবং হেসস সামনের সারিতে, সহাস্যে বসে আছে। আর সেই ছবিতে তাদের পিছনের সারিতে বসে আছে ফানক, ফ্রাংক, শিরাক, কেইটেল, রেইডার এবং স্ট্রেইচার। এই ছবিটার ঠিক পরেই অন্য ফটোগ্রাফে এই লোকগুলোরই ছবি প্রায় সেই একই ক্রম অনুসরণ করে কাঠগড়ায় বসে আছে। এ যেন তুমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ ইতিহাসের চাকা সদ্য অতীত থেকে বর্তমানের দিকে আসছে। অতীত আর বর্তমানকে এই যে মুখোমুখি করা এটাই তার তোলা ছবিগুলোকে গভীরতা দিয়েছিল।

মুন্সীয়ানা ছিল তার তোলা প্রতিকৃতিতেও যে মুহূর্তে তার বিষয়বস্তুর প্রকৃত স্বভাব সবচেয়ে বেশী ফুটে উঠেছে ঠিক তখনই হাক্কেকের তাদেরকে তার ক্যামেরায় ধরে ফেলা তার বিষয়বস্তুর চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্ব ফাঁস করে

দিয়েছে। গোয়েরিং তার চাউস ব্যাঙের মতো মুখ উগ্রভাবে নিমন্ত্রণ করতে চাইছে···স্ট্রেইচার শেয়ালের মতো দাঁত বার করে হাসছে···

···হাজেকের সংগ্রহ এইসব লোকদের মনের গভীরে পথ করে ঢুকে যেতে আমায় সাহায্য করল যেমন আগে যখন ঝুকভের আঁকা ছবি দেখেছিলাম, তখন যেমন হয়েছিল।

"দারুণ। ঠিক ভাবটা ধরার জন্য তোমায় কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়?"

"কখনও কখনও সারা অধিবেশন। এমনও হতে পারে যে আমি ফিল্মের অনেকগুলো রোল খরচা করে ফেললাম," হাজেক শান্তভাবে উত্তর দিল। তার ছবি যে আমায় নাড়া দিয়েছে এতে সে স্পষ্টতই তৃপ্ত।

"এত ফিল্ম নষ্ট করতে হয়?"

"আমি যখন একটা কুকুরের ছবি তুলি তখন এর চেয়ে অনেক বেশী ফিল্ম নষ্ট করি।"

"আর অতীতের ঐ সমস্ত অসাধারণ ছবিগুলো তুমি কোথায় পেলে?"

"ওহো সেটা একটা পেশাদারী গোপন ব্যাপারে," এই বলে ও হাসল। "দারুণ গোপন। কিন্তু আমাদের এমন একটা জায়গায় আর এমন একটা সময়ে দেখা হয়েছিল যে তোমার কাছে আমার বলতে আপত্তি নেই, বিশেষত তুমি যখন একজন ফটোগ্রাফার নও, আর তাই তুমি আমার প্রতিযোগীও নও। তুমি কি হেনরিখ হফম্যান-এর নাম শুনেছ?"

"না।"

"ও ছিল হিটলারের ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফার এবং এখন এই বাড়িতে আছে, ১৫৮ নম্বর রুমে। ফটোতে যে সাক্ষ্য এখানে তার বিশেষজ্ঞই হল হফম্যান। লোকটি বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করে। আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

"কিন্তু এই ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফার এখানে এল কি করে?"

"কেন, এইভাবে···"

এবং সে আমাকে একটা গল্প বলল যেটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না যদি না সে আমাকে নিজে ১৫৮ নম্বর গোপন রুমে নিয়ে না যেত আর আমি নিজে যদি এই আধা গোয়েন্দা গল্পের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত না হতাম।

হেনরিখ হফম্যান একজন উদ্যোগী ফটোগ্রাফার যে নগ্ন মেয়েদের ছবি

অবৈধভাবে বিলি করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করত। পরে সে তার কাজ কর্মের পরিধি বাড়িয়ে অশ্লীল ফটো তুলতে আরম্ভ করেছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈশ ক্লাবের পুরুষ ও নারী নৃত্যশিল্পীরা ছিল তার অশ্লীল ফটোর মডেল। তাদের মধ্যে একজন ছিল জনৈকা ইভা ব্রাউন। সেই নারী হফম্যান-এর সখ সৌখিনতা ধরে ফেলেছিল আর নিজেকে করেছিল হফম্যান-এর স্থায়ী সহকারিণী।

এখন হলো কি, একটা মডেলের কাজ করছে এমন এক অধিবেশনে, ইভা, হিটলারের দৃষ্টিও আকর্ষণ করল। হিটলার তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, ইভা, অশিষ্টতার সঙ্গে কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিল। এইভাবে তৃতীয় রাইখের সর্বশক্তিমান ফুয়েরার ও অসুন্দর ছবির মডেলের মধ্যে আলাপের ও পরিচয়ের শুরু। হিটলার তার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

এই সপ্রতিভ মেয়েটি জানত যে তার আগের প্রভু বা নিয়োগকর্তার কাছে তার অনেক ছবির নিগেটিভ আছে, যে সমস্ত ফটোগ্রাফ, কমিয়ে বললেও বলতে হয়, খুবই সন্দেহজনক ভঙ্গীর। এ তার পক্ষে বিপজ্জনক ; তার সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সদৃশ পৃষ্ঠপোষকের আন্তর্জাতিক মর্যাদার কথা না বলাই ভাল। একটা আলোড়ন তো আগেই পড়ে গিয়েছিল যখন গোয়েরিং এই ধরনের সাক্ষ্য দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, হিটলারের বিশেষ স্নেহভাজন যুদ্ধমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল ব্লোমবার্গকে ঘায়েল করে। অন্যান্য লোকের মাধ্যমে গোয়েরিং ফিল্ড মার্শাল ব্লোমবার্গকে ইভা ব্রাউনের আকর্ষণীয়া সহকর্মী এরিকা গ্রুহনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়। যখন সেই প্রেমমুগ্ধ-প্রেমকাতর তার কাছে এসে জানতে চায় যে এরিকাকে তার বিয়ে করা উচিৎ না উচিৎ নয়, তখন গোয়েরিং তাকে বিবাহ করার পরামর্শই দেয় এবং এমনকি বিয়ের সভায় কনেকে নিয়ে পর্যন্ত যায়। বিয়ের ভোজ হয় খুব জাঁকজমক করে যাতে এমনকি হিটলারও যোগ দিয়েছিলেন। যাই হোক, পরদিন ফরাসীদের নিচুস্তরের কোন পত্রিকায় একজন গিয়ে একটি ছবি দিয়ে আসে যাতে এরিকা গ্রুহন একজন যুবক সঙ্গীর সঙ্গে খুবই সম্মোহনী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। কেচ্ছা ছড়িয়ে পড়ল। ফিল্ড মার্শাল ব্লোমবার্গকে বরখাস্ত করা হল। আর যুদ্ধ মন্ত্রীর পদটি শূন্য হল।

এই গল্প বার্লিনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে যা ইভা খুব ভালভাবেই জানত। অবশ্য তখন ইভা যে অবস্থায় বা পর্যায়ে ছিল, তাতে তার পক্ষে

হফম্যানকে শারীরিকভাবে সরিয়ে দেওয়া কিছু কঠিন কাজ ছিল না। সেসব দিনে জার্মানীতে কোন চিহ্ন না রেখেই বহুলোক উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু ইভা জানত যে তার আগের নিয়োগকর্তা যথেষ্ট ধুরন্ধর, আর সে ইভার সবচেয়ে ভালো নিগেটিভগুলো বিদেশে, দেশের বাইরে কোথাও রেখেছে। ইভা আরও জানত যে হফম্যান যদি বন্দী হয় তাহলে সে গেস্টাপোদের সব বলে দেবে, এবং হিমলারকেও যে ইতিমধ্যেই কিছুদিন ধরে ইভাকে অনুসরণ করছে। একটা তৃতীয় বিকল্প খুঁজে নেবার চতুর বুদ্ধি ইভার ছিল, আর দেখা গেল সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

ইভার সাহায্যে তার পূর্বতন নিয়োগকর্তা হেনরিখ হফম্যান হিটলারের ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফারে পরিণত হল ও দারুণভাবে নিজের আখের গুছিয়ে নিল। সে একটা বড় প্রকাশন সংস্থা করল যার একচেটিয়া অধিকার ছিল, হিটলারের প্রধান পর্ষদের প্রতিকৃতি, সরকারী এ্যালবাম তৈরী, প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশন ব্যবসায়ের। তার সংস্থার বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল লক্ষ লক্ষ মারক। সেই যুবক যে ফটোগুলোতে ইভার সঙ্গী ছিল, সে যখন পিঠের ভাগ ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল, তখন একদিন কোন চিহ্ন না রেখেই উধাও হয়ে গেল। ইভা ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে জার্মানীর ১নং নাজীর সঙ্গে বসবাস করছে।

হফম্যানকে অধ্যাপক ও চারু শিল্পের ডক্টরেটের সম্মানে ভূষিত করা হল পুরস্কৃত করা হল নাজী দলের সোনার প্রতীক দিয়ে; যদিও এখন হফম্যান এই দাবী করছে যে সে কখনোই নাজী দলের সভ্য ছিল না। এটা, আমার ধারণা, সত্য।

সুতরাং, আমরা সেই গোপন ১৫৮ নং রুমের উদ্দেশ্যে গেলাম। যেখানে ধূসর টিরোলিন জ্যাকেট পরা, হরিণের শিঙের মত বোতাম লাগান, কোটের কলারের ভাঁজ করা সবুজ অংশে ওক গাছের পাতা বসান, একজন বয়স্ক, মজবুত শরীরের জার্মানের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। হফম্যানের মুখ স্থুল, মোটা। কাঁধ যেন চেতনাহীন বিবশ—বৃষস্কন্ধ। প্রাচীরপত্রে ছাপানো বীয়ারের বিজ্ঞাপনে একজন বাভারিয়ানকে যেমন লাগে, হুবহু সেইরকম লাগছিল তাকে দেখতে, নাবিকদের মতন ছাঁটে মুখের নিম্নভাগ ধূসর ও ঢাকা, হাসিমাখা পুরু ঠোঁট, আর কুতকুতে ছোট ধূর্ত চোখ—শূয়োর ছানার মত।

সে বেশ আস্থার সঙ্গে ব্যবহার করল, আর নিজের পরিচয় দিল বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে, নিজের নামের আগে 'ডক্টর' উপাধি যোগ করে। সে জানাল যে তার হাতে সামান্যই দেবার মত অবকাশ আছে, কেন না বিচারক তাকে তখনই সদ্য একগোছা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্যে, যে ফটোগুলো, সে জানাল সোভিয়েত অভিযোগকারীদের পক্ষে পেশ করা হয়েছে। সুতরাং সে তার সম্মানিত *অতিথির* জন্য কেবল কটি মিনিট দিতে পারে। সে তার সংগ্রহ অন্য কোন সময় দেখাবে, কিন্তু এখন কেবল কটি ছবি দেখাবে যেগুলি বিদেশীদের, বিশেষভাবে আমেরিকানদের খুবই টেনেছে আর আমেরিকানরা সেইসব ছবির জন্য প্রচুর দামও দিয়েছে। আমরাও এক সেট নিতে পারি।

সে টেবিলের ওপর পাখার মত করে কতকগুলো ছবি ছড়িয়ে রাখল। বাড়িতে হিটলার। সম্ভবতঃ সে তার অশ্লীল সব ছবির মহাজনী ক্রেতাদের যেভাবে ক্যামেরায় তোলা একঝাঁক নতুন অশ্লীল ফটো দেখাত, সেইভাবেই সে ছবিগুলো দেখাতে লাগল। হিটলার এবং ইভা পাহাড়ের কোলে এক বাড়ির বারান্দায়, বোঝাই যাচ্ছে জায়গাটা বারচটেসগাডেন··· ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে···কুকুর আদর করছে···শিকারীর পোশাক পরণে আর টুপি মাথায়, টুপিতে এক ধরনের বিশেষ পাখির পালক···সেই একই বারান্দায় কয়েকজন সেনাপতির সঙ্গে হিটলার আর সেখানে খুব সাধারণ একটা এ্যাপ্রণ পরে চা-পরিবেশনরতা ইভা,···আবার ইভা, হ্রদের তীরে সাঁতারের পোশাক পরিহিতা,···আগ্রহের সঙ্গে এটাই লক্ষ্য করার যে এই "ঘরোয়া" ছবিতে হিটলার এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে জাহির করে নি—সে নিশ্চিন্তভাবে যাতে তার একটা ভাবমূর্তি এই ছবিগুলোর মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়, সেই ভঙ্গীতে ছিল। স্পষ্টতই, সে আসলে যা, তাকে কদাচিৎ দেখা যাচ্ছিল না, যেন ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে, কেবল একটা ভূমিকা নয়, অনেকগুলো ভূমিকা।

"এবং এইখানে, এই যে হতভাগিনী ইভার একটা ছবি।"

ভালো কথা, আমার ধারণা তাকে খারাপ দেখতে ছিল না। তার গড়ন ছিল সুন্দর আর তাকে দেখাত বেশ পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি, তবে তার মুখাবয়ব ছিল কেমন চেটাল আর অগভীর মতন আর খুবই সাধারণ।

সে ছিল যেন গ্রাম্য প্রযোজনায় *রিং অফ দি নাইবেলংস*-এ ব্রান-হাইলডের চরিত্রের মতন।

"দেখো, এই হচ্ছে ফ্রাউলিং মিস ইভা", হফম্যান আবার বলল।

"আমি তাকে একবার দেখেছিলাম", আমি কথায় কথা বলার মত করে বললাম।

"কবে? কোথায়? কেমন করে? আপনি কি মজা করছেন? হের ওবেরস্ট এটা কি একটা দারুণ ব্যাপার নয়?"

আমি থামলাম আর হফম্যান আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কঠিনভাবে চেয়ে থাকল, তারপর বলে চলল, "রাইখ চ্যান্সেলারির কাছে, একটা বাংকারের পাশে, বোমা থেকে বাঁচবার সাময়িকভাবে আশ্রয়ের জন্যে তৈরী একটা গর্তের মধ্যে।"

এ কথাটা যোগ করা দরকার যে যদিও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সদৃশ তৃতীয় রাইখের ফুয়েরার তাঁর শেষ ইচ্ছা পত্রে তাঁর নিজের ও তাঁর যুবতী স্ত্রীর দেহ পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দিতে যেমন অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, সেই মত পোড়াবার মত যথেষ্ট পেট্রোল ছিল না, তবু তাদের মৃতদেহগুলি এমন ভাবে অঙ্গারে পরিণত করা হয়েছিল, যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সনাক্তকরণও সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি কোন বিস্তারিত আলোচনায় গেলাম না, কেননা তাদের মৃতদেহ উদ্ধারের ব্যাপার সরকারীভাবে এখনও ঘোষিত হয়নি।

ঘটনাচক্রে, ফ্যাসিবাদী একনায়ক ও তাদের গৃহিণীদের এই হল পরিণতি। অতি সম্প্রতি, ইটালির ডুকে আর তার লোক-দেখানো পত্নী ক্লারা পেটাককি, এই দুজনের লাশ, পার্টিজানরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার পর, মিলান শহরেও এক পেট্রোল স্টেশনের কাছে এক স্কোয়ারে সর্বসাধারণের দেখার জন্যে, পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু হফম্যানের কাছে আমি এ ব্যাপারের কোন উল্লেখ করলাম না। তাকে জ্ঞান দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে যেন নিখাদ বিষণ্ণ গলায় হফম্যান বলল, "বেচারা ইভা। সে এমন খারাপ মেয়ে নয় যে এইসব তার উচিৎ প্রাপ্য। তার রুচি ছিল। আর সে নিজেই ছিল, একজন ভালো ফটোগ্রাফার।" তারপর সম্ভবতঃ আমার শ্রেণী সচেতন অনুভূতির কাছে আবেদন করে সে, যোগ করল, "ইভা ছিল, আপনি জানেন, একজন সাধারণ শ্রমিকের মেয়ে। ওর বাবা এখনও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং

কারখানায় কাজ করে। আপনি যদি আমায় বিশ্বাস না করেন, নিজে গিয়ে দেখে আসতে পারেন।"

সে আমার হাতে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর সংবাদপত্র *স্টারস এণ্ড স্ট্রাইপস* থেকে একটা কাটা অংশ আমার হাতে তুলে দিল, যাতে সত্যি সত্যিই বৃদ্ধ ব্রাউনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। সে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এই বলতে চেয়েছে যে তার দুটি কন্যাই ছিল ভালো মেয়ে, সরল হৃদয় বালিকা, অন্যদের সম্পর্কে বিবেচক আর নিজেদের কাজে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন। তাহলে এই পৃথিবীতে কেন একজনকে লটকে আবদ্ধ হয়ে যেতে হল উন্মাদ হিটলারের সঙ্গে আর একজনই বা কেন পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল একজন এস-এস সেনাপতিকে! কিন্তু তারপর তার প্রথম জামাতা, হিটলার, মৃত্যুর আগে এস-এস সেনাপতিকে খুন করে সাবাড় করেছিল। সে এক বীভৎস ব্যাপার। এবং এখন হতভাগ্য বৃদ্ধ ব্রাউন তার শেষ বয়সে একেবারে সম্পূর্ণ একাকী। একজন সৎ শ্রমিকের কি সত্যি সত্যি এই ভাগ্য পাওনা ছিল?

উপহার হিসেবে, আমরা এক বোতল হোয়াইট হর্স' হুইসকি আর স্প্যামের একটা বড় টিন টেবিলের ওপর রেখে বাইরে চলে এলাম। অধ্যাপক হফম্যান, চারুশিল্পের সম্মানিত ডক্টর, নিগেটিভগুলোর মধ্যে যেন তন্ন তন্ন করে কিছু খুঁজে চললেন, আর কোন কিছু খেয়াল না করার ভাণ করলেন।

৮। আমাদের ঘুম আর খিদে ছিল না

আমি আগেই জানিয়েছি যে আমেরিকার পক্ষে প্রধান অভিযোগকারী মাননীয় বিচারপতি জ্যাকসন এইরকম অঙ্গীকার করে তাঁর ভাষণ শুরু করতেন: মানবতার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধ, আমরা তারই সাক্ষ্য পেশ করতে চলেছি…ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, কেননা এই সমস্ত সাক্ষ্যের প্রকৃতিই এমন যে তা আপনাদের ঘুম কেড়ে নেবে।

আমায় স্বীকার করতে হবে যে তাঁর এই কথায় সোভিয়েত সাংবাদিকরা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করতো। আমরা যারা বাবি ইয়ার, ত্রেবলিনকা, মাজদানেক, আর ওসউইএসিমকে নিজের চোখে দেখেছি, তারা আর এমন কি বেশী আতঙ্কগ্রস্ত হতে পারে? কিন্তু দেখা গেল বিচারপতি মিঃ

জ্যাকসন ঠিকই বলেছেন। নাজী রাইখ-এ লোকেদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এক বিশাল, খুবই উন্নত, সুপরিকল্পিত, সংগঠিত কারখানা বা শিল্পে পরিণত হয়েছিল। আমরা ইতিমধ্যেই সেই ভয়ঙ্কর সাক্ষ্যে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম—এইসব ব্যাপারে আমাদের কাঠিন্য এমনই অভেদ্য হয়েছিল যে আমরা আমাদের নিদ্রাও হারালাম না, আর সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষুধাও না।

কিন্তু সোভিয়েত পক্ষে প্রধান অভিযোগকারী লিও স্মিরনভ যখন এগিয়ে এলেন তখন সংখ্যাগতভাবে না হলেও, বস্তুতঃ আমরা দুটোই হারালাম। লিও স্মিরনভ ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত আইনজীবী, সুবক্তা, যিনি বিচারকদের আবেগের চেয়ে যুক্তির কাছে বেশী আবেদন করতেন। তিনি সত্য ঘটনাসমূহ উপস্থিত করলেন ও তার পরিপূরক হিসেবে দিলেন এমন সব প্রমাণ যে তার ফলে কাঠগড়ায় হৈচৈ পড়ে গেল, যুদ্ধ-অপরাধীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিল, শ্চদৎ হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল ও তাকে ঘুমপাড়ানি ওষুধ খাওয়াতে হল।

না, এই দৃশ্যটি ভুলে গেলে অবশ্যই চলবে না। আমি আরও বিস্তৃত করে এটির বর্ণনা দেব, কেন না ভবিষ্যতে, যতই সময় চলে যাবে, ততই এ কথা বিশ্বাস করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে যে চিন্তা শক্তিসম্পন্ন, যুক্তিবোদ্ধা প্রাণীদের আবাসভূমি এই গ্রহে, এই পৃথিবীতে কোনদিন এমন ঘটনা কখনো ঘটতে পারতো।

আমরা আগের দিনই জেনেছিলাম যে সোভিয়েত তরফের অভিযোক্তা কিছু বলবে এবং সাংবাদিকদের আসন যা সাধারণত খালিই থাকতো এখন তা ভর্তি। আমরা যখন আদালত-কক্ষে গেলাম তখন আমাদের জন্যে এক চমক ভাঁড়ারে তোলা ছিল। কিছু প্রদর্শন করানোর জন্যে বোর্ড খাড়া করা ছিল কয়েকটা আর ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখা ছিল চাদরে ঢাকা একটা বিরাট জিনিস। অভিযোক্তার টেবিলের ওপর ছিল কাপড়ে মোড়া কোন জিনিস, তাঁর সহকারীর টেবিলের ওপর ছিল চামড়া বাঁধান, মোটা একটা বই—যা মধ্যযুগীয় অতিকায় জন্তুর মতন দেখাচ্ছিল।

লিও স্মিরনভ তাঁর বক্তৃতায় এই চমৎকার করে বাঁধানো বইটির উল্লেখ করলেন। না রাইন নদীর তীরে কোন সুরম্য অট্টালিকার মালিকের

পারিবারিক ছবির অ্যালবাম নয় ওটা। ঘোড় দৌড়ে বাজী জেতা অনেক অশ্বের ছবির গোছাও নেই তাতে। এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন জাতির মানুষের নামের পর নামের অন্তহীন তালিকা, যাদের গুলি করে অথবা গ্যাসের সাহায্যে নাজী শিবিরে হত্যা করা হয়েছে। অভিযোগকারী যথেষ্ট কষ্ট করে সেই বিরাট বইটা তুলে ধরে, বিচারকদের দিকে ফিরে বললেন, "ওয়ারশ শহরে সাফল্যের সঙ্গে একটি আবদ্ধ ইহুদী পাড়াকে মুক্ত করার পর, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর জন্য মেজর জেনারেল স্ট্রুপ-এর করা এটি কেবলমাত্র একটি সরকারী নথি। যাদের হত্যা করা হয়, কেবল মাত্র তাদের নামই এতে লেখা আছে। মাননীয় বিচারকমণ্ডলী, আমার অনুরোধ এই বইটিকে, আদালতের বিচার্য বিষয়ের অন্যতম প্রমাণ হিসেবে যুক্ত করা হোক।"

এই কথা বলামাত্র সকলে আপনা থেকে কাঠগড়ার দিকে তাকাল, যেখানে পোল্যাণ্ডে নাজী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা, পোল্যাণ্ডের প্রাক্তন গভর্ন'র হ্যানস্ ফ্রানক, কালো চশমায় দু চোখ ঢেকে, অনড় হয়ে বসে আছে। এই শয়তান, ইতিহাসে কেবল তার নিজের স্থান নিয়েই উৎসুক ও মগ্ন ছিল, আর তাই সে তার শয়তানী কাজকর্ম ও চিন্তা ভাবনার এক দিনলিপি রেখেছিল। সকলের দোষদর্শী, ভয়ঙ্কর ভীতিকর এই দিনলিপিগুলি সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই সোভিয়েত পক্ষের প্রধান অভিযোগকারীর আর একজন সহকারী লিও শেইনিন এর কাছে শুনেছিলাম। লিও শেইনিন স্বদেশে কেবল মাত্র একজন আইনজীবী হিসাবেই খ্যাত ছিল না, একজন সাংবাদিক, লেখক ও জনপ্রিয় গ্রন্থ *নোটস অফ এন ইনভেসটিগেটর*-এর গ্রন্থকাররূপেও সুখ্যাত ছিল।

অভিযোগকারীদের অধিকারে এখন ডজন ডজন মোটা দিনলিপির বই যা জনসাধারণের কাছে এই নাজীর অন্তঃকরণ বেবাক উন্মোচিত করে দিয়েছে।

দিনলিপিতে লেখা ফ্রানকের চিন্তাভাবনার একটি, স্মিরনভ, উদ্ধৃতি সহকারে শোনালেন, "আমরা যে ১,২০০,০০০ ইহুদীকে অনশনে রেখে মৃত্যুদণ্ড দিলাম, একথা কেবল ছোট করে একপাশে লেখা থাকবে।" এই উদ্ধৃতি ফ্রানক-এর মুখে বাঁকানো, বিকৃত হাসি টেনে আনল।

যাইহোক, মৃতদের নামের তালিকাসহ সেই বই যখন বিচারকদের

টেবিলের ওপর সরিয়ে রাখা হল, আর ওয়ারশ'র ইহুদী পাড়ার বিধ্বংসী খতিয়ান যখন সকলের শোনার জন্য জোরে পড়া হতে থাকল, ফ্রানক তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পেন্সিল তুলে নিল আর এতই লক্ষণীয়ভাবে অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল যে তার পাশে বসা রোসেনবার্গ তার দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ ভ্রূকুটিতে চেয়ে তাকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল।

সেই ভয়ঙ্কর বই-এর প্রতিটি পাতার প্রতিটি পঙতি পৃথিবীকে জানিয়ে দিল জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের কার্যতঃ বাস্তব অর্থ কি।

জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে কিভাবে ইহুদীদের নিমূ'ল করে গণ ধ্বংস করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমেরিকান অভিযোগকারীদের পক্ষে বেশ কয়েকটি দলিল ইতিমধ্যেই দাখিল করা হয়েছিল যার মধ্যে স্কেচের সাহায্যে ভালভাবে সব বর্ণিত হয়েছে। নিজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত, নিজের ঘর থেকে বিতাড়িত শত সহস্র মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা গ্যাস-চেম্বারে, গ্যাস-ভ্যানে মারা যায়; সেসব নির্ভরযোগ্য তথ্যও তারা পেশ করে। যাই হোক, মেজর জেনারেল স্ট্রুপ যে বিবরণ পেশ করেন, তার সঙ্গে তুলনীয় কোন কাহিনীই আমরা এ তাবৎ শুনি নি ১৯৪৩ সালের ২৩শে এপ্রিল, কারকোতে অবস্থিত এস.এস. ফুয়েরার-এর মাধ্যমে এস.এস. রাইখ ফুয়েরার, আদেশ দিলেন ওয়ারশ-র আবদ্ধ ইহুদী পাড়াকে ভীষণ নৃশংস ও নির্মমভাবে ধ্বংস করে সমভূমি করে দিতে। এই আদেশ ওয়ারশ-র আবদ্ধ ইহুদী পাড়াতে কিভাবে কার্যকরী করা হয় সে কথা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রসঙ্গে, স্ট্রুপ লিখেছে, "আমি সেজন্য স্থির করলাম যে ইহুদীদের বসবাসকারী এলাকায়, আবাসিকদের পালাবার কোন সুযোগ না দিয়ে প্রত্যেকটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবো।" তারপর তার পেশাগত ভাবে বর্ণনা দেওয়ার মত করে লেখা ছিল, কিভাবে এস.এস. ফৌজের জঙ্গী লোকেরা আর স্যাপাররা যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল এদের সাহায্য করার, তারা কিভাবে নিস্ক্রমণের পথগুলো বন্ধ করতে, নীচের তলার জানালাগুলো পাটা মেরে বন্ধ করে দিতে, আর তারপর ঘরবাড়িগুলোয় আগুন লাগাতে সাহায্য করে। ঘন বসতিপূর্ণ বাড়িগুলো থেকে, যেখানে শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে তাড়া দিয়ে আনা পরিবারগুলো গাদাগাদি করে ছিল সেখান থেকে জলন্ত জীবন্ত লোকেরা হৃদয়বিদারী সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ করতে করতে কাতারে কাতারে বার হয়ে আসছে। বাড়িগুলোর ওপর তলায়, যেখানে

তখনো আগুন গিয়ে পৌঁছোয় নি, লোকেরা নিরাপত্তার খোঁজে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে সেখানে গেল, কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করতে লাগল গোটা বাড়িগুলোতে। সেই জীবন্ত বলিরা তাদের সব রকম জাজিম, গদি, তোষক ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল জানালা দিয়ে, আর তারপর সেই সবের ওপর, বাঁচবার চেষ্টায় শিশু আর বৃদ্ধদের ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। তারপর তারা নিজেরাই হাত পা ভেঙে তাদের মৃত্যুর বুকে লাফ দিয়ে পড়তে গেল। যারা অলৌকিকভাবে এর মধ্যে বেঁচে গিয়ে সেই অঙ্গারের মত ধ্বংসের মধ্য থেকে হ্যাঁচড়ে বার হয়ে আসার চেষ্টা করল, তাদের ধরে ফেলা হল। বিবরণে এইরূপ লেখা আছে, "তারা নিজেদের ইতিকর্তব্য পালন করল সেইসব লোকেদের নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা আর অপ্রয়োজনীয় কষ্ট শেষ করে দিল গুলি করে।"

স্ট্রুপ, যে হিটলারের সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত, বা একজন জঙ্গী আমলা, তার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো বিবরণে প্রত্যেকটি ব্যাপারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। এইভাবে, সে সম্ভবতঃ কোন পারিতোষিক প্রত্যাশী ছিল। সে দম্ভভরে ঘোষণা করেছে যে দশ হাজার লোকের নিয়তি, নরবলি সংগঠিত হয় নিখুঁত সংগঠন ও দ্রুততার মাধ্যমে। শেষের দিকে, পাছে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এই সন্দেহ করে যে স্ট্রুপ তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উদারতা দেখিয়েছে বা হেলা ফেলা করেছে, এই আশঙ্কায় সে জোর দিয়ে লিখেছে যে এরপরও যারা পালাতে সমর্থ হয় তাদের কুকুর দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। সে স্বীকার করে যে কোন কোন পলাতক নালার মধ্যে ঢুকে পড়ে, যেখান থেকে তাদের মৃত্যু যন্ত্রণার গোঙানি শোনা যাচ্ছিল। যারা গ্যাস দেয়, তেমন একটি ছোট দলকে আবার ডাকা হয়—কেবলমাত্র "তাদের অ-দরকারী কষ্ট শেষ করে দেওয়ার জন্য।"—আর তারা সেই নালাগুলোর মধ্যে গ্যাস ছুঁড়ে দেয়। যখন বাঁচার জন্যে লোকেরা ঠেলে বার হয়ে আসার চেষ্টা করে, তখন গর্তের ভিতর থেকে বার হয়ে আসা খরগোসের মত তাদের গুলি করে মারা হয়। একদিনে, স্ট্রুপ নথিভুক্ত করে রেখেছে, তারা ১৮৩টি ম্যানহোল খুলে তার মধ্যে গ্যাস বোম ছোঁড়ে। এ যে বিষাক্ত মৃত্যু গ্যাস, এই বুঝতে পেরে ইহুদীরা ঠেলে বার হয়ে আসার চেষ্টা করে। বহু লোক, দুর্ভাগ্যবশতঃ সঠিক সংখ্যা বলা যাচ্ছে না, নালাগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার ফলে

মারা যায়। স্যাপাররা এই অভিযানে অসাধারণ বিশেষজ্ঞের দক্ষতা প্রদর্শব করে।

পরে, এই বর্বোরচিত অভিযানের কথা বর্ণনা করার সময় স্ট্রূপ মূল কথা থেকে সরে গিয়ে সুরেলা অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর সব কথার মধ্যে জাতীয়তা-বাদী-সমাজতান্ত্রিক জার্মানদের বৈশিষ্ট্যের কথা এইভাবে বলে, "প্রতিরোধ যত বাড়তে লাগল……তারা পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের কর্তব্য করত, আর কর্তব্য করতে গিয়ে সামরিক উদ্দীপনার পরিচয় রাখত। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করতো। তারা ইহুদীদের খুজে বার করতো আর কোথাও বাস করতে দিত না……অফিসাররা, লোকেরা, পুলিশেরা, বিশেষতঃ যারা ফ্রণ্টে একসময় কাজ করেছে, যথার্থ সাহসীভঙ্গীতে তাদের জার্মান মেজাজ প্রকাশ করত।"

এইসব লোকেরাই ছিল নাজী রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক। কাঠগড়ায় যারা বসে আছে, তারা সবাই এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে, আর তারাই চেষ্টা করেছে "সত্যিকার টিউটন" তৈরী করতে। এইভাবেই তারা তাদের জাতীয় কর্তব্যের ব্যাখ্যা করত, আর সম্মান, সাহস, সামরিক শৌর্যের যে সুপ্রাচীন মূল্য, তা তারা এইরকম বুঝেছিল। এই হচ্ছে সেই জিনিস যা নিয়ে তারা দম্ভ করত, আর যার জন্যে তারা পুরস্কৃত হত।

"তুমি জানো, এইমাত্র কোন চিন্তা আমার মধ্যে উঁকি দিল?" আদালতে সাময়িক বিরতির সময় য়ুরি ইয়ানোভস্কি দাবড়ে মট মট করে আঙ্গুলের গাঁট মটকাতে মটকাতে বলল। "যতগুলি লোককে ওরা হত্যা করেছে, বিষ খাইয়েছে, অত্যাচার করেছে, তাদের সকলের রক্ত যদি ধীরে ধীরে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটি থেকে বার হয়ে আসতো, তাহলে সেই রক্তের হ্রদে হত্যাকারীরা ডুবে যেত।"

এ সবই যথেষ্ট ভয়ংকর, কিন্তু পরে বোঝা গেল, সর্বাধিক আতংকের যে অধ্যায় তা তখনো আসতে বাকী। আদালত কক্ষে হলের মাঝখানে সেই 'শো-কেশ'গুলো আর টেবিলের ওপর রাখা, আদালতে পেশ করা বিরাট বিরাট আকারে বস্তু তখনো প্রমাণের অপেক্ষায় চাদরে ঢাকাছিল। আদালতের সাময়িক বিরতির পরবর্তী অধিবেশনে, অভিযোক্তা, টেবিলের ওপর রাখা, আদালতে পেশ করা একটি প্রামাণিক বস্তুর ঢাকা ছিঁড়ে

ফেললেন। হতবুদ্ধি জনসাধারণ নিস্তব্ধ নিথর হয়ে, পরে আতংকে বিড় বিড় করতে লাগল। একটা সুন্দর মার্বেলের উপর বেল-গ্লাসে ঢাকা একটি মানুষের মাথা। হ্যাঁ। একটা মানুষের মাথা। উল্টে আঁচড়ানো লম্বা চুল। কুঁকড়ে কুঁচকে হাতের মুঠোর আকারে পরিণত হয়েছে—যা ভাবা যায় না। দেখলেই মনে হবে এটা একটা সাজাবার জিনিসের মতন, যা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে সেই দানব 'শিল্পীরা' তৈরি করেছিল, যেগুলি শিবির পরিদর্শনে কোন সম্মানিত পরিদর্শক এলে তাঁকে, স্মারক হিসেবে, শিবিরের প্রধান ভেট দিত। পরিদর্শনরত ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার চোখে লাগাত যে বন্দীকে, তাকে মেরে ফেলা হত, মাথার ঘিলু-মগজ, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়া মাথার হাড়, একটা কৌশলগত পদ্ধতির মাধ্যমে টেনে বার করা হত ঘাড়ের মধ্যে দিয়ে, তেমনিই কোন বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা মাথাটাকে কুঁকড়ে কুঁচকে দেওয়া হত, ভেতরে অন্য জিনিস ঠাসা হত, স্থাপন করা হোত অলঙ্করণ বা সাজানোর উদ্দেশ্যে।

সেই কাঁচের পাত্রে যখন আমরা এই মাথাটির দিকে তাকালাম, আমরা অনুভব করলাম যে আমাদের মাংসপেশী শিরশির করছে। ওপরে দর্শক গ্যালারীতে একজন মহিলা মৃগীরোগীর মত তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকে ছুটে সেই দিকে গেল।

লিও স্মিরনভ তাঁর সওয়াল অব্যাহত রাখলেন। কোনিগস বার্গ গবেষণা সংস্থা থেকে সিগমণ্ড মাজুর নামে জনৈক "বৈজ্ঞানিক"কে তিনি হাজির করলেন একজন সাক্ষী হিসেবে। সেই বৈজ্ঞানিক বর্ণনা করলেন, এই সংস্থার গবেষণাগারে কিভাবে মানুষের মাংস-মেদ এবং চামড়া থেকে—অর্থাৎ সেই বিরাট মৃত্যু-শিবিরে প্রতিদিন যা ফেলে দেওয়া হতো সেই সব জিনিসগুলি—"বৈজ্ঞানিক শিল্পগত উপযোগিতা" আবিষ্কার করা যায় তার প্রচেষ্টা চলত।

অভিযোক্তার নির্দেশে সব প্রদর্শনী স্ট্যাণ্ড ও সব টেবিল থেকে সব আচ্ছাদন সরিয়ে দেওয়া হল। আমরা দেখলাম নির্মাণ প্রণালীগত বিভিন্ন অধ্যায়ে মানুষের চামড়ার এক প্রদর্শনী : টাটকা ছাল ছাড়ান, মাংস ছাড়ানো ও ট্যান করা এবং পরিশেষে চামড়ার তৈরী জিনিস—সুন্দর হাত-ব্যাগ,

মেয়েদের জুতো, ব্রীফ কেস, ব্লটিং প্যাড, এবং এমন কি গায়ে দেবার জ্যাকেটও। নানা ধরনের সাবানের বাক্সও—সাধারণ সাবান, গেরস্ত-সাবান, বাচ্চাদের জন্যে সাবান, কলে-কারখানায় ব্যবহারের জন্যে সাবান, আর চটকদার রঙীন মোড়কে সুগন্ধী গায়ে মাখার সাবান, এই সবের বাক্স টেবিলের ওপর পড়েছিল।

নিথর নীরবতার মধ্যে অভিযোক্তা তাঁর সওয়াল করেই চললেন। চাপা উত্তেজনায় টান টান হয়ে বসেছিল প্রতিবাদীরা। নিজের দুচোখ গুটিয়ে, নিজের ঠোঁট কামড়ে একটা ব্যথিত অভিব্যক্তি নিয়ে বসেছিল রিবেনট্রপ; গোয়েরিং, তার বিচলিত ঝোলা মুখ নিয়ে টুকরো টুকরো কাগজে মন্তব্যের পর মন্তব্য লিখে পাঠাচ্ছিল তার পক্ষের আইনজীবীর কাছে। স্ট্রেইচার কাশছিল আর মৃগীরোগগ্রস্তের মত ফিক্ ফিক্ করে বোকার মত চাপা হাসছিল। ল্যাংকী স্ক্যাচট্ আবার প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল আর তার নড়াচড়াহীন নিষ্ঠুর বুল ডগের মত গতিহীন মুখ মনে হচ্ছিল মোম মাখান আর তার দেহ ছাড়া।

ক্রেশিনস্কি আর আমি হলাম প্রথম সাংবাদিক প্রতিনিধি যারা ওসউইসিম সরজমিনে দেখতে গিয়েছিলাম, তখনো যার জার্মান নাম ছিল অসচউইটজ। আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীদের পিছু পিছু উড়ে গিয়েছিলাম, আর ওই অতিকায় মৃত্যু শিবির যা তখনো প্রকৃত প্রস্তাবে চালু অবস্থায় ছিল, তা দেখেছিলাম। আমরা অনেক গুদাম ঘর দেখলাম যেখানে আলাদা করে করে বাছাই করা ও মান অনুযায়ী আলাদা করে রাখা মানুষের মাথার চুল থাকে থাকে রাখা। অথবা ইতিমধ্যে গাঁটরী বাঁধা অবস্থায় চালানের জন্য প্রস্তুত। বর্বরোচিত ডাক্তারদের নক্কারজনক গবেষণার বলি শিশুদের মৃতদেহের স্তূপও আমরা দেখেছিলাম। দুজন রুশ যুদ্ধবন্দী যাদের অন্যান্য বর্বর ডাক্তাররা, নিম্ন তাপমাত্রিক অঞ্চলের মনুষ্য প্রাণীর স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করেছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাদেরকে যতক্ষণ না তারা অজ্ঞান হয়ে যায়, ধীরে ধীরে স্রেফ ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়া হত এবং তারপর আবার আস্তে আস্তে সজাগ করা হোত। যদিও এসবই আমাদের স্মৃতিতে সজীব ছিল, তবু সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত, মনুষ্য শরীরের বাতিল জিনিস থেকে "কারখানায়" তৈরী এইসব উৎপাদন সামগ্রী দেখে আমরা কেমন বিভ্রান্ত বোধ করলাম। আমার গলার কাছে

বমি বমি করতে লাগল, আর আমার ইচ্ছে হল লাফ দিয়ে, ছুটে আদালত-কক্ষ থেকে বার হয়ে যাই।

যথার্থ কথা বলতে কি, এ আমাদের কাছে আদৌ নতুন কিছু নয়। আমেরিকান অভিযোগকারীদের পক্ষে, আগেই, রেখবানকের পূর্বতন প্রেসিডেন্ট ও সমর অর্থনীতির কমিশনার-জেনারেল, ওয়াল্টার ফানক-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল। ওয়াল্টার ফানক, বন্দী শিবিরগুলিতে, নিহতদের মুখ দিয়ে সমস্ত সোনা, প্ল্যাটিনামের মুকুট আর দাঁতের পাটি বার করে নেওয়ার জন্য এক বিশেষ দল গঠন করেছিল। আর তার নির্দেশ ছিল যে এর প্রত্যেকটি জিনিস একটা একটা করে নির্ভুল গুণতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে আর আলমারীর থাকে তুলে রাখতে হবে। এইসব দামী ধাতুর মূল্যে রেখবানকের আদায়ীকৃত 'সরকারী আয়' যে কত কত হয়েছিল, তা আমরা জানতাম। সে সাক্ষ্যও ছিল ভয়ঙ্কর, কিন্তু তবু আমরা তা মন দিয়ে শুনতে পেরেছিলাম। কিন্তু সত্যি ভয়ঙ্কর ছিল শান্ত, পেশাদারী ভঙ্গীতে লেখা সিগমণ্ড্ মাজুর-এর সাক্ষ্য—"মানুষের চামড়া যেহেতু জানোয়ারের মতন লোমে ঢাকা নয় তাই জানোয়ারের অপেক্ষা মানুষের চামড়া থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরি অনেক কম খরচে হয়।" অথবা "ঠাণ্ডা করার পর এই ফুটন্ত পদার্থকে ছাঁচে ঢাললেই ভালো সাবান খুব সহজেই তৈরি হয়।"

আমি লক্ষ্য করলাম যে এই প্রথমবার সেই তিনজন কুক্রিনিক্সির সামনে ফোলডার খোলা, হাতের পেনসিল হাত থেকে শূন্যে ঝোলান। তারা হতবাক হয়ে গেছে।

"এর সঙ্গে তুলনা করলে দান্তের ইনফারনো হলো নাচে গানে করা এক কমেডি", কারো কানে কানে এই কথাগুলি বলল যুরি কোরোলকভ। কিন্তু আদালত ঘর এমন নিশ্চুপ যে তিন সারি দূর থেকে আমরা তার কথা শুনতে পেলাম।

অধিবেশন থেকে আমরা নীরবে বার হয়ে গেলাম।

"কি বলবো, আমি এর পরে আর সত্যিই মাংস খেতে পারবো না", ভ্যান গাড়িতে ওঠার সময় বলল মিখাইলগুস।

"তাহলে তো, তর্কের খাতিরে বলতে হয়; তোমার সাবান দিয়ে গা ধোয়া উচিৎ নয়", বিষণ্ণ কণ্ঠে কৌতুক করে বলল সেমিওন নারিন ইয়ানি।

আমাদের দোভাষী, মায়া, সত্যি বেশ ভেঙে পড়েছিল। গাড়িতে বসে কম্পমান মায়া, ঠোঁট কামড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, হিক্কা ওঠার মত শব্দ হচ্ছিল। আর তার পাশে বসা টাইপিস্ট মেয়েটি মায়ার নাকে কোন তীব্র 'স্মেলিং সলট' ধরছিল।

অন্ততঃ একদিন, আমরা সকলেই সত্য সত্যই আমাদের ক্ষুধা বোধ আর রাতের ঘুম হারিয়ে ফেলেছিলাম।

৯। গোয়েরিং-এর লিবেনস্রাউম

আমি ইতিমধ্যে জানিয়েছি যে 'প্যালেস অফ জাসটিস', যা আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনাল ব্যবহার করছিল তা দেখে মনে হত যে তা যেন ন্যুরেমবার্গ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দ্বীপের মত:—একটি বোমাও এর ভিৎ বা মাটিকে আঘাত করেনি, আর এই প্রাসাদের বিশাল, দুর্গের মত পাঁচিলে ছিটকে আসা গোলাগুলি থেকে একটা আঁচড়ও লাগেনি। প্রাসাদের চারদিকে যে ধ্বংসাবশেষ তা টেনে টেনে সরাচ্ছিল এস-এস বন্দীরা—জবুথবু গোছের প্রকাণ্ড, ষাঁড় মুখো, হিংস্র মেজাজের সব লোক। তাদের গায়ের রঙ আর মোটা পেট দেখে মনে হচ্ছিল যে আমেরিকানদের হাতে বন্দী হিসেবে নিতান্তই কোন মন্দ জীবনযাপন করছে না। তারা কালো পোশাকে সার বেঁধে একটা ক্রম অনুসারে এসে ঠেলাঠেলি করে ধ্বংসাবশেষ-গুলো এক এক জায়গায় জড়ো করছিল। দুজন বা তিন জন জি. আই. তাদের কাজের ওপর "গোয়েন্দার মত কড়া নজর" রাখত। "গোয়েন্দার মত কড়া নজর" বলা ঠিক হল না। কেন না আমেরিকান সৈন্যরা সারাদিন কোথাও বসে রোদ পোয়াত আর চুয়িং গাম খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে গল্প করত।

অকপটে বলতে হয়, আমরা যতই রোজ এই অশুভ, অপকারী, মসীলিপ্ত এস এস ফৌজের 'কীর্তি' শুনছিলাম, তাই তাদের সম্পর্কে এই ঢিলে ঢালা ঔদার্য আমাদের ক্ষুব্ধ আর শঙ্কিত করেছিল, আর আমি জানি 'প্যালেস অফ জাসটিসের' এত কাছে এস-এস-এর উপস্থিতি নিয়ে আমাদের বিচারকরা বার বার প্রতিবাদ করেছিলেন। আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর প্রথম আমেরিকান বাহিনী যারা ন্যুরেমবার্গ দখল করে, কর্তৃত্বে ছিল, তারা কিন্তু

নম্রভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এসব আপত্তি তথা প্রতিবাদ ঝেড়ে ফেলেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এস-এস-এর লোকের এখন সাধারণ বন্দী। আর তা ছাড়া জেনেভা চুক্তির ধারাগুলিও বিবেচ্য।

সেদিন সকালে, যখন আমরা গাড়ি করে 'প্যালেস অফ জাসটিস'-এ যাচ্ছি, আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে এস-এস-এর লোকেরা তাদের জায়গায় কাজ করছে না। তার বদলে চৌহদ্দির মধ্যে উঠোন মত জায়গাটায় চারটে সাঁজোয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আর কামানের মুখগুলো রাস্তার দু'মাথার সংযোগ স্থলের দিকে তাগ করা। বালি ভর্তি থলির বিশাল সব 'বাংকার' প্রবেশ পথের দু পাশে করা হয়েছে আর তার ফাঁক দিয়ে গোলা চালানোর জন্যে মেশিনগানের হাঁ মুখ বার হয়ে আছে। সেই অট্টালিকায় ঢোকার মুখ বা প্রবেশপথ আরও ছোট ছোট 'বাংকার' দিয়ে ঘেরা। প্রবেশ পথের ওপর মিত্রবাহিনীর পতাকাগুলি উড্ডীন। প্রাসাদের মধ্যে বারান্দার কোণে কোণে থলির তৈরী "খেলনা" বাংকার, গাদা করে রাখা।

ঘটেছেটা কি? রাতারাতি সেই গোটা জায়গাটা যুদ্ধের মত হয়ে গেছে কেন? আমরা জানতে পারলাম যে এস-এস. বন্দীরা শিবির থেকে পালিয়েছে, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, পাহাড়ের ওপর পালিয়েছে আর এই রকম অনুমান করা হচ্ছে যে প্রধান যুদ্ধ অপরাধীদের মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে বন্দীশালা আক্রমণ করার জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছে।

দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সাময়িক বিরতিতে আমি বন্দীশালার দায়িত্বভার প্রাপ্ত সেনাপতি কর্নেল আনড্রুসকে দেখতে পেলাম। আমার এখানে আবির্ভাবের সময় থেকে আমাদের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যে বন্ধুত্ব আমি আগেই জানিয়েছি, যে অস্বাভাবিক পোশাকে আমি 'প্যালেস অফ জাসটিস'-এ পৌঁছেছিলাম, তার থেকে আমায় সাহায্য করেছিল। সে স্পষ্টতই মনে মনে অশান্ত ও পূর্বচিন্তায় নিমগ্ন ছিল। তবু সে কথা বলতে রাজী হল। আর সব আমেরিকান কর্তা-ব্যক্তিদের মত, সে সাংবাদিকদের এড়িয়ে যেত না।

"আজ 'প্যালেস অফ জাসটিস'কে অবরুদ্ধ কোন দুর্গের মত দেখাচ্ছে কেন?"

"এটা কি একটা সাক্ষাৎকার?"

"না। এমনি জানতে চাইছি। এই বিষয় নিয়ে আমি লিখবো না।"

"না? কেন নয়? ইচ্ছে করলে লিখতে পারেন। *প্রাভদায়* এ খবর পাঠাতে পারেন: "আমার মক্কেলদের পালাবার যে কোন সম্ভাব্য উপায় ধর্তব্যের বাইরে। আজ যে সমস্ত ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি, তার তাৎপর্য নিছক মনস্তাত্ত্বিক।"

"আপনি কি সত্যি সুনিশ্চিত যে পালানো অসম্ভব?"

"আমরা যে ওদের কিভাবে পাহারা দিচ্ছি, তা জানলে আপনিও আমার সঙ্গে একমত হতেন।"

"কিভাবে আপনার পাহারা দিচ্ছেন?"

"আপনি যদি সত্যিই চাক্ষুষ করতে চান…" তার সোনার ঘড়ি, যেটা তিনি কথা বলতে বলতে এক সময় অনেকটা অন্যমনস্কভাবে প্যান্টের পকেট থেকে বার করেছিলেন, সেটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, "যদি সত্যি আসতে চান, তাহলে আমার কাছে বারোটার সময় আসুন। এখন, আমি দুঃখিত, আমি একটু ব্যস্ত আছি……। এস-এসদের নিয়ে এই যে ঘটনা এটা একটা জঘন্য ব্যাপার।

আমেরিকান কায়দা অনুযায়ী, পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী ঘড়ির কাঁটায় আমার ও দোভাষীর সঙ্গে কর্ণেল দেখা করলেন। আনড্রুসের গড়ন মোটাসোটা। মুখখানা চতুর। গোল গোল এক জোড়া কাঁচের ডাণ্ডিহীন একটা চশমা সে পরেছিল। ছোট "লাতিন আমেরিকান" গোঁফ, যার জন্যে তাকে সুন্দর দেখাতো। কিন্তু তার দুই চোখ ছিল বুদ্ধিদীপ্ত ও মনোযোগী।

তার পোশাক ছিল সপ্রতিভ কেতাদুরস্ত। আর তিনি তার দপ্তরে থাকার সময়েও ঝকঝকে শিরস্ত্রাণ একটু বাঁকিয়ে মাথায় দিয়ে রাখতেন। এসব সত্ত্বেও, আমি নিশ্চয়ই বলব, তাকে দেখাত ও তার ব্যবহার ছিল অনেকটাই অসামরিক পদস্থ মানুষের মত।

"বসুন, বসুন………হুইসকি? জিন? নাকি ভারমুথ?……এই যে সিগারেট। নাকি 'সিগার' আপনার বেশী পছন্দ। আমায় যা আদেশ করেন।"

দেওয়ালের ওপর বন্দীশালার একটা নকসা ছিল। 'প্যালেস অফ জাসটিস' আসলে, আইনের কাজ কর্ম হচ্ছে এই রকম নানা কক্ষের এক

বিশাল সমষ্টি। গোটা বাড়িটার চারদিক ঘিরে একটা ছোট উঠোন। এরই একটা ডানায় বা ধারে বন্দীশালা। আমি আগেই জানিয়েছি মাটির তলার সুরঙ্গ পথ বন্দীশালাকে সরাসরি যুক্ত করেছিল আদালত-কক্ষের সঙ্গে।

"ওদের এমন কি পালাবার চেষ্টা করার কোন সম্ভাবনাও এর দ্বারা একেবারেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কেন না সুরঙ্গের শেষের দুদিকেই কড়া পাহারা আর গোটা সুরঙ্গটাতেই আগুন জ্বালিয়ে পারে। যে কোন ঝামেলার সামান্যতম লক্ষণ দেখলেই আমরা বাইরে যাবার সব কটা রাস্তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দোব—এখানে, এবং এখানে", ম্যাপের দিকে আঙুল তুলে আনড্রুস বুঝিয়ে বললেন।

"বন্দীশালার ঘরগুলোর কি ব্যাপার? ওগুলোর কি জানালা আছে?"

"না। আপনিই প্রথম ব্যক্তি নন, যাকে আমি জানাচ্ছি যে আমার মক্কেলরা কখনোই সূর্যের আলো দেখতে পায় না। কেবল কৃত্রিম আলো। আর যদি থাকতোও, তাহলে কারও কিছু করার ক্ষমতা হত না। রবার্ট লে-কে নিয়ে সেই দুঃখজনক ঘটনার পর, সান্ত্রীরা, দিনরাত কার্যতঃ বন্দীদের ওপর শিরিষ আঠার মত লেগে থাকে। আপনি কি চান যে ব্যাপারটা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখাই?"

"ও হ্যাঁ, নিশ্চয়"।

"কেবল মাত্র, কুমারী", সে আমাদের লিট্‌ল টিন সোলজার-এর দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, "'বন্দীশালার মধ্যে' মহিলাদের যেতে দেওয়া হয় না। তাহলে, একজন দোভাষী পাওয়া যায় কোথায়? আমাদের একজন সৈনিক আছে যে জন্মসূত্রে ক্রোসীয়। ক্রোসীয়া আর রুশ ভাষা অনেকটা এক; তাই না?" তিনি একটা বোতাম টিপলেন ও সেই ক্রোসীয়টিকে খুঁজে আনার নির্দেশ দিলেন।

"আচ্ছা, লে ওদের ফাঁকি দিতে পারলো কি করে?"

"লে? হ্যাঁ, ওটা অবশ্য, একটা নোংরা গল্প।"

উনি অবশ্য ঠিকই বলছেন। রবার্ট লে, অন্যতম ঘৃণ্য নাজী, নাজী নেতৃস্থানীয়দের একজন সদস্য, তথাকথিত শ্রমিক শাখার প্রধান, সেও মূলতঃ একজন প্রতিবাদী ছিল। এখন অবশ্য কাঠগোড়ায় তার জায়গাটা খালি। এইখানে, ন্যুরেমবার্গ বন্দীশালায় আত্মহত্যা করে সে কৃত কর্মের দায়িত্বের ভবিতব্য থেকে নিষ্কৃতি খুঁজে নিয়েছে।

যখন লাল ফৌজ বার্লিন শহর ও সপার্ষদ হিটলারকে ঘিরে ফেলে, তখন দল বল সমেত হিটলার সেই ঘেরা ফাঁদে ধরা পড়ে হামা দিয়ে আশ্রয়ের জন্য গুপ্ত খোঁয়াড়ে যায়, তখন রবার্ট লে হিটলারকে ত্যাগ করে নিজের স্বদেশ, বাভারিয়াতে পালিয়ে যায় এই আশায় যে সে বাভারিয়ার আলপস্ পর্বতমালা, যা সে তার শৈশব থেকে খুব ভালভাবে চিনত, সেখানে লুকিয়ে থাকবে। সে তার এস-এস সেনাপতির ইউনিফরম বদলে, পাহাড়িয়াদের সাধারণ যে পোশাক তাই পরিধান করে, দাড়ি রাখে আর পাহাড়ের মধ্যে এক কুটিরে জনৈক ডঃ ডোসটেল মেয়ার, এই নামে কিছু দলিল দস্তাবেজ পেশ করে লুকিয়ে থাকে। শ্রমিকদের সংগঠন ধ্বংস করার জন্য আর জার্মান শ্রমিক শ্রেণীকে নির্দয়ভাবে শোষণ করার পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য তার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। হিটলারের প্রিয় জমিদারী, ব্রেখটেসগাডেন-এ আমেরিকান বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে, লের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গিত জানিয়ে একই সঙ্গে আসতে থাকে, অজস্র চিঠি। আধা মাতাল অবস্থায় যখন তাকে তার পাহাড়ের বাসায় ধরা হয়, তখন লে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

"আপনার ভুল হয়েছে", লে যেন তাদের আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলেছিল, "আমি লেকে জানিও না। তাকে কখনো আমি দেখিনি আমার নাম ডোসটেল মেয়ার। এই তো আমার দলিল দস্তাবেজ। আমি বুঝতেই পারছি না যে আপনারা আমার কাছে কি চান।"

সে মাতাল অবস্থায় ছিল। তার চোখ ছিল লাল টকটকে। তার অসমান বিক্ষিপ্ত দাড়ি থেকে পচুই-মদের ঘিনঘিনে গন্ধ আসছিল। এই হল আর একটা চিহ্ন যা লে কে বিপাকে ফেলল। জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু একজন পাকা মদ্যপ বলে সুপরিচিত ছিল। নাজী দলের একজন প্রথম শ্রেণীর বিশেষ সভ্য, যাকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার মাধ্যমে ডোসটেল মেয়ার-এর সত্যিকারের পরিচয় প্রকাশ পেল। লে হাল ছেড়ে দিল।

"আমি হেরে গেছি", লে বলেছিল।

লে-কে ন্যুরেমবার্গ কারাগারে আনা হয়, যেখানে তাকে ভদ্র তথা বিনয়ী করা হয় এবং সে খুবই সক্রিয় হয়ে পড়ে। আমেরিকান ও রুশীয়দের মধ্যে এক বচসা বাধবে এই রকম এক পরিস্থিতির অপেক্ষায় সে থাকে।

"শ্রমিক শাখা"র এই নেতা যে শ্রমিকদের ও পুঁজিবাদীদের মধ্যে "অনন্ত শান্তি"র ডাক দিয়েছিল, সে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। নাজী ও আমেরিকান অর্থনীতির মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ পূর্ব যোগাযোগ ছিল, আর দু দেশের মধ্যে প্রভাবশালী যে সমস্ত ব্যবসায় সংস্থা ছিল তাদের মধ্যে নানা প্রকাশ্য ও গোপন বোঝাপড়া সম্পর্কে সে অবহিত ছিল। বোমাবৃষ্টির মত অজস্রতায় নানা চিঠিতে আমেরিকান সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এই পরিকল্পনা পাঠাল, পাশ্চাত্য ভূমি ও তার ধ্যানধারণা থেকে বলশেভিক রাশিয়াকে বিচ্ছিন্নকারী জার্মানী সব সময়েই, দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এখন এই মধ্যবর্তী রাষ্ট্রটি ধ্বংস হয়েছে। লাল ফৌজ যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এবং গোটা ইউরোপ ও মুক্ত বাণিজ্য ভাবনার ভিত্তিগত ধারণার ক্ষেত্রেই ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই মধ্যবর্তী রাষ্ট্রটিকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর এই ব্যাপারেই, ডঃ লে, অর্থ নৈতিক ব্যাপারে যার বেশ মুন্সীয়ানা আছে, সে উল্লেখযোগ্য কাজে লাগাতে পারে। সে নিজেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও বাহিনীর সেবার জন্যে নিযুক্ত করে…তার চিঠি পত্রে সে এইরকম খোলাখুলি লেখে, "জন সাধারণের সর্বাধিক শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল গলেইটার, ক্রাইমলার এবং অরটসগ্রাপেন লেইটার রু, যারা জার্মানির বণিক সমাজের কৌলিন্য সৃষ্টি করেছিল। আজ তারা সবাই হাজতে। কিন্তু তাদের কর্তৃত্ব ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে আমেরিকার সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটাবার ও জার্মানীকে ইউরোপের এক শক্তিশালী মিত্র শক্তিকে পরিণত করার মহৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগান জরুরী।" অথচ, সে বিষয়টি আরও সম্প্রসারিত করে লিখেছিল, "এই কাজ করতে হবে একান্ত গোপনীয়তার মধ্যে। আমার মনে হয় যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বার্থে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে প্রকাশ্য লোলুপতা না দেখানোই আমেরিকার বিদেশী নীতির পক্ষে সুবিধাজনক হবে।"

লের চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনার আকার নয় ও সংবাদপত্রের গোচরে আসে। সে এমনকি হেনরী ফোর্ড-এর কাছে বিশেষ বার্তা পাঠায়, কেননা সে জানত যে মোটর শিল্পের এই চুম্বক নাজীবাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। সে স্বেচ্ছাগত হয়ে ফোর্ডের সঙ্গে ভক্‌সওয়াগেন কারখানার সব কারিগরি অভিজ্ঞতাকে পরিচিত করার কথা বলে, বিশালাকার

মোটর গাড়ির কারখানা তৈরী করার জন্যে সাধারণের পুঁজি কিভাবে আকর্ষণ করা যাবে সে কথা জানায়, ও এই আশা প্রকাশ করে যে, সে, লে, ফোর্ডের সাহায্যে আসতে পারে।

সংক্ষেপে, রবার্ট লে জার্মানীতে আমেরিকার পরিচালন নীতি সম্পর্কে যথাযথভাবে এক যথার্থ মূল্যায়ণ করে আর আমেরিকার সুরক্ষার অন্তরালে সে হিসেব করে গুণে দেখে কেবল কৃতকর্মের দায়িত্ব এড়ানোই নয়, নিজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত করে নিয়ে যুদ্ধোত্তর জার্মানীর গণ্যমান্য উঁচু সমাজে নিজের একটি পাকাপোক্ত জায়গাও হিসেবের মধ্যে দেখতে পায়। কিন্তু একজন জঘন্য ও ঘৃণ্য লোক হিসেবে তার নাম বেশ লম্বা চওড়া ছিল।

এই "অনিচ্ছুক মদ্যপান পরিহারকারী"র মেজাজ একেবারে বদলে যায় যখন প্রধান যুদ্ধ-অপরাধীদের বিরুদ্ধে, যে তালিকায় তার নামও ছিল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি জানানো হয়। কয়েক পর্যায়ে ক্ষেপে ক্ষেপে নিরাশ থাকার পর সে কারাকক্ষে ছটফট করে বেড়াত। অথবা সে হঠাৎ নিজেকে ছুঁড়ে দেওয়ার মত করে হাঁটুর ওপর বসে পড়ে, এবং যেহেতু সেখানে কোন 'ক্রশ' নেই, পায়খানা বসবার আসনের সামনে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে দিল। বিচার আরম্ভ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক মাস আগে এক রাত্রে সান্ত্রী তার সঙ্গে এই রকম কথাবার্তা বলে—

"কি হল, ডঃ লে, আপনি এখনো ঘুমোননি কেন?"

এর উত্তরে সান্ত্রী অস্পষ্ট গলায় এই অর্থহীন কথা শোনে: 'ওরা আমায় ঘুমোতে দেয় না, ওই *অসটার বেইটরা*, ওই ইহুদীরা…ওরা আর বেঁচে নেই, ওরা, মৃত। তাহলে ওরা কেন এখানে এই কারাগারে রয়েছে?"

সান্ত্রী তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বারান্দা দিয়ে চলে যায়। যখন সে দেখবার গর্ত দিয়ে আবার তাকায়, তখন মনে হয় লে যেন ভয়ে গুটিসুটি মারার মত করে বসে আছে। সব কিছু ঠিক আছে এ বিষয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে সান্ত্রী আবার তার টহল দিতে থাকে। পরে যখন সে আবার লে-র কারাকক্ষে আসে তখন দেখতে পায় যে সেই একই অবস্থায় লে, নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। চকিত সান্ত্রী একজন অফিসারকে ডেকে আনে ও তারা কারাকক্ষের ভিতরে যায়। শৌচাগারের ভিতর বিছানার চাদর গলায় দিয়ে ফাঁস লাগিয়েছে।

এই সব কাহিনী কাগজে বিশদ করে ছাপা হয়েছে ও এ কাহিনী এখন আর কোন বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করে না। যাইহোক, তবু আমি সেই কারাকক্ষ চাক্ষুষ করতে ইচ্ছুক ছিলাম। আমি আমার কথা আরোপ করে চাপিয়ে দিতে চাইনি বলে খুব সতর্কভাবে কর্নেল আনড্রুসকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি এরকম কোন শংকা আছে যে যুদ্ধ অপরাধীদের মধ্যে আর একজন কেউ ডঃ লি-র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চাইবে?"

"ও, না। তার আর এখন কোন সুযোগ নেই। নিজেই দেখবেন চলুন।"

সেই ক্রোট দোভাষী ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে: লম্বা, কালো চুল আমেরিকার বাহিনীর প্রথম ডিভিসনের ফৌজী পোশাক যা চমৎকার ছাঁট কাটে তাকে সাধারণের থেকে বেশী মানিয়েছে। আমরা লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে হেঁটে বন্দীশালার দিকে গেলাম। বারংবার তালা খোলার ঘর্ঘর শব্দ হল আর রক্ষীরা আমাদের ছাড়পত্র দেখতে চাইল। অবশেষে আমরা সেই বন্দীশালার প্রধান বড় ঘরে পৌঁছুলাম। এই সেই শেষ পাগলাগারদ, যেখানের অধিবাসীরা মনে মনে কল্পনা করেছিল, কেবল মনে মনে কল্পনা করেনি, পাঁচটি মহাদেশে জার্মান *লেবেন স্রাউস* র ধারণা কি ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তার পন্থাগত পরিকল্পনা করেছিল। এই বন্দী নিবাস তিন তলা, আর ওপরের তলার বন্দী নিবাসের দরজাগুলো থেকে একটা লোহার গ্যালারী দেখতে পাওয়া যায়। এখন অবশ্য কেবল নীচের তলা, অর্থাৎ একতলাটাই ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি যখন লম্বা বারান্দা দিয়ে একঝলক তাকালাম তখন অবাক হয়ে গেলাম। প্রত্যেকটি দরজার পাশে একজন করে সৈনিক দাঁড়িয়ে, আমাদের দিকে অর্ধেক ফেরা, দরজার ওপরের অর্ধে যে পর্যবেক্ষণ ফোকর সে দিকে দু'চোখ দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ। কারাকক্ষের প্রতিটি কোণ আলোকিত করার জন্য, পর্যবেক্ষণ ফোকরের তলায়, ইস্পাতের দরজার সঙ্গে লাগানো যে প্রতিফলনকারী আলোর ব্যবস্থা, সেই ইস্পাতের দরজাগুলোকে দুই সারি সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। যখন তাদের উচ্চপদস্থ অফিসার এল, তখনও সেই সৈন্যরা স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও সেই পর্যবেক্ষণ ফোকর থেকে তাদের চোখ লহমার জন্যও সরাল না।

"আচ্ছা এখানে কি আর কেউ লি-র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারবে?"

গলায় আত্মতুষ্টির ছোঁওয়া নিয়ে জানতে চাইল বন্দীশালার রক্ষীদের ওয়ার্ডেন।

"দেখে তো নিশ্চয় মনে হচ্ছে যে ভরসা করা যায়।"

"আমি নিজে এই পদ্ধতি বার করেছি," একজন আবিষ্কারকের গর্ব নিয়ে বলল কর্ণেল আনড্রুস, যে মানব জাতিকে তার আবিষ্কার উপহার দিয়েছে। "এটা একটা খুব চমৎকার ব্যবস্থা, তাই নয় কি? কিন্তু পর্যবেক্ষণ ফোকর থেকে তোমার চোখ না সরিয়ে ওভাবে দাঁড়ানো খুবই কঠিন। আমার লোকেরা ওভাবে বহুক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। প্রতি ঘন্টায় তিনবার করে ওদের বদলে দেওয়া হয় এবং আমরা ওদের বিশ্বাসের জন্যে আরো অতিরিক্ত সময়ের ব্যবস্থা করেছি।"

"আমি কি কারাকক্ষের ভেতরটা দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই"।

আমরা এক নম্বর দরজার পাশে থেমেছিলাম যার ওপর লাগানো একটা এনামেলের ফলকে লেখা রয়েছে, "এইচ. গোয়েরিং"। কর্ণেল রক্ষীকে পাশে সরে দাঁড়াতে আদেশ দিল আর ফোকর দিয়ে আমি ভেতরে তাকালাম। আমি একটা প্রায় চৌকো ঘর দেখতে পেলাম, যেটার মাপ, দৈর্ঘে ও প্রস্থে তিন মিটার ও আড়াই মিটার হবে। এই ঘরটায় একটা ঘুমোবার জায়গা, চেয়ার, টেবিল, ফারের দেওয়াল ঘেঁষে মুখ ধোবার বেসিন, আর দরজার ডানদিকে পায়খানা করার জায়গা রয়েছে। জার্মানীর দ্বিতীয় নাজী জুতো পায়ে শোবার জায়গায় বসে আছে, সেই একই ধূসর ইউনিফরম পরা। সে হাতে ধরা খাবারের টিনের কৌটোর ডালাটা চেয়ারের ওপর রেখে, সেই টিন থেকে কিছু বার করে আস্তে আস্তে খাচ্ছে কতকগুলো কাগজ আর একজন স্ত্রীলোকের ছবি টেবিলের ওপর রাখা ছিল............

কারাগারের আর এক ঘরে হেসস হাতে বোনা একটা কার্ডিগান, আর কলারবিহীন একটা জামা গায়ে, বসে বসে কিছু পড়ছে। ও নিশ্চয়ই করিডোরে কোলাহল শুনতে পেয়েছিল কেননা ও হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল। ফাঁদে ধরা একটা নেকড়ের চোখও অসহায় বিদ্বেষে সম্ভবতঃ ওই রকম তীব্র ভাবে জ্বলজ্বল্ করে ওঠে যখন লোকেরা তার কাছে এগিয়ে যায়।

ছোট ও অতি সাধারণ দেখতে সকেল, আতঙ্কজনক এস এস ওপরওয়ালা। যে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের নিয়তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, অনেকগুলি ফটো

বেছে বেছে আলাদা করে রাখছিল আর সেগুলোর মধ্যে কোন কোনটা তারিফ করছিল……

এ্যাডমিরাল রেইডার, জলদস্যুদের নেতা, যে শত শত যাত্রীবাহী জাহাজ আর বহু বাণিজ্য পোত-বহরকে ডুবিয়ে দিয়েছে, সে গরম, হাতা-বিহীন ওয়েস্ট কোট আর বাহুত্রাণ পরে বসে বসে ভাঁজ করা কাগজের টুকরো দিয়ে কুক্কুট শাবক বানাচ্ছে। এইসব কুক্কুট শাবকের অনেকগুলোই দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের ওপর। ওকে দেখাচ্ছিল শান্ত এবং বিরক্ত, ঠিক একজন যাত্রীর মতন অপেক্ষারত, যার ট্রেন আসার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরেও যে সেই ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছে।

চলে আসার আগে আমি গোয়েরিং-এর দরজা দিয়ে আর একবার তাকালাম। খাবার টিন খালি, সে অবশিষ্ট যা কিছু ছিল তা মেখে একটা বিস্কুটের সঙ্গে মুখে পুরে দিল……হাত পা ছড়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কোণের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে স্থির হয়ে বসে থাকল। আমি না ভেবে পারলাম না যে এই লোক, আর যেকোন লোকের চেয়ে বেশী চীৎকার করেছে আর্যদের *লেবেনস্রাউম* নিয়ে পৃথিবীর ওপর থেকে সমস্ত জাতিকে তার আঙুলের ঘষায় মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছে, এখন একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠে বাস করছে, আর তার বাকী জীবনটা এখানেই সে কাটিয়ে দেবে, যদি, অবশ্যই সে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে। গোয়েরিং, সেই ভয়াবহ রাইখের একজন বিপুল ধনী লোক, যার অতীব ব্যয়বহুল ভোজসভায় নিমন্ত্রণ পাওয়ার স্বপ্ন দেখত জার্মানীর বাছাই করা মান্যগণ্য লোকেরা, সেই গোয়েরিং এখন টিনের কৌটো থেকে বিস্কুট দিয়ে টেনে টেনে কি একটা খাচ্ছে—চেটে পুটে পরিষ্কার করে।

আমি একথা না ভেবেও পারলাম না যে এই সমস্ত অপরাধী তাদের প্রিয় ডেসার্ট শেষ পাতে পাচ্ছে কি……

১০। কনস্তান্তিন ফেদিনের সঙ্গে ভ্রমণ

পুরনো স্মৃতি থেকে

মানবতার বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ বিচার সভায় উপস্থিত হতেই থাকল। দেখা গেল কি করে মৃত্যু-শিবিরে মানুষের

শরীরের বাতিল অংশকে কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মত ব্যবহার করা যায়। দৃষ্টান্তসহ স্মিরনভ যেমন দেখালেন, তার থেকেও নাজিবাদের মুখ দেখানর জন্যে অন্য বাকপটু পন্থাও আছে। ইউ.এস. অভিযোগকারীদের পক্ষে প্রধান মিঃ জাস্টিস জ্যাকসন যে পূর্বঘোষণা করেছিলেন তা অনেক আগেই সত্য বলে প্রমাণিত—প্রদর্শিত সাক্ষ্য, এমনকি আমাদের মত সাংবাদিকদেরও, আমরা যারা আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরের নির্দেশক্রমে, বিচারের সংবাদ দেবার জন্য সোজা সীমান্ত থেকে এখানে এসেছি, তাদেরও মুখ চলে গিয়েছিল। আমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার অনুভূতি নিয়ে অধিবেশন শেষে ফিরতাম। 'প্যালেস অব জাস্টিস'-এ বিষণ্ণ নীরবতার মাঝে আমরা যা কিছু দেখতাম ও শুনতাম, অহরহ সেই সবকিছু আমাদের মনে জাকত ও রাত্রে নৈশ দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বাঁচতে আমরা প্রচুর মাত্রায় ঘুমের বড়ি খেতাম।

কিন্তু এইরকম প্রতিভাত হল যে আমাদের জন্যে প্রসিকিউসনের ভাঁড়ারে তখনও অনেক এবং অধিকতর মাত্রায় আতঙ্কজনক সাক্ষ্য প্রমাণ মজুত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐদিন বিচারসভায় মানুষের চামড়া থেকে হাতে-তৈরী সার সার জিনিস দেখান হয়েছিল। একটি মৃত্যু-শিবিরের প্রধান পদাধিকারীর পত্নী, শিল্প বিষয়ে যার গভীর আগ্রহ ছিল এবং তিনি স্থির করেছিলেন যে উল্কির এক অনবদ্য সংগ্রহ তিনি করবেন। হ্যাঁ সেই উল্কির কথাই বলা হচ্ছে—যা মানুষ তার নিজের শরীরের চামড়ায় ফুটো ফুটো করে তার ওপরে ভুষোকালি বা নীল কালী দিয়ে বানায়। এই রকম সব জিনিসের জন্য বিশেষতঃ নাবিকরাই আগ্রহী। বড় বড় বন্দরে বিশেষ বিশেষ জায়গা আছে যেখানে সবচেয়ে খোলামেলা উল্কির নক্সা পাওয়া যায় যা খুবই মৌলিক ও উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হিসাবে বিবেচিত।

এই নাজির পত্নী, যিনি আবার একজন ধর্মপ্রাণা খৃস্টান হিসাবে, ভাল জননী এবং প্রেমপরায়ণা জায়া হিসাবে সুখ্যাতা ছিলেন, তিনি এই উল্কিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন—অবশ্যই মানুষের চামড়াসহ। একজন উল্কিয়ালা বন্দী-শিবিরে এলেই সেই মহিলাকে তৎক্ষণাৎ জানান হত। সেই মহিলা তখন একজন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে সেই উল্কিটি পরীক্ষা করত এবং যদি সেই উল্কি তার ভাল লাগত, তাহলে সেই লোকটিকে মেরে ফেলা হত, তার চামড়া চেঁছে ফেলা হত এবং উল্কি বসান চামড়ার টুকরোটা কেটে আলাদা করে

দেওয়া হত, তেলে চুবিয়ে ভিজিয়ে রাখা হত এবং বিশেষ পদ্ধতিতে অন্যান্য যা কিছু করণীয়, করা হত। সবচেয়ে ভাল আর মৌলিক নমুনাগুলো সেই মহিলার সংগ্রহের ভাঁড়ারে যেত। আর একটু কম চোখ ধাঁধান নমুনাগুলো নিয়ে তৈরী হত বাতির ঢাকনা, টেবিলের কালিমোছার প্যাড, হাতের ঝোলা আর টুকিটাকি সব নানান ধরনের জিনিস। এই মহিলার সংগ্রহ থেকে পাওয়া বেশ কিছু মোটা মোটা এ্যালবাম যার মধ্যে উল্কি বসান চামড়ার অনেক দৃষ্টান্ত পোরা রয়েছে তা সেদিন বিচার সভায় প্রদর্শিত হয়। এই মহিলা উচ্চপদস্থ পরিচিতদের ও পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রীদের স্মারকরূপে যে বাতির ঢাকনা, কালিমোছার প্যাড উপহার দেন তাও দেখান হয়।

কাঠগোড়ায় আবার আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শ্চাচৎ তার চোখ বন্ধ করে বসেছিল এবং ভন প্যাপেন কৃত্রিম ভান করে কানে তালা লাগিয়েছিল। নিউরাথ তার মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছিল আর গোয়েরিং আর হেস্‌স নিজেদের মধ্যে ইচ্ছে করে যেন মাঝে মাঝে কথা বলছে এইভাবে একে অপরের সঙ্গে ফিসফিস করছিল—যদিও নিঃসন্দেহে স্পষ্টতঃই তারাও ছিল ভয় জরজর। কেউ একজন অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাঁকে দর্শক গ্যালারি থেকে তুলে বাইরে নিয়ে যেতে হয়।

আমাদের স্নায়ুর ওপর এতই ধবাধবি হয় যে স্বভাবতই নিজেদের শিথিল এবং হাল্কা করার জন্য একটা রাস্তা বার করতে হয়। সেই কারণে আমরা সেদিন সন্ধ্যায় ন্যুরেমবার্গের চারদিকে পায়চারি করে আসার জন্য কনস্তানতিন ফেদিনকে রাজী করালাম। "পায়চারী" করা শব্দটা অবশ্য এক্ষেত্রে ঠিক হল না। এটা সঠিক হয়, যদি বলি, "কষ্টে সৃষ্টে আরোহণ করা," কেন না আমি আগেই বর্ণনা করেছি যে সহরের কেন্দ্রে কোন বড় রাস্তা ছিল না বললেই চলে,—কেবল ডাঁই করা ধ্বংসস্তূপের মাঝখান দিয়ে আসফল্টে ঢাকা একটা ছোট্ট সঙ্কীর্ণ পথ ছিল।

সুতরাং আমরা আমাদের ছোট্ট "টিন সোলজার," যার আমার মনে হয় কনস্তানতিন ফেদিন সম্পর্কে এক বিধ্বংসী ইচ্ছা ছিল তাকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। সহরের একটা মোটামুটি পরিষ্কার করা অংশ পার হয়ে যাওয়ার পর, আমরা দুপাশে পুরোন বাড়ির কালো ধ্বংসাবশেষ আর টাল করে রাখা ভাঙা ইঁটের টুকরোর মাঝ দিয়ে এক অপরিসর পথে এলাম। সেই রাস্তার অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পথ করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য

আমরা, একজন আর একজনের পিছনে এগোতে লাগলাম যখন রাস্তা আরও সংকীর্ণ হয়ে এল বা দেয়ালের ভেঙে পড়া টুকরোয় পথ যেখানে অবরুদ্ধ ছিল।

আমাদের এই শোভাযাত্রার আগে ছিল ফেদিন। যদিও জার্মানীতে যে পায়ে সে চোট পেয়েছিল, সেই পায়ে তার ব্যথা হচ্ছিল, তবু সে হাঁটছিল, প্রাণবন্ত, চটপটে ভঙ্গীতে খুবই আস্থার সঙ্গে নিজের পথ খুঁজে খুঁজে, আর সে মাঝে মাঝে পাইপ টেনে ধোঁয়া ছাড়ছিল, আমরা অনুসরণ করবো বলে, যার থেকে ভেসে আসছিল ভালো তামাকের সুগন্ধী। ঈশ্বর জানেন ওই পাথরের জঙ্গলে সে কেমন করে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল কেননা আমরা তো মাঝেমাঝেই মুখোমুখি হচ্ছিলাম অক্ষত কোন দেওয়ালের সঙ্গে যার গায়ে আবার লাগান বাস্তার চৌমাথার নীল-পথ-সঙ্কেত।

আমরা প্রায় একটি কথাও না বলে বেশ খানিকটা পথ চলে গেলাম। অকস্মাৎ ফেদিন একটা বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। বিশালাকার পুরোন ফটক, যা অলৌকিকভাবে তখনো দাঁড়িয়ে ছিল, তা যেন আমাদের ওপর শূন্যে ঝুলে আছে। সেই ফটক দিয়ে কোথাও যাওয়াও যায় না, সেটা কোন কাজে লাগে না। কোন বাড়ি বা উঠোনের কোন চিহ্ন মাত্র ছিল না, কিন্তু সেই মজবুত ফটক, যা জার্মানদের নিজস্ব ভঙ্গীতে চিরকাল খাড়া রাখবার জন্য যেন তৈরী করা হয়েছিল, সেটা যেমনকার ঠিক তেমনই আছে।

যখন সে তার চিন্তামগ্ন বড় বড় ধূসর চোখ নিবদ্ধ করল ওয়েফার-এর মত পাতলা নতুন চাঁদের ওপর, যে চাঁদ রূপালি তুষার ঢাকা ধ্বংসস্তূপের ওপর পথ করে করে আসছে। ফেদিন বলল, "এখানে যে বাড়িটা ছিল, সেই বাড়িটায় আমি একদিন ছিলাম, আর এই ফটকগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি শেষবারের মত এই শহরে গিয়েছিলাম অনেক, অনেক কাল আগে, অর্থাৎ আমি রাশিয়া ফিরে যাবার আগেই।" সে তার পাইপের ছাই উড়িয়ে দিল আর সেই ফটকের গায়ে ঠুকে ঠুকে পাইপটাকে ঝেড়ে নিল।

"আপনি কি করে এখানে থাকবেন?" হতবুদ্ধি 'লিটল টিন সোলজার' বলে উঠল সরল বিস্ময়ে, "তা কি করে সম্ভব?......হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি আপনি আমায় বোকা বানাতে চাইছেন আপনি...তাই না?"

আমি ফেদিন সম্বন্ধে জানি। তার লেখা উপন্যাস যা আমাদের সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও আমার যৌবনে আমার অন্যতম প্রিয়

বই" 'সিটিজ এণ্ড ইয়ারস' আমার মনে পড়ে গেল। আমি কল্পনায় অতি সহজে দেখতে পেলাম যে সেই গ্রন্থের নায়ক ওবেরলিউটনান্ট ভন জুর মুহেলেন শচনাও, এখন এখানে এই পুরোন ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে: তার ঋজু, নির্মেদদেহ, পোশাক লোহার ক্রুশে সজ্জিত, আর এক মাথা সুন্দর চুল নীচের দিকে মাঝ বরাবর যেন কোন ক্ষত চিহ্নের দ্বারা বিভক্ত। তার সমস্ত গর্বিত, উদ্ধত ভাষণ, একান্তই অসন্তুষ্ট সব খোয়াব আর হুংকার আমার মনে পড়ে গেল। ন্যুরেমবার্গ শহর যার কথা লেখা আছে ফেদিনের বই-এ, সেই গ্রন্থে বর্ণনা আছে যে উন্নয়নশীল, উন্নত, সুখী, পরিতৃপ্ত নগরবাসীর কথা, সেই ন্যুরেমবার্গ শহরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বইটির কথা আমি ভাবলাম। আর মনে হল, নাজীবাদের রাক্ষুসে বীভৎসতা, যার রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা আমরা রোজ শুনছি—যে ইতিহাস একজন মানুষ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বিশ্বাস করতে প্রায় অস্বীকার করতো, মনে হল ফেদিনের বই-এ সে রহস্য সমাধানের সূত্র আছে।

শ্রেণীর অফিসারদের আত্মস্বার্থসর্বস্ব, ভেতর গোঁজা, গর্বিত-উদ্ধত, নির্মম সমস্ত কথাই এই সব হিটলার, গোয়েরিং, রিবেন ট্রপ, ফ্রানকদের অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করেছে, লালন করে গঠিত ও পরিচালিত করেছে। ফ্যাসিবাদের প্রতি চাকরের মত অনুগত, দৃঢ় সমর্থক কাইটেল এ্যাডমিরাল রেইডার আর এ্যাডমিরাল ডোয়েনিটজ-এর মত লোকেরা ব্যারন ভন জুর সম্মেলন শচৎনাউ-এর মত গুপ্ত অবস্থা থেকে উঠে এসেছে। ১৯২০ সালে কনস্তানতিন ফেদিন হল প্রথম রুশ দেশীয় লেখক যিনি নাজিবাদের ভিত্তি উৎস ও বাহ্যমূর্তি যা ন্যুরেমবার্গের পানশালায়, চটিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, ক্রমে শক্তিসংহত করে একটা বিরাট সীমাহীন শক্তিতে পরিণত হয়ে, কেবল জার্মানীতে নয়, সারা ইউরোপে রক্তের প্লাবন এনেছিল, ফেদিন, তা কেবল শুধুমাত্র চোখে 'দেখে' আসেন নি, সে সম্পর্কে 'পূর্বঘোষণা' করেছিলেন। আসল সাহিত্য, তার সত্যিকারের গভীরতা ও তাৎপর্য, ন্যুরেমবার্গ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই ফটকগুলোকে দেখে আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম—, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য গ্রন্থে, মার্কসবাদী লেখক, পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে ঘৃণা করার বাস্তব ও সম্ভবতঃ ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে সকল জাতিকে সাবধান করেছিলেন।

এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এল। কাস্তের মত চাঁদ লুকিয়ে পড়ে তুষারোৎপাদী ছায়ার মধ্যে যেন বিলীন হয়ে গেল। যেহেতু আমাদের ঠাণ্ডা লাগছিল, আমরা পিছন ফিরলাম ও নীরবে আগের মত সার বেঁধে চললাম—কনস্তানতিন ফেদিন, লিটল টিন সোলজার আর তার পর আমি নিজে। আমব্রোস বিয়েরস এবং এডগার এ্যালান পোর কল্পনা শক্তিও যে ভয়াবহ চিত্র আবিষ্কার করতে পারতো না, সেই সব মানুষিক নৃশংসতার বস্তুগত সাক্ষ্য প্রমাণের অধ্যায় আমার মনে পড়ছিল। আচ্ছা, ফেদিন কি ভাবছিলেন? বোধ হয় তাঁর এই বাড়িতে কাটান যৌবনের কথা ভাবছিলেন যখন, ভার্সাই শান্তি চুক্তির ভস্মাবশেষের ওপর এককোষী নাজী ব্যাঙের ছাতা দ্রুত গজিয়ে উঠছিল। আমাদের লিটল টিন সোলজার মাঝেমাঝেই একঝলক তাকাচ্ছিল ফেদিনের দিকে, আর নিশ্চিত হতে চাইছিল সত্যিই ফেদিন তাকে বোকা বানাতে চাইছে কিনা। ফেদিনের সৃষ্টিশীল কাজের দূরদৃষ্টির কথাও ভাবছিলাম আমি আর মনে মনে ঠিক করছিলাম, যে মহান দেশপ্রেমের যুদ্ধ ও নুরেমবার্গের বিচার নিয়ে আমার যে নিজস্ব গভীরতর অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে '*সিটিজ এণ্ড ইয়ারস*' বইটি কিভাবে আবার সংগ্রহ করে পড়া যায়।

"তুমি কি জানো," হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ফেদিন বললেন, "যেখানে তোমরা এখন আছো, সেই 'রুশ প্রাসাদ' এক সময় একটা পুরোন ছাতাপড়া স্টেইন পানশালা ছিল? নিশ্চিত জানবে যে ওখানে চমৎকার বীয়র, সসেজ, আর সয়েরক্রাউট পাওয়া যেত। আর ওপর তলায় স্বল্প আয়ের লোকেদের থাকার ঘর ছিল। আমি কি করে জানলাম, না?"

আর জানার জন্য উৎসুক হয়ে আমরা থেমে পড়লাম।

"সত্যি, কি করে জানলেন?"

"প্রতি সপ্তাহের শেষে সেখানে বেহালা বাজিয়ে পেট চালাবার কড়ি উপার্জন করতাম," ফেদিন বলল, "আমি আমাদের গ্রাণ্ড হোটেল, যাকে তোমরা "বিগ উইগ" বল, সেখানে হাঁপিয়ে উঠেছি, চলো, তোমাদের ওখানে যাই। আমরা প্রেস ক্যাম্পের বার-এ বসতে পারি। আমি তোমাদের ছাতাপড়া পানশালার গল্প বলবো।

তাঁর প্রস্তাবে সায় দিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে ঝকঝকে নীলচে তুষারের পাশ্চাত্তপটে আবছা কালো ছায়ার মত প্রতীয়মান 'প্যালেস অফ জাসটিস'-এ

ফিরে গেলাম। আর সেখান থেকে একটা ভ্যানে চেপে চলে এলাম প্রেস ক্যাম্প-এ। চমৎকার কেটেছিল আমাদের সন্ধ্যা, যদিও একটা অদ্ভুত ঘটনা আমার সন্ধ্যাটা বরং নষ্ট করে দিল বলা চলে।

ফেবার ম্যানসনে প্রধান খাবার ঘরে খুব যত্ন করে, বদান্যতা সহকারে যে আমেরিকান খাদ্য আমাদের দেওয়া হতো তা খেয়ে আমাদের জিবে ছাতা পড়ে গিয়েছিল। চোখে দেখতে খুবই মনোরম আর ক্ষুধা উদ্রেককারী এসব খাবার, কিন্তু একেবারেই স্বাদহীন। অবশ্যই, আমাদের অতিথি-সেবকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। সাদা মাটা পাঁউরুটিও আনা, হত বাহারী পাতলা টিনের পাতের মোড়কে। পাঁউরুটিগুলো দেখতে স্পনজের মত, হাল্কা, বাদামী খোসা লাগান—কিন্তু কামড় দেওয়ামাত্র কোথায় কি, মনে হবে যেন খাবার টেবিলে দেওয়া কাগুজে তোয়ালে চিবোচ্ছি। বিখ্যাত আমেরিকান স্টিকও আমাদের পরিবেশন করা হত: খোঁচা খোঁচা কোঁকড়ানো পুরু মাংস পিণ্ডের ওপর সবুজ মটর শুঁটির দানা বসান, এত সবুজ দানা যে দেখে মনে হবে সদ্য বাগান থেকে আনা। কিন্তু যেই না তুমি সেগুলোকেও মুখে পুরলে, তাও একেবারেই স্বাদহীন মনে হবে। সব খাবারই বার করা হত মুখআঁটা টিন থেকে। কেবল মাংসই নয়, এমনকি ডিমও এখানে আনা হত হিমায়িত করে। ভগবান জানেন কতদিন ওগুলো ওই অবস্থায় রাখা থাকত। জ্যাম, টিনে রাখা ফল, শাকসব্জী ছিল, যেগুলো আসলে দৃষ্টিকে ফাঁকিই দিত। তুমি হয়ত খানিকটা ভোদকা ঢাললে আর তাতে এক টুকরো সবুজ জারকিন ফেলে দিয়ে কাঁটা দিয়ে ঘাঁটলে, কিন্তু গোটা জিনিসটা এমনি বিশ্রী রকম মিষ্টি হয়ে গেল যে গিলতে পারলে না।

গোড়ায় গোড়ায় নানা খাদ্যসামগ্রীর বৈচিত্র্যের বাহার আর দামে তা এতই সস্তা যে আমাদের তা পেয়ে বসেছিল। আমরা সত্যি ভূরি ভোজ করতাম, প্রথম পদটা আবার নিতাম ও পরে পরে যা দেওয়া হয়েছিল, তা-ও আবার কিছু কিছু নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতাম। কিন্তু আমাদের উৎসাহ শীঘ্রই ক্ষয় পেয়ে গেল আর আমরা কেবল সাধারণ বাদামী রুটি আর মুখরোচক আলুর জন্যে হা পিত্যেস করতাম। যথেষ্ট মাত্রায় ভিটামিন আমরা পাচ্ছিলাম না। সত্য যে সামরিক বাহিনীর ভাঁড়ারে তুমি যত চাও তা পেতে পারো। আর তা সবই আসতো খুব এলাহি মোড়কে জটিল সব বৈজ্ঞানিক নাম নিয়ে। কিন্তু একটা কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুনের

বিকল্প কি রবেরো পিল বা ট্যাবলেট হতে পারে? আমার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে বিমানে কিছু রসুন আমাদের পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম। পার্সেল যেদিন এসে পৌঁছল, সেদিন আমাদের টেবিলে কি উচ্ছ্বসিত উল্লাস!

"কৌতুক রসিকতার মত, রসুনও খুব দামী জিনিস", একটা বিস্বাদ পাঁউরুটির শক্ত খোলার ওপর সজোরে রসুন ঘষতে ঘষতে বলল নিকোলাই ঝুকভ, "যেকোন গোবর তুমি এ দিয়ে খেতে পারো, এমনকি পরে নিজের আঙ্গুল চাটতেও পার।"

টিনের খাবার যে কেবল রুশ পাকস্থলীতেই খারাপ প্রতিক্রিয়া আনছিল, তা নয়। আমরা যখন দুপুরের আহারে বসতাম আর রসুনের তীব্র গন্ধ যখন হাওয়ায় ভেসে ভেসে সেই বিশাল খাবার ঘরে ছড়িয়ে যেত, কাছাকাছি বসে থাকত যারা, তারা যে দেশেরই হোক না কেন কাছে এসে রুশীয় অনুদান চাইতো। পরদিন, থেকেই অনুমান করতে পার, আমরা আদালত কক্ষে রসুনের গন্ধ পেলাম।

"স্টারস এণ্ড স্ট্রাইপস" পত্রিকার সাংবাদিক প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এই রসুন। ওই পত্রিকার সেদিনের সংখ্যায়—আমার অসাধারণ ঝকঝকে উর্দিতে, আর আমার বুক আর শরীরের অন্যান্য জায়গায় দারুণ দারুণ সব পদক লাগানো—আমার চেহারা দেখা গেল। ছবিতে আমি কাঠগড়ার বিপরীত দিকে বসে গোয়েরিং এণ্ড কোম্পানীর দিকে নিঃশ্বাস ছাড়ছি। সেই ব্যঙ্গ চিত্রের নীচে লেখা, নাজীদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ রুশদের নতুন আবিষ্কার; বোরিস পোলেভয় *প্রাভদার* সংবাদ প্রতিনিধি ন্যুরেমবার্গ বিচারসভায় প্রতিবাদীদের মুখের ওপর রসুনের নিশ্বাস ফেলছেন। চিকিৎসকদের অভিমত এই যে এর ফলে বিচারের রায় প্রকাশিত হবার আগেই ওদের কেউ কেউ ভবলীলা সংবরণ করতে পারে।

'বিগ উইগ'রা মহাখুশী। ওই ব্যঙ্গ চিত্রের এক ডজন অনুলিপি আমি উপহার হিসেবে পেলাম। আমি যখন পানশালায় গেলাম, তখন ডেভিড আমার রীতিমত তারিফ করতে লাগল: আর এখানে পানশালার মালিক এঁকজনকে কিভাবে নিচ্ছে, না নিচ্ছে, তা এক মস্ত ব্যাপার। কি যে করা উচিত, আমার মাথাতেই আসছিল না।

"আচ্ছা, তাহলে আজকাল লোকেরা এমনি করেই জনপ্রিয় হয়।" মজা করে বিস্ময় প্রকাশ করল গুস।

বিশেষভাবে ফেদিনের জন্যে আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগল, কেননা সংবাদ প্রতিনিধিদের মধ্যে সে সুখ্যাত ছিল একজন যথার্থ সুধীজন হিসেবে। ওঁর চোখের সামনে এসব কি ব্যাপার! কিন্তু উনি এমন একটা ভাণ করলেন যেন উনি কিছুই দেখেন নি। যখন আমরা সকলে পরস্পরকে "শুভরাত্রি" জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি তখন উনি হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, "আমাকে দেওয়ার মত এক কোয়া রসুন তোমার কাছে নেই মনে হচ্ছে।" দুর্ভাগ্যবশতঃ, মস্কো থেকে কিছুদিন আগে আমার স্ত্রীর পাঠানো সেই মহার্ঘ্য ছোট থলিতে খোসা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

১১। শয়তানের রসুইখানা

যথার্থ সাহিত্যের শক্তি আর একবার আমার মনে গেঁথে গেল। আমার অনুরোধে আমার স্ত্রী *প্রাভদা* পাঠাগার থেকে খুঁজে ফেদিনের *সিটিজ এণ্ড ইয়ারস*" উপন্যাসটি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। আমি দু রাত্রে বইটি পড়ে নিয়ে আমার সাংবাদিক প্রতিনিধি বন্ধুদের দি।

সাহিত্যের যাদু এমনি যে বাদীপক্ষের জেরা চলার সময় আমি ফেদিনের নায়ক ব্যারন ভন জুর মুহেলেন শচনাউ-এর আভাস পেলাম, যার বয়স এখন আগের পঁচিশ বছর বেশী আর যে হিটলারের অধীনে নিজের আখের বেশ ভালই গুছিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে দেখতে পেলাম, সামরিক ব্যাপারে হিটলারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম কাইটেলের মধ্যে; আর ওই লাল-নেকো ধূর্ত শেয়াল আলফ্রেড জোডল, ছিল ওয়েরম্যাচট হাই কম্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি, তার মধ্যেও তাকে দেখতে পেলাম। তাকে দেখতে পেলাম গ্র্যাণ্ড এ্যাডমিরাল রেইডার এমন কি গোয়েরিং-এর মধ্যেও, বিচার চলাকালীন যে গোয়েরিং-র ওজন এতই কমে গিয়েছিল যে আর কেউ তাদের পাঠানো খবরের বিবরণে গোয়েরিংকে পৃথুল শূয়োর বলে উল্লেখ করতো না। মাত্র শেষের কদিন এই সব অফিসার পাদপ্রদীপের আলোয় ছিল।

আমরা এখন সেই অধ্যায় বা তার ভিতরে যেটাকে সঠিকভাবে নাম দেওয়া যায় শয়তানের রসুইখানা। প্রসিকিউসনে উপস্থাপিত সমস্ত দলিল

পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে এই আন্তর্জাতিক গলা কাটার দল পশ্চিম ইউরোপে তাদের রক্তাক্ত সাফল্যে নেশাচ্ছন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নির্মমভাবে আমাদের মাতৃভূমিকে শুধু টুকরো করে, এই দেশের জনসাধারণের সর্বস্ব লুট করে, একটি দলিলে যেমন লেখা আছে "তাদেরকে তাদের আদিম জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়ে দেবার" পরিকল্পনাই শুধু করেনি, দেশটিকেই ঘষে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও চেয়েছিল।

পরে জানা গেল এ সমস্তই, জুন মাসের সেই পরিষ্কার শনিবারের রাত্রি, যেদিন ফ্যাসিবাদী প্যানজাররা আর বোমারু বোম্বেটেরা অন্যায় আঘাত হানল আমাদের শান্তিপূর্ণ, গভীর নিদ্রামগ্ন, হতচকিত সব নগরীর ওপর—সেই শনিবারের অনেক অনেক আগে এই আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

আমেরিকার বাদীপক্ষের তরফে যে সমস্ত দলিল গত কয়েকদিনে পেশ করা হয় তা অবশ্যই আমাদের রুশ দেশীয় লোকেদের কোন বিস্ময় উদ্রেক করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনের জ্বালা আমাদের দেশের জনসাধারণ সহ্য করেছে, হিটলার তার নৃশংসতাপূর্ণ জঘন্য পতাকার তলায় যে সমস্ত নাজী সৈন্য সমাবেশ করেছিল তাদের সঙ্গে একা আমাদের দেশ লড়েছে, নাজী দৈত্যের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে আমাদের দেশ, আর নাজীবাদের সমস্ত ভয়াবহতা চাক্ষুষ করার অভিজ্ঞতা অবশ্য ঠিক, যে এই প্রথম আমাদের নাজী শয়তানের রসুইখানায় নিয়ে যাওয়া হল ও দেখানো হল *কিভাবে* হিটলার ও তার স্যাঙাৎদের মধ্যে গোপন সলাপরামর্শ সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার্মানীতে পরিণত করার জন্য মতলব ছকে ফেলা হয়, আর সেই পরিকল্পনা *কেমন দৈত্যাকারস্বরূপ* ছিল।

হিটলারের গোপন সলা পরামর্শ সভায় যোগ দিতে পারত কেবলমাত্র তার একান্ত বিশ্বাসভাজন লোকেরা—যুদ্ধঅপরাধী কাইটেল, রোজেনবার্গ, গোয়েরিং, বোরম্যান এবং সেনাপতি ল্যামারস। এই সমস্ত সভায় তাদের একে অপরের কাছে কোন ভান করার, গোপন করার বা যে কোন ছদ্মবেশ ধরার কোন ব্যাপারই ছিল না। তারা যা বলার সহজভাবে অকপটে খুলে বলত, বিশ্বনিন্দুক ও কসাই জল্লাদের দুর্বোধ্য কিচমিচ সমেত। হিটলার ঘোষণা করত যে নীতিগত ভাবে এখন উপস্থিত সাঙাৎদের উচিৎ পুরসহ গোটা পিঠেটাকে কেটে কেটে টুকরো করে আপন দায়িত্বভার বুঝে নেওয়া,

অবশ্যই ক্রম অনুসারে। প্রথমতঃ যেখানে যেখানে তাদের ইচ্ছা কর্তৃত্ব আর প্রভুত্ব করা; দ্বিতীয়তঃ, নির্বিচারে গুলি করা; তৃতীয়তঃ অঞ্চলগুলোকে শোষণ করা।

তার বিশ্বনিন্দুক আন্তরিকতা নিয়ে হিটলার এই সব বলতো এই কথা জেনে যে এইসব উক্তি তার উচ্চপদস্থ সহযোগীদের আমোদিত করবে। তারপর তার মানচিত্রের ওপর আমাদের দেশকে কেটে ছিঁড়ে টুকরো করে ভাগ করে নিত, কেবলমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এই দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতেই নয়, তার জনসংখ্যাকেও শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন, বিলুপ্ত করে দিতে।

হিটলারের চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত বালটিক সাধারণতন্ত্র জার্মান সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হওয়ার কথা। বালটিককে অভিহিত করার ছিল একটি জার্মান সমুদ্র হিসেবে। বাকু ও তার তৈলসম্পদভরা সমস্ত অঞ্চল জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা "কেননা আমাদের দেশের (জার্মান—বি. পি.) অর্থনীতির জন্য এগুলির প্রয়োজন জরুরী"। উক্রাইন-এর উর্বরা সমস্ত ভূমির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। অতঃপর ফুয়েরার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যখন যুদ্ধ শুরু করেছেন তখন তাদের পরিষ্কার জানা দরকার যে তারা কোনদিন সোভিয়েত দেশ ছেড়ে চলে আসবে না।

মনে মনে এ দৃশ্য দেখা খুব সহজেই যায়: টেবিলের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্র বিছানো, ছয় জন নাজী টেবিলটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে লোলুপভাবে লক্ষ্য করছে হিটলারের আঙুল কেমনভাবে সোভিয়েত ভূমিকে কেটে টুকরো টুকরো করছে। তারা আনন্দে মাতোয়ারা হয়, এমন কি সংবর্ধনাও জানায় এবং সেনাপতি ল্যামারস যে ইতিহাসের জন্যে এই সমস্ত গোপন সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে, যে লিখিত মন্তব্য করেছে যে সকলে একমত হয়ে ফুয়েরারের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে ও উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

এইভাবে যে পিঠে তখনো স্যাঁকা হয় নি, সেটিকে কাটা হয় ও যত্ন করে গুছিয়ে এবং যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যগুলি স্থির করা হয়। তারপর এই লক্ষ্যে কিভাবে উপনীত হওয়া সম্ভব, তারা সেই বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ শুরু করে। ওই দেশটিকে নিজ অধিকারে ও কব্জার মধ্যে আনার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি? ওই সমস্ত অঞ্চলের কয়েক কোটি জনসংখ্যার সঙ্গেই বা কেমন

ব্যবহার করা হবে? তারপর সমস্ত বিচার-বিবেচনা করার পর, হিটলার খুবই শীতলভাবে প্রস্তাব করলেন যে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য সুন্দরভাবে সংগঠিত এক দুর্ভিক্ষকে ডেকে আনা হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণকে উৎখাত তথা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে, সেই সমস্ত সাফাই করা অবাঞ্ছিত মুক্ত অঞ্চলে স্থায়ী জার্মান বসতি স্থাপনের জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়নে জনসাধারণের গণহত্যা সংগঠিত করার জন্য নাৎসীদের আবিষ্কৃত যেসব কৌশলগত পদ্ধতি, যেমন ভ্যানে গ্যাস দিয়ে মারা, গণ-কোতল, গ্যাস চেম্বারে হত্যা ইত্যাদির থেকে সারা দেশ জুড়ে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ, উপায় হিসেবে অধিকতর ভাল পন্থা।

কিভাবে রুশ জনসাধারণের ব্যাপক গণহত্যা সংগঠিত হবে, বিচারসভায়, নানা দলিল থেকে তা পড়ে শোনানো হয়। এই সমস্ত নির্দেশনামার উপপত্রে লিখিত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রভাগে জনশূন্য এখনই শুরু করা প্রয়োজন এবং সে উদ্দেশ্যে শিল্পকেন্দ্র সমেত সমগ্র উত্তরাঞ্চলে, মস্কো এবং সেন্ট পিতার্সবার্গে সমস্ত সরবরাহ এখনই সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। শিল্পাঞ্চলের জনসাধারণকে দূষিত করবার জন্যে আর শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকেদের গোষ্ঠী যাদের হিটলার বিশেষভাবে ভয় পেত তাদের বার করে দেওয়ার জন্যে দুর্ভিক্ষকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

এই সমস্ত দলিলের উপপত্রে লেখা আছে অনুর্বর অঞ্চলের সমস্ত শিল্পে, বিশেষভাবে মস্কো, সেন্ট পিতাস'বার্গ এবং ওই দুটির সব জেলা এবং উরাল শিল্পাঞ্চলে সরবরাহ রহিত করতে হবে এবং অন্য কোন শিল্পাঞ্চল বা শিল্পোদ্যোগকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করার কোন কারণ নেই।

উত্তরে এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার পর ও সেখানে ব্যবহারার্থ যেকোন বস্তুর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার পর, হিটলারের মতলব ছিল সেইসব অঞ্চলের কৃষিকাজকেও ধ্বংস করে দেওয়া যাতে নাৎসী শাসনের প্রথম বছরে এইসব অঞ্চল কোন উদ্বৃত্ত রাজস্ব না হয় এবং সেক্ষেত্রে শহরগুলোর জন্য তারা যেকোন কিছুই দিতে অক্ষম হবে।

এইভাবে, কেবল যারা নিজেরা চাষবাস করছে তাদের জন্যই কৃষি লাভজনক হবে। ফলে, বিপণনযোগ্য কোন শস্য বা পণ্যই উৎপন্ন হবে না। বিপণনযোগ্য কোন কৃষি বস্তু উৎপাদন বলে কিছুই থাকবে না। গোশালা

আর শূকর প্রজনন বেবাক তুলে দিতে হবে। নির্দেশনামার এই ব্যাপারের ওপর জোর দেওয়া হয় যে অধিকৃত অঞ্চলসমূহকে জনশূন্য করা ও সুপরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ ত্বরান্বিত করার জন্য ; অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলে তাবৎ মজুত তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করতে হবে, জনসাধারণের হাতে যে মজুত আছে তা ব্যবহার করা থেকে ও গৃহপালিত পশুকে জবাই করে খেয়ে বেঁচে থাকার থেকে জনসাধারণকে নিরস্ত করতে হবে। সুতরাং, গৃহপালিত সব পশু তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করতে হবে, সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে ও তা সোজা জার্মানীতে নিয়ে যেতে হবে। যেহেতু গবাদি পশুর খাদ্য বলে কিছু থাকবে না, গোরু, মোষ আর শূয়োর নিকট ভবিষ্যতে উধাও হয়ে যাবে ......যদি তারা নিজেরা সব বাজেয়াপ্ত না করে ও সামরিক প্রয়োজনে এবং জার্মানীর প্রয়োজনে ব্যবহার না করে, তাহলে স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনে সেগুলি শেষ করে ফেলবে, আর সেক্ষেত্রে জার্মানীর কোন উপকারই হবে না।

নাৎসী সৈন্যদের দেশ আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের আদেশ ছিল তাড়াতাড়ি দুর্ভিক্ষ তৈরী করার, পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যকরীভাবে ও নির্মমভাবে অভিযান চালানোর। সর্বোচ্চ সামরিক কম্যাণ্ড ও আগ্রাসী পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত খুবই উচ্চ পদস্থদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এই সমস্ত গোপন নির্দেশে উপপত্র মারফৎ এ কথা জানানো হয়েছিল যে এই সমস্ত অঞ্চলের সব শহরের জনসাধারণকে ও শহরের বহির্ভাগে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে নিদারুণ ও কঠিন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হবে। তাদের কাছ থেকে লোকজনকে নিয়ে সাইবেরিয়া বা আরও দূরে কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। কেবল স্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে বলার উদ্দেশ্যে জোর দিয়ে বলে যে রুশদের দ্বারা সরবরাহ করা সমস্ত রুশীয় শিল্প সামগ্রীর সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদিম কৃষি কাঠামোয় দেশটিকে ছোট করে আনা তাদের পক্ষে জরুরী। এই অঞ্চলের অসংখ্য লক্ষ লোক মারা যাবে, আর বাকীরা বাধ্য হবে সাইবেরিয়া বা আরও দূরে কোথাও যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে। এর সমস্তটাই নির্ভুল ও সঠিকভাবে বোঝা দরকার।

প্রকাশ করার আশা না করেই বিচার চলাকালীন আমি এইসব টুকে রেখেছিলাম কেননা আমার দিনলিপিগুলির প্রকাশনের জন্য আমার যেকোন

চেষ্টাই এতাবৎ বিফল হয়েছে। ভেলিকিএ লিউকি অভিযানের অংশবিশেষ *ভকভিয়াবয়*-এ প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আমার সমস্ত দিনলিপি বাড়িতে বসে বসে সময়কে অভিবাদন করে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের বাইরে আসার সময় কোনদিন হবে কিনা, কবে হবে, তা আমার আদৌ জানা ছিল না। আমার সমস্ত দিনলিপি, নিদেনপক্ষে, একজন স্ক্রিপ্টম্যান শিশু তলস্তয়ের কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে যে তলস্তয় অদূর ভবিষ্যতে, বা খুব সম্ভবত সুদূর ভবিষ্যতে, যখন এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া শান্ত হয়ে গেছে, তখন সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্পূর্ণ ছবি পুনর্নির্মাণ করবে।

সে যাই হোক, আমি চাই ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা জেনে রাখুন সেই ঘটনাচক্র আর পরিস্থিতি যার মধ্যে হিটলার ও তার গলা-কাটা বাহিনী, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের ছয় ভাগের এক ভাগ, আমাদের দেশকে, এক "প্রকাণ্ড পিঠের" মত ভাগ করে নিতে চেয়েছিল।

আমাদের সীমান্তে তার সৈন্য, বিমান আর প্যানজারবাহিনী যখন এই বার্লিন উন্মাদ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন সে লক্ষ্য অভিষ্ট পেতে চেয়েছিল, আগামী ঐতিহাসিকেরা তা জেনে রাখুন, তাই আমি চাই।

এইসব সাক্ষ্য পড়া হয়ে যাওয়ার পর, লর্ড লরেন্স তাঁর ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপণ করলেন ও তাঁর নিজস্ব শান্ত, নম্র ভঙ্গীতে বললেন, "আমার মনে হয় আজকের এই বিচার অধিবেশন আগামীকাল পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করার সময় হয়েছে।"

আমরা বাইরে যাবার পথের দিকে এগিয়ে গেলাম ও দরজার কাছে নিজেদেরকে দেখতে পেলাম একজন বয়স্কা আমেরিকান মহিলা সাংবাদিকের পাশেই যিনি রুশ ভাষা শিখেছিলেন। তিনি খানিকটা ইতঃস্তত: করে আমাদের রুশ ভাষায় বললেন—

"আপনাদেরকে ধন্যবাদ···*স্পাসিবো*···অনেক অনেক ধন্যবাদ লাল ফৌজকে···সৈনিক, অফিসার, সেনাপতি···*স্পাসিবো*।"

তাঁর ভাঙা ভাঙা রুশভাষা ও আন্তরিক করমর্দন আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করল। গত কদিনে আমরা বিচার সভায় যা কিছু শুনেছি সে বিষয়ে একজন সাধারণ মানুষের এই হল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া······

ভাল কথা, *সিটিজ এণ্ড ইয়ারস* আমাদের খালেডিয়ান দলবলের হাত ফেরতা হয়ে, বিচারকদের হাতে পৌঁছে গেছে। সেই উপন্যাস

মুদ্রেমবার্গে আর দ্বিতীয় যৌবনের মধ্যে জীবিত হচ্ছিল আর নতুন জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল। আমার শঙ্কা হচ্ছিল যে *প্রাঙদার* কড়া গ্রন্থাগারিকের কাছে আমার স্ত্রী বইটিকে দীর্ঘ সময় বাইরে রাখার জন্যে ঝামেলায় পড়বে।

১২। সান্তা ক্লজ-র কাছ থেকে ছুটি উপহার

আগের দিন ফেবার ম্যানসনের মস্ত হল ঘরে দারুণ একটা 'খৃস্টমাস ট্রী' খাড়া করা হয়েছে। ডেভিড জানাল যে আমেরিকার *প্রথম* বাহিনী নাকি সংগঠিত অভিযান করে ব্যাভেরীয় আলপস পর্বতমালার উঁচু কোন জায়গা থেকে গাছটা পেয়ে উঠিয়ে এনেছে। পাহাড়ী পথের ওপর দিয়ে ট্রেলার-এ করে গাছটাকে বয়ে আনা হয়েছে, তারপর দড়িতে বেঁধে টেনে তিন তলার জানালা দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। এখানে হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা, লম্বা, কুঞ্চিত ও অমসৃণ কিন্তু বিশাল আর চমৎকার এই গাছটার তাজা মোচাকার ফার গাছের পাতা থেকে উদ্ভূত সৌরভ সকলকেই তাদের ছেলেবেলা আর দূর দেশে থাকা পরিবার পরিজনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সাংবাদিক ও এই কাজে আসা সকলেই শান্ত মুখে ঘুরে ঘুরে দেখল। কিছুক্ষণ কোথাও কোন উৎকট কর্কশ হাসি শোনা যায় নি, এমনকি ডেভিডের পানশালায় উত্তেজিত তর্ক পর্যন্তও না।

একটা বিরাট সান্তা ক্লজও আমেরিকা থেকে বিমানে আনা হয়েছে আর সেটা গাছটার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর করে ছাঁটা সাদা ফার লাগান একটা মনোহর লাল কোট সান্তা ক্লজ এর গায়ে, মাথায় টাসেল লাগানো ঝকঝকে লাল টুপি, হাতে একটা স্বচ্ছ কাঁচের আধার, যেটা মাঝে মাঝে জ্বলা নেভা করছে। একটা বিশেষ পন্থায় গাছটিকে সাজানো হয়েছিল। কাঁচের সাধারণ গোলা, খেলনা, তুচ্ছ সব ছোট ছোট গয়না, সোনালি রূপালি ধারা আর ঝকমকে পতাকা, এই সব রাখা ছিল গাছের ওপরের দিকের ডালপালায়। আর নীচের দিকে শাখাগুলোতে হুইসকি জিন নানারকম সুরার বোতল, শুকনো ফল আর বাদামের ছোট ছোট থলি, ঝর্ণা-কলম, ক্যামেরা, এমন কি সুতায় ঝোলান একটা হাল্কা টাইপকরার-যন্ত্র পর্যন্ত নীচের দিকের শাখা থেকে ঝুলছে। সবগুলোর গায়েই কৈসো মত

লাগানো। আমেরিকান সান্তা ক্লজ একজন আবেগ বর্জিত কেজো বুড়ো মানুষ। সে এক জাঁকজমকপূর্ণ র‍্যাফল-এর আয়োজন করেছে যাতে, যার কাছেই খরচা করার মত ফালতু দুচার পয়সা আছে, সেই সান্তা ক্লজ-এর অতিকায় মোজার ভেতর একবার ভাগ্য সন্ধান করে নিচ্ছিল।

দেখে শুনে বোধ হল যে এই খৃস্টমাস ট্রী নিয়ে—দুটি জাতি আমেরিকান আর আমাদের রুশীদের উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। একটা ব্যাপার অনেক আগেই লক্ষ্য করেছি যে আমাদের আমেরিকান সংকর্মীরা আর আমরা হল্লা করে মজা করতে আর অবসরে ভাঁড়ামি করতে খুব ভালো পারি। আমার মনে হল, ব্যাপারটার ব্যাখ্যা এই সত্য ঘটনার মধ্যে আছে যে উত্তর আমেরিকা এবং রুশীয় নানা জাতি এখনো নবীন ও সক্রিয়। যদিও আমাদের প্রত্যেকেরই আছে সুখ সম্পর্কে আলাদা আলাদা স্বপ্ন, ভবিষ্যতের ধারণাও আমাদের স্বতন্ত্র, যে সামাজিক রীতি পদ্ধতির মধ্যে আমরা বাস করি তাও ব্যাসবেখার দুই বিপরীত প্রান্ত, কিন্তু আমরা দুতরফই আশাবাদী, আমুদে আর আমাদের নিজেদের মত বন্ধুৎপরায়ণ।

ভালো কথা, আমি তো ইতিমধ্যেই সান্তা ক্লজ এর কাছ থেকে আমার উপহার পেয়ে গেছি। দুটো পেয়েছি। প্রথমত: আমার সম্পাদকীয় দপ্তর, বড় দিনের ছুটিতে যুগোশ্লাভিয়ার কিছু বন্ধুর সঙ্গে ইউরোপে একটা ছোট্ট ভ্রমণ করার অনুমতি দিয়েছে। দ্বিতীয়ত: শেষ পর্যন্ত আমি একজন মোটর চালক খুঁজে পেয়েছি যে বেশ ভালো।

আমেরিকান অফিসার যিনি পরিবহণের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি এই মোটর চালকটিকে সুপারিশ করেন নি। সুপারিশ করেছিল, আমাদের সোভিয়েত মোটর চালকরা, যারা বিচার বিভাগীয় কাজের লোকজনদের গাড়ি দেখ শোনা করছিল। আমাদের 'চীফজাজ-এর মোটর চালক, বয়স্ক, মোটা সোটা, গোলগাল একেবারে রুশীয় মানুষের চেহারা—সে আমায় প্রথম এই চালকটির কথা বলে।

"আমরা শুনেছি, যে আপনি একজন ড্রাইভার খুঁজছেন। আমরা একজনের কথা ভেবেছি। তার নাম কুর্ট। জাতিতে জার্মান। প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর লোক। একজন পাইলট ছিল, এখন দুটো বেশী পয়সা আলাদা করে রোজগার করার জন্য আমাদের গ্যারাজে মিস্ত্রীর কাজ করে।

মোটামুটি লোকটা ঠিকই আছে, এমন কি একটু আধটু রুশ ভাষাও লোকটা জানে।

"লোকটি কি স্থানীয়?"

"হ্যাঁ..... উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের কোথাও বিমান যুদ্ধে আমরা ওকে একদিন কাত করেছি কিংবা বলা চলে ও বিমান থেকে পড়ে গিয়েছিল। ওর সর্বাঙ্গ পোড়া। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। কিন্তু আমি যেমন বললাম, সব ঠিকই আছে। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে ওকে লক্ষ্য করছি আর নির্দ্বিধায় ওর হয়ে বলতে পারি। ওর পরিবার আছে—মা আর একটি বোন। আপনি কি ওকে একবার দেখতে চান? আপনার কাছে তাকে পাঠিয়ে দোব।"

কিছুক্ষণ পরেই সশস্ত্র আমেরিকান রক্ষী যে আমাদের আস্তানার দরজায় পাহারায় ছিল আমার কাছে এসে জানাল যে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

"নিয়ে এসো তাকে"।

দরজা খুলে গেল আর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী একজন লম্বা লোক ভেতরে এল। সে খাড়া দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বেশ সাবলীল ভাবে জার্মান ভাষায় বললো, "কর্নেল, আপনার নির্দেশ মত আমি এসে হাজির হয়েছি।" তারপর একটু অসুবিধার সঙ্গে সে কোনমতে রুশ ভাষায় বলল, "আমি এসেছি।" তার এক ধরনের লম্বাটে মুখ, যাকে আমরা বলি, 'ঘোড়ার মত' মাথার চুলের রঙ খড়ের মত, বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু ক্লান্ত চোখ। তার কপালের পাশ আর গাল উজ্জ্বল লাল চামড়ায় ঢাকা।

আমি তাকে একটা আসনের দিকে আঙুল দিয়ে বসতে নির্দেশ করলাম, কিন্তু ও দাঁড়িয়েই থাকল। দুই ভিন্ন জাতির দুই লোকের মধ্যে অন্যের ভাষা সম্পর্কে যে যৎসামান্য ধারণা থাকে, তাদের দুজনের মধ্যে যেমন সম্ভব সেই ধরনের কথাবার্তা আমাদের মধ্যে হল। ও নিজের বিষয়ে বলল। সে স্টেইনের স্থানীয় বাসিন্দা; যুদ্ধের আগে ও ফেবারের কারখানায় কলের মিস্ত্রীর কাজ করতো। মিউনিখে এক নভোশ্চারণা স্কুলে সে বোমারু বিমান চালানো শেখে। ও ছিল সিনিয়র লেফটানেন্ট। উত্তর সীমান্তে কোন যুদ্ধে সোভিয়েত জঙ্গী বিমান তার বিমানে আগুন লাগিয়ে দেয়, কিন্তু সে তার জ্বলন্ত বিমানকে হাওয়াই আড্ডায় নামিয়ে আনে। সে একজন যুদ্ধ ফেরতা পঙ্গু।

"তুমি কি হিটলারের 'ইয়ুথ লিগ' আর 'ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির সভ্য ছিলে?

"হ্যাঁ, ইয়ুথ লিগ-এর সভ্য ছিলাম—, কিন্তু একজন নাজী—? না ছিলাম না।"

"যাইহোক, কি কি শর্ত তোমার আর মাইনে পত্তর কেমন চাও?"

এই বিষয়ে কথা বলার আগে ও আমায় জানিয়ে দিল যে ও পূর্ব সীমান্তে লড়াই করেছে আর আকাশ যুদ্ধে সাহসিকতার জন্যে তাকে 'আয়রণ ক্রস' দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

"তুমি তোমার সামরিক কর্তব্য করেছিলে।"

"আমি দুটো রুশ বিমানকে গুঁড়ো করে দিয়েছি।"

"কিন্তু আমাদের বৈমানিকরাও, আকাশে তোমার বিমানে আগুন লাগিয়েছে···কত বেতন চাও তুমি?"

"যত দিতে পারেন। আমার রুগ্ন মা আছে, একটি বোন আর দুটি ভাইপো আছে। আবার মা তাঁর ভাই-এর দুই ছেলেকে দেখাশোনা করেন, যার বিপত্নীক ভাই, বার্লিনে মারা যান······যত টাকা দিতে পারেন, বেখাপ্পা রকম বেশী নয়, মানে মানান সই সীমার মধ্যে নিশ্চয়ই, যা দেন আর কি···।

ওর এই সাধাসিধে ভাবটা আমার ভাল লাগল। আমি তাকে আমার টেবিলের পাশে বসিয়ে আমার সুটকেশ থেকে একটা বড় প্যাকেট বিস্কুট আর সযত্নে তুলে রাখা ভোদকার বোতল বার করলাম। সে খুব তৃপ্তি করে ভোদকা পান করল কিন্তু বিস্কুট ছুঁলো না পর্যন্ত। এমনকি সরিয়ে পাশে করে দিল। আমি আমার দোভাষীকে ডেকে সেই উপচীকির্ষু ক্যাপ্টেনকে জানাতে বললাম যে আমি এই লোকটিকে আমার গাড়ি চালক হিসেবে নিয়োগ করতে চাই এবং সুতরাং, তাকে যেন বিধিমত অনুমতি দেওয়া হয়। সেই ক্যাপ্টেন যে এমনিতে বেশ দয়ালু ও দক্ষ, এই কাজটা করার জন্যে তার আদৌ কোন ত্বরা আছে বলে বোধ হল না। সে জানাল যে এখনো যেহেতু এস. এস পলায়নপর এবং যেহেতু তাদের অনেককেই এখনো ধরা যায় নি, আমার পক্ষে একজন জার্মান মোটর চালক নেওয়া ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, আর বেশী কথা কি, লোকটা একটা অফিসার ছিল। না, সে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আমায় ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে বলল, কেননা সে চায় না যে আমি ঝুঁকি নি।

"ক্যাপ্টেনকে বলে দাও যে বিশেষ কারণ ছাড়া ও আমার কাজে বাধা দিতে পারে না। ট্রাইবুনালের প্রবিধান অনুযায়ী সাংবাদিক প্রতিনিধিদের পদমর্যাদা আইন বিষয়ক কর্মচারীর সমান, আর তাদের কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করা যায় না। তাকে বলে দাও যে আমার নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে, নিজে নিজের দেখা শোনা করা আমার অভ্যাস আছে।"

এ কথা শুনে সে জানাল একজন জার্মানকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পত্র দেওয়ার অধিকার তারও নেই, আর সে কারণে সেই লোকটির গাড়ি চালানো শহরের এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সে বাধ্য হবে।

আমি এরপর আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না।

"ওই ক্যাপ্টেনকে বলে দাও যে ও জাহান্নমে যেতে পারে। না, ও কথা বলো না। তাকে বলে দাও যে আমি কাজের জন্যে গাড়ি চাই, বনভোজনে যাবার কোন মতলব আমার নেই।"

তারপর এক খুব টোকো "ঠিক আছে" শোনা গেল লাইনে। সামান্য সময় পরে আমি বুঝতে পারলাম যে একটু উল্টোপাল্টা করে ফেলেছি। যাইহোক, বড় দিনের ছুটি আর পশ্চিম ইউরোপে একটু বেড়াতে যাওয়া, এতো আছেই। আমার মনে হল যে তাদের গাড়িতে আমায় নিয়ে নেবার জন্যে আমায় আমার যুগোশ্লাভীয় বন্ধুদের বলতে হবে। যাই হোক না কেন, সান্তা ক্লজের কাছ থেকে পাওয়া এই সব উপহার নিয়ে আমার সত্যিই ঘ্যান ঘ্যান করা উচিৎ নয়।

১৩। খুনের খোলা ক্ষুর

আমার যুগোশ্লাভ বন্ধুরা সোৎসাহে আমাদের ছুটিতে আমুদে ভ্রমণের প্রস্তুতি করতে লাগল। যুদ্ধের আগে আমি কালিনিন-এ আমার বাড়িতে থাকতাম, খুব কম বেড়িয়েছি। আমি এমনকি মস্কো গেছি কালেভদ্রে আর কখনো ইউরোপে দ্রষ্টব্য স্থান দেখার জন্যেও কোন ভ্রমণে যাই নি। কিন্তু আমার যুগোশ্লাভ সহকর্মীরা ভ্রমণে অভ্যস্থ ছিল, আর বেশ দক্ষতা নিয়ে ভ্রমণের ব্যবস্থাদি করতে লাগল,—দরকারী কাগজপত্র সব জোগাড় করা, ব্যাংকে টাকা পয়সার ও প্রয়োজনীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যাপার ইত্যাদি এমনকি আমার হয়েও দেখাশোনা করে দিল। ইতিমধ্যে আমি এই বছরের শেষ

প্রতিবেদন লিখে তার-যোগে পাঠিয়েছি, যেটার নাম, "খুনের খোলা ক্ষুর।" হিটলার তার *এস.এস.* বাহিনীর সংস্থাগুলোকে উল্লেখ করতো তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত "অস্ত্র" বলে। ও জন্মেছিল খুনে হবে বলে, জীবন যাপন করেছিল সেভাবেই। আর একটা ক্ষুরই নিশ্চয়ই 'খুনে'র সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্র।

বিগত কয়েকদিন প্রসিকিউটররা বিভিন্ন দলিল পেশ করে *স্টারমস্টাফেল*, কালো পোশাক পরা হিটলারের দেহরক্ষী বাহিনী, যা যুদ্ধের সময় *এস. এস.* বাহিনী বলে কুখ্যাত হয়, তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সাক্ষীদের বর্ণনা করতে বলছিলেন। ইউরোপের অধিবাসীরা, যাদের পিঠে হিটলার এই ক্ষুর দিয়ে আঘাত করতো. আর সেই একই ক্ষুর দিয়ে, সেই জীবন্ত বলি, তাদের চামড়া ফালা ফালা করে দিত, তারা হিটলারের এই প্রিয় সন্তান ও তার রাজত্বের প্রধান সমর্থকদের কথা দেহের ভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন করে কোন চিকিৎসার মত কাঁপতে কাঁপতে দীর্ঘদিন মনে রাখবে।

স্টারমস্টাফেল-কে অপরাধী চক্রের সংস্থা হিসেবে গ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনাল যৌথভাবে তার বিচার করে। অভিযোগকারী আইনজ্ঞদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার সময় আর প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রমাণ দেখার সময়, একজন *এস, এস*-এর সঙ্গে আমার প্রথম মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা আমি মনে করছিলাম। ১৯৪১ সালে শীতকালে কালিনিনের জঙ্গলে ঘটে সে ঘটনা, তখন আমাদের দিক থেকে পাল্টা আক্রমণের সদ্য শুরু।

সেদিন, আলেকজাণ্ডার ফাদায়েভ, যে সবেমাত্র *প্রাভদার* সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে এসে পৌঁছেছে, সে ও আমি দেখলাম যে সেনাপতি পোলেনভ প্রথম *এস.সস.* বন্দীকে ধরেছে। সেই বন্দী এর বেশী আর কি হতে পারে, কালিনিন সীমান্তে সদ্য পাঠানো এডলফ হিটলার ডিভিসনের একজন। যদিও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা ৪০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, আমরা বোঝা হাল্কা করে বরফে জমে যাওয়া ভোলগার ওপর দিয়ে স্তারিতসার দিকে ছুটে গেলাম। সেখানে সেনাপতি পোলেনভের বাহিনী বড় সারি থেকে ছোট দলে ছড়িয়ে পাশ থেকে শত্রুপক্ষকে বেষ্টন করেছিল।

স্কাউটরা যারা এই বিশেষ বা দ্রব্যকে বন্দী করেছিল তারা একটা ভালো করে গরম রাখা, লম্বা কেবিনে ছিল। বন্দী এক কোণে উবু হয়ে বসেছিল। বড়সড়, চওড়া কাঁধ, লাল-চুল কালো পোশাক। কোটের কলারের ভাঁজ করা অংশে চকমকে তকমা লাগানো, এমন পোশাক আমরা আগে

কোনদিন দেখিনি। তার টুপিতে রুপালি রেখার মানুষের মাথার খুলি আঁকা। তার জামার হাতায় সেলাই করে লাগান "এ্যাডলফ হিটলার" লেখা একটা রিবন, যেটা স্পষ্টতঃই সে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পেরে ওঠে নি। সেই উষ্ণ কেবিনে তার মুখ দপ দপ করছিল কোন মাজা তামার পাতের মত, আর তার শক্ত তারের মত ভ্রূর ওপর ঘামের ফোঁটা ঝরছিল। তার ছোট, ঝকঝকে, ফোলা ফোলা চোখ কাঁদে পরা খটাসের মত বিদ্বেষে পূর্ণ। আমি অবশ্য ইতিমধ্যে তার নাম ভুলে গেছি, কিন্তু তার মুখখানা আজও মনে আছে।

বন্দী তার আগেই খবরাখবর দিয়েছিল। যে লেফটেনান্ট তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তাঁর বিবেচনায় বন্দী তার বাহিনী সম্পর্কে, অস্ত্রশস্ত্র ও বিন্যাস সম্পর্কে যা কিছু জানতো, স্বেচ্ছায় বলে দিয়েছিল। আমাদের অভিযানার্থ পরিদর্শন পরিক্রমা ও প্রাথমিক নিরীক্ষার যেসব তথ্য ও শত্রুপক্ষের মতলব আমাদের যা জানা ছিল, তার সঙ্গে সে যা বলেছিল তা প্রায় একই। কিন্তু যে ব্যাপারটা সর্বাধিক কৌতূহলের সৃষ্টি করল তাই ওই এস এস বা তার দেওয়া খবরাখবর নয়। তাহল তাকে তল্লাসী করার সময় পাওয়া একটা জিনিস, যা এখন টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে। কেবিনের সবাই নিদারুণ বিরক্তি নিয়ে জিনিসটার দিকে চেয়েছিল।

আমাদের অনুসন্ধানী তথা প্রাথমিক নিরীক্ষা দলের ক্যাপ্টেন যে অনুসন্ধান পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, সে, ফাদায়েভকে বলল, "কমরেড ব্রিগেডিয়ার কমিশনার ওর গায়ের ওপর কি ছিল দেখুন।" এই বলে সে ভেতরে লুকিয়ে রাখা কোন কিছুর জন্যে বন্দীর গায়ের কাদামাখা জামার পেন্সিলের খোঁচা দিল। তারপর জামাটা সে বিছিয়ে দিল। কোথাও জামাটা ঝোলাবে এমন উপায় ছিল না, কেন না কেবিনের জানলার কাঁচের সার্সিগুলো ভেঙেগিয়েছে অনেক আগেই, আর তার ফলে ফাঁক গুলো এখন খড় দিয়ে বোজা।

বন্দী এস. এস. তার উত্তমাঙ্গের ভেতরের জামার তলায় যা পরেছিল সেটাই এখন আমাদের সামনে পড়ে আছে। সেটা একটা অদ্ভুত টারপলিনের তৈরী পোশাক, তাতে একটা চওড়া কোমর বন্ধনী, আর সেই কোমরবন্ধনীতে কাঁধে যেমন লাগান থাকে সেই রকম সরু সরু ফালি লাগান। কোমর-বন্ধনী থেকে ঝোলান ছোট ছোট চেটাল থলি, থলিগুলোতে, এ্যাডলফ হিটলার

ডিভিসন যেখানে যেখানে লড়াই করেছে সেখানকার সোনার মুদ্রা তার নোটে ঠাসা। ছোট করে নেবার জন্যে অলঙ্কারগুলোকে সোনার ছোট ছোট তাল আর পাত করে নেওয়া। আর তা ছাড়া সোনা, প্ল্যাটিনামের ছোট ছোট সোয়ারি, গ্রেট বৃটেনের মুদ্রা, যা এই লুটেরা তার হাতের বন্দিদের মুখ থেকে নিশ্চয়ই টেনে টেনে বার করেছিল, তাও থলিতে গিজ গিজ করছে। ফরাসী ও বেলজিয়ান ফ্রানক, অস্ট্রিয়ান শিলিংস, ডেনিস ক্রোন, যুগোস্লাভীয় দিনার রয়েছে। রয়েছে বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার পাঁচ ও দশ অঙ্কের রুবল, কেবল ঈশ্বর জানেন এ বস্তু ও কোথায় আর কেমনভাবে পেল। আরও আছে। পবিশেষে পাওয়া গেল পিটার দি গ্রেট-এর সময়কার একটা বড় আকারের সোনার মুদ্রা, যেটা ওর ভাষায় ও রেজহেভ-এ এক যাদুঘরে "ওর হাতে আসে।" এই সমস্ত মুদ্রা দেখেই হিসেব করে একেবারে ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া যায় যে তার বাহিনী কোথায় কোথায় লড়েছে। তার কাছে প্রায় একশো কুড়িটা ব্রিজেস আর গ্রেট বৃটেনের মুদ্রা ছিল, যার থেকে অবশ্যই এই বন্দীর হাতে নিহতের সংখ্যা কত বোঝা যায় না।

যখন সব কিছু খালি করে টেবিলের ওপর রাখা হল, সেই এস এস যে এতক্ষণ মোটামুটি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ব্যবহার করছিল, তার হালচাল গেল বদলে। সে ভয়ে আর লোভে ফুঁপিয়ে গোঙানি তুলে প্যান প্যান করে কাঁদতে লাগল।

"তুমি দেখছি মুদ্রা আর পদক সংক্রান্ত বিদ্যায় পণ্ডিত, তাই না?"

ফাদায়েভের কথা মত মেয়ে দোভাষী তাকে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু দেখে মনে হল সেই এস এস এ কথার মানে কি, তা পর্যন্ত জানে না।

"তা না হলে এসব জোগাড় করেছো কেন?"

এই স্বাভাবিক সাদাসিধে প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে লোকটা তার ভ্রূগুলো ওপরে তুলল।

"কেন আর, নিশ্চয়ই যুদ্ধের শেষে সুসময়ের জন্যে। আর সেই স্বপ্নই তো সব সৈনিক দেখে।"

আমার মনে আছে বিদেশী ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেই রুশ সাধারণ মেয়েটি, যে যুদ্ধের সময় বেশ কিছু বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে করে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, সে হঠাৎ ঘৃণায় বিস্ময়ে জোরে বলে উঠেছিল, "এ লজ্জাজনক! নীচ শয়তানী!"

ফাদায়েভ, সব বিষয়েই যার মন ছিল একটু বিশেষ রকম সন্ধানী, তিনি আর কোন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না, কিন্তু গভীর মনোযোগে তাঁর ছোট নোট বই-এ কিছু সংক্ষিপ্ত করে লিখে রাখলেন। এই নোট বইটি তিনি কদাচিৎ বার করতেন। আমার মনে আছে যে আমরা কিভাবে সেই এস এসটির দিকে চেয়ে থাকলাম—একজন মানুষ-দানব হিসেবে তাকে আমরা দেখছিলাম না, দেখছিলাম নতুন এক জানোয়ারের প্রজাতিভুক্ত এক জন্তুর নমুনা হিসেবে, প্রাণীতত্ত্ববিদরা যাকে এখনো চিহ্নিত করতে পারেন নি এবং যে এখনো মানুষের সাজে সেজে বসে আছে।

এখন, কেবল এরকমের একটি এস এস নয়, কিন্তু এই জন্তু সদৃশ প্রাণীর জন্মদাতা পুরো সংস্থাটাই বিচারাধীন। গোপন সমস্ত তাক ঘাঁটি বার করে সব ভেঙে ফেলা হয়েছে। পালের গোদাদের লেখা গোপন সব দলিল থেকে প্রসিকিউটররা স্বাভাবিক গলায় সেই সব লেখার সারাংশ পড়ে শুনিয়েছেন, যা সব শুনে প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সেই এস. এস যা একদিন ফাদায়েভ ও আমাকে খুবই আশ্চর্য করেছিল, সে হিটলারের রাইখ, অর্থাৎ হিটলারের শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিষদের আওতায় বেড়ে ওঠা শত শত হাজার হাজার-এর মধ্যে একজন মাত্র। অত্যন্ত যত্ন করে ছকা এক আভ্যন্তরীণ পদ্ধতি ছিল এই কাজে নির্বাচনের আর শেখানোর, সেই শিক্ষায় একজন মানুষের স্বাভাবিক সমস্ত দিক আর প্রবৃত্তিকে একেবারে তুলে সাফ করে দেওয়া হত তার মন থেকে, আর প্রতিনিয়ত তিরস্কার করে আবৃত্তির মত করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত রক্ত তৃষা, লোভ, অশুভ বিদ্বেষ আর অন্যের সমূহ ক্ষতি করার ইচ্ছা আর ধূর্ততা। এই সবের মধ্যে থেকে তৈরী হয়ে বার হয়ে আসত একজন এস. এস, যার কোন সম্মান বোধ, বিবেক, নিজস্ব চিন্তা, আদর্শ, অথবা যে কোন গুণ যা একজন মানুষকে একটা লুণ্ঠনজীবী জন্তুর থেকে আলাদা করে, তার কিছুই নেই।

খুবই গালভরা উচ্চনিনাদে হিটলার এদের ডাকত "আঘাতকারী শক্তি" বলে। হিটলারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সহায়ক ভৃত্য চূড়ামণি হিমলার, যে এই কালো পোশাকধারী অশুভ দুর্ভাগাদের হর্তাকর্তা ছিল, সে এদের একটাই ভিত্তিগত নীতি শিখিয়েছিল। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অন্ধ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। ফাদায়েভ ও আমি যে সেই খুনের কোমর বন্ধনীতে নানা মুদ্রা

আর সোনার ব্রিটিশ মুদ্রাবিশেষ তথা মুকুট দেখে ঘেন্নায় রি রি করে উঠেছিলাম, এটাই জাতীয়তাবাদী-সামাজিক রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে জাতিগত ভিত্তিতে অনুশীলনের সাহায্যে শেখানো ও তৈরী করা হয়েছিল। এস এস-এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর যারা পালের গোদা তাদের কাছে পাঠানো নানা আদেশ আর হুকুম যা বিচারসভায় পড়ে শোনানো হল তাতে লেখা যে এস এস ওপর নির্দেশ ছিল বন্দী শিবির থেকে সোনাদানা ও দামী ধাতুর তৈরী যে কোন কিছু সংগ্রহ করতে হবে। শুধু তাই নয়, শবদেহের মুখ থেকে কিভাবে তা সব বার করতে হবে, গুণতে হবে এবং "রাইখের এই সব মূল্যবান সম্পত্তি", কিভাবে রাইখ-ব্যাঙ্কে, যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিল ফানক, তার হাতে তুলে দিতে হবে, এই সম্পর্কেও বিস্তৃত নির্দেশ ছিল। ফানক এখন বিচারাধীন।

এস এসরা কেবলমাত্র কসাই ছিল না: বন্দী শিবিরে অগণিত সংখ্যক লোককে কিভাবে এককোপে গণহত্যা করা যায়, তারা ছিল আবিষ্কর্তা। একজন এস এস এর মধ্যে যেকোন মানবিক পেশা করে দেওয়া হয়েছিল উল্টোমুখো। বন্দী শিবিরে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এদের অন্যতম কাজ ছিল। গোপন সব ল্যাবোরেটরীতে ডাক্তাররা, যাদের পেশাগত মৌলিক শিক্ষাই হল রুগীদের জীবন বাঁচানো, তাদের তাবৎ মানবিক দুঃখ কষ্ট দূর করা, তারা, ডাক্তাররা, আবিষ্কার করেছিল গণ বিষ প্রয়োগের পদ্ধতি আর সেইসব মানুষের নৃশংস পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহার, যার অবধারিত ফলস্বরূপ, সেইসব বন্দী শিবিরের মানুষেরা স্বভাবতঃই মারা যেত। কালো পোশাকে সজ্জিত পূর্তকর্ম ও আর কারিগরী বিষয়ক ইঞ্জিনিয়াররা গ্যাস চেম্বার, ফারনেস, মানুষের হাড় গুঁড়ো করবার আর সেই গুঁড়ো করা হাড় আর দেহভস্মের ছাইকে জমির সারে পরিণত করার যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরী করত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন এস এস যে পেশায় আগে ছিল একজন শরীর স্বাস্থ্য বিষয় শেখানোর শিক্ষক, সে একটা চাবুক ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল যা দিয়ে পেটালে আপনি মরে যেতো মানুষেরা, আর তার এই যন্ত্র গোপনে পেটেন্ট, অর্থাৎ বিক্রির জন্যে একচেটিয়া অধিকারের ব্যবস্থাপত্র করে নিয়েছিল সেই লোক। এই যন্ত্র বন্দীকে আপনা থেকে চেপে ধরত কোন কাঠের মোটা তক্তা বা গুঁড়ির ওপর আটকানো আঙটার ওপর, আর তারপর

সেই যন্ত্র আপনা থেকে বন্দীর ওপর যতগুলো দরকার সেইমত নির্দেশ যন্ত্রে পুরে দিলে, ততগুলো আঘাত মারত। নিজের আবিষ্কার সম্পর্কে কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে সুপারিশসহ ব্যাখ্যান করে সেই আবিষ্কারক লিখেছে যে যন্ত্রের মধ্যে বন্দী তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না, কণামাত্র প্রতিরোধ করার শক্তিও তার থাকবে না, অথচ এই যন্ত্রটা যে প্রয়োগ করবে, তা চালাবার জন্য কেবলমাত্র একটা হাতলকে নাড়াচাড়া করানো ছাড়া সেই ঘাতকের কোন শারীরিক পরিশ্রম হবে না।

এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় এক যন্ত্র দেখানো হল আদালতে—গ্যাস ভ্যান—যার আবিষ্কারক যন্ত্রটি নিয়ে প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দক্ষিণ রাশিয়ার এক অঞ্চলে। পরীক্ষা নিরীক্ষায় "চমৎকার ও আস্থা-সূচক" ফল পাওয়ার পর ব্যাপক হারে সেই যন্ত্র তৈরী করার ব্যবস্থা করা হল। তাগানরগ অঞ্চলে এই মোটরগাড়ি কৃত দৌড় হত্যার কথা আদালত প্রথম জানতে পারল অধিকৃত নথিপত্র থেকে। কিভাবে এটা সবচেয়ে কম আয়াসে সর্বাধিক লাভজনকভাবে ফলপ্রসূ করা যায়, আবিষ্কারক তার জন্যে নানা প্রয়োগ করে দেখেছিল অক্লান্তভাবে। সে বিভিন্ন লোকেদের ওপর এই যন্ত্র প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেছিল। তারপর আলাদা করে প্রয়োগ করেছিল স্ত্রীলোক আর বাচ্চাদের ওপর। ভালো আবহাওয়া, ঝোড়ো আর শান্ত পরিমণ্ডল, সব পরিস্থিতিতেই স্বতন্ত্রভাবে এটি প্রযুক্ত হয়েছিল আবিষ্কারকের দ্বারা। তার বৃত্তান্তে দেখা যায় যে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায় যন্ত্রটাকে স্ত্রীলোক আর শিশুদের ওপর প্রয়োগ করে। সে তার বৃত্তান্তে এমন অভিযোগও করে, "দুর্ভাগ্যবশতঃ চালকেরা এই পরীক্ষা নিরীক্ষার মহান তথা ব্যাপক তাৎপর্যই বুঝতে পারে না।"

মনে হয়, সেই চালকেরা তাড়াতাড়ি হাতল টেনে মোটর গাড়ির ভেতর জমে থাকা গ্যাস নিকাশী নল দিয়ে বার করে দিত, যার ফলে সঙ্গে সঙ্গে শিবিরে আটকানো বন্দীদের নাড়ীর স্পন্দন থেমে গিয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হত আর তার ফলে সেই জনবসতিপূর্ণ এলাকার কানে সেই আর্তনাদ গিয়ে লোকজন টেনে আনতে, সেটাকে বলতে হয় "অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া। অথবা, অনেক সময় উল্টোটা হত, মানে হাতল টানত বড় দেরীতে যার ফলে পরিক্রমা পুরো শেষ হওয়ার পরও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তী বন্দীরা স্বস্থানে তখনো না মরে জীবিত থাকতো।

এইসব ব্যাপার আবিষ্কৃত যন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতে পারে যদিও যন্ত্রটা "স্বাভাবিক রীতি অনুসারে ব্যবহার করলে, নিখুঁত কাজ দেয়।"

আদালত কক্ষে পঠিত এইসব নথিপত্র দলিলের অংশ যখন এক মনে শুনছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল এস এস ইঞ্জিনিয়ারদের স্থাপন করা কারিগরি ব্যবস্থা সমন্বিত, যান্ত্রিক এই জবাই কসাই কারখানার তুলনায়, আমাদের স্কাউটরা চারবছর আগে যাকে গ্রেপ্তার করেছিল, 'এ্যাডলফ হিটলার ডিভিসনের সেই লালচুলো খুনী নিতান্তই গেঁয়ো কুটির শিল্পী।

আমি জানি না আন্তর্জাতিক সামাজিক আদালত কোন সাজা এদের জন্য নির্দিষ্ট করবে অথবা আমার এও অজানা যে কোন সিদ্ধান্তে এই মাননীয় আইনজ্ঞেরা আসবেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় শয়তানী কালো পোশাক পরা প্রত্যেকটি লোকের সমূহ সাজা প্রাপ্য। খুনের হাত থেকে ক্ষুরটাকে কেড়ে নেওয়াই নিশ্চয়ই কেবলমাত্র যথেষ্ট নয় : এই ক্ষুরটাকে একবারে ধ্বংস করে ফেলতে হবে যাতে আর একজন খুনে আবার এটার নাগাল পেয়ে কাজ শুরু করতে না পারে...

অধিবেশনের শেষে ক্রেসিনিস্কি আর আমি গাড়ি রাখার জায়গায় আমাদের গাড়ি দেখতে পেলাম। কুর্ট একটা বই পড়ছিল। দেখা গেল সেটা জার্মান থেকে রুশ ভাষায় অভিধান। যদিও বড়দিন আর মাত্র কদিন বাকী, তবু কেমন স্যাঁৎসেঁতে আর হাওয়ায় বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। পায়ের নীচে নরম বরফ ঝুর ঝুর করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আর বাতাসে উচ্চকিত হয়ে রয়েছে বসন্ত সমীরণের সুরভি।

গাড়িটার ভেতরটা তকতকে করে পরিষ্কার করা, কোথাও কণামাত্র ধুলো নেই আর গাড়ির জানালাগুলো ঝকঝকে না হওয়া পর্যন্ত মোছা হয়েছে। সারাদিনের সব কিছুর জন্যে মনের ওপর যে ভার জমেছে তা ঝেড়ে ফেলে তার থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে আমরা যেকোন একটা পানশালায় নিয়ে যেতে বললাম, যেখানে সন্ধ্যায় সাধারণ লোকেরা জড়ো হয়। উইলি ব্রিডএল এর নানা বইয়ে যে সমস্ত স্থানীয় শ্রমিকদের কথা আমরা বহু পড়েছি তাদের কজনকে দেখার বাসনাই আমাদের ছিল।

কুর্ট সামান্য সময়ের জন্যে চুপ করে বসে থাকল তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে স্মৃতি হাতড়ে, স্পষ্টতঃই বোঝার চেষ্টা করল, তার কাছ থেকে ঠিক কি

ধরনের কাজ চাওয়া হচ্ছে। তারপর সে বলে উঠল জাওহোল, আর তৎক্ষণাৎ রুশ ভাষায় অনুবাদ করে জানাল "ঠিক আছে।" প্রায় মিনিট দশ বাদে আমরা স্তেইনের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলাম, সেখানে পেনসিল কারখানার পিছনে একটা পরিষ্কার বীয়র পানের দোকানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে হুবহু একই রকম চৌকো চৌকো ঘর কাটা অতি সাধারণ পোশাকে একজন স্ত্রীলোক ও একটি বালিকা, দুজনেরই হাতা মাড় দেওয়া কড়কড়ে এ্যাপ্রোন গায়ে খদ্দেরদের পরিবেশন করছিল। মাত্র কটা টেবিলই ভর্তি ছিল। রুশরা, চাকুরীরতদের কথা না হয় বাদ দিলাম, বোধ হয় কেউ কোনদিন এখানে পা রাখে নি। আর সেটা বোঝা গেল মোটা সুতোর কাপড়ের জ্যাকেটের ওপর ওভারকোট গায়ে বয়স্ক লোকেদের আশপাশের টেবিল থেকে আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা দেখে। আমরা বীয়র আর সসেজ, আনতে বললাম। সেই সময়কার জার্মানীর বাজার অনুসারে দুটোর দামই অবিশ্বাস্য রকম চড়া আর গুণগতভাবে একেবারে ছ্যা ছ্যা রকম নিম্নতম মানের: বীয়ার একেবারে চায়ের মত পানসে আর সসেজগুলো পেনসিলের মত সরু কাঠি কাঠি। তবু ফেবার অট্টালিকার জাঁকজমকভরা মস্ত হলঘরের চেয়ে এখানেই আমাদের বেশী আরামদায়ক বোধ হল। বয়স্ক জার্মানরা ধীরে ধীরে তাদের পাইপে চুমুক দিয়ে চলল আর দুজন বড়সড় পরিচারিকা, দেখেই বোঝা যায় তারা দুজন মা আর মেয়ে দুজনেরই হাড় উঁচু, নিঃশব্দে নম্র সৌজন্যে বীয়রের মগ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ফিরে আসার সময় লক্ষ্য করলাম যে কুর্ট তার বীয়র খেয়েছে, কিন্তু সসেজ ছোঁয়নি। সে সসেজটা একটুকরো রুটির ওপর রেখে, কাগজের মুখ মোছা তোয়ালতে মুড়ে লজ্জিত সঙ্কুচিত মুখে পকেটে লুকিয়ে ফেলল।

দ্বিতীয় পর্ব

দণ্ড বিধান

ডাচাউ-এর রক্ত চোষারা

বড়দিনের ছুটিতে পশ্চিম ইউরোপের এখানে ওখানে যে ঘুরে এলাম, তা এখন আবছা স্বপ্ন। যদিও সেই 'খৃস্টমাস ট্রী' তা তার সাজসজ্জার অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে ছুটির মধ্যে, তাহলেও তা এখনও তিন তলার প্রধান বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রত্যেকে আবার ডুবে গেছি প্রাত্যহিক নির্ঘন্ট অনুসারী আদালতের কাজে।

যে বই-এ নাজীদের বিরাটাকার দৈত্যসুলভ অপরাধসমূহের কথা লেখা আছে, সে বই-এর প্রতিটি পাতা পুনর্বার উল্টে দেখা হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপ, আমরা যা দেখে এলাম, সব কিছুকেই নিচ্ছে হাল্কাভাবে। সেই সব ভয়ংকর দিন এখন নেই, মন্দ সময় কেটে কেটে। যদিও লোকেরা এখনও ক্ষুধার্ত, সম্পূর্ণ জোগান নেই। যুদ্ধের তাণ্ডবে ভেঙে পড়া নগরের ধ্বংসস্তূপ এখনও যেন নড়বড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারধারে বিজ্ঞানের ছাওয়া পরিখা দিয়ে। অধিকাংশ লোক যেন ইতিমধ্যেই ভুলে যাচ্ছে যে মাত্র আট মাস আগে জার্মান সৈন্যরা এই সমস্ত দেশের অধিকৃত ও পদানত রাজধানীগুলোতে কুচকাওয়াজ করে বেড়াত, গেসটাপোদের বাহিনীগুলো কর্মতৎপরতায় ছিল কাঁপা ফোলা, আর এই সমস্ত দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল দেশমুক্তির জন্য। সেই যোদ্ধারা আশায় বুক বেঁধে উদ্দীপ্ত হয়ে অনুসরণ করছিল লাল ফৌজের একক ভাবে, অন্যের সাহায্য ছাড়াই শত্রুর প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে নখে দাঁতে লড়াই।

কিন্তু এখানে ইউরোপের কেন্দ্রে যে বিচার চলছে তাতে সব জাতির প্রতিনিধি আছেন, আর সে বিচারে নাজীদের কৃত অপরাধ সম্বলিত যে বই তার পাতায় পাতায় বিবরণ পড়া চলছেই। এ অপরাধ এমন জাতের যে মানুষ আগে কোনদিন শোনেনি, আর তা এত অসংখ্য যেন এর শেষ নেই,

অনন্ত। আমি তো আগেই জানিয়েছি যে এস এস-এ সবচেয়ে মানবিক যে পেশা, তা-ই হয়েছিল সবচেয়ে অমানবিক। চিকিৎসার ব্যাপারে এটা সত্য। হেলিএন শহরের কাছে একটা গুহার পাথরের মধ্যে প্রাচীর ঘেরা হিমলারের যে ভাণ্ডার, আমেরিকান সামরিক কর্তৃপক্ষ তা খুঁজে বার করে। এই লুকোন মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ছিল চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র আর দলিল, যা হিটলারের জার্মানীতে রাখা হয়েছিল চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে। সেগুলি অনূদিত হয়ে এখন আদালত কক্ষে পঠিত হচ্ছে আর আমাদের বেবেলের টাওয়ার অর্থাৎ প্রেস ক্যাম্প এইসব বিকট দৈত্যসদৃশ ডাক্তারী খতিয়ান নিয়ে নানান ভাষায় কেবলই বক বক করছিল।

এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং এইরকম আরও কিছু যা আগে পড়ে শোনানো হয়েছে তা সেরগেই ক্রসিনস্কি ও আমার কাছে তেমন আশ্চর্যজনক কিছু মনে হয় নি। এখানে সাধারণ্যে ফাঁস হয়ে যাওয়ার আগেই যেসব ধর্ষকামমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তারা করেছে সে বিষয়ে আমরা জানতে পেরেছিলাম ও আমাদের খবরের কাগজে ইতিপূর্বেই আমরা সেসব বিষয়ে কিছু কিছু লিখেছিলাম। সোভিয়েত মারশাল কোনেভ র বাহিনী যখন পশ্চিম পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ও প্রথমে কারকাও ও তারপর নাজীদের সব মৃত্যু শিবিরের মধ্যে সবচেয়ে বড় মৃত্যু শিবির অসওয়েইসিম যখন মুক্ত করে তখনই জানা শুরু হয়েছিল। যেদিন কোনেভ-এর বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছিল সেইদিন সকালেই বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে আমরা একটা সংযোগ রক্ষাকারী বিমান চেয়ে নি, আর তার পিছনের আসনে বসে মহা উৎসাহে মানচিত্রের যে পথ ধরে যুদ্ধে আমাদের বাহিনী এগিয়ে গেছে তা অনুসরণ করি। বাহিনীর সদর দপ্তরে অসওয়েইসিম সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সব খবর ইতিমধ্যেই পৌঁছেছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেসব স্বচক্ষে দেখার জন্যে আমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম আর আমাদের মনে হচ্ছিল বিমানটা বড় ঢিমে তালে যাচ্ছে।

অবশেষে আমরা সেই প্রকাণ্ড লোহার ফটকের সামনে পৌঁছলাম যার ওপরে সেই দুঃখজনক কুখ্যাত বাণী লটকানো: "আরবেইট ম্যাচ্‌ট ফ্রেই"— "কাজ মানুষকে স্বাধীন ও মুক্ত করে।" তখন সবেমাত্র শিবিরটা অধিকার করা হয়েছে, তখনও সব কিছুই রয়েছে বিশৃঙ্খলার মধ্যে। সাঁজোয়া বাহিনীর যে দলটি এই অঞ্চল অধিকার করে তার সেনাপতি অবশ্য ইতিমধ্যেই

মুক্ত বন্দীদের অন্য এক শিবিরে সরিয়ে ফেলার জন্যে দায়িত্বভার দিয়ে কয়েকজনের এক সমিতি সংগঠিত করে ফেলেছেন।

বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে উড়ে এসেছিলেন লেফটেনেন্ট কর্নেল বোরিস নিকোলায়েভ, মানুষটি লম্বা, ফ্যাকাসে ধরনের। প্রচণ্ড আঘাতের জন্য তাঁর একটা চোখ তখনো ঢাকা। ক্যাম্পের সংগঠিত সমিতির সহকারীদের সাহায্যে তিনি গোটা পরিস্থিতির সঙ্গে ইতিমধ্যে সামান্য কিছুটা বেশী পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি কোনক্রমে খাদ্যের জোগানোর ব্যবস্থা করতে আর সেনাবাহিনীর ডাক্তার যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের কিছু কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে কাজ তিনি ইতিমধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। অন্তর্ঘাত নিবৃত্ত করার জন্যে সুরক্ষা আর বন্দী-শিবিরে নাৎসী কর্তাব্যক্তিদের ধরার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল। বন্দী-শিবিরের বড়, ছোট নানা কর্তা, এক একটা বিভাগীয় অধিনায়ক বা সমাহর্তা ধরনের, তা ছাড়া ওয়ার্ডেন, গ্যাস চেম্বার আর শবদাহে নিযুক্ত নিয়ন্ত্রকদের তাদের গোপন আস্তানা থেকে টেনে বার করা হচ্ছিল। নিকোলায়েভের তখন এত কাজ যে তার বিন্দুমাত্র ফুরসৎ তো নেই, সে যেন বহুধা হয়ে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল। আর এর ওপর কয়েকজন সাংবাদিক প্রতিনিধি বার বারই চড়াও হয়ে তাকে ছেঁকে ধরছিল।

সেই কালিনিন সীমান্তের লড়াইয়ের সময় থেকে আমি আর নিকোলাই পুরোন বন্ধু। কিন্তু এখন ও কেবল ফ্যাসফেসে ভাঙা গলায় বলতে পারল, "আমার এক মুহূর্তও সময় নেই বন্ধুগণ, তোমাদের নিজে নিজেই সব দেখে নিতে হবে। চারদিক ঘুরে, স্বচক্ষে দেখে এ বিষয়টাকে নিয়ে লেখ। কমরেড এক্টনিন এখানে আছে ওকে তোমাদের 'ভার্জিল' করে নাও। কমরেড এক্টনিন, আপনি কি এদেরকে এই 'ইনফারনো' দয়া করে ঘুরিয়ে দেখাবেন।"

এক্টনিন নামের সেই মানুষটি আমাদিগকে এই বিশাল বন্দী-শিবিরে, ইনফারনোর সব কটা চত্বর ঘুরিয়ে দেখালেন। তিনি জাতিতে চেক—ক্ল্যাডনো অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের একজন প্রাক্তন নেতা এবং তিনি একজন পুরোন কমিউনিস্ট। যুদ্ধের আগে তিনি মস্কো গিয়েছিলেন, রুশভাষা ভালই বোঝেন এবং সামান্য বলতেও পারেন। ফ্যাসিবাদ বিরোধী কমিটিতে তিনি এখন একজন কমিশনার। তার মুখাবয়ব পাণ্ডুর, মুখের

গড়ন খুবই কৌণিক, কানগুলো বড় বড়। মানুষটি এত রোগা আর হাড়ের কাঠামো এত সুস্পষ্ট যে তার বন্দীনিবাসের ডোরাকাটা উর্দি চাল্য হয়ে শরীরের ওপর ঝুল ঝুল করছে। গর্তে ঢুকে যাওয়া তার গভীর চোখ উৎসাহে দীপ্ত। তিনি নিশ্চিতই বুঝেছিলেন যে আমরা সাংবাদিক প্রতিনিধিরা কিসের সন্ধানে তৎপর—তিনি নিজেও একদা *রুডেপ্রাভো*-র জন্য কিছু নিবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি আমাদের এক মস্ত গুদাম ঘর দেখালেন যেটা পুড়িয়ে মেরে ফেলা মানুষদের পায়ের জুতোয় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঠাসা একদম-শ্রমিকের একজোড়া ভারী জুতো, মেয়েদের সুরুচিপূর্ণ শোভন জুতো, আর একটা বাচ্চার ছোট্ট বুট জুতো সব একসঙ্গে বিশাল স্তূপ হয়ে রয়েছে। তিনি আমাদের ঐরকমই আর একটা মস্ত গুদামঘরে নিয়ে গেলেন যেখানে মানুষের মাথার চুল পাহাড় প্রমাণ ডাই করে রাখা। চুলগুলি দৈর্ঘ্য ও রঙ অনুসারে বাছাই করে, মান অনুসারে আলাদা করে, গাঁঠরী বাঁধা, একেবারে বিভিন্ন কারখানায় চালানোর জন্য তৈরী।

তারপর আমরা একটা লম্বা ভাঙ্গা পাথরের স্তূপের সামনে দাঁড়ালাম।

"এই জায়গাটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল", এন্টনিন ব্যাখ্যা করে বলল, "এটাই ছিল সেং গবেষণাগার যার মধ্যে ডাক্তার আর ওষুধ প্রস্তুতকারকরা মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত। সমস্ত ব্যাপারটা ছিল সুরক্ষিতভাবে গোপন, যাদের নিয়ে পরীক্ষা হত তাদেরকে আলাদা করে এইখানে রাখা হত, আর এখান থেকে তারা কোনদিন ফিরতে পারত না। রাত্রে তাদের সোজা নিয়ে যাওয়া হত শবদাহের জায়গায়। তারা সেইখানেই থাকত।" উনি আর একটা বিশাল ধ্বংস স্তূপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। "চিকিৎসকরা যারা এইসব গবেষণা করতেন, তাদের গাড়িতে বসিয়ে গাড়ির কাঁচে পর্দা দিয়ে, গাড়ি চালিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসা হত......যখন তোমাদের কামানের গোলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল তখন এই দুটো বাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত বন্দীদের তারা হত্যা করে, এমনকি নিহতদের পুড়িয়ে ফেলারও সময় পায়। আমরা বেতারে বারংবার ঘোষণা করে এখানে যদি কেউ থাকে তাকে আমাদের সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ করতে বলেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত একজনও এগিয়ে আসে নি। এখানের সব ব্যাপারটাই ছিল গভীর ও একান্তভাবে দারুণ গোপন কিন্তু চারপাশে লোকমুখে আপনারা যা কিছু

শুনতে পাচ্ছেন তাতেই বোঝা যায় কি বিভীষিকাপর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না এখানে করা হত......"

অবশেষে এখন সেই সবকিছু গোপনতা ফাঁস হয়ে গেছে। বিচার সভায় ক্লশিনস্কি ও আমি পাশাপাশি বসে রুদ্ধ শ্বাসে অখণ্ড মনোযোগে সেই সব বিবরণ শুনছি যা লেফটান্যান্ট কর্নেল নিকোলায়েভ কিম্বা প্রখর অনুমান শক্তিসম্পন্ন এন্টোনিন, এদের দুজনের কেউই অসউইৎসেমকে মুক্ত হওয়ার পরে আর খুঁজে পাননি। হেলিএন-এর গুহায় পাওয়া হিমলারের মহাফেজ খানা, সেই সব বীভৎস ভয়ঙ্কর গোপনীয়তার প্রচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলেছে। গেস্টাপো প্রধান, এবং এস. এস. অধিনায়কদের কাগজপত্রে এই সব বর্বর বৈজ্ঞানিক, যারা লোক চক্ষুর আড়ালে একান্ত গোপনে বন্দী-শিবিরে মানুষের ওপর যে গবেষণা চালিয়েছে তাদের সেই সব কথা ঐসব কাগজপত্রে পাওয়া গিয়েছে।

হিটলারের সময় কোচ, ভিরচাও আর লেফলার দেশগুলোয় উদ্ভূত এবং ব্যাপকভাবে উন্নীত চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন জঘন্য নক্কারজনক শাখার কথাও আমরা প্রথম জানতে পারলাম। এমনকি এই জঘন্য শাখার জন্ম মুহূর্তও আমরা অবগত হলাম। ১৯৪১ সালের শরৎকালে রোমে জার্মান রাষ্ট্রদূত বিশিষ্ট অতিথিদের একদিন কফি পানে আপ্যায়ন করেন। তাতে উপস্থিত ছিলেন ইটালীর স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাউন্ট লিওনার্ড কোনটি, একজন বর্ষীয়ান জার্মান অধ্যাপক ডক্টর ক্লেয়াস শিলিং। এরা দুজনেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ম্যালেরিয়া কমিশনের সভ্য। তারা প্রথমে অনেক কিছু নিয়ে কথাবার্তা বলার পর আফ্রিকায় মুসোলিনীর বাহিনীর যে সমস্ত অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে এবং ইটালীর আগ্রাসী বাহিনীর জঙ্গী পল্টনরা যে মহামারীর মত জ্বরে অক্রান্ত হচ্ছে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করতে আরম্ভ করেন। সেই সময় নাজী সর্বোচ্চ ক্ষমতাপরিষদ ইতিমধ্যেই জার্মান অধিনায়ক রোমেলের সেনাবাহিনী দ্বারা অভিযানের মতলব ছকে ফেলেছে এবং এই আফ্রিকার এই জ্বর তাদের সমূহ উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে।

তারপর যেন হঠাৎ কথায় কথায় কাউন্ট কনটি শিলিং-এর কাছে এই অনুযোগ করলেন যে বিজ্ঞান জীবনের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না আর জ্বরের মোকাবিলা করার গবেষণা খুবই ঢিমে তালে চালানো হচ্ছে। বিজ্ঞানী

তো এই শুনে যুদ্ধের সময় যে সমস্ত অসুবিধে আছে সে সবের কথা বলতে লাগলেন, যেমন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে খরগোশ, কুকুর, গিনিপিগ ইত্যাদি যে সব প্রাণী বা জানোয়ার লাগে তারই অভাব, ইত্যাদি। তখন বিজ্ঞানীর দিকে কাউন্ট কনটি যেন আলগোছে ছুঁড়ে দিলেন এই প্রস্তাব : এ ব্যাপারে মানুষ কাজে লাগালে কেমন হয়? বন্দী-শিবিরে তো কতই চমৎকার সব গবেষণার মালপত্র রয়েছে। সেই পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, যিনি ম্যালেরিয়া রোগ মোকাবিলায় তাঁর কাজ ও অবদানের জন্যে রকফেলার ফাউনডেশন থেকে একদা পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন, সেই তিনি, এতে রাজী হলেন। মানুষ? চমৎকার! দারুণ প্রস্তাব! এরকম, এই দিকটা যে আগে কেন তার মাথায় আসেনি, এটাই আশ্চর্য। এই পদ্ধতি হল এক ঢিলে দু পাখি মারা। পরীক্ষা নিরীক্ষায় গবেষণার কাজে জানোয়ার বাবদ খরচাও কমে গেল আবার বন্দী আর যুদ্ধ বন্দীদের পোষার খরচও কমে গেল।

দু পক্ষই তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি সমর্থন করল আর সেই নিয়ে কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। অত্যন্ত গোপনে, উইডেকুনেন-এ এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এস. এস চিকিৎসা বিভাগের প্রধান ডাঃ গ্রাউইটজ, শিলিংকে তার ইচ্ছামত জার্মানীর যে কোন বন্দী-শিবির বেছে নিতে বলল অধ্যাপক বেছে নিল ডাচাও, যেটা অনেকগুলোর মধ্যে একটা পুরোন বন্দী-শিবির। তাছাড়া মিউনিখ নগরীর কাছে ডাচাও। মিউনিখে বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, আর চমৎকার সব গবেষণাগার আছে। ডাঃ শিলিং নিজে, অর্থাৎ স্বয়ং, বন্দীদের মধ্য থেকে যাদের গবেষণার কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত মনে হল, তেমন শত শত লোককে বাছাই করে তাদের মধ্যে যতরকম জর জানা আছে, সে সবের বীজাণু সংক্রামিত করা আরম্ভ করল। এইভাবে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক শয়তানী শাখার উদ্ভব হল পরে নাজীরা সেই শাখার প্রভূত বিস্তার করে।

এক সময় ছিল, যখন জার্মান চিকিৎসা ও ভেষজ শাখা তাদের কোন কোন চিকিৎসককে নিয়ে গর্ববোধ করত, যাঁরা তাঁদের নতুন আবিষ্কৃত ঔষধের প্রতিক্রিয়া ও ফল পরীক্ষা করার জন্যে আগে নিজের শরীরে রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে, তারপর নিজ দেহে, নিজের ওপর ঔষধ প্রয়োগ করতেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজও তাঁরা মহিমান্বিত। নাজীবাদ এই মহৎ কর্মকাণ্ডকে একেবারে উল্টো করে দিল। বিভিন্ন বিদেশী আকা-

বেবীর সম্মানিত সভ্য ঠাণ্ডা মাথায়, অল্পবয়সী, স্বাস্থ্যবান মানুষদের শরীরে ভয়ংকর সব অসুখের জীবাণু ঢুকিয়ে দেয় তাদের শিরা উপশিরার মধ্যে ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেয় 'ফেনল', আর তারপর খুব শীতলভাবে লক্ষ্য করে সেইসব মানুষের উদ্বেগ আর কষ্ট, আর সেই সব যন্ত্রণার বিভিন্ন স্তর ও ধাপের প্রতিটি মিনিট আর আর সেকেণ্ড মাপ জোক করে।

যে সমস্ত শত শত লোকের ওপর এই সব গবেষণা চালানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন মাত্র প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। একজন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক। নিবাস পোল্যাণ্ড। নাম মিথালোস্কি। দৈবক্রমে সে দাহ সংকার স্থান থেকে পালিয়েছিল। ডাঃ শ্চিলিংয়ের গবেষণার শত শত, হাজার হাজার বলির হয়ে, এই শয়তান ও খুনে অধ্যাপক শেষের দিকে যে সময় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল, মিথালোস্কি তার সাক্ষ্য দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ডাঃ শ্চিলিংয়ের পর আর এক আরও ভয়ংকর দানবের আবির্ভাব ঘটেছে মঞ্চে। তার নাম সিগমানড রাসচার। এই জঘন্য গবেষণা-সমূহের ক্ষেত্রে সে ডাঃ শ্চিলিংয়ের সুখ্যাত ছাত্র ও শিষ্য, যে শ্চিলিং-এর গবেষণা ও তার ছোট্ট গবেষণাগারকে পরে "ঔষধ-বিরোধী" এক কারখানায় উন্নীত ও পরিণত করে। হ্যাঁ, এই যে বর্ণময়, বহুবর্ণ চরিত্রটি, এটিকে নাজী নৈতিকতার উজ্জ্বলতর প্রতিনিধি স্থানীয় বলা যায়।

ডাঃ সিগমনড ছিল মিউনিখে বিমান ও নভোশ্চারণ বিভাগীয় ওষুধপত্রের অধ্যাপক, একজন এস. এস অফিসার আর হিমলারের একজন বন্ধু। সুতরাং হিমলারের বন্ধু হিসেবে তার জন্য জবরদস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সব সময় সুনিশ্চিত ছিল। তার বৌ, এক নৈশ ক্লাবের গায়িকা, সেও সর্বশক্তিমান গেসটাপো অধিনায়কের প্রিয় বান্ধবী ছিল, তার সঙ্গে থাকত, তার বাচ্চা পেটে ধরেছিল। এই সমস্ত সম্পর্ক আর যোগাযোগ রাসচারকে, যে সব সুযোগ দিয়েছিল, আসলে তার কোন শেষই ছিল না।

গোড়ায় তার কাজটা ছিল, আন্তর-আকাশে, মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ৬০ কিলোমিটারের মধ্যবর্তী আকাশে শূন্য স্থানে, যেখানে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সেখানে একটা জীবন্ত প্রাণীকে বসানোর সমস্যা সমাধান করা, যাতে সে ভবিষ্যতে ওই অঞ্চলের আবহাওয়া, বিমান হানার আগে

তাগে দেখতে পায়, জানতে পারে। "রাইখ, আমাদের বৈমানিকদের জীবন বাঁচানোর জন্যে এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায়" গিনিপিগ হবার জন্যে সে তার "আত্মীয় বন্ধুকে" আরও, আরও মানুষ যোগান দিতে বলল। অসংখ্য, অগণিত মানুষের যোগান দেওয়া হতে লাগল। তথাকথিত একান্ত ও চূড়ান্ত-ভাবে গোপনীয় ব্লকং নং ৫, ডাচাউ-এ, এক বিশেষ বাড়ি তৈরী হল। সে বাড়িতে সংলগ্ন করা হল ইস্পাত নির্মিত প্যারাস্যুট ব্যবস্থা সমন্বিত কেবিন আর পর্যবেক্ষণ জানালা। মানুষ আনা হত কখনো একা কখনো দল ধরে। গবেষণা শুরু হত চাপ কমানো দিয়ে: আস্তে আস্তে নিকাশী যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস বার করে দেওয়া হত, আর মানুষটা বোধ করত যে ফুলে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই গবেষণার বলি মানুষটির বা মানুষগুলির রক্ত কণিকার কোষগুলি ফেটে বিদীর্ণ না হয়ে যাচ্ছে বা সে বা তারা অজ্ঞান হয়ে যতক্ষণ না মারা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতো গবেষণা। ডাঃ রাসচার, আর তার দুই সহকারী, রাফফ আর বোমবার্গ পর্যবেক্ষণ জানালা দিয়ে দেখতো মৃত্যুর পথে তাদের গবেষণার জিনিসগুলোর কিভাবে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, কষ্টই বা কি। তারপর মৃতদেহের শরীরের তাপ থাকতে থাকতেই, তারা সেগুলোকে পেড়ে ফেলত টেবিলের ওপর সেগুলোকে কাটা ছেঁড়া করে শুরু করত তাদের মৃত্যুর কারণাদি নির্ণয়ার্থ শবদেহ-পরীক্ষা।

রোজ হত এই সব পরীক্ষা। প্রত্যহ। উল্লেখ্য যে রাসচারের অর্ধাঙ্গিনীও প্রায়ই এই সব গবেষণায় উপস্থিত থাকত, আর তার স্বামীর কাজ কেমন এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা যাতে তার প্রেমিক, দেখতে পায় তার জন্যে রাসচারের বৌ ক্যামেরায় এ সবের ছবি নিত। এই ভাবে যে কত লোক মারা যায় তার সঠিক সংখ্যা প্রসিকিউশন, অর্থাৎ আদালতে অভিযোগকারী পক্ষের দপ্তর জানতে পারেনি। কিন্তু আমরা জানি যে এই সংখ্যা বিপুল। এই সব গবেষণাকে ভিত্তি করে উদ্ভূত হল এক বই। সে বই-এর উদ্ভসিক নাম "শূন্যে, অনেক উঁচুতে, মানুষের জীবন বাঁচানোর পরীক্ষা নিরীক্ষা"। হিমলার আবার বিবেচনা করেছিল যে এই বইও একান্ত গোপনীয় হওয়া জরুরী। ফিল্ড মারশাল মিলচ, রাসচারের কাজে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে ও লেখককে তার "সফল গবেষণার" জন্য উচ্ছ্বসিত ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানায়।

অল্প কদিন পরেই মিলচ, রাসচারকে আর একটি "সমস্যা" ধরিয়ে দিল।

নিয়মিত ও ক্রমবর্ধমানভাবে রুশ ও ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানের গোলায় জার্মান বিমান চালকেরা উত্তর সাগরের বরফজলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। কখনো কখনো যদিও বা তাদের জীবিত তুলতে পারা যেত, তারা মরে যেত নৌকোয়। যে লোক বরফজলে বেশ কিছুক্ষণ সময় থেকেছে, তার শরীর গরম করে তাকে কিভাবে আবার স্বাভাবিক জীবন্ত করে তোলা যায়, সেই সম্পর্কে কোন উপায় চাইল মিলচ। মুখের কথা খসানো হতে না হতেই কাজ শুরু হয়ে গেল। এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণার কাজ বেশ বড়, বিশাল আকার ধারণ করে। রাসচার, সাহায্যকারী, সহকারী চেয়ে পাঠাল। যথাক্রমে কেইল ও ইনসব্রুক-র অধ্যাপক লোকার ও জ্যারিসচ ও মিউনিখের লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্যাথালজিস্ট ডাঃ সিনগার, ডাচাউ-এ একান্ত ও চূড়ান্তভাবে গোপন, ব্লক নং ৫-'এ' এসে যোগ দিল।

আর একটা আলাদা, বিকট ভয়ংকর দানবীয় গবেষণা শুরু হয়ে গেল। বন্দীরা, হয় উদোম ন্যাংটা, না হয় সামান্য বেশবাস, আবার কখনো বৈমানিকের পোশাক পরিল, সেই বন্দীদের শীতকালে ব্লকের মধ্যে বিশেষ ভাবে তৈরী জল রাখা বিশেষ চৌবাচ্চা বা স্নানের জায়গায় নামানো হত। তারপর সেই জলে ছুঁড়ে দেওয়া হত বরফ। আর জলটা আস্তে আস্তে হিমায়িত বরফ হয়ে যেতো। বিশেষভাবে আলাদা নক্সা করে বৈজ্ঞানিকরা তৈরী করেছিল এক ধরনের থার্মোমিটার যন্ত্র। আর সেই থার্মোমিটার তারা বসিয়ে দিত—গবেষণার গিনিপিগ—বন্দী মানুষদের শরীরে। হাতে স্টপ-ওয়াচ, নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বৈজ্ঞানিকেরা। আর দেখতো তাপাংক কমার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ, প্রবল কাঁপুনি। "বৈজ্ঞানিক"রা লক্ষ্য করতো কি ভাবে আতঙ্কে বোবা হয়ে তারা নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করে ও পরে, একেবারে শেষে, মারা যায়। এই রকম বিপুল পরিমাণ অজস্র পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষে তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যে শূন্য ডিগ্রী থেকে ২৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম, অর্থাৎ—৩২° সে. তে মনুষ্য শরীর শীতল হতে মোটামুটি সত্তর থেকে নব্বই মিনিট লাগে, আর প্রায় আরও এক ঘন্টা পরে—২৪° সে. থেকে—২৫° সে. তাপাংকের মধ্যে মৃত্যু হয়। একটা বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করায় যেমন প্রথা, সেইভাবে অজস্র সংখ্যক দৃষ্টান্ত নথীভুক্ত করা হয়, আর যেমন হয়ে থাকে, সেই সমস্ত বিবরণ থেকে আসা হয় সিদ্ধান্তে। সচরাচর ঘটে না, এরকম একটা দৃষ্টান্ত

যেটা আসলে ব্যতিক্রম, তাও নথীভুক্ত করা আছে : ওই সব পরীক্ষার অধীন এক বন্দী মানুষ—২৬'৫° সে. তাপাংকতেও মারা যায় না। অর্থাৎ গবেষণার থেকে মৃত্যুসীমা বলে যে তাপমাত্রা ঘোষণা করেছিল "বৈজ্ঞানিকেরা" সেই বন্দী মানুষ সেই সীমা পার হয়ে গিয়েছিল। মরে নি। নিজ জায়গায় প্রত্যাবর্তনশীল এই মানুষটিকে আরও অতিরিক্ত আশি মিনিট ধরে হিমায়িত অবস্থায় রাখতে হয়। এই বন্দীটির নিদারুণ মর্মযন্ত্রণা "অধ্যাপক"রা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে। তাদের গিনিপিগ, সেই বন্দী মানুষটির অপরিমেয় প্রাণশক্তি দেখে তার বিস্মিত ও আনন্দিত হয়। কিন্তু তাকেও "বিজ্ঞানের নামে", তারা শেষ করে দেয়।

এক কোপে সাফ বলতে যা বোঝায়, অনেক সময় তা ঘটত না। এই সমস্ত পরীক্ষাধীন বহু বন্দীই এ হেন একবারের গবেষণায় মরতো না। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া লোকেদের কি ভাবে গরম করে তোলা যায়, তা বার করার জন্যে গবেষণা চলত পাশাপাশি। এই সমস্ত গবেষণার ক্ষেত্রে, গিনিপিগ, অর্থাৎ বন্দী মানুষের দেহ যাতে আর জীবনের কোন আপাত লক্ষণ দেখা যেতো না, সেগুলিকে নানা ভাবে পুনঃ সঞ্জীবিত করা হত। নির্জলা এ্যালকহল মুখে ঢেলে দিয়ে, উত্তেজক ওষুধ বা মাদক দিয়ে, বিছানায় শুইয়ে গরম করে, সূর্যের উম'এ রেখে, এমনকি নারী শরীর দিয়েও এদের গরম করা হত। এক জার্মান লোকগাথার কাহিনীতে আছে যে একবার এক ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া সৈনিককে এক কুমারী তার দেহ দিয়ে তপ্ত করে তোলে, এই লোকগাথার কাহিনী থেকেই এ কাজে নারী দেহ ব্যবহারের ধারণা রাসচারের মাথায় আসে। রাসচার মনে করে এই পদ্ধতিও অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখার উপযুক্ত ও এই কাজের জন্য রাভেনসব্রুক এ মেয়েদের বন্দী শিবির থেকে চারটি যুবতী বেদুইন মেয়েকে এই কাজের জন্য তালিকা ভুক্ত করে।

বন্দী মানুষদের ঠাণ্ডা, শীতল করে জমে যাওয়ার স্তরে নিয়ে যাওয়া হত এবং আবার গরম করা হত। কমতে কমতে 'কোমা' স্তরে, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে অন্ধকারময় আচ্ছন্নতা সেখান থেকে জীবনে ফিরিয়ে আনা হতো। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও শেষ স্তর, শেষ পর্যন্ত ছিল : মৃত্যু। ওসওয়েইসিয়েম থেকে আসা চেকোস্লাভাকিয়ার

এ্যানটোনিন ঠিক কথা বলেছে—এই সমস্ত পরীক্ষার পর একজনকে জীবন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে অর্ধাঙ্গিনীর তোলা ক্যামেরার ছবি সমেত রাসচারের প্রতিবেদন, আর একবার ফিল্ড মারশাল মিলচকে অতীব সন্তুষ্ট করে। সে বৈজ্ঞানিক ও ডাচাউ-এর সেনাধিনায়ককে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিতে লেখে "রাইখ-র মহিমা তুলে ধরার কাজে এই মহান ও মানবিক অবদান ও কর্মযজ্ঞের জন্য।"

কিন্তু পূর্ব সীমান্তের পরিস্থিতি হিটলারের পক্ষে কেবলই জটিলতর হয়ে যাচ্ছিল। শীতকালীন অভিযান যা মস্কোর কাছে মুখ থুবড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, স্তালিনগ্রাদ-এ পরাজয়, আর রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর গোলায় অসংখ্য জার্মান নিহতের সংখ্যা যখন রুশ তুষারের আচ্ছাদনে জার্মান সৈন্যের মৃত্যু হারের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল, তখন এই সব দানব সব ছেড়ে দিয়ে "বরফে জমা তুষারমৃত হওয়া মনুষ্য শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে যে সক্রিয়তা, তা কি ভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়", এই বিষয়ে, এই দানবেরা মনঃসংযোগ কেন্দ্রীভূত করলো। আরও বর্বর ও নৃশংস অন্য ধরনের এক তৃতীয় গবেষণা শুরু হয়ে গেল। বন্দীদের সমস্ত কাপড় খুলে নিয়ে উলঙ্গ করে বরফের ওপর শুতে বাধ্য করা হতো। তারপর তারা যখন সম্পূর্ণ অসাড় আর অনড় হয়ে যেত, তখন তাদের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে নানা ভাবে গরম করা হত। ব্যাভারিয়ার মৃদু আবহাওয়ার মধ্যে এই ধরনের গবেষণার যথার্থ সুযোগ ছিল সামান্যই। একজন মানুষ জমে অজ্ঞান হয়ে যেতে অনেক সময় লাগত। আর বড় কথা হল, পশ্চিম সীমান্ত এই ধরনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছিল না। আর তাই ডাঃ রাসচারের গবেষণাগারকে সরিয়ে, "পূর্ব সীমান্তে বস্তুতঃ যা আবহাওয়ার পরিস্থিতি" তার কাছাকাছি ওসওয়েই-সিয়েম-এ গোপন ব্লকে তুলে আনা হল।

ক্রসিনস্কি আর আমি এক ঝলক দৃষ্টি বিনিময় করলুম। তাহলে, এই হল সেই যে সেখানে সেই ভয়ঙ্কর বর্বর আর নৃশংস কাজকর্ম চালিয়েছে; আর এই হল সেই সব জিনিস যা আমরা দেখতে পাইনি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি আর পড়ে আছে! কিন্তু তথাপি আমরা রাসচারকে ধরতে পারিনি: যদিও ভিসচুলা পার হয়ে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রতি আক্রমণ-কারী সোভিয়েত বাহিনীর অভিযান, আর দূরদর্শী হিমলার খুব দ্রুত কি এক অজুহাতে রাসচার আর রাসচারের বৌকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল।

তার "কৃতিত্বের" স্বপক্ষে অপ্রয়োজনীয় সাক্ষীদের হিসাবের আর কোন দরকার ছিল না.........

নীচে 'প্যালেস অফ জাসটিস' আমাদের রুশ আবাসনের আমরা উত্তেজিত হয়ে এই জঘন্য "ঔষধ-বিরোধী"-র কথা আলোচনা করছিলাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগেও মনুষ্যজাতি, এই নৃশংস বর্বতার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে বা এর কাছাকাছি আসতে পারে এমন কিছু জানতো না।

"এ, এ ভয়ঙ্কর...নক্কারজনক...ভাবা যায় না", দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে প্রতিটি কথাকে আলাদা আলাদা করে বলল ভেসেভোলদ তিখনেভস্কি। "ন্যুরেমবার্গের দুর্নাম, ন্যুরেমবার্গের কসাই আর জল্লাদদের জন্যে এ শহরের দুর্নাম বহু বহু দিনের...অন্ধকারময় মধ্যযুগ...লোহার কুমারী...ইস্পাতের জুতো...খৃষ্টের মুকুট...এসবই এখানে ঘটেছে, কিন্তু এইসব...ভয়ঙ্কর, বীভৎস...ঘুমের মধ্যে বিভীষিকা...বিকৃত ক্ষ্যাপামি..."

"মেফিসটোফিলিস, ফাউস্টের ভূমিকায় অভিনয় করছে", এই মন্তব্য করল ইয়ারোস্লাভ গালান, লভোভ থেকে আসা একজন উক্রাইনীয় লেখক, উচ্চশিক্ষিত, প্রচণ্ড স্বল্প বাক, আর অন্তর্মুখী মানুষ।

"বাদ দাও ভাই, ওই বুড়ো বেচারা জার্মান শয়তানকে এর সঙ্গে তুলনা করে অপমান করছো কেন?" লিওনিদ লিওনভ আরও বলল, "এইসব কিছু দেখে মেফিসটোফিলিস, বমি করে ফেলতো। *ভারডালাকি*, রক্তচোষা বাদুড়ের পাল—ওরা হল তাই। তোমরা কি উক্রাইনীয় ভাষায় এই একই শব্দ বলো?"

"হ্যাঁ। আমরা স্লাভোনিক ভাষা গোষ্ঠীতে ওই এক শব্দই বলি", খুব গম্ভীর, অনেকটা ছাত্র পড়ানোর কণ্ঠস্বরে গালান উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, আমার মনে হয় তুমি সঠিক তুলনা করেছো।"

স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, এই কথার অর্থ কি তা আমি জানতাম না। ছেলেবেলায় আমি একবার এই শব্দটা পেয়েছিলাম, "প্রোলেতারকা" কারখানায়, যেখানে আমি আমার জীবন শুরু করেছিলাম সেখানে এটা ছিল একটা নির্দোষ, দিব্যি দেওয়া মত ব্যাপার।

তার মুখ চাপা, আপাত-উদাসীন, কিন্তু আমি নিশ্চিত সে ভিতরে ভিতরে খুব টগবগে মানুষ সেই গালান ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিল। "স্লাভ পৌরাণিক কাহিনীতে *ভারডালাক* এক অপরিহার্য চরিত্র। সে এক মস্ত পাপী।

যাকে ঈশ্বর ও মানুষ সবাই শিকার দিয়েছে। এমনকি কবরের শান্তিও তাকে মঞ্জুর করা হয় নি। চন্দ্রহীন গভীর অমারাত্রে সে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াত; নিঃশব্দে চোরের মত আড়ালে আডালে প্রবেশ করত গ্রামে, তারপর হিংস্র প্রাণীর মত দাঁত ঘুমন্ত লোকের গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে সে তাদের রক্ত খেতো। একবার মানুষের রক্ত চুষে পান করতে পারলেই সে কিছুক্ষণের জন্যে তার আগের চেহারা ফিরে পেতে পারতো। কারপাথিয়ান পাহাড়ের স্থানীয় লোকেরা আজও বিশ্বাস করে যে এই রক্তচোষা বাদুড়ের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল, প্রতিবার নতুন চাঁদ উঠলেই তার কবরের ওপর থেকে ভিতর পর্যন্ত শূল গুঁজে দেওয়া।

"আমরাও তাকে শূল বিদ্ধ করবো…আর মাটির ওপর চেপে ধরবো… আমরা তাদের ধ্বংস করে দেবো…" ভিসেনেভস্কি বলল। বুলেটের মত হিস হিস শব্দে বার হয়ে এল তার কথা। মুঠি পাকিয়ে সে আঘাত করল টেবিলের ওপর। "সভ্য বর্বরের দল, তোমাদের কবরে শূল প্রোথিত করব আমরা…একেবারে শেষ পর্যন্ত ফুঁড়ে দেবে সেটাকে!"

"শূল"—আমার পরের বিবরণে, এই নামেই ডাকবো তাহলে।

২। নিম্নতর পৃথিবীতে আমাদের অবতরণ

আমাদের চিন্তাভাবনা কেবলই ডাচাউকে ঘিরে পাক খেতে লাগল। আমরা বারবার বাভারিয়ার মানচিত্র দেখছিলাম। মিউনিখ, মাত্র একশো মাইল দূরে, যেটা আমাদের সামরিক বাহিনীর লোকেদের কাছে, কিছুই না—ইঁট ছোঁড়ার দূরত্ব। আরও কথা কি, সেই কুখ্যাত শিবির, যেখানে এই সমস্ত বর্বর নৃশংস গবেষণা সংঘটিত হয়েছে, তা মিউনিখ থেকে মোটেই দূরে নয়। রাস্তা চমৎকার, বলতে পারি, আধুনিক সব জার্মান রাস্তার মতোই। তাহলে সবকিছু নির্ভর করছে একটা গাড়ির ওপর। সেই হতভাগা আমেরিকান ক্যাপ্টেনটা কুর্টকে শহর সীমার বাইরে গাড়ি চালাবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে। *তাস* আর বেতার বিভাগীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদের গাড়িগুলো হরদম কাজে ব্যস্ত। তাহলে আমরা একটা গাড়ি পাবো কোথায়?

সেই যে কথায় বলে না "আল্লার মেহেরবাণী' সেইভাবে সুযোগ যেন

আপনি হাতে এসে ধরা দিল। প্রাতঃরাশের সময় আমার কাছে নিকোলাই কথাটা তুলল দুইজন চেক—জিনদেক নেকাস আর জান ভ্রুডা। ভদ্র মানুষটি কিছু মেদবহুল, আমুদে, মস্ত মাথা, সিংহের কেশরের মত লম্বা, কুঞ্চিত ও অমসৃণ ঝাঁকরা চুল। যেন আমার মনের ভেতরের কথাটা নিখুঁত পড়ে নিয়েছে, এইভাবে ওরা প্রস্তাব করল—

"আমাদের চীফ প্রসিকিউটরকে নিয়ে তিনটি গাড়িতে ডাচাউ যাবার কথা ভাবছি। তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসতে চাও? তিনটে জায়গা এখনো খালি আছে।"

আমি আসতে চাই কি না? আহারে, কি জানতে চাইছে এ লোকটা! এইসব চমৎকার চেকোশ্লাভদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন হল আমি আর নিকোলাই ঝুকভ বন্ধুত্ব করে নিয়েছি। এদের সঙ্গ তো চমৎকার। আর যে কোন সাংবাদিকের কাছে ডাচাউ নিজে এক অমিত শক্তিধর চুম্বক। আমরা তিনজন যাব স্থির করলাম: ঝুকভ, মিখাইল দোলগোপোলভ আর আমি।

চেকোশ্লাভ প্রতিনিধি দল চলল টাটরাসে। কিছুটা অদ্ভুত মাছের মত দেখতে গাড়ি। কিন্তু মজবুত, ভরসা রাখার মতো গাড়ি। গাড়ির ইঞ্জিন পেছন দিকে। আর কোন শব্দ নেই বললেই চলে। চৌকো মুখ ভ্রুডা সামনে আর ঢ্যাঙা রোগা লম্বু নেকাস পিছনে আমাদের পাশে বসে গেল।

প্রথম ধীরে, তারপর গতি বাড়িয়ে ন্যুরেমবার্গের পথে এঁকে বেঁকে, ওস্তাদের মত ধ্বংসস্তূপ বাঁচিয়ে চলতে লাগল। ধ্বংসস্তূপ অতিক্রম করে আসার পর, শহর পিছনে ফেলে আমরা গাড়ি যাবার এক চমৎকার রাস্তায় পড়লাম, যে রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি ছয় সার গাড়ি ছুটত।

সেই মনোহর রাস্তার ওপর তুষার গলে গিয়েছিল। আর রাস্তাটা ছিল জনহীন। কোন শূন্য থিয়েটার হলের মতো। কদাচিৎ আমরা কোন দ্বিচক্রযান পার হচ্ছিলাম যাতে পুরু টায়ার লাগানো আর লম্বা কর্কশ কেশর-ওয়ালা ঘোড়ায় টানছে। কিংবা রাস্তার ধার দিয়ে আপ্রাণ প্যাডল করে যাচ্ছে এমন কোন সাইকেল আরোহীকে আমরা পেরিয়ে গেলাম। অঞ্চলটা মনে হল বসতিবিহীন। কিন্তু ক্ষেতগুলো থেকে ইতিমধ্যেই বরফ পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। সমস্ত মাঠে যত্ন স্পষ্ট। মাথার ওপর ভোরবেলার স্কাইলার্ক পাখির কিচিরমিচির শব্দ। এখানে কেরুয়াসী ঘাস আমাদের

এপ্রিল মাসের মতো। মাঠে এখানে ওখানে কেবলমাত্র গর্তগুলো তখনো তুষারে ঢাকা। ভিজে আচ্ছন্ন মৃত্তিকা এখন সুতীব্র বসন্ত সৌরভে পূর্ণ। কেবলমাত্র রাতেই মাটি বরফের পাতলা আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। এখনও কুঁড়ি ফোটার বেলা হতে অনেক দেরী। এই ঝলমলে সকালবেলার বৃক্ষরাজি যেন জলপাই রঙের স্বচ্ছ কুয়াশায় চাদর-জড়ানো।

পথিপার্শ্বের অনেক পান্থশালা আমরা পার হয়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে গলায় ঢালবার মত এক পাত্র বীয়র পেলে তার আর জবাব নেই, কিন্তু নেকাস মুখ টিপে হেসে, মাথা নেড়ে কিছু বোঝাতে চাইল।

"আর একটু ধৈর্য ধরো বন্ধু।"

তারপর একটা পান্থশালা দেখা গেল যার সামনে আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী। আর সোভিয়েত গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। যেন খুঁটিতে বাঁধা অনেকগুলি অশ্ব। হ্যাঁ, এমনকি আমাদের সোভিয়েত গাড়িও সেখানে ছিল। গাড়ির সামনের দিকে বনেটে বিচার সভার পতাকা বাঁধা। যেহেতু আমাদের সামনের গাড়িটা থেমে গিয়েছিল, পশ্চাৎগমন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। আমরা পানীয় নিলাম। সঙ্গে যেসব 'স্যাণ্ডউইচ' এনেছিলাম তা খেলাম। উঠে পড়লাম। জার্মানীর এই অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ক্ষতি প্রায় কিছুই হয় নি। যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সদ্য শেষ হয়েছে, তার চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে বার করা এখানে বেশ কঠিন।

সুন্দরী মিউনিখ, তার সব প্রাচীন পার্ক, সরোবর, প্রশস্ত জনপথ—এসবের ওপর মিত্রপক্ষীয় বাহিনী বারংবার বোমা ফেলেছে, কিন্তু ন্যুরেমবার্গের তুলনায় ক্ষতি অনেক, অনেক কম। দেখে মনে হয় যেন একজন ভদ্রলোক, যিনি সুদীর্ঘ দিন ধরে জীবিত আর যার ললাটের মাত্র একটি পাশে চুল পাকা। ছেঁড়া হারের মত বোমাবিধ্বস্ত একটি ঝোলান সেতু, আর চারদিকে পরিষ্কার ঘেরার মধ্যে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে থাকা কিছু ভগ্নাবশেষ, এই কেবল এইমাত্র ধ্বংসের চিহ্ন।

আমরা তাড়াতাড়ি মিউনিখ পার হয়ে ডাচাউ-এর রাস্তা ধরলাম। ছবির মতো গ্রামের পর গ্রাম আমরা পার হয়ে গেলাম। গ্রামের বাড়িগুলির সাদা সাদা খাড়া দেওয়াল, টালি ছাওয়া ছাদ; ক্রুশাকারে ছেদন করার ভঙ্গীতে দাঁড়ান থাম, বড় বড় খামার বাড়ি, আর পুরোন বাগ বাগিচার আড়ালে খাস জমিদারিতে জমিদারের বাসভবন, আমরা পার হয়ে চললাম।

এক সময় আমরা একটা পথ নির্দেশ চিহ্ন দেখতে পেলাম, তাতে লেখা "ডাচাউ-এর দিকে।" তার ঠিক পরেই আয়তাকার এক বাঙ্কার। বাঙ্কার বালির বস্তা বোঝাই। তার চারটি দিকেই গুলি চালাবার জন্যে ফোকর, যেখান থেকে মেশিনগানগুলো উঁকি দিয়ে সামনের দিকে বার হয়ে আছে। সুঁচাল খাঁজওয়ালা কাঁটার বস্তু চারদিকে খাড়া করা হয়েছে। সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে সামরিক বাহিনীর টেলিফোনের তার সটান টানা। ওহহো, তাইতো, হালে যে কজন এস এস বন্দী পালিয়েছিল, তার থেকে কিছু শিক্ষা নিশ্চয়ই হয়েছে তাহলে। আমরা চৌকিতে সংক্ষেপে সামান্য কথা বললাম। সেখানে ডিভিসনের সদর দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই বার্তা পৌঁছে গেছে ও আমাদের কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হল। চেকদের উর্দি ছিল পশ্চিমা ধাঁচের। তাদের কাগজপত্রের ওপর এক ঝলক চোখ বোলানো হল মাত্র। আমাদের সোভিয়েত উর্দি সংশয় ও কৌতূহল জাগিয়ে তুলল ওদের। বাঙ্কার থেকে একজন লেফটেন্যান্ট বার হয়ে এল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এল। সে আমাদের কাগজপত্র আবার পরীক্ষা করল, কাউকে ফোন করল ও তারপর চীফ প্রসিকিউটারকে কুর্নিশ করে বলল, "আপনারা এগিয়ে যেতে পারেন।"

লোহা ঢালাই করা অক্ষরে খোদাই করা *"জেডেম ডাস সিনে"*। "প্রত্যেকে আপন আপন" এখনও লোহার ফটকের ওপর ঝুলে রয়েছে। এই রসিকতা ফুয়েরারের উদ্দেশ্যে উদ্দীষ্ট! তারপর এলো কাগজপত্রের আরও বিস্তৃত আর লম্বা পরীক্ষা। আমাদের গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে বলা হল। ফটকের ঠিক মধ্যেই আমরা এক লম্বা, থলথলে মাংসল লেফটেনান্ট কর্নেলকে দেখতে পেলাম। লোকটা তার চমকানো সামরিক পোশাকের মধ্যে কোন ক্রমে নিজেকে ঢোকাতে পেরেছে। হ্যাঁ, একজন বিশেষ মাননীয় চীফ প্রসিকিউটরের আগমন সম্পর্কে তাকে আগেই জানানো হয়েছে, সে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, নিজে সে ফটকের কাছে চৌকিতে স্বয়ং যেতে পারেনি বলে তাকে যেন মাফ করে দেওয়া হয়। তার হাতে এত কাজ! এরকম একটা বিরাট শিবিরের প্রধান দায়িত্ব থাকা কি মুখের কথা! খুব কঠিন, খুব কঠিন।

তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন আর সেখান থেকে হাজির করলেন তাঁর পদাধিকারী, পূর্বকামী নামী কর্তার পড়বার ঘরে। পেক্লার

খেলার আদবাবে শারাম মস্ত বয় সেটা। আপাতদৃষ্টিতে কোন কিছু বদলানো হয়েছে বলে মনে হয় না। কেবল হিটলারের প্রতিকৃতির বদলে ট্রুম্যানের প্রতিকৃতি লাগানো হয়েছে। আর নাজী পতাকার পরিবর্তে কোণের দণ্ডে নক্ষত্র ও টানাটানা দাগের পতাকা রয়েছে। সেই চিরপরিচিত প্রশ্নটি আমাদের করা হল—

"চা? কফি? হুইস্কি? ভারমুথ?"

আমরা বসে বসে চুক চুক করে নানা পানীয় চুমুক দিতে লাগলাম। এখন এই শিবিরে অধিকাংশ বন্দীই এস এস। তারা ঠিক কত জন, মানে সঠিক সংখ্যা কত? দুর্ভাগ্যবশতঃ, বন্দী-শিবিরের অধিনায়ক সঠিক সংখ্যা বলতে পারলেন না। শিবিরে যে নানা মান স্থির করা হয়েছে, সেই অনুপাতে তারা অনেক। ওদের জল খাবার দেওয়া হয়: জেনেভা কনভেনসনে সৈনিকদের খোরাক সম্পর্কে যেমন নির্দেশ দেওয়া আছে সেই রকম দেওয়া হয় ওদের অবসর কাটানোর ব্যাপারেও শিবিরের পরিচালন সংস্থা যত্নবান। সপ্তাহন্তিক গান বাজনা, সপ্তাহে তিন দিন ফিল্ম দেখানো, এ সবের ব্যবস্থা আছে। বড়দিনের সময় গায়ক গায়িকা, বিনোদন ক্ষেত্রের শিল্পীরা এখানে এসেছিলেন। উনি নিশ্চিত যে আমরা যদি কোন বন্দীকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে সে বন্দী বলবেই যে সে ভাল আছে……ওরা এস. এস ছিল: ঠিক আছে, তাতে কি! ওরাও তো সৈনিকই ছিল। তাই ছিল নাকি ওরা? আমেরিকা হল গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী দেশ আর সেই দেশ তার সমস্ত যুদ্ধ বন্দীকে সেইভাবে দেখা শোনা করে।

আমরা এস. এস-দের নৃশংস কাজকর্ম সম্পর্কে ইতিমধ্যে অঢেল শুনেছি, আর তাদের সম্বন্ধে এই সমস্ত আয়োজন আর বিবেচনা শুনলে রক্ত ফুটতে থাকে। অধিনায়ক তাঁর মাননীয় চেকোস্লোভাকিয়ার অতিথি, যিনি আত্মসংবরণও ধৈর্যের জন্য বিখ্যাত, তাঁকেও অধিনায়ক স্পষ্টতঃ অস্থির করে তুললেন। তিনি খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ তাঁর হুইস্কির গ্লাশ পাশে সরিয়ে রেখে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"আশা করি, আপনি দয়া করে আমাদের বন্দী-শিবিরটা দেখাবেন?"

"আপনারা নিশ্চয়ই ৫নং ব্লক দেখতে খুব আগ্রহী?……এই মুহূর্তে সবাই ওটাই দেখতে চায়। কিন্তু বড়ই আফশোষের কথা; ওর আর কিছু বাকী নেই। আমাদের সাঁজোয়া বাহিনীর ট্যাংকগুলো যখন ব্যাভারিয়ার রাস্তায়

গুড় গুড় শব্দ করে চলতে আরম্ভ করলো, তখনই জার্মানরা এটাকে উড়িয়ে দেয়।"

সিমেন্টের ঢালাই করা যে ইমারত সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, সেই বাড়িটাও তিনি আমাদের দেখালেন। কেবল পাঁজা পাঁজা ইঁট আর ভেঙে মুষড়ে যাওয়া ইস্পাতের কাঠামো থেকে লোহার রড ছড়ানো রয়েছে। বন্দী-শিবিরটা অবশ্য অক্ষত আছে। সেটা বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কেবল বন্দী-শিবিরের অধিবাসীরা বদলে গেছে। জীবন্ত সব কংকাল ডোরাকাটা জামা আর পাজামা পরা, যেমনটি আমরা দেখেছিলাম অসওয়েইসিম-এ, তাদের পরিবর্তে এসেছে ভাল খেয়ে দেয়ে, আঁটোসাটো যুবকেরা, তাদের নিজস্ব কালো পোশাক পরিধানে। তাদের যেটুকু বদলেছে তা হল, তারা কোন পদক বুকের ওপর ঝুলিয়ে নেই। অথবা মর্যাদা নির্দেশক কোন তকমাও তাদের গায়ে লাগানো নেই। আর তাদের সেই ঝকঝকে জুতো গোড়ালির দিকে একটু ক্ষয়ে জীর্ণ হয়ে গেছে।

"তোমার কি মনে হয় না যে এরা কোন একটা উদ্দেশ্যে এদের এরকম করে রেখে দিয়েছে?" চলতে চলতে যেমন সে করে থাকে, সেইভাবে রেখাচিত্রে স্কেচ করতে করতে ঝুখভ আমার কাছে জানতে চাইল।

আমরা কাছাকাছি হলে, সামনের এস. এস-রা সৈনিকদের সতর্ক ভঙ্গীতে দাঁড়াল। তাদের চোখ শিবিরের কর্তা ব্যক্তিদের ওপর নিবদ্ধ। এলোমেলো ভাবে হাতটা টুপির কাছে সামান্য তুলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাদের প্রত্যাভিবাদন করলো।

"ট্রুম্যান অবকাশ আবাস" বিষণ্ণতায় ভরা কৌতুকে বলল ছুভা। শত্রু অধিকৃত প্রাগ-এ সে থেকেছে। আর সে এই কালো পোশাকপরাদের কর্মরত ভয়ংকর অবস্থায় দেখেছে। আমাদের মতো তারও স্নায়বিক বিকারের ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল।

বন্দী-শিবিরের জার্মান পরিচালন সংস্থা ব্লক নং ৫-কে উড়িয়ে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু যে দিকটা আসল কসাইখানা সেদিকটা উড়িয়ে দেবার সময় পায় নি কিংবা ভুলে গিয়েছিল। সেখানকার সবকিছু যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেছে। যে সমস্ত জার্মান ফ্যাসীবাদের বিরোধী ছিল, তাদের মাথা কেটে ফেলবার জন্যে একটা ঘর ছিল। ঘরটা পরিষ্কার; আলো আছে, আর মসৃণ মেঝেতে টালি বসানো। মেঝেটা ঢালু আছে, যেমন ঘর

ধোয়া জল গড়িয়ে যাওয়ার জন্যে থাকে। ঘরটার একটা রক্তস্রোত গড়িয়ে নীচে পড়ার জন্যে মেঝের নীচে নালা* করা আছে। আর তাছাড়া রক্ত ধুয়ে দেবার জন্য ধাতুর ঝকঝকে আংটা মত লাগানো হোস পাইপ আছে। আর একটা ঘর আগেরটা থেকে আরও একটু বড় এই ঘরটা, এখানে, এই ঘরটা ব্যবহৃত হত, লোকদের ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে। ঘরের ছাদের নীচে ঝোলান একটা বাঁকানো লোহার পাত। তাতে লাগানো অনেক কপিকলের চাকা, আর লোমে তৈরী টুপির সঙ্গে ফাঁসি দেওয়ার ফাঁস যা টানলে আরো চেপে বসে। ফাঁসি দেওয়ার জন্যে ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা যারা ফাঁসি প্রত্যক্ষ করত তাদের জন্যে একটা কৃষ্ণবর্ণ ডেস্ক আর কোণে ধর্মযাজকের জন্যে, একটা গীর্জায় যেমন থাকে, ধর্মোপদেশ দানের ছোট মঞ্চ মতন। কারখানায় যেমন ঠিক পর পর নিয়ম অনুসারে উৎপাদনের কাজ হয়, সেইরকম চূড়ান্ত দক্ষতায় এখানে কাজ হতো। ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর, মৃত্যুর সার্টিফিকেট লেখা হত। ফাঁসে ঝোলা মৃতদেহ একটা পাতা রেলে করে অন্য ঘরে পাঠানো হত, আর তখনই অন্য একটা কপিকলে আর একটা ফাঁস চালু করে দেওয়া হত……এবং অবশেষে এলাম, এটা একটা তৃতীয় ঘর। এখানে কারিগরি যন্ত্রপাতি অনেক কম। এখানে লোকেদের গুলি করে মারা হত। এটা একজন শল্য চিকিৎসকের চিকিৎসা কেন্দ্রের মত। এই ঘরে নানা যন্ত্রপাতি—মানুষের শক্তি মাপার যন্ত্র, তার ফুসফুসের কিউবিক হিসেব, তার ঘাড় ও পাকস্থলীর মধ্যগত দেহাংশের মাপ কি, আর তার উচ্চতা। বিশেষভাবে তৈরী একটা পাটাতনের ওপর লোকটি দাঁড়াত। ব্যবস্থা এমন যে তার মাথাটা আপনি চেপে যেত দেওয়ালের ওপর একটা লোহার পাতে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে মাথার পিছনে পেত একটা বুলেট। দাগা বুলেট যাতে পিছন থেকে এসে মাথার পিছনে ঠিক বিদ্ধ করে তার জন্যে লোহার পাতে ছ্যাঁদা থাকত। দেওয়ালের ঠিক উল্টো দিকে থাকত একটা পর্দা। আর সেই দিকটায় দেওয়ালের ওপর পুরু রবার লাগানো থাকত, যাতে বুলেটটা সবেগে ঠিকরে না ওঠে।

কসাইখানার প্রতিটি শাখা আর মৃতদেহবাহী কনভয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ কিভাবে প্রতিটি পরম্পরা ভেবে তৈরী করা। কিন্তু এও এখন পুরোন, বাতিলের পর্যায়ে পড়ে। অসওয়েসিম-এ যে গ্যাস চেম্বারে মাত্র পনেরো

শিবিরে, এক জোটে এক হাজার জন পর্যন্ত মানুষকে নিকেশ করা যেত।

"পাদটীকা"র মতন সেই শিবিরের কম্যাণ্ডাণ্ট আমাদের নমুনা হিসেবে নাজীবাদের নানান আশ্চর্যের মধ্যে একটি দেখালেন। পনেরো বছর বয়স, সোনালি চুল, জবুথবু এক বালক। তার চোখ দুটি নীল। তার বিবর্ণ মুখখানি আকর্ষণীয়। তার নাম মাকস। জানা গেল সে এই বন্দী-শিবিরের পূর্বতন জার্মান নাজী কম্যাণ্ডান্টের পুত্র। তার পিতা তাকে নাজী রীতিনীতির কঠোর শৃঙ্খলায় তাকে বড় করে তুলছিল। তার জন্মদিনে, কেক ও মোমবাতি দেওয়ার পরিবর্তে, এই বালককে জন্মদিনে, ঠিক সংখ্যক বন্দী মানুষকে গুলি করতে দেওয়া হত। এই বালক তেরো পর্যন্ত মেরেছে, কিন্তু চতুর্দশ সংখ্যাটা তার হাত থেকে ফসকে গেছে…একটা বিশেষ ঘরে তালাচাবি বন্ধ করে প্রকৃতির এই রহস্যকে রাখা হয়েছে। তার চেহারা দেখে মনে হয়, তাকে বেশ ভাল খাবারদাবার দেওয়া হয়। এই ছেলেটাকে নিয়ে যে কি করা উচিত সে সম্পর্কে বর্তমান বন্দী শিবির কর্তৃপক্ষের কোন ধারণাই নেই। বয়স কম হওয়ার জন্যে তাকে অভিযুক্তও করা যাচ্ছে না। অথচ কেবল এই ছেলেটার জন্যেই নাজী কিশোর ও বালকবয়সী অপরাধীদের জন্যে একটা আলাদা শিবির সংগঠিত করার কোন মানেই হয় না। আর যেকোন অবস্থাতেই এই ছেলেটিকে তো ছেড়ে দেওয়া চলতেই পারে না। কেননা নিজের জন্মদিনে ও কিরূপ ব্যবহার করত, সে সম্পর্কে বহু লোক জানে।

"এখন আপনারা যাঁরা উকিল, আর আইনবিদ তাঁরা যদি এইসব ছেলেদের জন্যে কোন আন্তর্জাতিক আইন করেন", এই বন্দী-শিবিরের কর্তা বললেন।

আমরা নীরবে ন্যুরেমবার্গে ফিরে এলাম। যা কিছু দেখেছি, তাতে পীড়িত বোধ করেছি আমরা। এমনকি জান ড্রডাও, যে স্বভাবে আমুদে, খালি রগড় করে, মজার গল্প বলে, সে ডাচাউ যাবার সময় দুষ্টু মিভরা চেক আর স্লোভাক গান গাইছিল, সেও কেমন যেন বোবা আর বিমর্ষ হয়ে গেছে। পথি-পাশে আমাদের পুরোন সেই পান্থশালা ঝলমল করছিল আলোয়। বাইরে আরও অনেক বেশী সংখ্যক গাড়ি দাঁড়ানো। আমরা সেটা পার হয়ে গেলাম, এমনকি গাড়ির গতি পর্যন্ত কামানোর কথা মনে হল না। আমাদের কারোরই আর সে মেজাজ ছিল না।

আমরা আস্তানায় ফেরার পর, আমি কিছু সুসংবাদ পেলাম। ডাক্ক পত্রিকার প্রধান সাংবাদিক প্রতিনিধি বেসপালভ, বিমানে মস্কোয় ফিরে গেছেন, সিঁড়ির নীচের দিকে একটা ছোট ঘর খালি হয়েছে। ছেলেরা স্থির করল যে ঘরখানা আমায় দেওয়া হবে। তাহলে এখন আমার আবাসন হেরমান গোয়েরিং সমান সমান। উপরন্তু আমার বাইরের উঠোন দেখার মত একটি ছোট বাতায়নও আছে। কেবল আমার ঘরের ভিতর কোন "শৌচাগার" নেই। জানালার ধারে একটা ছোট টেবিল। যে চেয়ারটা ছিল, সেটা সরিয়ে কুর্ট, তার বাড়ি থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসে রেখেছে। আগের চেয়ারটার এ ঘরে আমার পূর্বতন বাসিন্দার দেহের ভারে দফারফা হয়ে গেছে। আমার অনুরোধে কুর্ট আমায় একটা 'এ্যালার্ম-ঘড়ি' এনে দিল। ঘড়িটা চাপা দেবার জন্যে একটা নিকেলের ঢাকনা আছে। ঘড়িটা এমন গাঁক গাঁক করে টিকটিক করে, যে বোধ হয় তা বারান্দা থেকে শুনতে পাওয়া যায়। আর ঘড়ির এ্যালার্ম-এর আওয়াজ এতই তীক্ষ্ণ, যে আমি নিশ্চিত, আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়বো। মনে হচ্ছে যেন কেউ ছিপি খোলার জন্যে পেঁচাল যন্ত্র দিয়ে আমার কানের মধ্যে অকস্মাৎ খোঁচাচ্ছিল।

ভোর ছটায় আমি উঠে পড়লাম। যেমন একজন চাষী ওঠে। আমার মস্তিষ্ক তাজা। ঝরঝরে। সুতরাং আমার সাহিত্য কর্মের দিকে আমি মন দিতে চাইলাম। এখন পর্যন্ত তো দেখা যাচ্ছে যে এ ব্যাপারে আমার কপাল খুব সুবিধার নয়। যে সব সংবাদ আর বিবরণ আমার পাঠানোর কথা, তা আমি ঠিক ঠিক সময়ে পাঠিয়ে যাচ্ছিলাম। আর রোজই সযত্নে এই দিনলিপিও, সব ঠিকঠাক উল্লেখ করে লিখে যাচ্ছি। যদিও আমার কোন ধারণা নেই যে এই দিনলিপি কোন কাজে লাগবে। সেই এক-পা পাইলট এখনো আমায় মহা সমস্যায় রেখেছে। ঝামেলা আর কি! একটা কাগজের ওপর আমি গল্পের নাম লিখে রেখেছি "একজন সত্যিকার মানুষের গল্প"। আদালত কক্ষ থেকে আমি কিছু চমৎকার কাগজ খামচি মেরে তুলে নিয়ে এসেছি। এমন কাগজে একজন লেখক তার শ্রেষ্ঠ রচনা লেখে, যা কালজয়ী হয়। সে সবের জন্যেই এই কাগজ। অথচ কাগজগুলো এখনও টেবিলের ওপর তীক্ষ্ণ এ্যালার্ম ঘড়ির পাশে শুধু পড়ে আছে। কখনো কখনো রাতে, আমি হঠাৎ নিদ্রা থেকে জেগে উঠি। দেখছে

পাই অন্ধকারে সেই বিমান চালক দাঁড়িয়ে আছে। তার গালে চোয়াল উঁচু হাড়, ঘন কালো চুল। বাদামী দুই চোখ। ঠিক যেমনটি সে দাঁড়িয়েছিল ওরেলের ঠিক সামনে। তার ফটো আমার টেবিলের ওপর রয়েছে। তার ক্লান্ত গভীর, কিছু কর্কশ স্বর, যা গোলমেলে বাজনার মত। এমনকি আমি যেন এসব স্পষ্ট শুনতে পাই। ঐ বৈমানিক কেবলই আমার পিছনে পিছনে দিচ্ছে। আবার অন্যদিকে ফৌজী ছাপ আর বিকৃত মুখ, কুর্ট-এর যার সঙ্গে আমার মনে হয় আমি বন্ধুত্ব করে ফেলেছি, তা কেবলই, অবিরতভাবে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আর একজনের প্রতি আমার করণীয় কর্তব্যের কথা : যার নাম মেরেসিয়েভ কিংবা মারেসিয়েভ।

আমার পরিকল্পনা নিয়ে আমি কেবল দুজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি, নিকোলাই ঝুখভ এবং মিখাইল খারলামভ। ভারী চমৎকার লোক এই খারলামোভ। সম্প্রতি মস্কো থেকে এসেছে। তারা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনলো বটে, কিন্তু ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে এমন একটা ঘটনা সত্যি ঘটে থাকতে পারে। ওদের সংশয় থাকলেও, ওরা কিন্তু কাহিনীটা অনুমোদন করলো।

"তবে এটা লেখা খুব কঠিন। ব্যাপারটা নিয়ে তোমায় সব খুলে বিস্তারিত ভাবে লিখতে হবে, না হলে আদৌ না লেখা ভাল।" চিন্তামগ্ন খারলামভ বলল। "কি ব্যাপার জানো, তোমরা, বলতে চাই লেখকরা তো আর হামেশা এমন উপাদানের সাক্ষাৎ পাও না।"

কিন্তু নিকোলাই ঝুকভ তার নিজস্ব প্রবল আবেগে বলে উঠল, "বসে পড়। আর ভগবানের দোহাই, ব্যাপারটা লিখে ফেল। সঙ্গের ছবিগুলো আমি আঁকবো।"

সে বিষয়বস্তুটা নিয়ে এতই প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে যে পরবর্তী সকালগুলোতে দেখা হলে "কেমন আছো" বলার বদলে সে জিজ্ঞাসা করবে, "কি হল, তুমি কি সেই বৈমানিককে নিয়ে লিখছো? না? ওঃ। অথচ তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে লিখবে!"

৩। সত্য, সম্পূর্ণ সত্য এবং আর কিছু না শুধু সত্য

নানা দেশের, নানা পেশার, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপটের সাক্ষীদের লম্বা সারি আদালত কক্ষে ইতিমধ্যে সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তাঁদের সাক্ষ্য, যা

খুবই সরল সাদামাটা আর ছলাকলাহীন, তা নাজীবাদের মুখের চেহারা আরো স্পষ্ট বিস্তারিত করে, হাতে ছোঁয়া যাবে এই ভাবে ফুটিয়ে তুলল, যেমনটি ওই বিচারকদের টেবিলের ওপর ডাঁই করে রাখা নথীভুক্ত ভয়ংকর সব নানা দলিল পারেনি।

অন্ততঃ কয়েকজন সাক্ষী আদালতের সামনে যা বলেছিলেন তা না বললে এই বিচারের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেজন্য সোভিয়েত ফরিয়াদী পক্ষ যে সব সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন তাদের কারো কারো কথা বলব, আর সেই প্রসঙ্গে আমার দিনলিপিতে তাঁদের কথা যেমন এসে গেছে তাও বলবো।

আদালতে সোভিয়েত পক্ষের অভিযোগকারীদের অনুরোধে লর্ড লরেন্স একজন সোভিয়েত চাষীকে সাক্ষ্য দেবার জন্যে আহ্বান করলেন। তার বাড়ি কুজনেৎসোভো গ্রামে। জেলা পোরখভ। অঞ্চল পসকভ। দু পা সামান্য ফাঁক করে, লম্বা লম্বা পা ফেলে বেশ রাজকীয় ভঙ্গীতে ও সাক্ষী দেবার জায়গায় দাঁড়াল। নেমে এল স্তব্ধতা। কিভাবে জার্মান সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় ধ্বংস করেছে ওবারশ, নভগোরদ, পসকভ, ধ্বংস করেছে শত শত শহর, হাজার হাজার গ্রাম, এমনকি কখনো কখনো একটা সম্পূর্ণ অঞ্চলকে "মৃতের এলাকা" করে দিয়েছে সে বিষয়ে বিচার সভা ইতিপূর্বেই বিস্তারিতভাবে অনেক কিছু শুনেছে। এ সমস্তই বিচারের দলিলে নথীভুক্ত রয়েছে।

কুজনেৎসোভো গ্রামের ইয়াকভ গ্রিগরিয়েভ খুব ধীরে ধীরে তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করল। ১৯৪৩ সালের ২৮শে অক্টোবর কয়েকজন মত্তমাতাল জার্মান সৈন্য তাদের গ্রামে ঢুকে পড়ে। গ্রামটি ইতিমধ্যেই জার্মানদের কবলে শুধু নয়, আগ্রাসী জার্মান বাহিনী এটিকে পিছনে ফেলে গিয়েছিল। অর্থাৎ গ্রামটি ছিল বাহিনীর পিছন দিকে। তারা গ্রামটির চারদিক থেকে আগুন লাগিয়ে দেয়, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করতে করতে গ্রামের লোকেরা বেরর হয়ে আসে এবং তাদের ছেড়ে দিতে বলে, প্রাণভিক্ষা চায়। তারা মানুষগুলোকে তাড়া করে এক জায়গায় জড়ো করে, ধাক্কা মেরে মেরে কোলখোজ অফিসের ভেতরে ঢোকায়। খোঁটা লাগিয়ে বাইরে থেকে দরজাগুলো বন্ধ করে। তারপর জায়গাটায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আদালত এ ধরনের কথা আগেও শুনেছে। শুনেছে সেইসব ফরাসী মানুষদের কথা যাদের

গুরাডোরে একটা গীর্জার মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল। শুনেছিল লিডিস নামে সেই গ্রামের কথা যেটাকে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু ইয়াকভ গ্রিগোরিয়েভের সাধারণ গল্প বিচারকদের, যাঁরা ইতিমধ্যেই এত দেখেছেন আর শুনেছেন, তাদের চোখেও জল এনে দিল।

সে তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকে সামরিক পোশাকে সজ্জিত সেইসব খুনেরা আরো ১৯জন গ্রামবাসীকে ধরে তাদের ঘর থেকে বার করে এনে একটা গোলাবাড়ির ধারে কিভাবে গুলি করে মারে।

"আমি আর আমার দুই ছেলে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। দেওয়ালের ধারে। কসাইদের দিকে আমাদের মুখ। আমার দুই ছেলের একজন—আমার বড় ছেলে—তাকে মেরে ফেলা হল, সে মরে গেল প্রথম ঝাঁকগুলিতে। আমার ছোট ছেলের পায়ে গুলি লাগল। সে পড়ে গেল। আমার এখানে গুলি লাগল।" সে তার নিজের কাঁধ দেখাল। "আমিও পড়ে গেলাম। তারপর আমার ওপর আরও অনেকে পড়ে স্তূপ হয়ে গেল। সেগুলো মৃতদেহ। মৃতদেহের। স্তূপ। আমি সে সবের তলায় চাপা ছিলাম। সে রাত্রে একটা ঝড় উঠল। আমি সেই মৃতদেহগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে বাইরে এলাম। আমার ছোট ছেলেকে নিলাম। পালালাম ক্ষেতের দিকে। তুষারের ওপর ওরা নিশ্চয়ই আমাদের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিল। ওরা সেই দাগ ধরে আমাদের পিছু পিছু খুঁজেছিল। আমার মনে হয়, আমাদের খুঁজে বার করার জন্যে ওরা কুকুর পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল। আমরা বনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম। আর সেই বনটা আমার নিজের বাড়ির মতো চেনা। কোন শয়তানের সাধ্য ছিল না আমাদের ধরে।" সে তার কথা শেষ করল। তার চোখ কাঠগড়ার ওপর যুদ্ধ-অপরাধীদের দিকে।

ডাঃ গিলবার্ট, একজন আমেরিকান মনোরোগ চিকিৎসক, তাঁর প্রতি আমেরিকান প্রসিকিউসনের নির্দেশ ছিল বিজ্ঞানসম্মতভাবে আসামী প্রতিবাদীদের মানসিক অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার। আসামীদের সঙ্গে তাদের জেলকুঠরিতে যাওয়ার অনুমতি তার ছিল। শোনা যায় ডাঃ গিলবার্ট তাঁর দেওয়া প্রতিবেদনে বলেছেন যে কেইটেল আর জডল, যারা সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ আক্রমণের পরিকল্পনা রচনায় অংশগ্রহণ করেছিল, যারা লক্ষ লক্ষ লোককে শান্ত শীতল ঠাণ্ডাভাবে মৃত্যু

দিয়েছিল, তারা গ্রিগোরিয়েভের সাক্ষ্য দেওয়ার শেষে স্পষ্টতঃই বিমর্ষ ছিল।

এরপর সাক্ষ্য দিল ইয়েভজেনি কোভেলশ। চেহারা শক্ত সমর্থ, মজবুত বাঁধুনি দেহের। সে উক্রাইনীয় সেনা বাহিনীর একজন চিকিৎসক। বেশ কম বয়স। কিন্তু যদি খুব কাছ থেকে তাঁর চোখের দিকে চাও, ভালো করে চোখ দুটি লক্ষ্য করো, তাহলে বুঝতে পারবে আসলে তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ। তাকে নাজীরা বন্দী করে ও তার ওপর এত অত্যাচার করে, এত কষ্ট আর নিগ্রহ ভোগ করতে হয় তাকে—তিনি নিজেই বললেন, তাঁর এখন মনে হচ্ছে যে নাজীদের অপরাধের কথা বলার জন্যেই বেঁচে থাকা জরুরী ছিল। একজন বৃদ্ধের জ্ঞান ও বিষণ্ণ চোখ নিয়ে সেই যুবক অভিযুক্ত করল কেইটেল আর জডলকে। অভিযুক্ত করল সকলকে, যারা এখনো বোঝাতে চাইছে যে তারা শুধুমাত্র সৈনিক। বোঝাতে চাইছে যে তারা কেবল নীরবে আদেশ পালন করেছে। সযত্নে তৈরী করা পরিকল্পনার আদেশ অনুসারেই তারা যুদ্ধ বন্দীদের দলবদ্ধ ভাবে নিশ্চিহ্ন করেছে আর সেভাবেই অধিকৃত এলাকায় সব বলশালী বিরোধী তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। যে মৃত্যু শিবিরে কোভেলশ বন্দী ছিল সেখানে একজন নাজী কর্তা ঘোষণা করেছিল যে "আমাদের সৈন্য বাহিনীর জন্যে কেবল মৃত রুশই নিরাপদ।"

তারপর এল আব্রাহাম সুজকেওয়ের। ভিলানিয়াস-এর নাগরিক। কবি। ইউরোপে সুখ্যাত। তার মুখ, কেবলই থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে আকস্মিকভাবে সঙ্কুচিত হচ্ছিল। একজন রুশ শহীদের প্রতিমূর্তিতে যে পীড়নের অভিব্যক্তি, তাঁর মুখে তা-ই ফুটে আছে। সম্প্রতি প্যারিসে তাঁর বই *দি ভিলনিয়াস ঘেট্টো* প্রকাশিত হয়েছে এবং এখন রুশ ও ইংরেজীতে অনূদিত হচ্ছে। মৃত্যু শিবিরের বিভীষিকা সম্পর্কে আদালতকে জানাল সেই কবি। তার কণ্ঠস্বর কাঁপ কাঁপা, কখনও স্নায়বিক আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল সে। আন্দোলিত সে স্বর রক্তমঞ্চকে দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরল।

সে কোন সংখ্যার উল্লেখ করেনি। কিন্তু সরল ভাবে জানাল তার পরিবারের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। সে বলল কিভাবে তার স্ত্রীর চোখের সামনে তাদের বাচ্চা শিশুকে মেরে ফেলা হয়। সে জানাল সে পরে নিজের চোখে দেখে কিভাবে তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। শহরের ইহুদী পাড়ার

রাস্তায় কখনো কখনো গুলি করে মারা লোকেদের রক্তের লাল ধারা, রাস্তা দিয়ে বয়ে যেত। গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে তা পড়ত রাস্তার নর্দমা আর পয়োঃ প্রণালীর মধ্যে। জীবন্ত লোকেদের ব্যবহার করা হত নিশানা হিসেবে, গেস্টাপোদের হাতের তাগ ঠিক করার মহড়ার জন্যে জীবন্ত নিশানাগুলি যখন তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দৌড়বে, পালাবে তখন—গুড়ুম—শেষ। বন্দীদের বাধ্য করা হত জার্মান সৈন্যদের পায়ের বুট জুতো জিব দিয়ে চাটতে। বন্দীদের বাধ্য করা হত, নিজের বিষ্ঠা নিজে খেতে। নিষ্ঠুর আচরণ করে প্রবৃত্তিগত যৌন বিকৃতি যাদের, সৈনিকের পোশাকে সেই সব কসাই জল্লাদরা বড়ই আমোদ পেত এই সব দৃশ্য দেখে।

পোল্যাণ্ডের লেখিকা সেয়েরয়ানা সঙ্ম্যাগলিয়েসকা ভয়ংকর বিভীষিকাপূর্ণ এক বন্দী-শিবিরে কাটিয়েছিলেন প্রায় দুবছর। সেই শিবির ছিল বিরকেনাউ-এ সেটা অসওয়েসিমের শাখা।

সেই মহিলা যে শিবিরের বর্ণনা দিয়েছিলেন, আমার তা মনে আছে। যেদিন এই অঞ্চল জার্মানদের হাত থেকে মুক্ত করা হয় সেদিনই আমি ওই শিবির পরিদর্শন করি, আর সেদিনই *প্রাভদায়* আমার প্রতিবেদন পাঠাই, যার শিরোনাম ছিল: "বিরকেনাউ-এর ধোঁয়া।" এই মৃত্যু শিবির খাস অসওয়েসিমের থেকে কিছু কম আতঙ্কের ছিল না। আদালতকে সেই পোল্যাণ্ডের লেখিকা যখন বললেন যে নাজীরা সেখানে প্রবৃত্তিগত ভাবে নিষ্ঠুর যৌন বিকৃতির বিভীষিকার রাজ্য করেছিল, তখন তিনি ঠিক কথাই বললেন। ডজন বা শ'য়ের হিসেবে নয়, একটা গোটা রেল গাড়ি বোঝাই করে এখানে মানুষদের খুন করা হত। আর এটা করার জন্যে একখণ্ড পোড়ো জমিতে একটা জংশন রেল স্টেশন করা হয়েছিল। এই স্টেশনটাই সম্পূর্ণ ভান আর মিথ্যা। গাদা গাদা রেললাইন পাতা হয়েছিল। ট্রেন ছাড়ার সময়সূচীকরা হয়েছিল। সময়সূচী অনুসারে সেখান থেকে বিভিন্ন গন্তব্যের ট্রেন ছাড়ার কথা—বার্লিন, ভিয়েনা, প্রাগ, মিউনিখ, বুদাপেস্ত এবং মিলান। আসলে এই স্টেশনটা ছিল একটা যবনিকা। আর পাতা রেলের লাইনগুলো কোথাও যায় নি: যতদূর চোখ দেখতে পারে ততদূর পর্যন্ত লাইনগুলো কেবল পাতা ছিল। বিরকেনাউ ছিল সৈন্যদের এক বিশাল আবাস। সে শিবিরে সৈন্যদের আবাসন স্থানই ছিল শত শত। স্টেশনের গা থেকে আলাগা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এটা। যেন ওই স্টেশনটাকে নিয়ে তার কিছুই করার নেই।

প্রমিক বোঝাই মাল গাড়ি আসত হাঙেরী, রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ড থেকে। গাড়িতে ঠাসা থাকত লোক। দরজাগুলো পিছন থেকে বন্ধ করা। ভেতরে লোকেদের শ্বাস কষ্ট হতো। তারা গাড়ির মেঝের ওপর জড়াজড়ি করে, একজন আর একজনের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে থাকত। ভিতরের বাসী বাতাস হয়ে থাকতো খুবই দুর্গন্ধময়। তবু, অন্ততঃ শেষ পর্যন্ত তারা বিরকেনাউ-এ পৌঁছেছে, যেটা দেখে মনে হয় বড় জংশন রেলওয়ে স্টেশন। দক্ষ আর বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সৈন্যরা এগিয়ে আসতো যাত্রীদের দিকে। অর্কেস্ট্রা শোনা যেত স্টেশনে। যাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হত যে তাদের যাত্রাপথের অগ্নিপরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাদের জন্য স্নানের ঘর প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। তাদের জামাকাপড বীজাণুমুক্ত করে নিতে হবে। তারপর তাদের যাত্রীবাহী ট্রেনে এখান থেকে কাজের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। মানুষ, সবকিছু সত্ত্বেও মানুষ, সমস্ত কষ্টের বিনিময়েও আরও ভালো কিছুর দিকে নিজেকে টান টান করে মেলে দেয়, প্রসারিত করে, যেমন ঘাস নিজেকে মেলে দেয় সূর্যের দিকে। আর মানুষ, আরও ভালো কিছু বিশ্বাস করতে চায়, আপ্রাণ, খুবই চায়। সেই সব লোক বিশ্বাস করত। তাদের যা কিছু বলা হয়েছে তারা তা বিশ্বাস করতে চাইতো। মনে হতো এতেই তাদের মুক্তি।

স্টেশন থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হত আয়তাকার বড় বড় বাড়িতে। সেখানে দরজার ওপর এনামেলের পাতে লেখা ঝুলত: "স্নানাগার—পুরুষ" আর "স্নানাগার—স্ত্রীলোক ও শিশু"।

তারা একটা বড় হল ঘরে যেত—যেটা "মালপত্তর রেখে দেবার জায়গা।" সেখানে তারা তাদের সুটকেশ, জিনিসপত্রের বাণ্ডিল, চটের ঝোলা, এই সব জমা করে দিত। তাদের দেওয়া হতো চকচকে ধাতুর গোল চাকতি। তারপর আসত "জামা কাপড ছেড়ে রাখার ঘর"। সেখানে তাদের আবার দেওয়া হত ধাতুর গোল চাকতি। আর দেওয়া হত এক টুকরো সাবান। তারপর সেই নবাগতরা চলে যেত এক মস্ত ঘরে। সেই ঘর টালি লাগানো। কোন জানালাই নেই, কিন্তু ভালো ভাবে আলোকিত। সার সার শাওয়ার। সেইসব শাওয়ারে ঠাণ্ডা আর গরম জল বয়ে যাচ্ছে। স্নান করে আবার পরিষ্কার হাওয়ার জন্যে কাতর লোকগুলো স্নান করতে শুরু করতো। তারা লক্ষ্যই করতো না যে তাদের পিছনের দরজাগুলো কেবল বন্ধই করে

দেওয়া হয়নি। দরজাগুলোকে বাতাস ঢোকার ফাঁক মাত্র না রেখে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর ছাদের নীচে যে হ্যাচ, ঘুলঘুলির মত, সেখান থেকে গলগল করে বার হয়ে আসত সবুজাভ পাউডার। অতি দ্রুত এক তীব্র বিষাক্ত গন্ধে ঘর ভরে যেত। প্রথমে মানুষগুলো, তাদের গলায় অনুভব করত ঘড়ির টিকটিক করার মত এক ধরনের স্পন্দন। তারপর ভয়ঙ্কর ব্যথা। মনে হতো ব্যথায় ফুসফুস ছিঁড়ে ফেটে আলাদা হয়ে যাবে। সেই সব বন্দিরা তারা এতক্ষণে পুরো বুঝতে পেরে যেতো কি হচ্ছে। তালা বন্ধ দরজার ওপর দৌড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। কাকুতি মিনতি করত। চিৎকার করত। আর যত জোরে পারে সেই কংক্রীটের দেওয়ালের ওপর ঘুসি মারত। কিন্তু হায়রে, এ সবই বৃথা! মিনিট পনেরো পরে তারা সবাই অসম্ভব দৈহিক আর মানসিক যন্ত্রণায় মুচড়ে মর্মান্তিক আতংকে একটু একটু করে মরে যেত। তারা জানতেই পারতো না যে নানান ফোকার দিয়ে তাদের সব কষ্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। তারপর ভেতরের ওই বিষবাষ্প টেনে বার করে নিত শক্তিশালী যন্ত্র। তারপর আসতো একদল বন্দী। তারা আসতো হাতে আঁকশি নিয়ে। টেনে টেনে সরাতো মৃতদেহ। হোস পাইপের জল দিয়ে ধুয়ে দিত ঘরের মেঝে। এক দল বিশেষ লোক আবার তুলে নিত ধাতুর চাকতি, সাবান। ওগুলো পরের স্নানার্থী দলকে দেওয়া হবে। আর একটি বিশেষ দল এল মৃত বন্দিদের আঙুল থেকে খুলে নিত আঙটি, কানের দুল, ছিঁড়ে নিত দামী যে কোন কিছু। মুখের ভেতর থেকে খুবলে তুলে আনতো ধাতু বাঁধানো দাঁত মৃতদেহগুলির শরীরে আর কণা মাত্র মূল্যবান কিছু অবশিষ্ট নেই, এ বিষয়ে সবিশেষ ও কঠোর তল্লাসী হয়ে যাওয়ার পর, তবেই, সেগুলি নিয়ে যাওয়া হোত জ্বালানী চুল্লীতে। এই ভয়ংকর কারখানা দিনে হাজার, কোন কোন দিন একদিনে দেড় হাজার লোক সাবাড় করে দিত। ঘড়ির কাঁটা ধরে সারা দিন রাত কাজ করেও যখন জ্বালানী চুল্লীতে এই বিপুল পরিমাণ "কাঁচা মালকে" ছাই করতে পারতো না, তখন তারও আলাদা ব্যবস্থা ছিল। মৃতদেহ ডাঁই করে ফেলে দেওয়া হত বিরাট বিরাট গর্তে। সেগুলোর প্রত্যেকটার মাপ-জোক একেবারে নিখুঁত। তেল ছিটিয়ে দেওয়া হত ডাঁই-এর ওপর। তারপর জ্বালিয়ে দেওয়া হতো খোলা বাতাসে। এই পদ্ধতিতে গোটা ব্যাপারটা দ্রুত করণের জন্যে, লম্বা ধাতু দণ্ডের আগায় লাগানো হাতা নিয়ে

গর্তের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াত লোকেরা। জলন্ত মৃতদেহ থেকে যে সমস্ত স্নেহজাতীয় পদার্থ, চর্বি গলে বার হচ্ছে সেগুলি তুলে আবার আগুনে ঢালতো। এইভাবে আগুনটা জলতো আরও তাড়াতাড়ি, আর লকলকে হয়ে...

সেরগেই ক্রুশিনস্কি আর আমি যখন বিরকেনাউ গিয়েছিলাম তার আগেই সেই মিথ্যা জংশন স্টেশনের বাড়িঘর, আর বিষবাষ্প দেবার মরণখোপগুলো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তালগোল পাকিয়ে পড়েছিল রেললাইন। চূর্ণবিচূর্ণ কংক্রীটের ডাঁই-এর ফাঁক থেকে একটা অতি সাধারণ রেলের সময়-সারণী উঁকি দিচ্ছিল: "এখান থেকে গাড়ি ছাড়ে, যায় ভিয়েনা...বেলগ্রেড,...প্যারিস...মিলান..."। এক পোলিশ পার্টিজানের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তার পরিধানে ছিল রেল-কর্মীর পোশাক। মাথায় ছিল চৌকো টুপি। সে রুশ ভাষা জানতো। এখানে যা কিছু হত, তার সব কিছু সে আমাদের বলেছিল। সে আমাদের সেই তথাকথিত স্নান-ঘর দেখিয়েছিল। সেটা তখন ধ্বংসস্তূপ। আর দেখিয়েছিল ধূসর পিণ্ড পিণ্ড অবস্থায় কিছু তাল। দেখে মনে হয় যেন সাদা পাথরের টুকরোয় কাঠকয়লা মেশানো। এটা ছাই। মানুষের ছাই। জ্বালানী থেকে আসা পিণ্ডীভূত ছাই। স্থানীয় লোকেরা বলত "ফায়ার প্লেস"। বড় অদ্ভুত ভাবে ভেঙে গেছে এটা। যেন যন্ত্রণায় ব্যথায় চাপা কাতরানি আর বিলোপ করছে ও। আর মানুষের কাছে যেন ও ভিক্ষা করছে সমুচিত শাস্তি বা প্রতিশোধ।

এই শিবিরে সেরেরয়ানা সাজমাযেস্কা ছিলেন ঠিক দুবছরে সামান্য বেশী। দু বছর তিনি বিরকেনাউ-এর জ্বালানীর চুল্লী থেকে বার হয়ে আসা ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছেন। আর ছাই গুঁড়োয় ঢাকা কালো তুষারের ওপর দিয়ে হেঁটেছেন। আতংকিত হয়ে তিনি আদালত কক্ষে মনে করে আরও কিছু বিস্তারিত ভাবে বললেন, যা দুবছর আগে পোল্যাণ্ডের সেই রেল কর্মী হয় কোনদিন দেখতে পায়নি, কিংবা সেই রেলকর্মী আমাদের কাছে বলবার সাহস পায়নি। এই ভদ্রমহিলা দেখেছেন বিষবাষ্প দেওয়ার বড় কঠুরিতে দলে দলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শিশু আর কচি বাচ্চাদের।

"শিশু আর কচি বাচ্চাদের মেরে ফেলা এস এস-দের কাছে ছিল এক খেলা ধুলোর আসরের মত। ব্যাপারটায় তারা তীব্র উত্তেজক আনন্দ পেত।

ওদের মধ্যে একটা লোক ছিল, তার নাম এ্যাডলফ। বাবা মার সামনে কচি বাচ্চাকে গুলি করে মারাই ছিল তার আমোদ...যখন জ্বালানী চুল্লীগুলো আর কাজ সামলে উঠতে পারতো না, শিশু আর কচি বাচ্চাদের স্রেফ গুলি করা হত...বর্বর জানোয়ার সব, সত্যিকারের বর্বর পশু!"

সেই মহিলা প্রায় চিৎকার করেছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসছিল। যেন আদালত কক্ষের সেই গম্ভীর, নিশ্ছিদ্র নীরবতার মধ্যে যেন সেই মৃত্যুযাত্রী কচি শিশুদের তাঁর সামনে গুলি করা হচ্ছে। তারপর তিনি কাঠগড়ার দিকে ফিরলেন, তার দুর্বল ফিসফিসে গলায় এক প্রশ্ন করলেন, আমাদের ইয়ার-ফোনের মারফৎ আমরা তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

"বন্দী শিবিরে যে সমস্ত নারীরা ছিল, তাদের সকলের হয়ে জার্মানদের কাছে আজ আমি জানতে চাই: 'আমাদের ছেলেমেয়ে বাচ্চারা কোথায়।"

আর সেই মুহূর্তে প্রত্যেকে দেখল সেই নাজী খুনীদের। সেই খুনীরা যারা আদালতের কাজকর্মের মোটামুটি শান্ত আর মসৃণ পদ্ধতিতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ওরা নিজেদের মধ্যে আস্তে কথা বলত। টুকটাক নোট লিখে রাখত। মাঝে মাঝে চিউইং-গাম চিবোত ওরা। ওরা নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। এখন ওদের চোখ নীচের দিকে নামানো। ওপরে তুলতে পারছে না। ঘাড়ের ওপর মাথা লটকে আছে।

গোটা আদালত কক্ষ আবার চুপচাপ যখন আকাদেমী সদস্য জোসেফ ওরবেলি সাক্ষীর পাটাতনে উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ, সুদর্শন মানুষ। কোঁকড়া কোঁকড়া ধূসর দাড়ি। দেখে মনে হয় যেন ওল্ড টেস্টামেন্টের, পূর্বখণ্ডের একজন অবতারের মত দেখতে তাঁকে। তিনি গর্ব করে উঁচু মাথায় জানালেন যে যতদিন লেনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ ছিল সেই পুরো সময়টা তিনি লেনিনগ্রাদে ছিলেন। তিনি কথা বললেন দুইভাবে। এক, সাক্ষী হিসেবে। আবার বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিল্পকলার পক্ষে একজন অভিযোগকারী হিসেবে। জার্মান সৈন্যরা হিটলারের আদেশ কিভাবে পালন করছে তা তিনি দেখেছিলেন। সেনাবাহিনীর কাছে কেইটেলের মাধ্যমে সেই আদেশ জানানো হয়েছিল, "নগর হিসেবে পিতার্সবার্গ ধ্বংস করে দাও" আর "সেটা করা হলেই তবে আমরা ফিনল্যাণ্ড ও সন্নিহিত দেশের দিকে মন দিতে পারি।" তারা খুব চিন্তাভাবনা করে

পরিকল্পনামত লেনিনগ্রাদের ওপর কামানের ভারী গোলা ফেলতে লাগল। আর আকাশ থেকে বোমা ফেলতে লাগল। ওরবেলি দেখেছিল যে শত্রু আলাদা আলাদা করে ভাগে ভাগে শহরটাকে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করছে। আরও দেখেছিল শত্রুর বিশেষ লক্ষ্য শিল্প ও স্থাপত্যের কীর্তিকে চূর্ণ করে দেওয়া।

শিক্ষাশ্রমের নির্দেশক হিসাবে ওরবেলি সেই ভবনের সীমানার মধ্যেই বসবাস করতেন। এই বিশ্ব বিখ্যাত শিল্প-বস্তু সংগ্রহশালায় জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী নিরবচ্ছিন্নভাবে ভারী কামানের গোলা ও বোমা বর্ষণ করত। প্রতিবাদী, অর্থাৎ যুদ্ধ-অপরাধী আসামীপক্ষের আইনজীবী তৎক্ষণাৎ সাক্ষীকে জেরায় পাল্টা আক্রমণ করতে চাইল। উদ্দেশ্য তাঁর সাক্ষ্যে ওরবেলি যে ধারণার সৃষ্টি করেছেন, তা তছনছ করে দেওয়া।

"মিস্টার ওরবেলি, আপনি কি একজন গোলন্দাজ? আপনি, যিনি একজন পেশাদার গোলন্দাজ নন তিনি কি করে বুঝবেন যে জার্মান বাহিনী তাদের কামান ও বোমার আক্রমণ আপনার সংগ্রহশালা বা আশ্রমকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল এবং কাছাকাছি সেতুগুলোই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না? যুদ্ধের কৌশলগত আক্রমণের লক্ষ্য কি সেতু নয়?"

"আমি কোনদিন গোলন্দাজ ছিলাম না।" সঙ্গে সঙ্গে ওরবেলি উত্তর দিলেন। "আমার ধারণা জার্মান গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য যদি সেতুই হবে তাহলে, সেতুতে গোলা লাগবে আর সেতু পেরিয়ে আশ্রমবাড়ির গায়ে গোলা লাগবে তেত্রিশটা, তাতো হতে পারে না। এই ঐতিহাসিক ভবন আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কেবলমাত্র অসামরিক প্রতিরক্ষায় অসীম বীরত্বের জন্য। আমি এ কথা আবার বলছি, মাননীয় বিচারপতি", তিনি বিচারকদের দিকে ফিরে বললেন, "আশ্রম ভবনের গায়ে গোলা লাগে তেত্রিশটি আর কাছেই বড় সেতুর গায়ে লাগে মোটে একটা। আমি নিশ্চিতভাবে জোর দিয়ে বলতে পারি যে, সংগ্রহশালাই ছিল নাজীদের আক্রমণের লক্ষ্য। এই সীমার মধ্যে—আমি একজন গোলন্দাজ।"

যদি বিচারকক্ষে হাততালি দেবার অনুমতি থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে ওরবেলি বিপুল অভিনন্দন পেত।

এমনকি লর্ড লরেন্স যিনি সাধারণতঃ দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সাময়িক বিরতি ঘোষণা করার সময় রোজই এই কথাগুলি বলতেন, "আপনাদের কি

মনে হয় না, ভদ্রমহোদয়গণ, যে সাময়িক বিরতি ঘোষণা করার সময় হয়েছে", তিনিও আজ তার ভাষা সামান্য বদলে নিলেন।

"আপনাদের কি মনে হয় না, ভদ্রমহোদয়গণ, যে সাক্ষীর এইরকম এক অপূর্ব সাক্ষ্যদানের পর সাময়িক বিরতি ঘোষণার সময় হয়েছে।"

সাক্ষ্যদানের শেষে ওরবেলি নেমে আসার পর, ভিসনেভস্কি, সায়ানভ এবং লেনিনগ্রাদের অন্যান্য লোকেরা যারা তাদের নগরীর উৎসাহী সমর্থক, তারা সেই আকাদেমীসদস্যকে সাংবাদিক ও স্বাক্ষর শিকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে আমাদের কাছে নিয়ে এল।

"আপনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত বলেছেন", জোরে বলে উঠল সায়ানভ। আকাদেমী সদস্যের হাত দুটি সে আবেগে জড়িয়ে ধরে আছে।

"উহুঁ, তুমি ঠিক বলনি। এই বিচারে ঈশ্বর কেবল চোখ বুজে থাকতে পারেন অথবা কর্ম-সহযোগী হতে পারেন। যতদূর জানি আইনে একটা ধারা আছে, যেটা বলে যে চোখ বুজে থাকাটাও দণ্ডযোগ্য অপরাধ," সাফল্যের উত্তেজনায় কৌতুক করল ওরবেলি।

"তুমি একেবারে ওদের ওপর পেরেক ঠুকে দিয়েছ......গুঁড়ো করে দিয়েছ...এই সমস্ত নোংরা আবর্জনাকে একেবারে সাফ করে দিয়েছ", ভিসেনেভস্কি বলল তার স্বভাবসিদ্ধ দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে প্রতিটি শব্দ আলাদা উচ্চারণ করে। "আমি অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের একজন বসবাসকারী হিসাবে, একজন নৌ-অধিনায়ক হিসাবে, আর সোভিয়েত নাগরিক হিসাবে—তোমার হাতে হাত মেলাচ্ছি। তুমি বিরাট...দারুণ...তুমি সত্যিকারের সফল!"

য়ুরী ইয়ানোভস্কি, শহুরে শান্ত মানুষ, আমাদের ভীড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে এমনিতেই মুখ চাপা এবং আমার ধারণা লাজুক। সেই আকাদেমীসদস্য ওরবেলির চারদিকে উচ্চকলরব থেমে গেলে সে এগিয়ে এসে কেবল ওরবেলির সঙ্গে করমর্দন করেছিল।

বিচারের প্রথাগত পদ্ধতি অনুসারে যেকোন সাক্ষীর পাটাতনে উঠে দাঁড়াবার পর, এক হাত রাখতে হত বাইবেলে আর অন্য হাতের দুটি আঙুল তুলে শপথ গ্রহণ করতে হত।

"আমি শপথ করছি যে, সত্য বলব, সম্পূর্ণ সত্য বলব, সত্য ছাড়া অন্য কিছুই বলব না।"

সোভিয়েত সাক্ষীদের বাইবেল স্পর্শ করে শপথ নিতে হত না, কিন্তু তাদের অভিযোগের সত্যতা, আগুনের শিখার মত শক্তিতে, প্রতিবাদী অপরাধীদের অপরাধ-কঠিন হৃদয়ের ভেতরেটাও পুড়িয়ে খাক করে দিত। আমাদের সহকর্মীরা ডক্টর গিলবার্টের কাছ থেকে জানতে পারল, যে এমনকি গোয়েরিং, যার আহার নিদ্রা দিব্যি চলছিল, সেই গোয়েরিং-এরও এবার খিদে কমে গেছে।

৪। ষষ্ঠ বৃহৎ শক্তির কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ

এই শনিবার, আদালত থেকে ফেরার সময় আমি আর ক্রুশিনস্কি এক ধরনের অর্থহীন ঝামেলার পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়লাম। টাইপ করে যে মেয়েরা তারা সেদিন সন্ধ্যায় নুরেমবার্গ ঘুরে দেখবে বলে ব্যবস্থা করেছে। এখনো নাকি ওদের সবকিছু ঠিকমতো দেখা হয় নি। এই কারণে সব সাংবাদিকদের গাড়ি তলব করা হয়েছে। আমার গাড়ির তলব তো হবেই, কেননা তার নিজের সহরে কুট' একজন ওস্তাদ।

সুতরাং সেদিন আমি আর ক্রুশিনস্কি গাড়ি বিহীন। রাস্তার ওপর অধৈর্য হয়ে একটা ভ্যানের অপেক্ষায় আছি, যেটা আমাদের প্রেস ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। আমরা যখন অপেক্ষা করছি তখন দেখলাম যে রাস্তার ওপর দিয়ে একটা জীপ গাড়ি তীব্র বেগে যেন বুনো আহ্লাদে ছুটে যাচ্ছে। পেগি চালাচ্ছে জীপ। নিউ ইয়র্ক মহিলাদের পত্রিকার সাংবাদিক প্রতিনিধি। মহিলাকে আমরা, সাংবাদিকরা জানতাম—তাঁর প্রচুর, আমি বরং বলবো, তাঁর চেয়ে দেখার মতো সুন্দর চাহনি, অপচয় করার ক্ষমতা আর অসম্ভব কোন কিছুর পেছনে বাজী ধরার ব্যাপারে অত্যুৎসাহ যা এক ধরনের অন্ধ আবেগ বলা চলতে পারে, তার জন্যে। উনি জীপ গাড়ির ব্রেক সম্পূর্ণ দাবিয়ে দিলেন। গাড়ির চাকা পথের ওপর ঘেঁসটে প্রায় ন ফুট চলে আমাদের পাশে এসে থামল।

"প্রেস ক্যাম্প?"

"হ্যাঁ।"

"প্লীজ…উঠে পড়ুন…ঠিক আছে?" ইংরেজী আর রুশ ভাষার এক জগাখিচুড়ি করে উনি বললেন।

আমরা পেছনের আসনে উঠে বসলাম। এই ছিমছাম পরিপাটি গাড়িতে

চড়া থেকে আমাদের কপালে যে কি আসতে পারে সে সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ ধারণাও আমাদের ছিল না। আজ পেগি আমেরিকান সৈনিকের পোশকে সজ্জিতা—কোমরের কাছে চওড়া কোমরবন্ধনী দিয়ে উচ্চাংশের গায়ের জ্যাকেট বাঁধা। নিতম্বের কাছে ঢিলেঢালা চোগা বা পাতলুন, পায়ের ওপর সাদা পট্টি দিয়ে আঁট করে বাঁধা। ফিতে বাঁধা পায়ের জুতো। জুতোর সোল উঁচু। বোধ হয় তার ছোট পায়ের মাপ মতো মানানসই করে বিশেষভাবে তৈরী। তার চকচকে তাম্রবর্ণ অলক গুচ্ছ সৈনিকের টুপির ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান। ওনার সবচেয়ে প্রিয় হবি হল পোশাক। আর যেকোন পোশাকে, ওনার ক্ষমতা ছিল একজন পেশাদার বিজ্ঞাপন-বালার মত সাজানোর। দেখে মনে হত যেসব পত্রিকার জন্যে উনি কাজ করেন, সেইসব পত্রিকার কোন সৌখীন পোশাক বিষয়ক পাতার থেকে উনি উঠে এসেছেন। আইন বিষয়ক সমস্ত স্টাফদের মন উনি জয় করেছিলেন এবং আমাদের সাংবাদিক প্রতিনিধিদেরও মনও। যেসব জায়গায় যাওয়ার অনুমতি আমাদের সাংবাদিক প্রতিনিধিদেরও দেওয়া হত না, যেসব জায়গাতেও ছিল তাঁর অবাধ গতি। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি কেবল একা নিজের কাজেই লাগাতেন না। যেকোন দেশ থেকে আসা সব সাংবাদিককেই তাঁর দ্বারা যা সম্ভব, যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। যেমন ধরা যাক, উনি ডাঃ গিলবার্টের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ গিলবার্টের মাথায় ছোট ছোট কদম ছাঁট চুল। ময়লা রঙ। একপাশ থেকে দেখলে তাঁর মুখাবয়ব কোন বড় পদকের মত। তখন পর্যন্ত, অর্থাৎ উনি আলাপ করিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত, প্রেসের পক্ষে ডাঃ গিলবার্ট ছিলেন অগম্য, সম্পূর্ণভাবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

তাই, আমরা যখন সাদাসিধে মনে জীপে উঠলাম, তখন ওই অঘটন পটিয়সী মহিলা যে আমাদের কপালে কি তুলে রেখেছে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। আমরা বসতেই উনি লহমায় গাড়ির গতি শূন্য থেকে সত্তরে চড়িয়ে দিলেন। আমরা ন্যুরেমবার্গের রাস্তা দিয়ে উড়ে চললাম। দুপাশের ধ্বংসস্তুপের মাঝে পথের ওপর আমাদের বোধ হয় দেখাও যাচ্ছিল না।

আমরা জানতাম সহরে পথ দুর্ঘটনার হার সম্প্রতি বেড়েছে। পথ দুর্ঘটনা এত ঘন ঘন হচ্ছে যে সামরিক কর্তৃপক্ষ বেপরোয়া চালকদের সাবধান করার

জন্যে সংকেত দেবার ব্যাপারে বেশ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন : একটা জীপ গাড়ি যেটা দারুণ ধাক্কা খেয়ে তোবড়ানো টিনের পাত্রের মত প্রায় হয়ে গেছে, সেটা একটা চত্বরের মধ্যে ইঁটের বেদীর ওপর দাঁড় করানো। অর্থবহ সংকেতটি হল "আমি আগের গাড়িকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইছিলাম।" এই বাক্যটি বেদীর চারদিকে চারটি ভাষায় লেখা। যেকেউ ঘন্টায় ৫০ মাইলের বেশী বেগে গাড়ি চালাবে তাকে ধরবার ও কঠোর শাস্তি দেবার নির্দেশ সামরিক পুলিশ বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা চলেছি ঘন্টায় ৭০ মাইল বেগে। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সামরিক পুলিশের একটা জীপ তেড়ে গাঁক গাঁক করতে করতে আমাদের পিছনে ধাওয়া করেছে। যে সমস্ত বাঁক নেওয়া অবিশ্বাস্য, তাই নিচ্ছে পেগি। ওর চুলের গোছা ভিজে ঘাড়ের ওপর লেপটে যাচ্ছে। ওর মুখে ঝলক আর চমক। চোখে আগুন। ঠিক যেমন 'মার দাঙ্গা' মারকা ছবিতে দেখা যায়।

"মাথা খারাপ হয়েছে তোমার পেগি ? এ তুমি কি করছো ?"

"আমি বুঝতে পারছি না", উনি জবাব দিলেন ভাঙা ভাঙা অশুদ্ধ রুশ ভাষায়।

"গাড়ির গতি এখুনি কমিয়ে দাও। পিছনে সামরিক পুলিশ।"

"গোল্লায় যাক ওরা", বেপরোয়া উত্তর দিয়ে, ছেলেদের মত থুতু ছিটোল।

ওকে গ্রেপ্তার করার জন্য যারা অনুসরণ করছিল তারা বোধ হয় কোন কানা সরুগোলিতে ঢুকে গিয়ে থাকবে যার জন্যে দুই এক মুহূর্ত ও এম. পি-দের হারিয়ে ফেলল। কিন্তু ওদের ছিল পুলিশের গার্ড। তাতে তো বেতার যন্ত্র আছে। আমরা তো এগিয়ে চললাম আর অন্য রাস্তা দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথ ধরলাম স্টেইনে যাবার। বাস্! একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর মারদাঙ্গা মার্কা ছবির আবহাওয়া আরও জোরদার হয়ে গেল। এ কি পরিস্থিতিতে পড়লুম রে বাবা! সামরিক পোশাকে দুজন সোভিয়েত অফিসার এক আমেরিকান গাড়ির পিছনের আসনে বসে। তাদের মাথা নিয়মিত ঠোকা যাচ্ছে। আর এইসব কিছু এই ক্ষেপা বালিকার জন্যে!

"থামো!" আমি ওকে ঘুঁষি দেখালাম।

ওর ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসতে লাগলো। আর তখনই কানের

ওপর ধাক্কা মারতে লাগল পিছন থেকে আসা পুলিশের গাড়ির নির্দিষ্ট বিরতিতে থেমে থেমে কাঁপা কাঁপা সাইরেন। প্রথম যে গাড়িটা আমাদের পিছু নিয়েছিল আর সেটাকে নিশ্চয়ই আমরা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি সেই গাড়িটা নিশ্চয়ই কোন বেতার বার্তা পাঠিয়েছে। তাই দ্বিতীয় আর একটা গাড়ি এখন আমাদের ধাওয়া করছে।

"থামো!" আমি এমন একটা ভাব করলাম যেন পিছন থেকে তার গলা টিপে ধরবো। কিন্তু পেগি কেবল তার মাথাটা ঝাঁকাল। তার চুল পতাকার মত উড়ছে। কি হাস্যকর, উপহাস্যাস্পদ ব্যাপার! মনে হচ্ছে যেন আমাদের বারোটা বাজতে চলেছে এক্ষেত্রে এই *স্টার এবং স্ট্রাইপস*-এর হাতে। ও একেবারে অকস্মাৎ ঝটতি এক বাঁক নিল। গাড়ির মুখ ঘোরাল। তারপর হামা দেওয়ার মত গুটি গুটি এক ধ্বংসস্তূপের আড়ালে চলে গেল। আমাদের ধরবার জন্যে যারা পিছনে আসছিল তারা আমাদের অতিক্রম করে সাঁ করে পেরিয়ে গেল। তারপর পেগি আবার রাস্তা বদলে স্তেইনের দিকে গাড়ি চালাল। বেশ সম্ভ্রান্তভাবেই গাড়িতে বসে আমরা প্রেস ক্যাম্প পর্যন্ত গেলাম। প্রেস ক্যাম্পে ঢোকার যে প্রধান প্রবেশ পথ তার পাশে পেগি আমাদের নামিয়ে দিয়েই আওয়াজ করে, কোথাও হাওয়া হয়ে গেল। চিরাচরিত গদ বাঁধা "ধন্যবাদ" শব্দটার জন্য অপেক্ষা না করেই। আমরা যখন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছি, তখন দেখলাম যে সামরিক পুলিশের একটা গাড়ি ফটকের পাশ দিয়ে তীরের মতো চলে গেল।

অল্প কথায় মধ্যাহ্ন ভোজের আগে সত্যি সত্যি আমাদের এক পর্ব হয়ে গেছে যাকে বলে "ঘোল খাওয়ানো"।

আমি এই মজার ঘটনাটার বর্ণনা করলাম এই কারণে যে কদিন থেকে মনে হচ্ছে, মন চাইছে যে আমার সহকর্মীদের কথা কিছু বলি। সেই সব বিদেশী সাংবাদিকদের কথা বলি, যাঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি, সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সকলেই বিশেষকিছুই জানি না। বিশেষভাবে তাঁদের সম্পর্কে যাঁরা পাশ্চাত্যের লোক। আমায় স্বীকার করতেই হবে যে বিচার শুরু হওয়ার গোড়ার দিকে তাঁদের সম্পর্কে আমাদের কিছু মন গড়া ধারণা ছিল। আমরা নিজ নিজ দলে থাকতাম। নিজ গোষ্ঠী অনুসারে দল বেঁধে প্রেস-বক্সে বসতাম। সেইভাবেই পানশালায় যেতাম ও সেইভাবে

এক সঙ্গে পানশালা থেকে বার হয়ে আসতাম। যে কোনভাবেই হোক না কেন যেন মানসিক প্রবৃত্তির দিক থেকেও আমরা বিদেশীদের থেকে দূরে থাকবার জন্যে নিজেদের চারদিকে বেড়া দিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে এমন কি অদ্ভুত একজন ছিল। সেই অদ্ভুত করতো কি কোনো বিদেশীর সঙ্গে পরিচিতির সময়, সে নিজের পরিচয় দিতো এক একজনের কাছে এক একটা আলাদা আলাদা নাম বলে। সে হাস্যকরভাবে ভাবতো তার যথার্থ যে নাম, সে নাম গোপন থাকলো। কেন না নাম গোপন রাখাএকটা রাষ্ট্রীয় গোপন ব্যাপার। মহা আলাতন! ড্যানীল ক্রামিনভ-এর কথা বলি। সব দিক থেকে সে ভাগ্যবান। কেন না সোভিয়েত সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে ও কাটিয়েছিল দ্বিতীয় সীমান্তে। ও ছিল ভারী বুদ্ধিমান। আর ইংরাজী জানত, যাকে বলে চমৎকার রকম ভালো।

আমরা সোভিয়েত সাংবাদিকরা, বিশেষতঃ যারা সামরিক পোশাকে আসতাম, তারা এই ন্যুরেমবার্গে বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কেননা আমাদের সামরিক উর্দি তাতে প্রতিফলিত হত "লাল ফৌজ"-এর গরিমা। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নাবলীর উত্তর আমাদের প্রথম দিতে হত। বিদেশী সাংবাদিকরা, এমনকি ইংরেজরাও যারা "সাধারণ লোকের ভীড়"-এর সঙ্গে মানসিক দিক থেকেই কাছাকাছি আসত না আর নিজেদের বৃত্তে যারা ঘোরা ফেরা করতো, সেই ইংরেজরাও সাধারণতঃ আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইত, আলাপ করতো আর আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতো। অথবা প্রেসক্যাম্পে হামেশা ভোজ উপলক্ষে যেসব জমায়েত হত তাতে এসে তারা আমাদের কাছে "রুশ কর্ণার" বা "রুশ টেবিল"-এ এসে যোগ দিত, বসত।

আমাদের বিদেশী সহকর্মী বন্ধুরা যে কেবল ভদ্রতাবশেই আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতো তা বোধ হয় নয়। একটা পেশাদারী ধরনের আগ্রহও ছিল এর পিছনে। তা হল যুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজের রুশীয় যে কোন কিছুর বিষয়ে আগ্রহী হওয়া, আর সে আগ্রহও ছিল পেশাদারী। ম্যাডেলাইন ছিল প্যারিস থেকে আসা মহিলা সাংবাদিক। উৎসাহে টগবগে। সব সময়েই সে কৌতূহলোদ্দীপক বা আগ্রহ সঞ্চারী বিষয় বস্তু চুঁড়ে বেড়াচ্ছে। ওর তোলা অনেক ছবি আমেরিকার ডাক সাইটে পত্রিকা লাইফ-এ দুপাতা জুড়ে ছাপা হয়েছে। ম্যাডেলাইন আসতো কোন

কোন সন্ধ্যায়। রুশ ভাষা জানে তার এমন কোন স্বদেশবাসীকে ধরে নিয়ে আসতো আমাদের কাছে। তারপর সেই রুশ ভাষা জানা তার স্বদেশীয়ের মাধ্যমে আমাদের বলতো লাল ফৌজের দুর্ধর্ষ সব লড়াই, যুদ্ধের কথা বলতে। স্বদেশ রক্ষার লড়াই-এর কথা জানতে চাইতো। আর বিশেষভাবে জানতে চাইতো সোভিয়েত নারীদের কথা। খুব মন দিয়ে শুনতো সে। মাঝে মাঝে টুকটাক খাতায় কিছু লিখেও নিত। আমাদের সেই খুব সাবধানী সহকর্মী, যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েই যেতো বিদেশীদের কাছে তার আসল নাম গোপন রাখার জন্যে, সে বসে থাকতো তফাতে। আর তফাতে বসে গোলামের মত নত, হীনভাবে বলতো—একজন গুপ্তচর। এই মহিলা একজন গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু না। এই কথাটা সে হামেসা আমাকে গেলাতে চাইতো। আর এর থাকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল কৌশলী মিখাইল খারমালভ। তার কাছেও ও একই সন্দেহ প্রকাশ করতো মেয়েটির সম্পর্কে। আর মিখাইল তাকে সাফ সাফ বলে দিত জাহান্নমে যেতে।

এক ইংরেজী টেলিগ্রাম এজেন্সীর হয়ে এখানে কাজ করতো এরিক। তার চোখ দুটি নীল। আমুদে আর উৎসাহে ভরপুর। এক একদিনে চার কিংবা পাঁচটা বিবরণ সম্বলিত তারও সে পাঠাতে পারত এবং পাঠাতও। রুশ ভাষা শেখার জন্যে এরিক সময় করে নিয়েছিল। সে মজা করে বলতো যে রুশ ভাষা না শিখলে কোন সাংবাদিকের পক্ষে আর জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। সে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে প্রতিদিন অন্ততঃ দশটি নতুন রুশ ভাষা সে শিখবে। আর কদিনের মধ্যে সত্যি সত্যিই সে বেশ খানিকটা বুঝতে আরম্ভ করল। একজন শ্রদ্ধেয় আমেরিকান ভদ্রলোক, যিনি ছদ্মনামাই থাকবেন, তাঁর ছিল অবাক করা নীলচে নাক। হুইস্কির সঙ্গে তাঁর যে পুরোনো দস্তি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি আমাদের আনন্দ দিতেন মজার মজার দ্বিভাষিক বাগবৈশিষ্ট্য, যা তিনি গঠন করতেন কুশলী দক্ষতার সঙ্গে।

ছোটখাটো আর খুব কাজের সুইস সাংবাদিক প্রতিনিধি ছিল একজন। তার চুল সোনালি, চোখ নীল। সে আমাদের বলেছিল যে তার দেশের রাজধানী ও বিভিন্ন প্রদেশের বারোটা পত্রিকার বা কাগজের জন্যে সে লিখছে। সব রকম মতামত ও প্রবণতার কাগজ আছে এর মধ্যে, চরম

দক্ষিণপন্থী থেকে চরম বামপন্থী পর্যন্ত। আর একই সঙ্গে প্রত্যেকটি কাগজের জন্যে সে ঠিক ঠিক মানানসই তথ্য যুৎসই বিষয় ও প্রসঙ্গ ঠিকই গুছিয়ে নিতে পারছে। অবশ্যই এই সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ব্যাপারে তার মতামত ছিল একেবারেই পরস্পর বিরোধী। তার নিজ ভাষা ছিল দুটি—যথাক্রমে বাবা ও মার দিক থেকে—ফরাসী ও জার্মান। একদিন এই ব্যাপারটা এই বেচারাকে এক কেলেংকারীর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। ভুলক্রমে সে তার প্রবেশ-পত্র তার ঘরে ফেলে যায় ও সেটি ছাড়াই প্রেস ক্যাম্প-এ ফিরে আসার চেষ্টা করে। প্রহরারত রক্ষী তাকে আসতে দেবে না। সে তাকে ফরাসী ভাষায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করানোর চেষ্টা করল। কিন্তু রক্ষী ফরাসী ভাষা বোঝে না। তখন সে উত্তেজিত হয়ে জার্মান ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করল। আর এটাই হয়ে গেল দারুণ দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। রক্ষী ভাবল লোকটা জার্মান। তাকে ধাপ্পা দিয়ে প্রেস ক্যাম্পে ঢুকতে চাইছে যদিও পরিষ্কার সব বিজ্ঞপ্তি টাঙানো রয়েছে যে জার্মানদের এখানে প্রবেশাধিকার নেই।

"তবে রে শয়তানের পো, এই তোর খেল!" সামরিক রক্ষী তার ঘাড়ের কলার ধরে টানতে টানতে তাকে হিড়হিড় করে নামিয়ে সেই রাজকীয় প্রবেশ পথের মনোরম মর্মর পাথরের সিঁড়ির ওপর ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল।

প্রেস ক্যাম্পের পড়বার ঘরে টেবিলের ওপর প্রতিদিন সকালে নানা দেশের নানা কাগজ, পত্র-পত্রিকা রেখে দেওয়া হত। আমাদের সংবাদপত্রও *প্রাভদা*, *ইজভেস্তিয়া* এবং *ট্রাড*ও, নিয়মিত বিমানে পাঠানো হত। রুশদের সম্পর্কে আগ্রহ এত বেশী ছিল যে কাগজগুলো রাখা মাত্র উধাও হয়ে যেত। আমাদের যে সব কর্মী রুশ ভাষা শিখছিলেন, তাঁরা কাগজগুলিকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যেতেন। 'প্রেস ক্যাম্প'-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন মেজর ডিন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল খুবই চমৎকার। তাঁর কাছে, মানে তিনি অভিযোগও পান কাগজ ঘরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে। এই সব মানে সোভিয়েত সাংবাদিকের ওপর এই যে আক্রমণাত্মক সমাদর এ বস্তু কি করে বন্ধ করা যায় এ নিয়ে আমরা তাঁকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে আলোচনাও করেছি। আর যাই হোক, কাগজগুলো তো আঙটায় কিংবা শিকলে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা যায় না।

স্লাভ দেশ থাকা আসা প্রায় প্রতিটি সাংবাদিক প্রতিনিধির আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশের ঘটমান সব কিছু. প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তারা যে আগ্রহ দেখাত. তাতে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। তারা প্রায় সকলেই নানা সময়ে আমাদের বলেছে যে স্বল্পকালের জন্য হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে ব্যবস্থা করতে আমরা যেন তাঁদের সাহায্য করি।

আমাদের প্রতীচোর সহকর্মীরা সাংবাদিকতাকে উল্লেখ করত "পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ শক্তি" বলে।

এই টাওয়ার অফ ব্যাবেল ওরফে প্রেস ক্যাম্পে পৃথিবীর ষষ্ঠ শক্তির প্রতিনিধিত্বে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আসা নাগরিকরা কেমন ঝাঁক বেঁধে ছিলেন। একজন সাংবাদিক. নাম র‍্যালফ পারকার অতি সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে বিমানে এসে পৌঁছেছে। দ্বিতীয় উক্রাইনীয় যুদ্ধ সীমান্ত দ্নিপার-এর পশ্চিম তীরে তুমুল যুদ্ধের সময় আমাদের আগে সাক্ষাৎ আর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে যখন শুনল যে আমি ন্যুরেমবার্গে আছি, সে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ হাচিনসন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত আমার দুটি বই ; বড় এক বোতল ভোদকা, এক টিন কালো ক্যাভিয়ার নিয়ে আমার কাছে চলে এল। এ সবই আনল আমাদের অতীত সাক্ষাৎ. মহব্বতের সম্মানে আনন্দ ফুর্তি করার জন্যে। মেজর ডিন র‍্যালফ পারকারের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন প্রেস ক্যাম্পে তার সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করার ও তাকে অভ্যার্থনা জানানোর—সে সরাসরি সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে সিধা বলে দিয়েছিল যে সে তার রুশ বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে মিলতে চায়। আমাদের এখানে অনেকেরই সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল আগে মস্কোতে। মস্কোতেও ওর খুব নাম, সুখ্যাতি। আমরা সানন্দে ওর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। যাইহোক, রুশদের উদ্দেশ্যে এই ভোজসভা অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করলো। নীল রঙের বসবার ঘর, মানুষজনে এমন ঠাসা হয়ে গেল যে চেয়ারের অকুলান হল। কেউ কেউ বসে পড়ল জানলার সামনের তাকে এমনকি মেঝের ওপরও। তার আনা ভোদকা এতগুলি গেলাসে চালতে হল যে কেউই এক অঙ্গুষ্ঠানা, অর্থাৎ সেলাই করার সময় সূচের আঘাত এড়ানোর জন্যে আঙুলে যে আবরণ পরা হয়, তার চেয়ে বেশী পেল না। আর সেই ক্যাভিয়ার কেটে ছোট

ছোট টুকরো করে, এত ছোট পরিবেশন করা হল, যে তা নিছক চিহ্নমাত্র। সেই সন্ধ্যা কাটলো ভারী আমোদে। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মানার্থে উদ্দেশ্যে মদ্যপানের প্রতিটি প্রস্তাব, নানা ভাষায় মিলিত "হুর রা" চিৎকারে প্রতিবার সম্বর্ধিত হল।

এখানে বসন্তের সূচনা কাল অনেকটা আমাদের বিদায়ী শরৎকালের মত। এই সময়টা ঘরের ভিতর কাটানোই সব চেয়ে ভাল। এই সময়টায় প্রেস ক্যাম্পের বসবার ঘর, পড়বার-ঘর আর পানশালায় আমাদের বিদেশী সহকর্মীদের সঙ্গে নানা কথাবার্তায়, তর্ক বিতর্কে আমরা জড়িয়ে পড়তাম। এই সব তর্ক বিতর্ক কখনো কখনো পরিণত হত তুমুল বাক বিতণ্ডায়। তবে অধিকাংশ সময়েই এই সহ আলোচনা ছিল সরস হাস্য পরিহাসে ভরা।

অধিকাংশ বিতর্কে ড্যানীল ক্রাসিনভই ছিল আমাদের প্রধান মুখপাত্র তথা বক্তা, কেননা আমাদের বিদেশী সহকর্মীদের সঙ্গে ও তাদের কাজকর্মের পরিবেশের সঙ্গে সে সুপরিচিত।

"আমার কাগজে যে কোন সেনেটর বা কংগ্রেসের সভাকে আমি সমালোচনা করতে পারি আর তার জন্যে আমার কোন কিছুই হবে না," হাস'ট এজেন্সী থেকে আসা একজন প্রতিনিধি বলল খুব জোর দিয়ে। "কিন্তু তুমি তা করতে পারো কি?"

"হ্যাঁ, আমরা আমাদের মন্ত্রীদের সমালোচনা করতে পারি। আমাদের দেশে অন্যতম রাষ্ট্রীয় স্লোগানই হল: বাতাস এবং জলের মত আত্ম সমালোচনা আমাদের জরুরী প্রয়োজন।"

"আমি হোয়াইট হাউসের সামনে প্রকাশ্য চত্বরে দাঁড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে জোরে চীৎকার করে বলতে পারি, 'ট্রুম্যান একজন বোকা।' তুমি পারো এমন বলতে?"

"আমিও রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে পারি ট্রুম্যান একজন বোকা,' এই কথা বলল সোমরন নারিনইয়ানি।

"কিন্তু ওই কথা স্তালিন সম্পর্কে তুমি বলতে পারো কি?"

"না। সেতো মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। ওনার ওটা প্রাপ্য নয়। তাছাড়া লিখিত কুৎসা বা মান হানিকর বা আক্রোশ পূর্ণ বই বা বিবৃতি দেওয়া, আমাদের দেশে এক দণ্ডনীয় অপরাধ।"

এই ধরনের উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি ও মন্তব্য ছোঁড়াছুঁড়ির পর আলোচনায় যোগ দিল ড্যানীল ক্রামিনভ।

"কিন্তু তুমি কি তোমার অফিসের বড় কর্তাকে সমালোচনা করতে পারোকি এমন কোন সেনেটর বা কংগ্রেস্ সদস্যকে যিনি তোমার অফিসের বড় কর্তার বন্ধু। বন্ধু মানে কি বেশ দহরম মহরম আছে, একসঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলেন, একে অন্যের হাত থেকে খেলার সময় 'কি-উ' নেন? পারবে? পারো? ছাপানো বিবৃতি বিলি করতে পারো? আর যদি তুমি তা করো, পরে তোমার ভাগ্যে কি হবে?" মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞাসা করল ড্যানীল ক্রামিনভ।

চারপাশে নীরবতা। আমাদের পাশ্চাত্যের সহককর্মীরা পরস্পরের সঙ্গে একঝলক দৃষ্টি বিনিময় করল। রসিকতাপূর্ণ কৌতুক আর কুশলী বিচক্ষণ মন্তব্যকে তারিফ করতো ওরা। ওদের সম্পর্কে যে দিকটা লক্ষণীয় ভাবে বিশেষ সুখকর, তা যে ওরা নিজেদের নিয়ে নিজেরা হাসাহাসি করতে পারতো। ক্রামিনভের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই ওরা পছন্দ করলো যেন।

আমরাও লাগাতার তর্ক করতাম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে। আমাদের কাছাকাছি ছিল দারুণ দারুণ সব দোভাষী যারা এই সংক্রান্ত সব নানা শব্দের একেবারে সঠিক অর্থ ও প্রতিশব্দ জানতো। কিন্তু কখনোই আমাদের মতের, দৃষ্টিভঙ্গীর আদ্যোপান্ত মিল হতনা। এসব বিষয়ে আমাদের মতামত ওদের সঙ্গে হুবহু মিলতো না কিছুতেই। উভয় পক্ষেরই নিজ নিজ বক্তব্য সম্পর্কে আপন দৃষ্টিভঙ্গী ও অর্থবোধ বা নিজস্ব মানে থাকতোই। এই সব আলোচনায় তর্ক বিতর্কে যে কেউ এক মত বা ভিন্ন মত পোষণ করতে পারতো। এর জন্যে নিজের নিজের বিশ্বাসের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ বা দলছুট হয়ে খেলা করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

এক আমেরিকান দম্পতীর সঙ্গেও আমি বন্ধুত্ব করেছিলাম। ভদ্রলোক একজন সুপরিচিত সাংবাদিক, নাম র‍্যালফ ডি। নিউ ইয়র্কের এক সংবাদপত্রের ইউরোপীয় সম্পাদকীয় দপ্তর তিনি চালাতেন। চোখের দৃষ্টি ঈষৎ নীচের দিকে ঝোলা ও ক্লান্ত। তাঁর স্ত্রীর নাম তানিয়া। তিনি কোন রুশ ব্যক্তির কন্যা, যিনি বিপ্লবের আগে দেশের মাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। মহিলার বেশ চটক আছে। ভারী

মিষ্টি মুখ। নাক চেপ্টা, মোটা। বড় বড় নীল চোখ। চিউইংগাম মুখে, তাঁরা দুজনেই আমেরিকান অফিসারদের সামরিক উর্দি পরে ঘুরে বেড়াতেন। তাদের খুব দামী মোটর গাড়িতে চারদিক ঘুরতেন তানিয়া। দেশাত্ম-বোধক নিগ্রো গান গুণ গুণ করতেন। আর তাঁদের প্রতিবেদন একটা রীতিমত চেপটা হাল্কা, সঙ্গে করে বওয়া যায় এমন টাইপ-যন্ত্রে টাইপ করতেন। অবসর সময়ে তানিয়া পড়বার ঘরে বসে থাকতেন—হাতে গোয়েন্দা গল্পের বই ধরা, আর ফৌজী বুট জুতোর মধ্যে ঢোকান তাঁর ছোট ছোট পা সামনের চেয়ারের পিছন দিকের ওপর তোলা। তানিয়া তার মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন তাঁর নাম, চাহনি, রুশ ভাষা সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান, আর পেয়েছেন, আমার বিবেচনায় "তাঁর পিতৃভুমির জন্যে" এক ধরনের আকুলতা যা তাঁর মানসিক অবচেতনে ছিল এবং যে দেশ তিনি কোনদিন দেখেন নি।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের যে তর্ক আর যুক্তি জাল তাতে র‍্যালফ অংশ গ্রহণ করেনি। সে সেখানে বসেছিল মুখে হাসি নিয়ে, আর নিজেরই ভাবনায় মসগুল। তাঁর লেখা একটি নিবন্ধ সম্প্রতি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাড়া তুলেছিল। তাঁর বিবরণে তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন স্লাভ দেশ থেকে অনেক অপরাধী বিশ্বাসঘাতক দল বেঁধে পালিয়েছে। একদিন অধিকৃত স্লাভ অঞ্চলসমূহে এইসব পলাতক নানা অপরাধ করেছিল, যা যুদ্ধ-অপরাধ হিসাবে গণ্য। সেই কৃত অপরাধের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যেই এই পলায়ন। আর তারা বাভারিয়ায় আমেরিকান সামরিক কর্তৃপক্ষের ছত্রচ্ছায়ায় ক্রমশঃ সংগঠিত হচ্ছে, এই সমস্ত সংগঠন সম্পর্কে আমি আগেই লণ্ডন থেকে আসা বিখ্যাত উক্রাইনীয় লেখক ইয়ারোস্লাভ গালান-এর কাছ থেকে শুনেছিলাম। গালান জার্মান ভাষা ভাল বলতেন। তাঁর আলাপ পরিচয় আর যোগাযোগ ছিল অসংখ্য। আর গোটা ব্যাপারটা কিভাবে ঘটানো হচ্ছে তা তিনি যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ দূরত্ব থেকে নজর রাখতেন ও বোঝার চেষ্টা করতেন। কারণ এই সব কিছুর পরিণাম যে ভীষণ মারাত্মক হতে পারে, তা তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন। যে সংবাদপত্রে র‍্যালফের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, আমি তার একটি অনুলিপি মস্কোতে পাঠিয়েছিলাম। *প্রাভদা* এটিকে পুনর্মুদ্রণ করে ও সংবাদপত্রে ব্যাপারটিকে সমধিক গুরুত্ব-সহকারে প্রকাশ করা হয়। র‍্যালফ আর তানিয়াকে এক সমধুর বিস্ময়

উপহার দেবার জন্যে; আমি, *প্রাভদা* যে সংখ্যায় র‍্যালফের নিবন্ধ আছে, তা ওদের দিলাম। র‍্যালফ শুধু মাত্র একটু হাসল আর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল।

ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম পরে, যখন তানিয়া আমায় জানালেন যে র‍্যালফকে তাঁর অফিসের কর্তা কঠিন তিরস্কার ও কড়া ভৎ'সনা করেছে। একটি রোষকসায়িত ক্রুদ্ধ তার এসে পৌঁছেছে র‍্যালফের কাছে তাতে লেখা যে এই ধরনের কোন লেখার সম্পাদকীয় দপ্তরের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই; আর যদি এই ধরনের কোন কিছু আবার হয়, তাহলে র‍্যালফের কাজ আর লাগবে না, অর্থাৎ তাকে বরখাস্ত করা হবে। তার বার্তায় এই সব কথা লিখে জানানো হয়েছে বিচার সভায় কর্মরত একজন সাধারণ প্রতিবেদককে নয়, একজন বিশিষ্ট সাংবাদিককে।

সেদিন সন্ধ্যায় ডেভিডের পানশালায় বসে আমরা চুপচাপ চুমুক দিয়ে হুইস্কি পান করলাম। স্রেফ চুপচাপ। কেননা তার সব মাধুর্য নিয়েও, তানিয়াও তার স্বামীকে খুশীতে ফিরিয়ে আনতে পারল না। আলোগুলো ইতিমধ্যেই তিনবার নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মানে এখন শুয়ে পড়ার সময়। পানশালা থেকে আমরা কজন ছাড়া আর প্রায় সকলেই চলে গেছে। আর আছে নরওয়ের দুজন। ওরা এত খেয়েছে, যে আর প্রায় উঠতেই পারছে না। হঠাৎ র‍্যালফ বললেন, "মিঃ বোরিস, জানেন আপনারা যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা আর তর্ক করছিলেন, আমাদের ছেলেরা আপনাদের ঠিক কথা বলছিল না, যখন বলল যে তারা একজন সেনেটরের কঠিন ও কড়া সমালোচনা করতে পারে। আমার কথাই ধরুন। আমি নানারকম গুরুতর সব প্রসঙ্গ আর বিষয় নিয়ে কাজ করছি, যেগুলো আমার ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার মতো। কিন্তু সে সবে আমার সম্পাদকীয় দপ্তর বা প্রকাশকের কোন প্রয়োজন নেই। এসব নিয়ে কোনকিছু লেখাই অর্থহীন। এগুলো হয় ছাপাই হয় না কিংবা এই মন্তব্য সহ আমার কাছে ফেরত দেওয়া হয় যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর এমন অর্থহীন বিষয়ে তার বার্তা পাঠানোর জন্যে যে খরচ খরচা তা আমার কাছ থেকে আদায় করে নেওয়ার জন্যে আমার কাছে বিল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আপনি কি বুঝলেন? আমি যা চাই, বা আমার যা ইচ্ছে, আমাদের রাজত্বে তা লিখছে-

কোন বাধা নেই, সত্যি স্বাধীনতা আছে বলতে পারেন, যা চাই তাই লিখতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা যখন ছাপানো বা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হবার প্রসঙ্গ ওঠে...আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন যে ঠিক অবস্থাটা কি। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা পাখি, কেবলই জানালায় নিজেকে ঠুকছে, এমন আপনি কখন দেখেছেন কি? পাখিটা ভাবে যে কোন কিছুই তাকে ধরে রাখে নি: আকাশ, জমিন, গাছপালা মাত্র একটু দূরে। ও ডানা ঝাপটে বার বার আসে, অদৃশ্য কোন কিছুর ওপর যন্ত্রণা নিয়ে আঘাত করে, তারপর পড়ে যায়...আসুন, বাকী হুইস্কিটা চুমুক দিয়ে নি, তাই নয় কি? আমরা তো যাহোক, সবটার জন্যে দাম দিয়েছি।"

"আর নয়, লক্ষ্মীটি", উদ্বিগ্ন তানিয়া তার স্বামীর হাত গেলাস থেকে সরিয়ে নিল।

"প্রিয়ে, আজ সত্যি এটা আমার দরকার", গেলাস তুলে নিতে নিতে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল র‍্যালফ। "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এই নিয়ে আমরা গর্বিত। আর এই স্বাধীনতা সত্যই আইনগত অধিকার। কিন্তু এইরকম কতকগুলো অদৃশ্য বাধা যে আছে।" সে তার রোগা হাতটা তুলল। আঙুলগুলো ছড়ালো। "প্রথম কথা হল, সংবাদপত্রের রাজনৈতিক মতবাদ।" ও ওর একটা আঙুল ভাঁজ করে খাটো করল। "এই মতবাদ বদলায়। কখনো কখনো দেশের রাজনৈতিক জলহাওয়ার সঙ্গে তাল দেবার জন্যে বদলে উল্টো স্রোতে বয়। আর সাংবাদিক হিসেবে তাল দেবার জন্যে সেইমত আপনাকেও বদলাতে হবে। আর তা না করলে আমি আপনাকে বুড়ো আঙুলের তলায় টিপে ধরবো। দ্বিতীয় কথা হল, পাঠক।" উনি তাঁর দ্বিতীয় আঙুল ভাঁজ করে নামালেন। "ওহো, আমাদের এক একজন পাঠক যে কেমন, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা একজন দশম বর্ষীয় বালকের মত। তিনি তাঁর ছোট্ট জগতের বাইরে আর কিছুই জানতে চান না। চারদিকে সোরগোল বা সাড়া পড়ে যাওয়া কোন বিষয় না হলে তিনি সে নিবন্ধ ছুঁয়েও দেখবেন না। যখন নাজীবাদ চারদিকে সাড়া ফেলে দিয়েছিল, তখন সে সেটাকে ভয় পেত কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আগ্রহ পোষণ করত। এখন তারই মত যে পাঁচিশ লাখ লোককে অসওয়েসিম আলানী চুল্লীতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। অসওয়েসিম এখন একটা বস্তা পচা ব্যাপার

ওদের কাছে। ও নিয়ে এখন আর ওদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এখন বরং তার রমরমে আগ্রহ ইয়ানকি আর সেনেটরদের মধ্যে রাগবী খেলার ফলাফলে…আমাদের প্রত্যেককে ডানা মুড়ে বা বেঁধে ফেলতে হয়, নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়; আর পাঠকের স্তরে ডুবে যেতে হয়। আর তা না হলে তার কাছে তুমি অসহ্য রকম ক্লান্তিকর, এক অকর্মার ঢেঁকি। তার কাছে তোমার কোন উপযোগিতাই নেই। আর এর পর হল তিন নম্বর……" তিনি তার তৃতীয় আঙুল ভাঁজ করে নামালেন। কিন্তু তানিয়া তার নিজের পা দিয়ে তার স্বামীর পায়ের ওপর মৃদু চাপ দিলেন। "হ্যাঁ প্রিয়ে তুমি বোঝাতে চাইছ। আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি আমাদের বন্ধুটিকেও বোধ হয় তিক্ত বিরক্ত করে দিয়েছি। আর একটু হুইস্কি, বোরিস?"

আমি আর নিলাম না। আমরা উঠে পড়ে দরজার দিকে চললাম। মনে হল র‍্যালফ আবার তার নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে, নিজের ভিতরে কিছু খুঁজছে। তানিয়া সযত্নে ও শক্ত করে তার স্বামীর হাত ধরে ছিল। সিঁড়িতে নামার মুখে চত্বরটায় র‍্যালফ থামলেন।

"যে পাখি উড়ে একটা ঘরে ঢুকে গেছে, সে বারবার কাঁচে ধাক্কা মেরে হয় নিজে মরে যায় না হলে সে বিলক্ষণ বুঝে যায় যে এক অদৃশ্য কিন্তু অনতিক্রম্য বাধা তাকে বনজঙ্গল থেকে আলাদা করে রেখেছে। আর শেষ পর্যন্ত সেই পাখি সেই ভেতরের গোটা সংকুচিত চার দেয়ালের দুনিয়া থেকে বার হওয়ার চেষ্টাই ছেড়ে দেয়…আচ্ছা, শুভ রাত্রি!

তিনি আমার দিকে হাত নেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। এইসব যা কিছু বললেন, তিনি একজন "বাম ঘেঁষা" বা অবশ্যই কোন কমিউনিস্ট নন। "উনি একজন শ্রদ্ধেয় বুর্জোয়া সাংবাদিক প্রতিনিধি।"

আমার ঘরে এরিকের সঙ্গে এই একই বিষয়ে আমি কথাবার্তা বললাম। এরিকের কথা তো আগেই বলেছি। সঙ্গসুখকর আমুদে লোক যে সব সময়েই বেশ ভাল মেজাজে থাকে। আমার লেখা যুদ্ধের দিনলিপি *"ফ্রম বেলগোরদ টু দি ক্যারপাথিয়ানস"* যা যুদ্ধের সময় বৃটেনে প্রকাশিত হয় তা পারকার নিয়ে এসেছে এখানে। এরিকের তা পড়া হয়ে গেছে। ও আমাকে আমার বইটা ফেরত দিতে এসেছিল। আমি জানতাম যে এরিক যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে, মহাদেশীয় অঞ্চলে শত্রু অবরুদ্ধ বা অধিকৃত অঞ্চলে মিত্রবাহিনী যখন অবতরণ করেছে, তখন সেইসব

অভিযানের সঙ্গী থেকেছে ও। এমন একজন মানুষের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয়। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম যে আমার বইটার মত একই রকম সে কিছু লিখেছে কি না।

"দেখো বন্ধু, একজন সাংবাদিক হওয়ার জন্যে এই সমস্ত লেখা যথেষ্ট নয়। তোমাকে ঘটনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আর সে অংশ একজন সাদা মাটা সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে নিলেই চলবে না। নিতে হবে একজন সামরিক অফিসার হিসেবে। তোমাকে হয়তো একথা বলে আমি অবাক করে দিতে পারি যে মহাদেশে অবতরণ করার পর একটা লড়াইও আমি দেখিনি। না, আমরা বোবা নই, কালাও নই। আর এই অভিযোগও করতে পারি না যে যথেষ্ট খবরাখবর আমাদের দেওয়া হত না, বা আমরা পেতাম না। সুদক্ষ মানী অফিসাররা আমাদের বলেছিলেন আগে কি কি ঘটেছে আর এখন কি ঘটছে। যুদ্ধ অধিনায়করা সাংবাদিক সম্মেলনে আসতে কদাচিৎ অস্বীকার করতেন। আর কখনো সখনো আমরা বেশ বলবার ও জানবার মত সাক্ষাতকার নিতাম। আমাদের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের যথেষ্ট সুনাম আছে। আমাদের নায্য যা প্রাপ্য তা-ও আমাদের দেওয়া হত কিন্তু আমাদের কখনোই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হত না। অথচ তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো যে আমাদের ছেলেরা, তোমাদের থেকে কিছু কম সাহসী নয়। যে সমস্ত খবর আমরা পেতাম, তা আমরা এক ধরনের পরিপাক করতাম বলতে পারো। সেটা এক সুন্দর ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে সামরিক সদর দপ্তরে যেত অথবা চলে যেতো সেই সব তাঁদের কাছে যাঁরা সৈন্য দল, রণতরী এইসবের মত সোপান বৎ বিন্যস্ত এবং যারা ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছেন আর তারপর আমাদের পাঠানো বিবরণ শুরু হত এইভাবে: 'একজন ওয়াকিবহাল অফিসারের বিবরণ অনুসারে…' অথবা 'বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ…', ঈশ্বরের দোহাই, এসব কোন ধরনের প্রতিবেদন? ভাসাভাসা অর্থহীন আবর্জনা সব। একজন মানুষ যিনি গৃহসীমান্তে আছেন, এসব হল তাঁর মন্তব্য।"

সে যা বলছিল, তা বোধ হয় সত্য। ড্যানীল ক্রামিনভ, যে যুদ্ধ বা সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর মধ্যে কাটিয়েছে, সেও চাঁচা ছোলা কর্কশ ভঙ্গীতে প্রায় ওই একই কথা বলেছে। যাইহোক, আমাদের পাশ্চাত্য তথা প্রতীচ্যের সহকর্মীদের কাছ থেকে আমাদের কিছু কিছু শেখার ছিল, যা

শেখায় যোগ্য। প্রথম এবং প্রধান কথা এই যে শুধু মাত্র নিয়ত যোগাযোগ নয়, পেশাদারী দক্ষতা, যার ফলে সত্য ঘটনার বিবরণই শুধু দিলে চলত না, ব্যাপারটা "ভাল মোড়কে" উপস্থিত করতে হবে। তারপর শেখায় তাদের পেশাগত কর্ম কৌশল, গতি আর অন্য সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে নিজের পাঠানো খবর অন্যদের আগে সর্বপ্রথম ছাপার হরফে প্রকাশ করার জন্যে ঐকান্তিক ইচ্ছা। কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন যে সব ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বা শেষ করার জন্যে তাদের ওপর জোর করা হত, যা বাধ্য করানোর নামান্তর। এই দিকটাও সত্য বলে তারাই সব এমন মন্তব্যের সঙ্গে একমত হবে। কিন্তু এও সত্য যে জীবনে নিজের জায়গা পাওয়া বা করে নেওয়ার জন্যে এটাও একটা লড়াই। তা হলে তো আমাদের ওপর জোর খাটানো যায় বা আমাদেরকেও বাধ্য করা যায় তাড়াতাড়ি সব বিবরণ সম্পূর্ণ বা শেষ করতে যাতে সমাজতন্ত্রকে আর সকল কিছুকে ছাপিয়ে যাওয়া যায়। এটাকে বলা চলে বা চলতে পারে সমাজতন্ত্রের সম্মানে আর সাংবাদিক হিসেবে নিজের নামকে তুলে ধরার জন্যে লড়াই।

সরলভাবে সত্যি কথা বলতে কি, এখানে ন্যুরেমবার্গে যেখানে সারা পৃথিবী থেকে বাছাই করা শিরোমণি গোছের সাংবাদিকরা জড়ো হয়েছেন, সেখানে প্রতিযোগিতার মেজাজের লক্ষণ এখনো কোন কোন রুশ সাংবাদিকের মধ্যে আছে। কিভাবে অথবা কখন লিখলাম, তার চেয়ে আমাদের বেশী চিন্তা ছিল কি বিষয় নিয়ে আমরা লিখলাম। আজ অথবা কাল—যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো—আমাদের সোভিয়েত সাংবাদিকদের এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে আর মিখাইল কলটসভ, ইভান রিয়াবভ, আলেক্সি কোলেসভ এবং বোরিস গালিন এঁরা যেমন দিয়েছেন, এঁদের মত ফল দিতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ বাড়ি ফেরার পথে সিঁড়িতে আমাদের দেখা পেগির সঙ্গে। তার পরিধানে তখন বালিকাদের মত পোশাক। গলায় বো। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সে হাঁটছিল আর চারপাশে ঘিরে চলেছিল কিছু মানুষ জন যাঁরা বৃত্তিগতভাবে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত। এখন সে নীল নয়না বালিকার মত লীলাময়ী যেন। তার দিকে চেয়ে, তোমার পক্ষে কল্পনা করাও খুব কঠিন যে এই হল সেই পেগি যে সকালে তার

দুই সরল হৃদয় সহকর্মীরা ভীষণ কণ্টকাকুল পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছিল। আমাদের যখন সে লক্ষ্য করল, সে মিষ্টি করে হেসে প্রথমে নম্র ইংরেজীতে আর পরে তার নিজস্ব অদ্ভুত রুশ ভাষায় বলল, "শুভ-রাত্রি"।

ওর ওপর চটে যাওয়াই অসম্ভব।

আমি যখন আমার আস্তানায় ফিরলাম তখন সিঁড়ির নীচে আমার নিকটতম দূরত্ব থেকে আমি টাইপ রাইটারের দ্রুত শব্দ শুনতে পেলাম। যথা রীতি ক্রশিনস্কি তার কাজ করে যাচ্ছে। সেই পা-বিহীন বৈমানিক, যার কথা বর্ণনা করার বাসনা আমার আছে, সে এখনো কত জবরদস্ত কৌশলেই না আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আর তাকে নিয়ে যে বইটার কথা ভেবেছি, তার এখনো কিছুই করা গেল না। ব্যাপারটা সহজে, জলের মত যাকে বলে, আসছিল না। আর ওই ওতেই হয়ে যাচ্ছিল। আমার সমস্ত ধারণা ছিল ভাসা ভাসা, আকারহীন। হয়তো আমাদের সাক্ষাতের পর এই যে তিন বছর চলে গেছে এই সময়ে গোটা বিষয়টাই তার "কামড়" হারিয়ে ফেলেছে। আর দেখো, সেরগেই ক্রশিনস্কি অন্যদিকে তার উপন্যাস *দি মাউনটেন টরেন্ট* লিখছে গভীর আত্মশৃঙ্খলা আর কাজে লেগে থাকার দম নিয়ে। ও প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত পাতা লিখত। ইতিমধ্যে অনেকটা টাইপও করে ফেলেছে। এই মূল্যবান কারণের জন্যই সন্ধ্যায় আমি ওকে আমার ঘর ব্যবহার করতে দিতাম।

৫। বারবারোসা পরিকল্পনা

বিচার সভায় ব্রোনজের তৈরী, পটভূমি মধ্যে নির্মিত, আদম ও ঈভের মূর্তি রাখা ছিল কিছু যোদ্ধার মূর্তির পাশে। পার্থিব ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষার জন্য যেমন হয়ে থাকে রোমান শাসকদের সামনে বাহিত পিছল দণ্ডের মত মূর্তির সামনে রাখা। বিচার সভায় একটি দেওয়ালের দিকে তোরণের মুখে সবুজ মর্মরের ওপর সে মূর্তি উঁচু করে রাখা।

ওই যোদ্ধারা নিশ্চয়ই বলার মত কোন ভালো কাজ করেনি। এ যে কেউ তো কোন ঝুঁকি না নিয়ে নিরাপদে একথা বলতে পারে যে এই পৃথিবীর অধিবাসী অসংখ্য আদম ও ঈভের বংশধররা আর কখনো এমন মরলোকীয় বিপদের মুখোমুখি হয়নি, যেমনটি তারা হয়েছে গত দশকে,

যখন শয়তান সর্পের বা কোন সরীসৃপের ছদ্মবেশে আসেনি, এসেছে হিটলারের চেহারায়। এসেছে হিটলারের শয়তানসুলভ আদর্শের হাত ধরে যা মানবতার ও মানবজাতির এক নতুন সর্বাত্মক আগ্রাসী আক্রমণ।

আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে নানা দেশ থেকে আসা মানুষেরা সাক্ষীর পাটাতনে দাঁড়িয়ে সে বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য দিয়েছে। সে সব সাক্ষীর মধ্যে রুশ, আমেরিকান. ইংরেজ, ফরাসী, চেক, বেলজিয়ান, স্পেন, ওলন্দাজ এবং নরওয়ে সকল দেশ ও দেশের অধিবাসীরা ছিল। সাক্ষী হিসেবে জার্মানরাও এগিয়ে এসেছিল অনেকে। তাদের সাক্ষ্য ছিল অকাট্য। সেই শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গ মানবতা আর মানুষ জাতির বিরুদ্ধে কি বিভীষিকাময় চক্রান্ত গড়ে তুলেছিল একের পর এক সাক্ষ্য তা বিস্তারিত ভাবে ফাঁস করে দেয়। এই শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার উল্লেখ করার সময় তারা ভদ্রভাবে আইনের ভাষায় বলে 'প্রধান যুদ্ধঅপরাধীরা'।

সেদিন বিচার সভায় সোভিয়েত জনগণের কণ্ঠ আবার শোনা গেল। সোভিয়েত অভিযোগকারীদের পক্ষে প্রধান প্রতিনিধি আর এ. রুদেনকো, বক্তৃতামঞ্চ থেকে সেদিন কথা বললেন। আমরা যখন আমাদের ইয়ার ফোনের মাধ্যমে আমাদের জন্মভূমির ভাষা শুনতে পেলাম, আমাদের মনে হল যে মহান ও শক্তিমান সোভিয়েত জনগণ বিচার সভায় ঢুকে গেছে আর এই বক্তৃতামঞ্চ থেকে (প্রতিবাদী আসামীদের) কাঠগড়ার দিকে চেয়ে আছে। সেই সোভিয়েত জনগণ যারা এককভাবে, একা হাতে ভেঙে দিয়েছে নাজী জানোয়ারের শিরদাঁড়া যখন সেই জানোয়ার প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের রস শুষে গোগ্রাসে গিলছে, আর অন্যান্য মহাদেশ গিলে খাবার জন্যে নিজের মুখের হাঁ খুলে ধরেছে।

ট্রাইবুনালের সামনে পরাস্ত নাজীবাদ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সোভিয়েত অভিযোগকারীদের পক্ষে প্রধান তাঁর শান্ত ও ধীর কণ্ঠে বিশ্লেষণ করে সেই বিকটাকার দানব যার অনেকগুলো মুখ আর মাথা, তার শব ব্যবচ্ছেদ করছেন, যে বিষ দাঁত ও থাবা, যার থেকে ইউরোপের মানুষেরা এত কষ্ট আর নিগ্রহ পেয়েছিল, কেবল তাই দেখাচ্ছেন না, দেখাচ্ছেন তার লুকোন মারাত্মক বিষের থলি আর বিকটাকার পেট যা সমস্ত অনার্য জাতিকে খেয়ে হজম করে একেবারে সাফ করে দেবার জন্যে তৈরী হয়েছিল। এই দানবের ভয়ঙ্কর মস্তিষ্কের ভাঁজে ভাঁজে মানবজাতির

বিরুদ্ধে কত চক্রান্ত পাকে পাকে একত্রিত, তা সোভিয়েত পক্ষের প্রধান অভিযোগকারী খুলে দেখালেন। সেই দানবের শরীরের খুবই গভীরে লুকায়িত সেই স্নায়ুমণ্ডলী, যা ওই বীভৎস শরীর সংস্থানের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষময় উদ্দেশ্য স্থির করেছে।

যদিও আদালতের সামনে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে, তবু আমার মনে হল যে এর আগে নাজীবাদের এমন বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্যিকারের চেহারা এমনভাবে আগে কোনদিন উন্মোচিত হয় নি। সেইদিন সোভিয়েত পক্ষের প্রধান অভিযোক্তার বক্তব্য শোনার আগে এত প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারি নি। সেই পার্থিব বিপদের অর্থাৎ মৃত্যুর চেহারা, যার হাত থেকে লাল ফৌজ আমাদের দেশ, দেশের মানুষ ও সমস্ত মানুষ জাতিকে রক্ষা করেছে।

তার উচ্চাশাপূর্ণ জীবন গঠনের একেবারে গোড়ার দিকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক গোলাগুলির ছোঁড়ার অনেক অনেক আগে, হিটলার যখন ইউরোপ ও পৃথিবীর বাকী অংশকে নিজের শাসনাধীনে আনার শুধু স্বপ্ন দেখছিল, তখনই হিটলার এক আন্তরিক মুহূর্তে তার বন্ধু রাউসচিলকে বলেছিল—

"আমাদের একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে, যার কাজই হল জনসংখ্যা হ্রাস। তুমি যদি আমায় জিজ্ঞাসা করো যে 'জনসংখ্যা হ্রাস' বলতে আমি কি বলতে চাই; তাহলে শোনো, আমি চাই জাতিভিত্তিক ব্যবস্থাকেই পুরো সরিয়ে দিতে। আর আমার বাসনাই হল সেই কাজ করা—এই কাজই, মোটামুটিভাবে, আমার দায়িত্ব। প্রকৃতি নিষ্ঠুর, সুতরাং আমরাও নিষ্ঠুর হতে পারি। যদি জার্মানীর শ্রেষ্ঠ অংশ বা পূর্ণাঙ্গ নিদর্শনকে আমি যুদ্ধের নরকে পাঠাতে পারি এবং দামী জার্মান রক্ত যা ঝরবে তার জন্যে যদি আমি আদৌ অনুতপ্ত না হই, তাহলে আমার নিশ্চয় অধিকার আছে নীচু জাতিগুলো যারা পোকামাকড়ের মত বংশবৃদ্ধি করে তাদের মধ্যে থেকে লক্ষ লক্ষ লোককে সরিয়ে দেবার।"

লক্ষ লক্ষ লোককে মেরে পুরো জাতিকে জাতি ধ্বংস করে ফেলতে হবে। 'প্রভু জাতির' সুবিধার জন্যে যে সমস্ত লোক ভূমণ্ডলে অনন্তকাল ধরে বসবাস করছে, তাদের 'জনসংখ্যা হ্রাস' করতে হবে, আর ধ্বংস করে দেওয়া জাতিগুলোর যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পড়ে থাকবে, সেটাকে পরিণত করতে

হবে ভারবাহী জানোয়ারে। এই হল নাজীবাদ নামক তত্ত্বের সরকারী দলিল। জার্মানীর পড়ুয়া বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের স্কুলে নীচের গানটা শেখানো হত।

যদি সারা পৃথিবী হয় ধ্বংসের স্তূপ,
আমাদের কি ভাবনা তা নিয়া ?
আমরা তো কদমে কদমে এগিয়েই যাবো জোর দমে,
কেন না আজকে জার্মানী আমাদের,
কাল আমাদেরই সারা দুনিয়া।

জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ কর্মসূচী এই গানের মধ্যে প্রতিফলিত। এই গান হিটলার ও তার শয়তানী চক্রের দৃঢ় সমর্থক ডান হাত, স্যাণ্ডাতরা—যারা এখন কাঠগড়ায় বসে আছে—তাদের আদেশে গাওয়া হত, যখন বড় বড় দলে নাজীরা ইউরোপের নানা জাতির ওপর আগ্রাসী অভিযান শুরু করে।

এই আক্রমণ ছিল নিখুঁত। সমস্ত আগ্রাসী আক্রমণের যে অভিযান পরিকল্পনা ও প্রচার সেসব মতলব সিদ্ধির জন্যে করা বিস্তারিত নকশা আদালতের হাতে আছে। এই সমগ্র মতলবকে হিটলার সাতটি স্তর বা ভাগে বিভক্ত করেছিল। পরিকল্পনা ছিল প্রথম পাঁচটি স্তরে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া, সমগ্র ইউরোপে বিভিন্ন মহাদেশ সমেত গোটা ইউরোপ জয় করা। ষষ্ঠ স্তর বা ভাগটার নাম ছিল বারবারোসা পরিকল্পনা, যখন এই গলাকাটা দুর্বোধ্য ভাষায় কিচমিচ করা নাজীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার মতলব করছিল। শেষ পর্যায়ে পূর্বদৃষ্ট ছিল ইংলিশ চ্যানেল লাফ দিয়ে পার হয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে, সোভিয়েত সরকার নানা আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে ও কূটনৈতিক স্তরে পাশ্চাত্য দেশীয় সরকারগুলিকে বারংবার হিটলারের চক্রান্ত সম্পর্কে সাবধান করেছিল। যুক্তিপূর্ণ সেই কণ্ঠস্বর তারা শুনবে না, শোনেনি। সেদিন সোভিয়েত পক্ষের প্রধান অভিযোক্তা আবার গুণে গুণে দেখিয়ে দিলেন হিটলারের পরিকল্পনায় যেমন ভাবা হয়েছিল, ঠিক সেইমত ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কিভাবে নাজী সৈন্যবাহিনী নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে আগ্রাসী অভিযানের প্রথম পাঁচটি

স্তর সম্পন্ন করে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সূচীর আগেই সেরে ফেলে কাজ। তিনি আরও দেখালেন যে পশ্চিম ইউরোপের শক্তির দুর্গ বলে বিবেচিত রাষ্ট্রও কেমন আচমকা অপ্রস্তুত অবস্থায় তার কবলে পড়ে, তাদের মধ্যের একতা নষ্ট হয়ে যায়, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে সেই সব দেশে বিচার-বিবেচনাহীন অ-বিবেকী অ দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বীয় দেশের স্বার্থের আর মারমুখী ফ্যাসিবাদী জল্লাদের সামনে পড়ে কিভাবে বিনা প্রতিরোধে সেইসব দেশ ছিন্নভিন্ন পযু্দস্ত অবস্থায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। অধিকৃত জাতিসমূহের কাঁচা রক্ত খেয়ে হিটলারের যুদ্ধ যন্ত্র ক্রমশঃ আরো শক্তি লাভ করে ও অদমিত অভিযানে দ্রুত আরো আরো সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কখনো সখনো, ইউরোপের সবচেয়ে বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিকেরা এই রকমই ভাবতে থাকেন যে হিটলারের অভিযানকে থামাতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই। আটলান্টিক মহাসাগরের অন্য পাড়ে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ থেকে সেখানকার লোকেরা এই ধরনের যুক্তি ও বিতর্কপূর্ণ ভাষণ শুনতে পায়। "আপাতদৃষ্টিতে হিটলার অজেয়। খুব বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগে, এটাই কি অধিকতর ভালো হবে না যদি তার সঙ্গে আমরা একটা চুক্তি বা সমঝোতায় আসি, আর ইউরোপ ভূমিতে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দি?"

যাইহোক, যখন হিটলার পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে নিজের পদানত করল, সেইসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সমস্ত উৎস কব্জা করল। সেইসব দেশের শিল্পসম্পদ যখন তার আওতায় এল, যখন হিটলার তার মিত্রশক্তি ও উপগ্রহদের নানা বাহিনীর ও সেই সব বাহিনীর বিভিন্ন শাখাকে তারা নিজ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে অধিকতর শক্তিশালী হল, তখনই সে ঘুরে দাঁড়াল পূর্ব দিকে। তার লক্ষ্য তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন। বারবারোসা পরিকল্পনা প্রযুক্ত হতে শুরু করল। বারবারোসা পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি তৈরী হয় হিটলারের গোপন সব সভায়, যাতে অংশগ্রহণ করে কেইটেল, জডল ও জেনারেল ওয়ারলিমোন্ট—যারা সবাই এখন আসামীর কাঠগড়ায়। এই পরিকল্পনার জন্য "বারবারোসা" নাম যে বেছে নেওয়া হল তা কোন দৈব সংঘটিত বা আকস্মিক ব্যাপার নয়। ফ্রেডারিক বারবারোসা অথবা "লালদাড়ি" বহুকাল আগে সুদূর অতীতে ছিল একজন ভয়ঙ্কর,

ও রক্তপিপাসু জার্মান শাসক। সেই শাসক এখানে ন্যুরেমবার্গে পাহাড়ের ওপর প্রাচীন দুর্গে থাকতো। যে সমস্ত বুরুজ বা উঁচু পাঁচিল সে বানিয়েছিল, তা আজও অক্ষত আছে। যখন সামরিক পোশাকের ছদ্মবেশে এইসব গলাকাটা জল্লাদরা তাদের আগ্রাসী অভিযানের মতলব ভাঁজছিল, তখন আর একজন গলাকাটা জল্লাদ জোয়াচিম ভন রিবেনট্রপ কূটনৈতিক পোশাকের ছদ্মবেশে, আমাদের সরকারের সঙ্গে সম্পাদন করছিল এক অনাক্রমণ চুক্তি, যার উদ্দেশ্য নিজেদের সামরিক প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ গোপন করা।

বারবারোসা পরিকল্পনার মূল বয়ান এখন সামরিক ট্রাইবুনালের হাতে। সেই মূল বয়ান থেকে অবিসংবাদিতভাবে শুধুমাত্র এই প্রমাণই হয় না যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত, আরও প্রমাণিত হয় যে এই উদ্দেশ্যে *সমস্ত* সশস্ত্র বাহিনী, *সমস্ত* বোমারু বিমান, *সমস্ত* মোটরচালিত সংস্থাকে সংহত একত্রিত করা হয় এবং আমাদের দেশের সীমানায় আনা হয়। কেবল পরিপূরক সংস্থাগুলো—যাদের সদস্য ছিল যুদ্ধের জন্যে সংগৃহীত বয়স্ক লোকেরা, বিজয়ী দেশ থেকে অধিকৃত অস্ত্রাদি ছিল যাদের হাতিয়ার—কেবল সেইসব সংস্থাই ইউরোপের অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে রাখা হয়।

বারবারোসা পরিকল্পনাকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে, সে বিষয়ে তার আদেশে হিটলার লেখে যে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর এমনভাবে প্রস্তুত হওয়া জরুরী যে তারা যেন এমন কি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হবার আগে, বিদ্যুৎ গতি বিমান আক্রমণে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জয় করতে পারে। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে সামরিক বাহিনীকে কেবল অধিকৃত অঞ্চলের সুরক্ষা ও সম্ভাব্য কোন আপৎকালীন মোকাবিলার জন্যে যারা ও যেটুকু অপরিহার্য তা বাদ দিয়ে আর সমস্ত উৎস ও শক্তি সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করতে হবে। পূর্ব দিকে এই যুদ্ধ পরিকল্পনায় সব আয়োজন ছিল সীমাহীন—একমাত্র সীমা ও চিন্তার বিষয় নাকি ছিল সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্যে নিজেদের যে অঞ্চল তার প্রতিরক্ষা ও সমর সম্ভার উৎপাদনের প্রয়োজনের তুলনায় অকুলান বা অভাব।

পরবর্তীকালে তার এই *ব্লিৎজক্রেইস* পরিকল্পনার দিককে আরও বিস্তৃত করে হিটলার আদেশ দেয় যে রাশিয়ার পশ্চিম ভাগে যে বিরাট

রুশ বাহিনী নিযুক্ত আছে, সাহসিক আঘাত ও অভিযানের দ্বারা তাদের ধ্বংস করতে হবে: আক্রোসন অভিযানের জন্য প্যানজার বাহিনীকে পাঠিয়ে দিতে হবে অনেক দূর। রাশিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চলে যুযুধান জার্মান বাহিনীর যে কোন পশ্চাৎদাপসারণ রুখতে হবে। এই অভিযানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ভোলগা-আর্চাঞ্জেল ধার বরাবর রুশ ভূখণ্ডের এশীয় ভূমির বিরুদ্ধে সুরক্ষা গড়ে তোলা।

নাজীদের এই সমস্ত সম্পূর্ণ মতলব আদালতে উন্মোচিত ও নানা সাক্ষ্য প্রমাণের ধারা সমর্থিত। ন্যুরেমবার্গ থেকে দেখা, এই মতলবের প্রধান উদ্যোক্তা ও আয়োজক যারা, তাদের বিচার দেখা, বিশেষ করে লাল ফৌজের সর্বাত্মক ধ্বংসের জন্যে তাদের দানবীয় আয়োজন ও চেষ্টার দিকটা দেখা বিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। সোভিয়েত ভূমির সীমান্তেই হিটলারের *ব্লিৎজক্রেইস* পরিকল্পনার বিজয়কাঙ্ক্ষা পরাভূত হয়। অহরহ যুদ্ধে হিটলারের আগ্রাসী অভিযানের সৈন্যেরা মরতে থাকে আর কেবলই আরও দুর্বল হয়ে যায়। হিটলারেরা আগ্রাসী বাহিনীর পশ্চাৎ দিকে, তাদের মধ্যে সংযোগকারী সমস্ত ক্ষেত্রে: স্বদেশপ্রেমীদের যে যুদ্ধ বেগে জ্বলে ওঠে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নানা শাখা ও সৈন্যদের যে সুদৃঢ় প্রতিরোধ যা শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থাতেও অবিচল যুদ্ধ করতে থাকে, তাতেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় শত্রুর শরীরের রক্তের নিয়তি। আগ্রাসন অভিযানের প্যানজার বাহিনী, তা, প্রায়শই তাদের মূল ছাউনিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর হামেশাই তারা জ্বালানী ও অস্ত্রশস্ত্রের সরঞ্জাম বিহীন অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। স্মলেনস্ক-এ প্রধান যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুদৃঢ় প্রতিরোধের মোকাবিলায় যুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে মার খাওয়ার পর হিটলারের "অজেয় ইস্পাত সদৃশ ফৌজ" পেষাই অবস্থায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আসে। হিটলারের আদেশে তার সাধারণ বাহিনী জ্বরগ্রস্ত কাঁপুনি নিয়ে অগ্রসর হয়, বারবারোসা পরিকল্পনার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম জটিল টাইফুন অভিযান সফল করতে। অপারেশন টাইফুনে সব সুদক্ষ বাহিনীর লক্ষ্য স্থীর হয় সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজধানী মস্কো নগরীর অবরোধ ও অধিকার অভিযানে।

মর্মভেদী দৃঢ়তায় আচ্ছন্নতা সৃষ্টিকারী ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে বলছিলেন রুদেনকো। তিনিই যথার্থই একটি জাতির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন যে জাতি হিটলার তার হাতের তাস দেখাবার অনেক আগে থেকেই

নাৎসীবাদের শত্রু, যে শত্রুর সঙ্গে যে কোন ভাবে তার যে কোন মিলন অসম্ভব, যে জাতি এই যুদ্ধের ভার বহন করার দায়িত্ব বহু করেছে; নিজের দেশের দুই কোটি লোক প্রাণ উৎসর্গ করেছে নাৎসী জানোয়ারের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়ার জন্যে।

পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া দখল করে ও সোভিয়েত ভূখণ্ডের কিছু অঞ্চল অধিকার করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, রুদেনকো দেখালেন, কিভাবে নাৎসীরা তাদের শয়তানসুলভ "জনসংখ্যা হ্লাস" পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করে, যা এক সময় সমগ্র পৃথিবীকে ভীত করে তুলেছিল। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের গণ হত্যা......অজস্র গ্যাস চেম্বার..... প্রচুর গ্যাসভ্যান...প্রচুর মৃতদেহ ফেলার...কবরভূমি......দাহ করার জন্যে গর্ত...সব মৃত্যু ফাঁদ ...মানুষ শিকারী কুকুরের ব্যবহার......বিষপূর্ণ সব পানীয় জলের কূপ......এ সবই হল সুসংগঠিত, আমি আবার বলছি, এ সবই হল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মাধ্যমে সংখ্যাতীত মানুষকে শেষ করে দেওয়ার পদ্ধতি..... সমগ্র শহরের পর সমগ্র শহর, গোটা গোটা গ্রাম, আর সব অমূল্য জাতীয় সম্পদকে ধ্বংস করা ...এ সবের হাত থেকেই সকল জাতিকে লাল ফৌজ রক্ষা করেছে।

বিচারকেরা, অভিযোগকারীদের পক্ষে আইন বিশারদেরা, অভিযুক্ত পক্ষীয়দের আইনবিদরা ও উপস্থিত সমস্ত মানুষ গভীর উদ্বেগে সোভিয়েত অভিযোগকারীদের পক্ষের প্রধানের ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকলেন। এমনকি সব জাঁদরেল সাংবাদিক প্রতিনিধিরাও যারা সহজে কোন কিছুতেই প্রভাবিত হত না। তারা, পরিশ্রমী ছাত্রের মত তাঁর ভাষণের বয়ান, নিজের নিজের আসনে বসে পরিশ্রম করে আপন আপন খাতায় লিখে নিতে ব্যস্ত। প্রেস বক্সের এখানে ওখানে কেবলই শূন্যে উত্তোলিত হচ্ছে কোন না কোন সাংবাদিকের হাত। অর্থাৎ সে আদালত কক্ষে সাংবাদিকদের দেওয়া বিবরণবাহী কর্মীকে ডাকছে। উদ্দেশ্য: তার প্রতিবেদন, তার নিজের কাগজের উদ্দেশ্যে জরুরী তারবার্তা পাঠানো। দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে পানশালা ছিল খালি, অথচ সাংবাদিকদের প্রেস রুমে, অজস্র টাইপ যন্ত্রে ঝড়তোলা খটাখট খটাখট তুমুল শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়।

রুদেনকোর বক্তৃতা, আসামীদের কাঠগড়াতেও তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রোজেনবার্গ, যে রুশ ভাষা জানত তাই সে তার ইয়ার ফোন সরিয়ে

দিয়ে এক কানে আঙ্গুল চাপা দিয়ে মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শোনে। রুদেনকো যখন গোয়েরিং-এর মুখের কথা উদ্ধৃত করে বলেন "আমি লুঠতরাজ অত্যাচার করতে চাই, আর সেটা করতে চাই বিস্তারিতভাবে পুরোপুরি" তখন ক্রুদ্ধ গোয়েরিং তার ইয়ার ফোন ছিঁড়ে ফেলে, তারপর ভীতত্রস্তভাবে আবার সেই ইয়ার ফোন জোড়তালি দিয়ে নিয়ে বক্তৃতার একেবারে শেষ পর্যন্ত কানে লাগিয়ে রাখে। কেইটল তার কোটের কলারের মধ্যে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দেয়, আর যন্ত্রের মত কেবলই সেটা নিজের দিকে জোরে টানতে থাকে, যেন দড়ির ফাঁস ইতিমধ্যেই তার ঘাড় চেপে ধরতে আসছে। সেদিন, যেদিন সোভিয়েত অভিযোগকারীদের জয়-জয়কার, কেবলমাত্র হেসস ছিল শান্ত আর উদাসীন। যেন সে শান্ত ঔদাসীন্যের মাধ্যমে এই ব্যাপারটার ওপরই জোর দিতে চাইছিল যে বারবারোসা পরিকল্পনা বা অপারেশন, টাইফুন রচনায় তার কিছুই করার ছিল না এবং জার্মান বাহিনীর জয় অথবা পরাজয় যে কোনটারই কোন দায়িত্ব বহনের কোন অভিপ্রায়ই তার নেই।

৬। মৃতের সাক্ষ্য

সেইদিন আদালত কক্ষে চোখ ধাঁধানো কৃত্রিম আলোগুলো অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিচার-কক্ষ অন্ধকারে ডুবে গেছে বলা যায়। সেই কাঁপা কাঁপা আবছা আলোয় সাক্ষীর পাটাতন অধিকার করে আছে মৃতরা যাদের ছাই করে দেওয়া হয়েছে বহুদিন আগে ম্যাজডানেক, অসওয়েসিম, বুচেনওয়াল্ড এবং ডাচাউ-এর মানুষ জ্বালানো ফারনেসে, যাদের পচিয়ে ফেলা হয়েছে বাবিয়ার আর খারকভের ভয়ঙ্কর সব গর্তে, অথবা শুয়ে আছে লেনিনগ্রাদের পিসকারেভস্কোয়ে সাধারণ সমাধি ক্ষেত্রের নানা কবরে।

প্রামাণিক তথ্য চিত্র নির্মাণে, সোভিয়েতের সাহসী শিল্প স্রষ্টারা যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আর জীবিত নেই, এই সমস্ত মৃতদেরকে পুনর্জীবন দেন ও তাঁদের ন্যুরেমবার্গে বিচারসভায় নিয়ে আসেন। যেন তাঁরা তাঁদের সমাধি আর কবর থেকে জেগে উঠে ; আত্মরক্ষাকারী প্রতিবাদী আসামীদের

মুখের ওপর জোরে জোরে ছুঁড়ে দিচ্ছেন একের পর এক অকাট্য প্রমাণের পর প্রমাণ।

অন্যদিনের মতই যথারীতি সেদিনও অধিবেশন শুরু হল। সোভিয়েত পক্ষের প্রধান অভিযোগকারীর সহকারী স্মিরনভ তাঁর শান্ত স্বরে আদালতকে সম্ভাষণ করে জানালেন যে তিনি আদালতের সামনে এক প্রামাণিক তথ্য চিত্র পেশ করতে চান। সেই তথ্য চিত্রের বিষয় সোভিয়েত ভূখণ্ডের ভিতরে নাজীদের বর্বর নৃশংসতা। আলো কমিয়ে দেওয়া হল, আর কেবলমাত্র আত্মরক্ষাকারী প্রতিবাদী আসামীদের মুখগুলো, তাদের নীচের দিক থেকে জ্বালিয়ে দেওয়া আলোয় আলোকিত থাকল। যেন অন্ধকারে ওই মুখগুলো ভাসমান।

চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যাপারটাতে আমি আশ্চর্য হই নি। সীমান্ত যুদ্ধে আমার পুরোন বন্ধু রোমান কারমেন—ও ছিল ছবি তোলায় ওস্তাদ ক্যামেরাম্যান ও সাংবাদিক। যুদ্ধের শুরুর সময়ই উল্লেখযোগ্য তথ্য চিত্র তৈরী করে ও নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল—আমায় বলেছিল যে "একটা বোমা বিস্ফোরণ করার জন্যে" ওরা তৈরী হচ্ছে। ছবির বোমা অবশ্য, যেটার বিস্ফোরণ ঘটবে আসামীদের কাঠগড়ার ওপর। আর সেই বিস্ফোরণের কথা মনে থাকবে প্রত্যেকের। যখন কারমেন ও তার সহকর্মীরা এখানে বিচারসভায় কাজ করছে, তখন তার লেখা পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধের বিষয় নিয়ে ছবি তোলা হচ্ছিল মস্কোতে। যে চলচ্চিত্র সে দেখাতে যাচ্ছে, তার বিষয়বস্তু আমি জানতাম। সেদিন যা কিছু দেখানো হয়েছিল, তার অনেকটাই আগে নিজের চোখে দেখেছিলাম। তবুও, সেই চলচ্চিত্র আমায় বিশেষ নাড়া দিয়েছিল। আর এখন যা কিছু লেখা হচ্ছে, তা সেই নাড়া দেওয়ারই ফল।

অন্ধকারের মধ্যে ঝলসে উঠল নীলাভ আলো। সভাকক্ষ ভেদ করা সেই আলোক রশ্মিতে পর্দার ওপর নীচের লেখাগুলি ফুটে উঠল: "আগ্রাসী অভিযানকারী জার্মানদের বর্বর নৃশংসতার প্রামাণিক তথ্য চিত্র।" সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে প্রধান অভিযোগকারীর নিবেদন একটি প্রামাণিক তথ্য চিত্র। তার নীচে দৃশ্যমান হল নীচের কথাগুলি—

"আমরা সীমান্তের সামনের সারির ক্যামেরাম্যান ভোরনতসভ, গিকভ, ডবরোনিতস্কি, ইয়েশুরিন, জেনিয়াকিন, কারমেন, কুটুপ-জাডেহ, লেভিতান,*

মিকোশা, মুখিন, পানভ, গোফেলস্কি, জেগাল, সোলোভিয়েভ, সোলোভবভ, ত্রয়ানোভস্কি, শতাতলাও শপথ করে জানাচ্ছি যে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, আমরা লাল ফৌজের বিভিন্ন সামরিক বিভাগে যুক্ত ছিলাম। আমরা আমাদের প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের সূত্রে সেই স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ বীরোচিত যুদ্ধের নানা দিক চিত্রায়িত করি। জার্মান ফ্যাসিবাদী বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে উৎখাত করে সেইসব অঞ্চলে প্রবেশ করে আমরা যা দেখতে পাই, এই তথ্য চিত্রে অন্তর্ভুক্ত স্থির চিত্রগুলি হুবহু তারই প্রতিরূপ।

প্রথম দেখানো স্থির চিত্রগুলি অদৃশ্য হল। ইয়ার ফোনের মাধ্যমে চারটি ভাষায় ভেসে এল ঘোষকের গলা: রোস্তভ, নভেম্বর ২৯, '৯৪১।

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রোস্তভের এক রাস্তা আমরা দেখতে পেলাম। ভেসে উঠল শান্তিপ্রিয় অসামরিক নাগরিকদের মৃতদেহের পর মৃতদেহ। এই তুষারাচ্ছন্ন মৃত প্রাকৃতিক পৃষ্ঠপটে ক্যামেরা তুলে ধরল শায়িত এক মৃত বালক। সে তার অনড় হাতে একটি ঘুঘু পাখি ধরে আছে। সেই পাখি তার ডান ঝাপটাল ও তার চোখ বন্ধ করল। এটা কি হল? কি হয়েছে? এটা পরিষ্কার যে সেই বালক সৈন্যদের কাছে তার পাখিটিকে দিযে দিতে চায়নি, সুতরাং তারা তাকে গুলি করল। কিন্তু যখন তারা পিছ হটতে শুরু করল, তখন ওই পাখিটাতে তাদের কি দরকার ছিল, আর বালকটিই বা তাদের পথের বাধা হচ্ছিল কি ভাবে?

একটি রেল স্টেশনে চতুষ্কোণ চত্বর। স্টেশন বাড়ির পাশে সার সার ডাঁই করা মৃতদেহ: লাল ফৌজ যুদ্ধ বন্দী? ওরা নিশ্চয়ই জায়গা ছেড়ে নিজেরা সরে যেতে অস্বীকার করেছিল। তাই তাদের গুলি করা হয়েছিল। আর জ্বালানি কাঠ যেভাবে সাজানো হয়, সেভাবে মৃতদেহগুলি থাক থাক করে রাখা। কিন্তু যথা সময়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়নি ওগুলোকে। মৃতদেহগুলির আরও কাছে এগিয়ে গেল ক্যামেরা। আর আমরা আলাদা করে দেখলাম মৃতদেহগুলির হাত, পা, মাথায় নোংরা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। না, ওরা যুদ্ধ বন্দী নয়। ওরা আহত সৈনিক, যাদের হত্যা করে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। পর্দার ওপর ঝলসে উঠল এই লেখাগুলি যা দলিল—যা জার্মান প্যানজার বাহিনীর একজন অধিনায়কের আদেশ "উচ্চতর সামরিক কর্তৃত্বের আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আমি আমার সকলকে জানিয়ে দিতে চাই, যে এখন

থেকে প্রয়োজন হলে প্রতিটি অফিসারের নিজ একক সিদ্ধান্ত অনুসারে যুদ্ধ বন্দীদের গুলি করে মারার অধিকার থাকবে।" রোস্তভে এই ঘটনা ঘটেছিল।

দেখে মনে হয় যেন সেই বিশাল সীমান্ত রেখা: কের্চ, ভ্রনবস্কি, খারকভ অঞ্চলে আমাদের অগ্রবর্তী অভিযানের যে পথ তাই যেন আমরা আবার চিনে চিনে যাচ্ছি। খারকভের সব কিছুই ছিল আমার খুবই পরিচিত। আমার সব কিছু খুঁটিয়ে মনে আছে যে কিভাবে আমি আর বেতার বিভাগীয় সাংবাদিক-কর্মী প্যাভেল কোভানভ এক রাত্রে গাড়ি চালিয়ে খোঁড়াখুড়ি কাজ সত্ত শুরু হয়েছে এমন একটা বিরাট গর্তের কাছ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেই বিরাট গর্তটা এখন পর্দায় দেখানো হচ্ছে। এটা সাঁজোয়া বাহিনীকে ফাঁদে ফেলার জন্যে একটা গর্ত। যে গর্তে মাটির পাতলা আস্তরণের তলায় হাজার হাজার গলিত পচা শবদেহ পড়ে রয়েছে। নাজীদের বর্বর নৃশংসতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য আমরা রাষ্ট্রীয় কমিশনের সভাদের সঙ্গে চারদিক ঘুরে দেখলাম। তখন পর্দার ওপর যে হাসপাতালের ছবি দেখানো হচ্ছে আমরা সেখানেও গিয়েছিলাম। আহতদের সঙ্গে এই হাসপাতালও তারা পিছু হটে পালাবার সময় আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। রুশ কমিশন কাঠকয়লার মতো কালো কংকালগুলি পরীক্ষা করেন। কোন কোন কংকাল তখনো প্লাসটার লাগানোর ছাপ বয়ে বেড়াচ্ছে। উঠোনোর মাঝখানে খোঁড়া হয়েছে খনি মুখের মত এক সুড়ঙ্গ। তার মধ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়া ড্রেসিংগাউন পরে মৃতদেহগুলো ভয়ংকর সব ভঙ্গীতে ছিরকুটে পড়ে রয়েছে। লেখক এ্যালেক্সি তলস্তয়—ভারিক্কী, ধীরে নড়াচড়া করেন—তিনি রাষ্ট্রীয় কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন। তিনি যা কিছু দেখেছিলেন, তা নিয়ে আতংকগ্রস্তের মতো তিনি বেঞ্চে বসেছিলেন।

"এটাকে বর্ণনা করা কঠিন", তিনি আমাদের উঁচু তীক্ষ্ণ গলায় বললেন। "এই হল *ফ্যাসীবাদ*। তুমি এর কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পাবে না। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু বা এর মতো কোন কিছু নেই। সেই খনি মুখের মত সুড়ঙ্গ দেখে তিনি যোগ করলেন, "লোভ, হীনতা, নীচতা আর কাপুরুষতার কেন্দ্রীভূত বিশুদ্ধ সারাংশই হল ফ্যাসীবাদ। আহতদের হত্যা করবে কেন? শান্তিপ্রিয় হাজার হাজার মানুষকে শেষ করে দেবে কেন? এ সবের থেকে কোন বস্তু পাওয়া যায়, কোন লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, এমন

করে? কিছু না, কেবল ঈশ্বরের দয়ায় যেন কেউ না টের পায় যে তুমি একটি দৈত্য নও, যেন কেউ না বোঝে যে আসলে তুমি ভণ্ডামিপূর্ণ কথাবার্তায় ভরা ঘ্যানঘেনে এক তুচ্ছ বিকারগ্রস্ত প্রাণী। লোকে যেন তোমাকে কেবল ভয় করে, তোমার সম্পর্কে লোকেদের ভয় যেন কখনো না ঘোচে...এই লক্ষ্য..."

সোভিয়েত লাল ফৌজ বাহিনীর অগ্রগতির রেখা ধরে ধরে যুদ্ধক্ষেত্রের সেই অসম সাহসী ক্যামেরা, দক্ষ ছবি তুলিয়েরা আমাদের কেবলই আরও, আগে নিয়ে চলল। মনে হচ্ছিল যেন সেই অন্ধকার বিচার সভা কক্ষে হাজার হাজার মৃতদেহের ওপর শত শত মৃতদেহ সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আলো ফেলা হয়েছিল কেবল যুদ্ধ অপরাধীদের মুখের ওপর আলাদা আলাদা করে। আমরা সামনেই বসেছিল ক্রুক্রিনিক্সিরা। তাদের সামনে ছবি আঁকার খাতা খোলা। তাদের হাতের পেনসিল কাঁপতে কাঁপতে জোর কাজ করে যাচ্ছে। তারা যে অন্ধকারে কেমন করে ছবি আঁকতে পারছিল, তা আমি সত্যি জানি না। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে তাদের মাথা পর্দা থেকে আসামীদের কাঠগড়ার দিকে ঘুরে যাচ্ছিল আবার ফিরে আসছিল পর্দায়। তখন আসামীদের কাঠগড়াটা লক্ষ্য করা ছিল সবিশেষ আগ্রহকর ব্যাপার। একটা গোঁয়ার অতিকায় পাখির মত দলা পাকিয়ে মাথাটা ঘাড়ের মধ্যে গুঁজে বসেছিল গোয়েরিং। কেইটেল বিরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল আর ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। জডল বসেছিল হতবাক বোবার মত। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পর্দার দিকে, যেন তার দুদিকে নাট বল্টু দিয়ে সেই ভাবে কেউ গেঁথে দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সে যেন কিছুই দেখছিল না। প্যাটের চোখ দুটো ছিল বোঁজা। হাতের পাতার ওপর নিজের মুখ চেপে ধরে বসেছিল রিবেনট্রপ। ওদের যে সমস্ত বলিকে তারা বহুদিন আগে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তাদের সঙ্গে এই সাক্ষাতে ওরা ভীত, যথার্থই আতংকিত।

তারপর একটি পরিচিত দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল পর্দায়। ঘোষক বলল "কিয়েভ", কিন্তু আমি শুনলাম "বাবি য়ার"। ওইভাবেই কিয়েভ-এর উল্লেখ করা হত। অক্টোবর বিপ্লবের ২৬তম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে মস্কো ফিরে যাবার পথে আমরা উক্রাইনীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ সীমান্ত থেকে শত্রু অবরোধ মুক্ত উক্রাইন রাজধানীতে বিমানে উড়ে গিয়েছিলাম। নগরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তখনো ফিরে আসেনি। বোমায় উড়িয়ে দেওয়া

ক্রেশচাটিক জনপথ পাথরকুচির ভ'াই হয়ে পড়ে আছে। কিয়েভ-পেচোরস্কি মোনাস্টেরির মাঝে প্রাচীন গীর্জার ধ্বংসাবশেষ তুষার সাদা বৃক্ষরাজির প্রেক্ষাপটে বিষণ্ণ করুণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার অধিবাসীরা সাগ্রহে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে নাৎসীদের টাঙানো সাইনবোর্ডগুলো। যার সঙ্গেই আমরা কথা বললাম সে "বাবি য়ার" কথাগুলো উচ্চারণ করলোই। আমরা নগরের দক্ষিণ পশ্চিম উপকণ্ঠের সহরতলিতে গেলাম। সেখানে যা দেখলাম, তা কখনোই ভুলবো না, ভোলা যাবে না। এখনো আমাকে তা তাড়া করে, বোধহয় আমৃত্যু তাই করবে: সেই বিশাল গিরিখাতের ওপর ঢালের মত জায়গা যা উঁচুভাবে ফালা করে কেটে দুফাঁক করে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর প্রায় আড়াই গজ পুরু মনুষ্য শরীরের জড়াজড়ি যা গোটা ঢালের ওপর দিয়ে ভূতাত্ত্বিক পাললিক শিলাময় অঞ্চলের মত বয়ে গেছে।

আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের স্যাপাররা খুঁড়ে তুলছিল। ভিজে তোয়ালে তাদের মুখ বাঁধা। কেন না তুষারাচ্ছন্ন আবহাওয়া সত্ত্বেও পুতিগন্ধময় দুর্গন্ধ ছিল আতঙ্ককর। এমন কি আমরাও, যারা খারকভ-এ সেই খনি গর্ত দেখেছি, দেখেছি পোলাতাভা শহরের ঠিক বাইরের মৃত দেহের স্তূপ, তারাও এই বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য দেখে অবশ, চলৎ শক্তিহীন হয়ে গেলাম। এক নারী যার ধূসর রঙের চুল আলুথালু হয়ে আকাশে উড়ছে, বোঝাই যায় সে তার সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছে, সেই উন্মাদিনী ঘুরে বেড়াচ্ছিল চারপাশে। সেই নারী হাসছে না কাঁদছে তা নিশ্চিত করে বোঝা একেবারেই অসম্ভব। কালো চুলের একটি ছোট্ট বালিকা সেই নারীকে সেখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করার মত হাতে কোন সময় ছিল না। সেদিনই আমাদের এই বিষয় নিয়ে লেখা দিতে হবে, কেননা সেই দিনই আমরা বিমানে মস্কো ফিরে যাচ্ছি। আমরা কেবল স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথা বললাম। কেউ বলল পঁচাত্তর হাজার লোক মারা গেছে। কারো হিসাব মতে এক লাখ। কারো বিবেচনায় মৃতের সংখ্যা দেড় লক্ষ। কিন্তু এই গহ্বরের মধ্যে মৃতদেহের সংখ্যা কে গুণতে পারে? আমরা মনে মনে ভাবলাম, এখানে এই স্থানে একদিন কিয়েভ-এর জনসাধারণ এক স্মৃতি সৌধ খাড়া করবে তাদের নিকট ও সুদূর

উত্তর পুরুষদের কাছে নাজীদের বর্বর নৃশংসতার এই বিভীষিকাময় দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ; আর তাদের কাছে এই আবেদন জানাবে এর সমুচিৎ প্রতিদান ও এর বিরুদ্ধে সদা সতর্ক প্রহরার জন্যে।

পর্দায় তারপর এই সব ছবিই ফুটে উঠল। যেন গণনাতীত সুবিস্তৃত মৃতের পাহাড়। স্তব্ধ বিচারসভা। অতীতকে পুনরায় সামনে এনে দিয়েছে।

এই তথ্য চিত্র আমাদের আরও এগিয়ে নিয়ে গেল আরও পশ্চিমে লাতভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পরিশেষে খোদ জার্মানীতে।

"লেহেমস্ ড্রফ-এ সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দীদের বন্দী শিবিরে", সূত্রধার উল্লেখ করলেন আমাদের জন্যে।

এবং আবার আমরা দেখলাম শত শত মৃতদেহ আর জ্যান্ত অসংখ্য মানুষ যাদের দেখতে চলমান কঙ্কালের মতো।

"ড্যানজিং প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি কক্ষ। মানুষের শরীরকে কিভাবে শিল্প উৎপাদন সামগ্রী হিসেবে কারখানা ভিত্তিক মাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়, এই প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রযুক্তিগত পদ্ধতি বিস্তারিত করা হতো," সূত্রধারের ক্লান্ত একঘেয়ে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ইয়ার ফোনের মাধ্যমে।

আমরা ইতিপূর্বেই এ বিষয়ে জানতাম। এই কারখানাভিত্তিক উৎপাদনের নমুনা বিচার সভায় সাক্ষ্য ও নিদর্শনস্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। তথাপি, এখনো এইসব দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। মনে হয় চোখ টিপে ধরে লাফ দিয়ে উঠি ; দৌড়ে আদালত কক্ষ থেকে বাইরে চলে যাই। কিন্তু এই পৃথিবীর ওপর শয়তানের তৈরী নরকের সব কটি পাকের মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। নাজীবাদের বুকের ভেতরে কি ছিল তা স্পষ্ট করে দেখতে হবে। আর এই নাজীবাদ মনুষ্যজাতিকে কি এনে দিয়েছিল তার সব কিছু, তার সমগ্রতাকে জানতে হবে।

আমরা ভূগর্ভস্থ একটা জায়গা দেখলাম, যেখানে, কারখানার গুদাম ঘরে যেমন ডাঁই করা কাঁচা মাল থাকে, সেইরকম সেই ভূগর্ভ মৃতদেহে পুরো বোঝাই করা। সত্যি কথা হল, এইসব কাঁচামাল ছাড়া আর কিছু নয়। চর্বি বা স্নেহ জাতীয় সম্ভাব্য প্রাপ্য পরিমাণের নিরিখে এগুলির মান নির্ধারণ করে আলাদা করে রাখা। আলাদা করে রাখা অজস্র কাটা মুণ্ড, রয়েছে

এক কোণায়। ওগুলো বাতিল মাল, স্রেফ নষ্ট। ওগুলো সাবান তৈরীর অনুপযুক্ত। অথবা এও হতে পারে যে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছু নির্মাণের সঙ্গে নাৎসী বিজ্ঞান পাল্লা দিয়ে চলতে পারে নি আর তাই ওই কাটা মুণ্ডুগুলোকে কিভাবে কারখানাভিত্তিক শিল্প সামগ্রী হিসেবে উপযোগী করা যায় তার উপায় ও পদ্ধতি তখনো বার করতে পারেন নি। তারপর আমরা দেখলাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো ছিন্ন ভিন্ন করা অজস্র মনুষ্য শরীর, যেগুলি তরল এ্যালকালিনে টগবগ করে ফুটে সেদ্ধ হবার জন্যে চৌবাচ্চার মধ্যে স্তূপ করে ফেলা আছে।

আমি আপনা থেকে যেন যন্ত্রচালিভাবে কেইটেলের দিকে তাকালাম কেননা এই সেই লোক, সেই অনুমতি দিয়েছিল, এমনকি আদেশ ঘোষণা করেছিল যে যুদ্ধবন্দীদের সুপরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা উচিৎ। এই ঘোষণা সম্পর্কিত নিদর্শন রূপ দলিল যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষের অভিযোগকারীরা বিচারসভায় পড়ে শোনান, কেইটেল তার আত্মপক্ষ সমর্থনে বেশ খানিকটা সফল হয় যখন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে সে বলে, যে সে একজন সৈনিক এবং সে এই যুক্তিতে অটল থাকে যে একজন সৈনিক হিসেবে আদেশ বহন করতে ও আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে সে বাধ্য। এখন অবশ্য আমি লক্ষ্য করলাম যে সে আসামীর কাঠগড়ার কিনারাটাকে দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরার কেমন যেন বেপরোয়া চেষ্টা করছে।

বিচারসভায় আবার আলো জেলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই প্রেতরা, যারা উঠে এসেছিল তাদের কবর থেকে, তারা আবার মিলিয়ে গেছে বাতাসে। জনে জনে সকলে এক হতবুদ্ধি, হতবাক, মৃত্যুময় স্তব্ধতার মধ্যে নিজ নিজ আসনে আসীন। কেবল কুকরিনিক্সিরা এবং বোরিস ইয়েফিমভ প্রাণপণ কাজ করে যাচ্ছে এখনো, খুব চেষ্টা করছে যা তারা এইমাত্র দেখল, তার সবটা ধরে রাখতে। কতকগুলো পেন্‌সিল আর রাবার দাঁতে ধরা নিকোলাই ঝুকভের মুখ দিয়ে বার হয়ে আছে। এখন তার পেন্সিল যা কিছু করছে তা ছাড়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তার কোন কিছুই খেয়াল নেই।

প্রামাণিক তথ্য চিত্রটা দেখতে দেখতে আমি একটা জিনিস মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতিতে আমি পাকড়াও করলাম আনিয়াকে। আনিয়া আমাদের নতুন দোভাষী, বুদ্ধিমতী, শান্ত

তারু-তারু, মোটা নাক, আনিয়া এখন আমাদের দোভাষীর কাজ করছে লিটল টিন সোলজার সে মস্কো ফিরে গেছে, তার জায়গায়। আনিয়াকে নিয়ে প্রায় ছুটে গেলাম ডাঃ গিলবার্টের কাছে। তথ্যচিত্র দেখানোর সময় উনি আমেরিকার পক্ষে অভিযোগকারী সদস্যদের মধ্যে বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে জানতে উৎসুক ছিলাম যে তাঁর মক্কেলরা অর্থাৎ অভিযুক্ত আসামীরা ছবি দেখার পর কে কি বলেছে।

অনেকটা মার্জনা চাওয়ার মত করে ডাঃ গিলবার্ট তার কাঁধে ঝাঁকি দিলেন। তিনি এখনো তাদের সঙ্গে কথা বলে উঠতে পারেন নি। কেবল তাদের মুখ, মুখাবয়ব লক্ষ্য করেছেন। তাঁর বিবেচনায় তারা অনেকেই হঠাৎ ভয়ে বেশ চমকে গেছে। ভন প্যাপেন আর নিউর‍্যাথ পর্দার দিক থেকে তাদের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বসেছিল। স্প্যাট নিজের সঙ্গে বিড় বিড় করে কি কথা বলছিল। মনে হচ্ছিল ফ্রানক বুঝি কাঁদছে। কিন্তু সে কথা হলফ করে বলা যায় না, কেননা এমনো হতে পারে যে স্রেফ আলোছায়ার প্রতিক্রিয়ায় ওকে ওরকম দেখাচ্ছিল। এক কথায়, ডাঃ গিলবার্টের সঙ্গে আমার পরদিন দেখা করা উচিৎ এবং সম্ভবতঃ আগামীকাল এ বিষয়ে তাঁর পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হবে।

সেই অট্টালিকায় যে দিকটা রুশ অধিবাসী অধ্যুষিত সেখানে তুমুল হৈ হৈ—সব 'বিগ উইগ' আর 'খলোডিয়ান'রা কারমেন আর শতাতল্যাণ্ডকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করছে আর অভিনন্দন জানাচ্ছে।

৭। দাবাখেলায় চালমাতের পর

ডাঃ গিলবার্টের পেশা বা জীবিকা একটু বিশেষভাবে অন্যরকম। তিনি একজন ফরেনসিক মনোবিশেষজ্ঞ এবং ঘক্ষেত্রে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় লোক। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমেরিকানরা চাঁছা ছোলা লোক আর তারা ছাপাখানার লোকদের মতো। যদি ঠিক কৌশল প্রয়োগ করা যায় তবে তাঁদের সাক্ষাৎকার পাওয়া কঠিন নয়। যাই হোক ডাঃ গিলবার্ট তাঁর অধিকাংশ স্বদেশবাসীর থেকে কিছু অন্যরকম। তিনি ছিলেন স্বল্পবাক, মুখ চাপা ধরনের। নিউ ইয়র্ক থেকে যেসব সাংবাদিক চূড়ামণি অল্প সময়ের

জন্য ন্যুরেমবার্গে উড়ে আসতেন তাঁদের সঙ্গে ছাড়া ডাঃ গিলবার্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা কদাচ বলতেন। যদিও, আমুদে এরিক যেমন বলতো, আমাদের সকলের কাছেই তিনি ছিলেন "লোভনীয় এক টুকরো খাবার।" নিশ্চয়ই, তিনি তাই ছিলেন। মনে রেখো, বিচারাধীন বন্দী যুদ্ধ অপরাধীদের কুঠরিতে তিনিই একমাত্র লোক, যিনি যে কোন সময় যেতে পারতেন, তাদের সঙ্গে যে কোন বিষয় কথা বলতে পারতেন ও বিচার সভায় যা কিছু ঘটছে সে সব কিছু সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার সুযোগ একমাত্র তাঁরই ছিল।

কর্নেল অ্যানড্রুস বেশ কিছু সময় ডাঃ গিলবার্টের কাজকর্ম মনোযোগ দিয়ে নজর করেছিলেন ও এই মন্তব্য করেছিলেন যে বন্দীদের বিশ্বাস ও আস্থা কি করে অর্জন করতে হয় তা ডাঃ গিলবার্ট জানেন। এমনকি ভেতর গোঁজা হেস্‌স এবং কেইটেল আর জডল, যারা খুব সাবধানী তারাও স্বেচ্ছায় তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিত।

আমি ইতিপূর্বে নিবেদন করেছি যে সেই বেপরোয়া মেয়ে পেগির মারফৎ আমি ডাঃ গিলবার্টের সঙ্গে পরিচিত হই এবং এর বিনিময়ে তার একটি বাজি জেতার সুযোগ করে দিই—এক বোতল ফরাসী কগনাক। বোধ হয় গিলবার্ট আমায় পছন্দ করতে আরম্ভ করেছিলেন। আমরা প্রেস ক্যাম্পে একসঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারতাম। তিনি ছিলেন বেশ সদয় আর চমৎকার ব্যক্তিত্বের মানুষ। কিন্তু তাঁর এইসব দয়া ও চমৎকারিত্বের দিক দিয়ে আমার কাজ হত খুব সামান্যই। তিনি বলেছিলেন যে নীতিগতভাবে প্রেস অর্থাৎ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে, বিশেষ রুশ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তাঁর বলার কিছুই ছিল না, কিন্তু দুটি কারণে তিনি সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করতেন। প্রথমতঃ তিনি একজন ডাক্তার সুতরাং তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পেশাগতভাবে গোপনীয় এবং দ্বিতীয়তঃ, বিচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনার কথা তিনি মনে মনে চিন্তা করেছেন।* প্রতিদিন তিনি প্রতিবাদী যুদ্ধঅপরাধীদের সঙ্গে তাঁর

* ডাঃ গিলবার্ট, সত্যই একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন (*ন্যুরেমবার্গ দিনলিপি*, এন.ওয়াই. ১৯৪৭)। এর মধ্যে বহু আগ্রহসঞ্চারী বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমি যখন আমার *দিনলিপিগুলি*

কথোপকথন যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এটা করা তাঁর প্রয়োজন ছিল, কেবল তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক কাজের জন্য নয়, তাঁর ভবিষ্যৎ কাজের জন্যও।

"যদি আমি খবরের কাগজের মাধ্যমে এইসব মালমশলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দি, তাহলে শেষকালে আমার নিজের জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না", তিনি বলেছিলেন।

আমি যখন সরাসরি জানতে চাইলাম যে আগের দিন প্রদর্শিত তথ্যচিত্র প্রতিবাদী আসামীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া এনেছে, তিনি কেবল জানালেন যে তাদের মুখে চোখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল, যা তিনি আগের দিন আমায় বলেছিলেন, সাধারণভাবে তাই মিলে যাচ্ছে বা সমর্থিত হচ্ছে। প্রতিবাদী আসামীরা ভেতরে ভেতরে খুবই অসুবিধা আর চঞ্চল বোধ করেছে। এছাড়া তাঁর আর কিছু বলার নেই। তারপর তিনি যোগ করলেন; "কিন্তু আপনিও কি চঞ্চল বোধ করেন নি?"

আমি অবশ্যই তাঁর ওপর এ নিয়ে কোন চাপাচাপি করি নি। হাজার হোক প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পেশাগত গোপনীয়তা আছে। আমি আমার কফি শেষ করে, তাঁর সঙ্গে ভদ্রভাবে করমর্দন করে চলে এলাম। আমার বিলক্ষণ মালুম ছিল যে তাঁর কাছ থেকে আমি যা টেনে বার করতে চেয়েছিলাম, আমার সে চেষ্টা আবার ভেস্তে গেছে।

তাই বলে, সারাদিনটাই যে জলে গেল, তা নয়। সোভিয়েত অভিযোগ-কারীদের পক্ষের প্রধান পরম দক্ষতায় প্রশ্নের পর প্রশ্নে গোয়েরিংকে কোণঠাসা করলেন।

"আত্মরক্ষাকারী প্রতিবাদী, তুমি কি স্বীকার করো যে তোমাদের সৈন্যবাহিনীকে পূর্বদিকে পাঠিয়ে তোমরা শান্তিচুক্তি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী? আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে; তোমাদের সর্বাধিনায়ক এক গভীর ও বিষম অপরাধ করেছে; যার চূড়ান্ত পরিণতি জার্মানীর ধ্বংস?"

প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, আমি তাঁর রচনার সঙ্গে আমার লেখা দিনলিপির কোন কোন অংশ যথাযথভাবে সাজানোর জন্য মিলিয়ে নিয়েছিলাম।—লেখক।

"এটা কোন অপরাধ নয়, এটা একটা ভুল", যেন কোন সুরহীন কাঠ কাঠগলায় উত্তর দিল জার্মানীর ২ নম্বর নাৎসী। "আমি কেবল এইটুকু স্বীকার করতে পারি যে আমরা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চেয়েছিলাম কেন না আমরা জানতাম না বা আমরা অনুমান বা সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারে নি, এমন অনেক কিছু যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ চলাকালীন সময় স্পষ্ট হয়। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ তার কাজ ভালই করেছিল। লাল ফৌজের শক্তি আপনাদের ট্যাঙ্কের সংখ্যা, বিমান বহর আর সামরিক উৎপাদনের ক্ষমতা আমরা মোটামুটি জানতাম। দুটি বাহিনীর সর্বাঙ্গীণ শক্তির তুলনা করে আমরা আমাদের জয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। আমরা কিন্তু সোভিয়েত রুশদের জানতাম না। প্রাচ্য এবং তার অধিবাসীরা সব সময়েই পশ্চিমের পৃথিবীর কাছে এক প্রহেলিকা, ধাঁধার মতো। নেপোলিয়ন ভুল করেছিল এবং আমরা তাকে অনুকরণ করেছি।" এবং ঘরের ওপর পানে সে তার ধাতব চোখ তুলে বলল, "এটা দণ্ডনীয় কোন অপরাধ নয়। এ নিয়তি।"

নিয়তি? আমায় স্বীকার করতেই হবে যে তার স্বীকারোক্তিতে আমি কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় ও নিবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নিয়তি! লহমায় আমার মনে পড়ে গেল সেই পা-হারা বৈমানিককে, যে তার অবাধ্য আর একগুঁয়ে জিদ নিয়ে এখনো আমায় তাড়া করে চলেছে। যার গল্প আমার এখনো লেখা বাকী। সুতরাং ওটা হল তোমার "নিয়তি, ভাগ্য", তাই কি? ওটাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যুদ্ধের শেষ যোগফল, আর তোমায় ছুঁড়ে দিয়েছে আসামীর কাঠগোড়ায়, হেরম্যান উইলহেলম গোয়েরিং!

সেই বৈমানিকের ক্লান্ত, দাড়ি না কামানো মুখ আমি আবার দেখতে পেলাম। ঠিক যেমনটি তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ওরেল-এর কাছে বিমান ক্ষেত্রে যেখানে একটা যুদ্ধে দুটো শত্রুবিমানকে গুলি করে বিধ্বস্ত করার পর সে যেখানে বার হয়ে এসেছিল। আমি আবার দেখতে পেলাম তার বড় বড় কালো চোখ, যে চোখের দৃষ্টি রাজ্যের ক্লান্তির ভারে মনে হচ্ছিল লালচে রক্তাভ। আমি আবার শুনতে পাচ্ছিলাম তার ভাঙা ভাঙা ফিসফিসে কণ্ঠস্বর...এখনও যদি এই মানুষটার বিষয়ে আমি লিখতে না পারি, তাহলে আমাকে একজন সাংবাদিক বলা যাবে কোন সুবাদে! আমি

সেদিনই আমার টেবিলে বসে যাব, আর বসেই থাকব সেখানে যতক্ষণ না আমার আহৃত মাল মশলাগুলো আমি আবার নিজের ভেতরে ঝালিয়ে নিতে পারছি। ভাগ্যকে অজস্র ধন্যবাদ যে আমার সেই ছোট্ট খাতাটা, যার শিরোনাম "৩য় স্কোয়ার্ডনের বিমানসূচীর বর্ষপঞ্জী" এখানে আমার কাছে, ন্যুরেমবার্গেই আছে! প্রেস ক্যাম্পে মেজর ডিন যে অর্কেস্ট্রা ও ফিল্ম দেখানোর আয়োজন করেছেন, তা গোল্লায় যাক। ফেবার ম্যানসনের বসবার ঘরে আমার পশ্চিম দেশীয় সহকর্মীদের সঙ্গে যে অফুরান তর্ক আর কৌতুক যুদ্ধ, গোল্লায় যাক তা-ও। ওসব কোনভাবেই বিশেষ কোন কাজে লাগে না। এই যে দিনলিপি আমি লিখছি এটাও গল্লায় যেতে পারে, খুব সম্ভবতঃ এটা কখনো আমার কোন কাজেই লাগবে না। আর কাজে লাগার ব্যাপারই যদি হয়, তাহলে কারো কাজেই লাগবে না। দ্রুত-লিখন আর টেপ করে নেওয়ার যুগে ধারাবিবরণীমূলক লেখা একেবারেই সেকেলে আর অচল হয়ে গেছে।

বাড়ি ফেরার পথে আমি কুর্টকে তার বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করতে চাইলাম। আমি বিশেষ ভাবে জানতে চাইলাম যে আমাদের জঙ্গী বিমান যখন তার বিমানকে আঘাত করত, তখন সে যেমন অনুভব করত বা তার তখনকার সব অনুভূতি কি ধরনের আর কোন কৌশলে কি করেই বা সে জ্বলন্ত বিমান চালিয়ে, সে বিমান ক্ষেত্রে নীচে নেমে আসতে পারতো। এইসব নানা খুঁটিনাটি আর আবেগের সমস্ত ব্যাপার, আমার মনে হল আমার কাছে ধারণাতীত মূল্যের। কিন্তু আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে আমি খুব একটা সাড়া পেলাম না। কুর্ট আর আমি প্রায় রোজই ঘর সংসারের নানা ব্যাপার নিয়ে বেশ সহজে নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করতাম, কিন্তু গার্হস্থ্য পারিবারিক সীমানার বাইরে কথা বলার চেষ্টা করলেই আমরা হয়ে যেতাম দুটি বুদ্ধিমান সারমেয়র মত, যারা সবকিছু সম্পূর্ণ বোঝে, কিন্তু বলতে পারে না।

আমরা যখন প্রেস ক্যাম্পে পৌঁছুলাম, তখন আমি হেঁটে হেঁটে বিরাট বাড়িট পার হয়ে গিয়ে বাগানে বসলাম। সুন্দর বসন্ত এখানে সত্যই আবির্ভূত হয়েচে। ছোট ছোট গর্তে পড়া তুষার অদৃশ্য হয়েছে। সেদিন সকালে আমার বন্ধুরা ওই বাগানে পায়চারী করে নীল আর হলদে বাসন্তী পুষ্প নিয়ে এসেছে। একথা ঠিক যে নিশীথে ফুলগুলিকে আলাদা করে দেখা

যায় না। কিন্তু বিগত বৎসরের পত্ররাজি আর তুষারে আচ্ছাদিত হয়ে ঢাকা নেই। পায়ের নীচে খসে পড়া শুকনো পাতার মর্মর, আর বিকীর্ণিত বসন্ত সুরভির ঘ্রাণ। দক্ষিণ সমীরণের স্পর্শে প্রাচীন বৃক্ষরাজির লম্বা অমসৃণ কেশর কুঞ্চিত শীর্ষ দেশের আমোদিত দীর্ঘশ্বাস, আর সামনের সরসীনীরে প্রতিবিম্বিত মুকুতোপম চাঁদের বিচ্ছুরিত চন্দ্রকিরণ কণা। আমার বোধ হল যে আমার ওভার কোটের প্রান্তভাগ আমি তুলে দিই, আর লক্ষ্যহীন অনির্দিষ্টভাবে ছুটে সামনে কোথাও চলে যাই।

আমি আমার ঘরে ফিরে ঝাঁকি দিয়ে জানালা খুলে দিলাম। শুকনো পুটি ঝুরঝুর করে মেঝের ওপর পড়ল আর ঠাণ্ডা, ভিজে ভিজে বসন্ত বাতাস সেই ছোট্ট ঘরের সাংঘাতিকভাবে ক্ষিপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে এসে গেল—প্রবল ভাবে হু হু করে। সেই পাতা, যার শিরোনামে "একজন সত্যিকার মানুষের গল্প," যা আমি কয়েকমাস আগে ভেবেছিলাম, তা এখনো টেবিলের ওপর রয়েছে। আমার মনে আছে কি লিখবো, আমি তাই স্থির করতে পারলাম না। কি লিখবো—প্রবন্ধ, গল্প, না উপন্যাস। জাগ্রত প্রকৃতির তীব্র সুরভি ভেসে আসছিল ঘরের মধ্যে। আমি মানস নয়নে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম সেই মৃদু আলোকিত দিনটিতে নিরানন্দ সেই অরণ্য : সেই অরণ্য আর তার অন্তহীন স্তব্ধতা যা ভেঙে পড়া বিমানের শব্দে ব্যাহত হয়েছে। দেখতে পাচ্ছিলাম সেই বৈমানিককে যে ভিজে পিছল বরফের মধ্যে প্রায় ডুবে গেছে। আর শুনতে পাচ্ছিলাম বন মর্মর। আমি লিখতে আরম্ভ করলাম, আর লেখা বেশ ভালোই এগিয়ে চলল।

সেই পুরোন এ্যালার্ম ঘড়ি, যা বোধ হয় কাজে যাওয়ার জন্যে কোনদিন কুর্টের ঠাকুর্দাকে ডেকে ঘুম থেকে তুলেছে, সেই ঘড়িতে এখন ভোর তিনটে। লেখায় ভরা সাত সাতটা পাতা টেবিলে পড়ে আছে। আমি লেখার একটি পাতাও দলা পাকিয়ে ফেলেনি, আর কাটাকুটি করিনি বললেই চলে। আমার মন ছিল পরিষ্কার। আমি হয়তো লেখা চালিয়ে যেতাম, কিন্তু বোধ হল যে একটু ঘুম দিয়ে নেওয়া দরকার। ওই হতচ্ছাড়া ঘড়ি তো আমায় কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেবেই।

আমি মনে মনে আমার বৈমানিককে শুভরাত্রি জানালাম। আমার এ বিষয়ে বিন্দু বিসর্গ ধারণা ছিল না যে ওরেলের কাছে সেই খনিতে ভূমধ্যস্থ আবাসের কাছে আমরা দুজন যখন কথা বলছিলাম, তখন কিছুটা দূরে কুরস্ক

বালজ যুদ্ধে যে গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছিল, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে তার এই মহাভারতীয় আখ্যান লেখার সময়, সেই সবের মধ্যে আমি আবার ডুবে যাব!

৮। তাদের দুর্বোধ্য কিচমিচ

বিচার শুরু হওয়ার সময় নাজী কর্তারা তাদেরকে "প্রতিবাদী আসামী" বলে উল্লেখ করায় গোসা করেছিল। তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে সমারোহ করে সশ্রদ্ধ ভাবে "মাননীয় মন্ত্রী", "মাননীয় রেইখ মারশাল" "মাননীয় গ্র্যাণ্ড এ্যাডমিরাল" এই সব বলে সম্বোধন করতে হবে। এখন অবশ্য সয়ে সয়ে তারা "প্রতিবাদী আসামী" শব্দটায় অভ্যস্থ হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর তারা গোসা করে না। মনে করে না যে তাদের অপমান করা হচ্ছে।

সেদিন আমি সেই সব গোপন সভার দলিল আর সেই সব সভার নথীভুক্ত লিখিত সভার কার্যবিবরণী দেখছিলাম। এই সব গোপন সভায় কঠোরভাবে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নেতারা মিলিত হত ও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো। আমি এইসব দলিল থেকে সেই সারাংশ টুকে নিলাম, যা আমার কাছে মনে হল, দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ আর যার মধ্যে এই সমস্ত শয়তানের চরিত্র ও শয়তানী ব্যক্তিত্ব বিশেষ পরিস্ফুট।

এইতো তাদের কথাবার্তার একটি নমুনা। তার উচ্চাশাপূর্ণ বৃত্তিগত জীবনের শুরুতে, হিটলার রসচনিঙ্গের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে ঘোষণা করেছিল, "যাদের হাতের মুঠো শক্ত এমন সব লোকেদের আমার দরকার। তাদের নীতি বোধ প্রয়োজনে মানুষ খুন করার কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করবে না। আর যদি মওকামত তারা ঘড়ি বা গয়না ছোঁ মেরে তুলে নেয়, তাহলে তাদের ঝালাই মেরামতি করতে আমার বয়ে গেল।"

এই হল জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক নেতা হিসেবে হিটলারের আদর্শ। আর এই আদর্শ কখন? যখন সে সর্বশক্তিমান ফুয়েরার হয়নি। যখন সে কেবলমাত্র কতকগুলো ঠগ আর গলা কাটা খুনের দলের নেতা যে দলের বিশেষত্ব আর বিশেষ দক্ষতা ছিল সংখ্যালঘুদের নিগ্রহ সাধনে। ইহুদীদের

দোকান লুঠ আর অবশ্যই নগদ মূল্যের বিনিময়ে শ্রমিক সভা ও বিক্ষোভ ছত্রখান করে দেওয়া ছিল যাদের কাজ।

কিন্তু পরে হিটলার হল নাজী জার্মানীর নেতা। তার কাজ করার সুযোগ বেড়ে গেল দারুণভাবে। কিন্তু যে নীতির সে লোকেদের তার খাস আদমী তথা অনুচরে উন্নীত করত, তখনো হুবহু সেই পুরোন নীতিই বহাল থাকল। তারা ছিল সব সময় সেই সব লোক যাদের হাতের মুঠো বেশ জবরদস্ত, যাদের কাছে কোন কিছুই পবিত্র ছিল না, যাদের সম্মানবোধ বা বিবেক বলে কোন পদার্থ ছিল না। আর তাদের কাছে একটা জিনিসই দাবী করা হত: ফুয়েরারের প্রতি অখণ্ড অন্ধ আনুগত্য। যদিও তাদের বিভিন্ন সব মর্যাদার পদ দেওয়া হত, যেমন, মন্ত্রী, রেইখ মারশাল, গ্র্যাণ্ড এ্যাডমিরাল এবং গ্যালিয়টার ইত্যাদি, কিন্তু আসলে মূলত: তারা থেকে গিয়েছিল সেই ঠগ, গলা কাটা খুনে সব অপরাধী, যেমন তারা ছিল নাজী দলের সেই সব দিনে, যখন মদ্যপান করতে বসে কলহে গেলাস ভাঙত নাজী দলের লোকেরা, বাভারিয়ার পানশালায়। বেশী কথা কি, যখন তাদেরকে তাদের নিজস্ব পরিধি আর বৃত্তের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হত তার আগের মতোই সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কিচমিচ আর কচর কচর করতো।

অধিকৃত অঞ্চলের রেইখ মন্ত্রী সামরিক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি ও সরকারী আমলাদের সঙ্গে গোয়েরিংয়ের সভাসমিতির এক সর্ট হ্যাণ্ড লেখা প্রতিবেদন সোভিয়েত অভিযোগকারীদের পক্ষে প্রধান অভিযোক্তা আদালতে পেশ করেন। নাজীবাদের শয়তানী প্রকৃতিকে খুলে ধরার জন্যে এই লেখা এক মহামূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ও উর্বরতম ভূমি জার্মানীর অধিকারে এ কথা বলার পর গোয়েরিং বলে যে আটলান্টিক থেকে ভোলগা এবং ককেশাস পর্বতমালা, দেশের পর দেশ, যা একটা অন্যটার চেয়ে সমৃদ্ধতর, তা সবই সাহসী জার্মান বাহিনী জয়ের পর জয় করে চলেছে। গোয়েরিং আরও জানায় যে তার অভিপ্রায় হল সে চায় তার সমস্ত বন্ধু, সঙ্গী এক্ষুনি এই সব দেশে লুঠতরাজ আরম্ভ করুক। সে সত্যি সত্যিই "লুঠ" শব্দটা ব্যবহার করে। কেননা এই শব্দের আসল মানেটাকে গোপন করার জন্যে কোন যুতসই প্রতিশব্দ খুঁজে দেখার সে কোন দরকার দেখেনি।

"অতীত কালে," সে বলেছিল "সবকিছুই তুলনামূলকভাবে অনেক সরল ছিল। তখনকার দিনে এটাকে বলা হত ডাকাতি। সেই পুরোন নীতি অর্থাৎ বিজিতের যথা সর্বস্ব নিজের দখলে নাও, তার সঙ্গে এটা ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সব নীতি আজকালকার দিনে আরও অনেক মানবিক হয়ে গেছে। যাইহোক আমার অভিপ্রায় লুঠ করা, হ্যাঁ লুঠতরাজ, আর তা করা আগাগোড়া কোন ফাঁক ফোকর বা বাকী না রেখে, সম্পূর্ণভাবে।

এই হল সেই "পরিচ্ছন্ন পথ" যা নিজের ভাষায় গোয়েরিং তার সরকারী প্রতিনিধি ও সেনানায়কদের জানিয়ে দিয়ে আদেশ দিল: "তোমাদের হওয়া উচিৎ রক্তপায়ী শিকারী কুকুরের মত, জার্মান মানুষের কাজে লাগতে পারে এমন যে কোন কিছুর সন্ধান পেলে তা নিয়ে আসবে। সমস্ত গুদাম-ঘর খালি করে সব মালপত্র এখানে, এ দেশে তোমাদের নিয়ে আসা উচিত বিদ্যুৎবেগে......"

গোয়েরিং-এর আদেশ ছিল যে অধিকৃত দেশের সমস্ত দোকান ঘরের বাইরের জন্য বড় বড় জানলায় সাজিয়ে রাখা সব কিছু, শস্য ওজন ও বহন করার কপিকল, আর খাদ্যভাণ্ডার এখুনি বাজেয়াপ্ত করতে হবে ও জার্মানীতে নিয়ে আসতে হবে।

গোটা ইউরোপ জুড়ে লুঠতরাজ করার বিপুল সম্ভাবনার কথা বলতে বলতে গোয়েরিং ক্রমশঃ আরও আবেগের উত্তেজনায় ঘোষণা করল যে রেইখ কমিশনাররা, অর্থাৎ অধিকৃত অঞ্চলে জার্মান শাসক প্রতিনিধিরা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে অথবা লুণ্ঠিত দেশের নিশ্চিহ্নকরণ, কোনটাতেই যেন পিছপা না হয়। গোয়েরিং বলেছিল, "একটা জাতি, যারা, সহজাতভাবেই আমাদের নিশ্চিত শত্রু, তাদের বাঁচিয়ে রাখার দায়দায়িত্ব আমাদের নয়। এই কথা মনে রেখো যে যদি অধিকৃত দেশগুলো থেকে তোমাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া মন্দ ও চূড়ান্ত সব ধীক্কার আমাদের কানে আসে, তাহলেই আমরা জানবো যে তোমরা তোমাদের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করছো।"

যেহেতু গোয়েরিং তাদেরকে তাদের হাতের কাছে যা কিছু আসবে তা-ই লুঠ করার আদেশ দিল, গোয়েরিং জানিয়ে দিল যে এই লুঠেরাদের প্রাণ যা চায়, তাই তাদের দেওয়া হবে, আর এই সব জিনিস পূর্ণ হলে সেইসব দেশের অনাহার ক্লিষ্ট জনগণ গোরুতে যে ঘাস পাতা খায়, তাই খেয়ে থাকবে।

এর দ্বারা এ ব্যাপারটাই গুরুত্ব সহকারে প্রকটিত হবে যে জার্মানরা হল প্রভু শ্রেণীর জাতি, স্থানীয় অর্থ নৈতিক আইনটাইন এই বাছাই করা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, আর তারা তাদের যেমন খুশী, তেমন থাকবে। গোয়েরিং একথাও বলেছিল যে সে যদি শোনে যে প্যারিসের সব ভালো রেস্তোরা জার্মানদের খাবার বিতরণ করছে না, তাহলে সে অসন্তুষ্ট হবে। আর পরিচারিকারা কেবল জার্মান অফিসারদের, শুধু জার্মান অফিসারদের ভাল খাবার পরিবেশন করবে, কোন ফরাসীকে নয়।

এ কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে এইভাবে রেইখ মারশাল, নাজী নং দুই, ৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই বিশাল ইউরোপের দেশগুলির বিষয়ে—যে ইউরোপ পৃথিবীকে মহান বিজ্ঞানী, কবি, চিন্তাবিদ, ইত্যাদি আশীর্বাদের মত উপহার দিয়েছে—তার সামরিক অধিনায়কদের ও অসামরিক লোকজনদের এই সব পদ্ধতিগত নির্লজ্জ সব নির্দেশ ও আদেশ দিত।

এই আলোচনা সভার কার্যবিবরণী নাজী পালের গোদাদের স্বরূপ, যা তারা যথার্থই ছিল, তাই খুলে ধরেছে এবং দেখিয়েছে তাদের কাপুরুষতা ও সোভিয়েত পার্টিজানদের সম্পর্কে তাদের জানোয়ারের মত ভয়।

গোয়েরিং যখন ফরাসী দেশ লুঠ করার কথা বলছিল তখন রেইখ কমিশনার ও জঙ্গী অধিনায়কদের বেশ অনুপ্রাণিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু যখনই গোয়েরিং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করল, সেই উচ্চপদস্থ গলাকাটা খুনেরা তাদের উৎসাহ হারাতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে। তাদের মুখ যেন কেমন কালোমত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মেজাজের এই পরিবর্তন গোয়েরিং বুঝতে পেরেছিল। আর তাই সে আরো জীবন্ত করে আর আমুদে হাসিখুসী ভঙ্গীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল সম্পদ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করতে করতে বলল, "ভদ্রমহোদয়গণ, ডন কসাকস-এর ভূমি অঞ্চল সম্বন্ধে আমার আপনাদের বলা উচিৎ, যাতে আপনারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন ও জীবনকে একটা আশার আলোকে দেখেন।"

অধিকৃত কসাক গ্রামগুলোতে দখলদারী জার্মান সৈন্যরা কেমন নিজেদেরকে মাখন, মধু আর মাংসের মধ্যে ঠেসে ধরে আছে, এমন কি বাসী টক ননীর ভেতর ডোবানো মাংস কিভাবে খেতে হয় তা তারা শিখে গেছে,

শিখেছে অবজ্ঞাভরে মাখনের তাল ফেলে দেওয়া—এই সব কথা গোয়েরিং বলতে লাগল উপস্থিত সৈন্যদের উদ্দীপিত করার জন্য। সে মহা উৎসাহে হিসেব করে দেখতে লাগল যে কিভাবে ক্ষুধা উদ্রেককারী ক্যাভিয়ার ও নানা সুস্বাদু উপাদেয় সব মৎস্য আজভ ও ক্যাসপিয়ান সাগর থেকে নিয়ে আসা হবে জার্মানীতে, ও প্রতি বছর এই উর্বরা দেশ থেকে কি পরিমাণ খাদ্য শস্য তৃতীয় রেইখ, বিদেশে রপ্তানী করবে।

অকস্মাৎ রেইথ মারশাল, নাজী নং দুই-এর স্বপ্ন, যে এই সমাবেশে ডাকাত দলের সর্দারের মত ব্যবহার করছিল, জনৈক লোহসের কথায় আড়াল হয়ে গেল। লোহসে, ছিল বালটিক সাধারণতন্ত্রসমূহ ও সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের পশ্চিম ইউরোপ ভূখণ্ড…লুঠতরাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত রেইখ কমিশনার।

লোহসে : "আপনি যা কিছু বললেন, হের রেইখ মারশাল, তা সর্বৈব ঠিক! চাষ আর ফলন সত্যই অত্যন্ত চমৎকার……কিন্তু যেসব ঝামেলা পাকাচ্ছে ওদের গেরিলা যোদ্ধা আর পার্টিজানরা, তা যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি, তাহলে মাঠের শস্যের কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব……চার মাস ধরে সাহায্যের জন্য আমি কান্নাকাটি করছি। কিন্তু সেনাবিভাগ আমায় আর কোন বাহিনী দিতে পারছে না…*এস এস* রেইখ ফুয়েরারও এই সব দেশপ্রেমী যোদ্ধাদের বিষয়েও কিছু করতে পারছেন না।"

গোয়েরিং ঃ "কিন্তু অনেকটা ভেতরে ঢুকে তুমি যেখানে ঘাঁটি গেড়েছো, এসব ঘটছে তোমার ঘাঁটির পিছন দিকে, তাই নয় কি? এত মজবুত তোমার প্রতিরক্ষা, আর তুমি বলতে চাও যে এই সব পার্টিজান-দের হাত থেকে তুমি নিজেকে ও নিজেদের বাঁচাতে পারো না?"

লোহসে ঃ "এ পুরোপুরি অসম্ভব ব্যাপার। সমস্ত জায়গায় আমাদের কৃষি বিভাগীয় কমিশনারদের হত্যা করে ফেলা হচ্ছে। এমনকি মিনস্ক থেকে আরও বেশ দক্ষিণেও, একই ব্যাপার। বেশ কয়েকজন কমিশনার ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছে, আর আমাদের পক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরও অনেককেই আচমকা হত্যা করছে ওরা। এই সমস্ত পার্টিজানকে নানা আঘাতে যদি একেবারে খতম করে দেওয়া না যায় তাহলে বাইলো-রাশিয়া, শাসন করা আর তার সমস্ত সম্পদের সদগতি করা অসম্ভব।"

রোজেনবার্গ (তার আসন থেকে) "এই তো সরকারী দলিল।" দেড় হাজার আমাদের সহর প্রধান আর ম্যাজিস্ট্রেটকে মেরে ফেলা হয়েছে।

এই প্রথম সারীর নেতৃস্থানীয় ডাকাতদের যে অধিবেশনের শুরু হয়েছিল এই স্বপ্ন নিয়ে যে শ্রেষ্ঠ ফরাসী রেস্তোরায় পানীয় সমেত অতীব ব্যয়বহুল সব খাবার কেবল মাত্র জার্মানদের পরিবেশন করা হবে, সেই অধিবেশনের শুরুর স্বপ্ন আস্তে আস্তে তাদের হাত থেকে খসে গেল, আর শেষ হল সংশয় নিয়ে। লোহসে, কোচ, উক্রাইনের রেইখ কমিশনার, রোজেনবার্গ আর হিটলারের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহচররা—"সেই সব হাতের শক্ত মুঠিওয়ালা লোক. যাদের নীতিবোধ মানুষের জান প্রাণ নিয়ে নেওয়া থেকে তাদের নিবৃত্ত করবে না", তারা. রেইখ ২নং নাজী, গোয়েরিংয়ের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে, "লুঠতরাজ, আগা গোড়া কোন ফাঁক ফোকর না রেখে, সম্পূর্ণভাবে লুঠতরাজ করা দরকার।" কিন্তু তারা বিস্মৃত হয়ে ভুলে গিয়েছিল যে এই সভা তথা গোপন অধিবেশন ডাকা হয়েছিল অধিকৃত সব অঞ্চলের লুঠের মালের বিষয় নিয়ে। সে আলোচনা থেকে সরে তারা কথা বলতে আরম্ভ করল পার্টিজানদের লড়াই নিয়ে আর "পূর্বদিকে এই সমূহ বিপদ" নিয়ে। অধিকৃত সব অঞ্চলে জার্মান বাহিনীর ঘাঁটির পিছন দিকে পার্টিজানরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুদ্ধের যে অনির্বাণ ও অনতিক্রম্য মশাল জ্বালিয়েছিল, তাদের কথাবার্তায়, সেইসব পার্টিজানদের সম্পর্কে তাদের ভীতি, আতঙ্ক, বেফাঁস হয়ে বার হয়ে পড়ল।

আমি যেসব কথা এখানে তুলে দিলাম তা কোন গোয়েন্দা বাহিনী বা প্রেস ক্যাম্পে মেজর ডীন যে আমাদের প্রায়ই মার দাঙ্গা আমেরিকান ছবি দেখিয়ে আপ্যায়ন করতেন, তার থেকে তুলে দিই নি। আমি যা শুনেছিলাম আর আদালত কক্ষে বসে যা কিছু লিখতে পেরেছিলাম, এ হল তারই চুম্বক। এর মধ্যেই পরিস্ফুট হিটলারের সাম্রাজ্যের নেতাদের শয়তানী সব চিন্তাভাবনা আর উদ্যোগী উচ্চাশা।

ঠগদের আদর্শ, উদ্যোগ আর উচ্চাশার সঙ্গে একীভূত এইসব উপাধিধারী নিজেদের মধ্যে একমত হয়েছিল যে তাদের প্রতি রেইখ সেনা অধিনায়ক, রেইখ মন্ত্রীদের মত উপযুক্ত ব্যবহার করা হচ্ছে না। আদালতে এখন তাদের "প্রতিবাদী আসামী" বলে সম্বোধন করলে তারা আর অভিযোগ করছে না কোন। আহা, এটা শোনাও কত সুখের, কি সুখকর

এটা শোনা যে এই সমস্ত শয়তানরা, যারা অকথ্য নির্যাতন দ্বারা মিল জ্জের মত ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে লুঠতরাজ চালিয়েছিল, তারা কেমন কম্পমান হত, কেঁপে উঠত, সোভিয়েত নামে।

মহান স্বদেশপ্রেমী যুদ্ধের পার্টিজানরা, তোমাদের অবদান, তোমাদের এনে দিয়েছে অক্ষয় গৌরব।

৯। এক সত্যিকারের সাড়া

ট্রাইবুনালে যাওয়ার পথে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসে গলায় কুর্ট জানতে চাইল, "একথা কি সত্যি যে গতকাল আদালতের অধিবেশন চলার সময় জেনারেল রুদেনকো একটা পিস্তল বার করে হেরমান গোয়েরিংকে গুলি করেছে?"

"কুর্ট. তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কি বললে তুমি?"

কুর্ট তার সেই এক প্রশ্ন ফিরে আবার করল, আর আমি গল্পটা শুনিই নি বলে খুব আশ্চর্য হল, কেননা ন্যুরেমবার্গে লোকের মুখে মুখে তখন গল্পটা চলছে। আমায় স্বীকার করতেই হবে যে এই ধরনের ফোলানো ফাঁপানো গল্প শুনে আমি খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম আর অনুমান করতে চেষ্টা করছিলাম যে জেনারেল রুদেনকোর মত একজন মানুষ—সব সময় শান্ত, কৌশলী, রাশভারী—কিভাবে অভিযোগকারীদের আসন থেকে গোয়েরিং-এর দিকে পিস্তল 'তুলে ধরতে পারেন। আমি মনে মনে ছবির মতো দেখার চেষ্টা করে হেসে ফেললাম। কুর্ট, একজন ভালো আর সিরিয়াস ধরনের লোক যে কখনই একজন কেচ্ছা বিলাসী নয়। আমি কুর্টকে বললাম, "কেউ তোমায় বুদ্ধু বানাতে চাইছে।" সে যেন কেমন হাঁদার মত হয়ে গেল। "আমি নিজে দেখিনি। কিন্তু সবাই বলছে যে একটা আমেরিকান খবরের কাগজে এটা বার হয়েছে।"

যদিও এরকম যে হতে পারে তা অভাবনীয়, কিন্তু এই মর্মে এক নিবন্ধ সত্যিই কাগজে ছাপা হয়েছে। আমাদের বহু ভাষাবিদ ইয়ারোস্লাভ গালান, যে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে প্রচুর কথাবার্তা বলতো, সেও এটা সমর্থন

করে বলল, "হ্যাঁ, চারদিকের বাতাস এরকম রটনায় পূর্ণ—আর স্রেফ রটনাই নয়।"

সে আমাদের আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনীর সংবাদপত্র *স্টারস এণ্ড স্ট্রাইপসের* একটি সংখ্যা দেখালো যাতে মুদ্রিত নীচের খবরটি সে নীল পেন্সিলে দাগিয়ে রেখেছিল: "আদালতে বিয়োগান্ত ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিযোগকারীদের পক্ষের প্রধান জেনারেল রুদেনকোর, হেরম্যান গোয়েরিং-এর প্রতি পিস্তলের গুলি নিক্ষেপ।" সাংবাদিকদের যে পানশালা তা অস্পষ্ট কোলাহল আর উত্তেজনায়পূর্ণ। কয়েকজন খবরটাকে বিশ্বাস করে নি, কারো কারো অভিব্যক্তি ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের, আর অন্যেরা প্রাণভরে হাসছিল। যখন আমি র‍্যালফকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এইরকম একটা বাজে জিনিস কাগজে ছাপা হতে পারে কি করে, তখন ও নিজের কাঁধে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে কাঁধ নাচিয়ে বলল, "একটা সাড়া। যেকোন কিছুর বিনিময়ে একটা সাড়া"। হলিডের চিত্রাভিনেত্রীর মত ঝকঝকে সুন্দর দাঁত বার করে খিল খিল করে হাসল পেগি। এরিক বিড়বিড় করল, "ইয়ানকিরা সব সময়ই ইয়ানকি। যত তাড়াতাড়ি ওদের চিনে নাও, ততই ভালো।" এই বলে, ওই যাকে আমরা কথায় বলে বলি, সেইভাবে সে বলল, ইংরেজীতে কথায় বলে "ষাঁড় যদি সামনে থেকে আসে তবে তুমি সাবধান হও। সাবধান হও ঘোড়ার পিছনে গেলে। আমেরিকান সাংবাদিকের ব্যাপারে, সাবধান হও তার সব দিক থেকে।"

সেদিনের অধিবেশন শুরু হবার অনেক আগেই প্রত্যেকে আদালতে উপস্থিত। সব কিছু যথারীতি রোজকার মতো। পায়ের ওপর একটা ফৌজী কম্বল বিছিয়ে বসেছিল গোয়েরিং। অভিযোগকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে আছেন রুদেনকো। বারবারোসা পরিকল্পনা তখনো আলোচনা হচ্ছে। এবং তথাপি সেদিন একটা সাড়া পড়ল। আর কি ধরনের কেমন সাড়া সেটা! সেই সাড়ার জন্য সেই আদালত বাড়িতে সংকেত বাজল টানা দশ মিনিট। সংকেত বেজে বেজে সাংবাদিক আর প্রেসের তাবৎ সব কিছুকে কেবলই আহ্বান আর তলব করে ডেকে পাঠাতে লাগল পানশালা থেকে, ধূমপানের ঘর থেকে আর টানা সব বারান্দা থেকে। একহাতে মুখে স্যাণ্ডউইচ ঠেলে গিলতে গিলতে দৌড়ে দৌড়ে, মুখের মধ্যে ঢালা বীয়ারের গ্লাস থেকে ঠোঁট সরিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে পড়িমরি করে

সাংবাদিক আর সাংবাদিক প্রতিনিধিরা নিজের নিজের আসনে ছুটে গেল।

বারবারোসা পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত অভিযোগ বিচার সভার সমক্ষে পেশ করার সময় সোভিয়েত অভিযোগকারীদের পক্ষে প্রধান, আদালতকে অনুরোধ করলেন ফিল্ড মারশাল ফ্রেডরিখ ভন পাউলাস-এর হলফনামা গ্রহণ করতে। হলফনামাটি তিনি পড়েও শোনালেন। বারবারোসা পরিকল্পনা রচিত হওয়ার সময় ফিল্ড মারশাল ফ্রেডরিখ ভন পাউলাস ছিলেন জার্মান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান সেনাপতি এবং এই মানুষটি তার নিজ প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণে স্বীকার করছে যে বারবারোসা পরিকল্পনা রচনায় সে নিজে প্রত্যক্ষভাবে ও সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল।

এই হলফনামার ব্যাপারে আসামী প্রতিবাদীদের যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তেমনটি সচরাচর দেখা যায় না। তারা নিজেদের মধ্যে কেবলই কথা বলতে লাগল আর নিজের নিজের আইনগত পরামর্শদাতা ও আইনজীবীদের হাতে নোট লিখে লিখে দিতে লাগল। তাদের পক্ষের আইনবিদরাও নিজেদের মধ্যে কানে কানে ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগল, আর তারা তাদের আসনে বসে থাকলেও অস্থিরভাবে, উসখুশ করতে লাগল।

এই আগ্রহের যে কারণ তা আমরা জানতাম। ফিল্ড মার্শাল ভন পাউলাসকে যখন বন্দী করা হয়,—সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাছে সেই প্রথম উচ্চ পদাধিকারী জার্মান সেনানায়ক যে আত্ম সমর্পণ করে—তখন জার্মানীর নাজী সরকার, সেই ঘটনা জার্মানীর জনসাধারণের কাছে গোপন করে। স্তালিনগ্রাদে জার্মানদের পরাজয়, তিন লক্ষ সেনা সমন্বিত জবরদস্ত বাহিনীর পরাজয় ও সম্পূর্ণ ধ্বংস জার্মানদের মনের জোর নষ্ট করে দিয়েছিল। সেই পরাজয় জনগণের কাছ থেকে গোপন করা ছিল অসম্ভব। সমগ্র জার্মান রাষ্ট্রে তিনদিন জাতীয় শোক ঘোষিত হয়। পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। আর গীর্জায় অন্তিম প্রার্থনা জানানো হয়। মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে সারা দেশে ঘন্টাগুলি বাজে। জনগণকে এ কথা জানানো হয় যে একজন সত্যিকার জার্মান সৈনিকের মতো সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, ফিল্ড মার্শাল ভন পাউলাস শেষ পর্যন্ত মরণপণ সংগ্রাম করে তার জীবন উৎসর্গ করেছে। তার সম্মানে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল

শোকসভা। সেই শোক সভায়. তার আত্মার জন্য সমবেত-প্রার্থনা অনুষ্ঠানে, বার্লিনের সকল পদস্থ কর্মী যোগ দেয়। আর শূন্য শবাধারে হিটলার স্বয়ং অর্পণ করে মরণোত্তর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মান। দেখে শুনে বোধ হল, পাউলাস যে আত্মসমর্পণ করেছিল এ কথা সব প্রতিবাদী আসামী জানে না। এবং এখন সেই ফিল্ড মারশালের লিখিত সাক্ষ্য পড়ে শোনানো হচ্ছে।

সোভিয়েত অভিযোক্তা প্রমাণ হিসেবে এই সাক্ষ্যকে নথীভুক্ত করার অনুরোধ শেষ করতে না করতেই উঠে দাঁড়ালেন গোয়েরিং-এর সমর্থনে তার পক্ষে আইনজীবী, মর্যাদাপূর্ণ চাল-চলন বিশিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট ডঃ স্ট্যাহমার। তাঁর পরণে জলপাই রঙের উকিলের পেশাগত জোববা। উঠে দাঁড়ালেন ডঃ সেইডল, খর্বাকৃত খড়্গনাশা, উনি সরকারী ভাবে সমর্থন করেছিলেন হেসকে। দুজনেই বিচারকদের দিকে ছুটে গেলেন ও দুজনেই নিজের নিজের কথা বলতে চেয়ে পরস্পরকে বাধা দিতে দিতে, আদালতকে অনুরোধ করলেন লিখিত সাক্ষী পাউলাসকে সশরীরে উপস্থিত হবার জন্য তাকে তলব করা হোক। তাবা নিশ্চয়ই এই আশায় ছিল যে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হবে, আর তার ফলে সেই সাক্ষীর নামে প্রমাণ বলে যা কিছু লিখিত হাজির করা হচ্ছে সেই সাক্ষ্যের মর্যাদা কমে যাবে, আর এই সব কিছুর চূড়ান্ত ফল হবে এই যে এ সবের দ্বারা তলে তলে সোভিয়েত পক্ষের তোলা অভিযোগের গুরুত্ব কমে যাবে। যদি ভন পাউলাস বেঁচেও থাকে, তাকে ন্যুরেমবার্গে এনে হাজির করতে সময় লাগবে অনেক। তাছাড়া, মস্কোতে লিখিত বিবৃতি দেওয়া এক কথা আর ন্যুরেমবার্গে তার পূর্বতন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সব ব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন বন্ধুদের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য দেওয়া একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

প্রতিবাদী আসামী পক্ষের আইনজীবীদের কাছে এটাই মনে হল নিরাপদ উপায়। সুতরাং ঐ আবেদন করে, সেই বড়সড়ো হৃষ্টপুষ্ট অত্যধিক মাংসল মানুষটি আর সেই ছোটখাটো একটু নারভাস ধরনের মানুষটি সোভিয়েত অভিযোগকারীদের কিস্তীমাত করে দেওয়ার ভঙ্গীতে সদর্পে তাকিয়ে তারপর নিজ নিজ জায়গায় ফিরলে তাদের সহকর্মীরা তাদের সঙ্গে হাত মেলাল।

বিচারকরা নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করলেন। লর্ড লরেন্স অপর বিচারকদের সঙ্গে শবামর্শের পর রুদেনকোর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রতিবাদীর এই আর্জির বিষয়ে জেনারেল কি বলেন?"

গভীর স্তব্ধতা নেমে এলো। সবাই তাকিয়ে আছে রুদেনকোর দিকে প্রতিবাদী আসামী আর তাদের পক্ষের আইনজীবীরা তাকিয়ে আছে অবজ্ঞা-পূর্ণ বিরোধিতার সঙ্গে। বিচারকেরা তাঁরই দিকে চেয়ে আছেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আর আমাদের সাংবাদিকদের চাহনিতে কৌতূহল।

"ইওর অনার, সোভিয়েত অভিযোগকারীদের পক্ষে এতে কোন আপত্তি নেই," উত্তর দিলেন রুদেনকো। তাঁর মুখাবয়ব শান্তই থাকল। কিন্তু আমরা সোভিয়েত সাংবাদিকরা যারা বিগত কয়েকমাসে আমাদের পক্ষের চীফ প্রসিকিউটরের বৈশিষ্ট্য বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি, তারা তাঁর চোখে সামান্য ঝিলিক যেন দেখতে পেলাম।

তিনি একথা বলার পর, পর পর তিনবার সেই "সাড়া" সূচক সংকেত সাইরেন, হলঘর, আদালতকক্ষ, বারান্দার পর বারান্দা, ক্যানটিন ও পানশালায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

"জেনারেল, আপনার সাক্ষীকে এখানে নিয়ে আসতে আপনার কত সময় লাগবে?" জানতে চাইলেন লর্ড লরেন্স।

"ইওর অনার, আমার মনে হয়, পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না", রুদেনকো এমনভাবে বললেন যেন কোন কথার কথা বলছেন এমন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, ধীর স্থির, "সাক্ষী এখানে, প্যালেস অফ জাস্টিসে, সোভিয়েত প্রতিনিধিদের ঘরেই আছে।"

রুদেনকোর এই উত্তরে সারা আদালত কক্ষে যে পরিস্থিতি হল, তার সঙ্গে তুলনীয় হল গোগলের *দি ইন্সপেক্টর জেনারেল* নাটকের একবারে অন্তিম দৃশ্য, যেখানে সবাই মঞ্চের ওপর নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে যায়। তারপর সকলেই পরস্পরের মধ্যে কথা, কথার মধ্যে বাধাদান, এইসব নিয়ে আলোড়িত হয়ে উঠল। প্রতিবাদী আসামীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল, আর তাড়াহুড়ো করে নিজের নিজের আইন-জীবীর কাছে কাগজে লেখা মন্তব্য দিতে লাগল। আইনজীবীরা তাদের আত্মমর্যাদা ভুলে গিয়ে, উত্তেজিত আলোচনা করছিলেন উত্তপ্ত ভঙ্গীতে। ডঃ স্ট্যাহমার ও ডঃ সেইডল তাঁদের বড় বড় জোব্বার প্রান্তভাগ তুলে ধরে ছুটে গেছেন মঞ্চের দিকে। তাঁরা দুজনেই মাইক্রোফোন ধরে পাশাপাশি একই সঙ্গে কথা বলতে বলতে পরস্পরকে বাধা দিয়ে বলতে লাগলেন, "না, না। প্রতিবাদী পক্ষ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে ঘটনাবলী

পর্যালোচনা করেছে ও সাক্ষীকে তলব করার ব্যাপারে প্রতিবাদী পক্ষ কোন জিদ করছে না। আমরা যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে ওই হলফনামা খুঁটিয়ে দেখেছি। সে বিষয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। আদালতের সময় নষ্ট করে কি হবে?"

এবার গোগলেরই নাটকের আর এক দৃশ্য দেখা গেল প্রেস-বক্সে। এবার অবশ্য গোগলের নাটকের সেই দৃশ্য 'সাত' থেকে। সাড়ার ব্যাপারে দেওয়া টানা সাইরেন শুনে যেসব সাংবাদিক ছুটে আদালত কক্ষে আসছিল, দরজার কাছে তাদের ধাক্কা লেগে গেল অন্যান্য সাংবাদিক প্রতিনিধির সঙ্গে, যারা ইতিমধ্যেই ছুটে বাইরে যাচ্ছিল এই সাড়া জাগানো সংবাদ নিজ নিজ সংবাদপত্রে তার করে জানানোর জন্য—দরজার মুখে তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে গেল। একটা দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল বিচারসভা কক্ষে, যা সব সময়ই শান্ত ছিল।

"আদালত সাক্ষী ভন পাউলাসকে আহ্বান করছে", অন্যান্য বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শ করে একথা ঘোষণা করলেন লর্ড লরেন্স। এবং তারপর তাঁর ধীর, ঘরোয়া গলায় যোগ করলেন, "আর আমার মনে হয়, এখন আপাতত অধিবেশনের সাময়িক বিরতি ঘোষণা করার সঠিক সময় এসেছে।"

যদিও এ আমার পক্ষে কোন কৃতিত্বই নয়, তবু আমায় স্বীকার করতে হবে যে ভন পাউলাস যে ন্যুরেমবার্গে আছে, আমি তা জানতাম না। তার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি বিলক্ষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। বুঝে দেখো, যখন অবরুদ্ধ স্তালিনগ্রাদে মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব প্রতিরোধ আর আত্মরক্ষার লড়াই চালানো হচ্ছে, তখন আমি সুদীর্ঘ সময় থেকেছি ঐ সহরে। শত্রু অবরোধ হটিয়ে ফেলার চূড়ান্ত দৃশ্যও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। সেই মুহূর্ত কি কেউ ভুলতে পারে যখন এক অস্বাভাবিক, এক ধরনের ভীতি উদ্রেককারী নীরবতার মধ্যে অফিসারদের ও সৈনিকদের একটা ছোট্ট দল দোমড়ানো মোচড়ানো ধ্বংসস্তূপ পরিবৃত ফাঁকা, শূন্য চত্বরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে গেল সামরিক শাখার বিভাগীয় 'স্টোর' বাড়িতে, যেখানে পৃথিবীতে অপূর্ব দৃষ্ট মহান লড়াইয়ের শেষ অঙ্ক অনুষ্ঠিত হবে? এই সহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটা আর পায়ের তলার টাটকা তুষার সশব্দে মচমচ মুড় মুড় করে গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা ছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি।

আমরা জানতাম যে জার্মান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর স্তালিনগ্রাদের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। সোভিয়েত বিমান আর গোলন্দাজবাহিনী এই অঞ্চলকে বিশেষভাবে বিধ্বস্ত করেছে। আমরা জানতাম যে ভন পাউলাস খুব সম্ভব পালাতে পারে নি। কিন্তু অসংখ্য বন্দীর দেওয়া বয়ান থেকে আমরা এও জানতাম যে ভন পাউলাস সাহসী, দৃঢ়চেতা, অনমনীয় সেনানায়ক যে তার বাহিনীকে ত্যাগ করে বিমানে সেই অবরুদ্ধ সহর থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না, যেমন তার অন্য অনেক সেনাপতি করেছিল। ভন পাউলাসের সঙ্গে তার প্রধান সদর দপ্তরের কথাবার্তা সোভিয়েত বেতার কর্মীরা আড়ি পেতে ধরেছিল এবং আমরা জানতাম হিটলারের হুকুম—"শেষ পর্যন্ত লড়ে যাও। হতাহতের সংখ্যা নিয়ে একদম মাথা ঘামিও না।" আর একটি আদেশও আড়ি পেতে ধরা হয়—"জেনারেল ভন পাউলাসকে পুরস্কৃত করা হবে ফিল্ড মারশাল ব্যাটন দিয়ে এবং জার্মানীর সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানেও তাকে ভূষিত করা হবে।"

এইরকম খবর ছিল যে ভন পাউলাস ও তার যোদ্ধারা, সেই প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত স্টোর বাড়ির ঠিক মাটির তলার ঘরে আছে। সোভিয়েত সৈনিকদের ওপর নির্দেশ ছিল তাকে জীবন্ত বন্দী করার। ভন পাউলাস কি আত্মসমর্পণ করবে? অথবা করবে না? কিসের দ্বারা সে চালিত হচ্ছে—যুক্তি না আবেগ? সোভিয়েত অফিসার ও সেনাদের মনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই মানুষটি সম্পর্কে কিছু শ্রদ্ধা ছিল, যে মানুষ শেষ পর্যন্ত আগলে আছে ঘাঁটি, যে যুদ্ধের বিয়োগান্ত পরিণতির মুহূর্তেও তার সেনাবাহিনীকে কিছুতে পরিত্যাগ করে ছেড়ে যাবে না।

পরিশেষে, সেই বিভাগীয় স্টোর বাড়ির, যার মাত্র একটা কোণের দিকে কাঠকয়লার মত দেওয়ালের খানিকটা দাঁড়িয়েছিল, আমাদের সামনে। বাইরে থেকে মাটির তলার ঘরে যাবার একটা দরজা রয়েছে। সেই দরজার পাশ দিয়ে কিছু তার টানা। তার চারপাশের আর সব যা কিছু, তা সাফ করা। চারদিকের ভাঙা ইঁটের পাহাড়ের মধ্যে সেই তকতক করা জায়গাটা ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সোভিয়েত অফিসার, যাঁর চরমপত্র দেবার কথা, তিনি ধীরে ধীরে মাটির নীচের ঘরের দিকে নেমে গেলেন। সিঁড়ির ধাপে প্রতি পদক্ষেপে পায়ের জুতো যেন তাঁর পায়ে আরো আঁট হয়ে বসে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে সেই সোভিয়েত

অফিসারের কি রকম অনুভূতি হচ্ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। একটা বাঘের গুহায়—সেই বাঘ যদি আহতও হয়—নিরস্ত্র অবস্থায় হামা দিয়ে নেমে যাওয়া কোন মজার ব্যাপার নয়। আমার বিশেষভাবে মনে আছে তাঁর মুখ—ফ্যাকাশে, ফেব্রুয়ারী মাসের চাবুকের মত বাতাস সত্ত্বেও সেই ফ্যাকাশে মুখ ঘর্মাক্ত। সবাই উত্তেজনায় টান টান। সৈন্যরা অধৈর্য হয়ে তাদের পা বদলে বদলে ভর দিয়ে দাঁড়াতে লাগলো আর তাদের নিজের নিজের মেশিনগান তাগ করে তৈরী হল। ভন পাউলাস-এর অধীনস্থ সৈন্যরা শেষ মুহূর্তে কি করবে, কি করতে পারে, তা কে জানে?

গত ছয় মাসে, স্তালিনগ্রাদে একটা ক্রমাগত, নিরবচ্ছিন্ন গর্জন শোনা সকলের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যেন প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাওয়ার স্পষ্ট টিক টিক শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। আবার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। দরজা খুলে গেল। আমাদের অফিসার পুনরায় আবির্ভূত হলেন। তাঁর মুখ যা কয়েক মুহূর্ত আগেও ছিল ফ্যাকাশে, এখন তার মুখ উজ্জ্বল ও লাল। সে যে সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা রেখে উঠে এল তা নয়। সে উঠে এলো ছুটে, দৌড়ে। সামরিক কঠোর শৃঙ্খলা ভুলে গিয়ে, সেই মধ্যবর্তী সেনা অফিসার, যে কয়েক মুহূর্ত আগেও অসামান্য সাহস আর সংযম দেখিয়েছে, ভাঙা ভাঙা গলায় চীৎকার করে উঠল, "ওটা নিয়েছে! চরমপত্র ও নিয়েছে। ও এখন বাইরে বার হয়ে আসছে।"

এবং সত্য সত্যই, কয়েক মুহূর্ত পরেই দীর্ঘদেহ, চওড়া কাঁধ, শরীর সামনের দিকে সামান্য ঝোঁকা, মাথায় সামরিক টুপি, ফার দেওয়া লম্বা ঝুলের কোট গায়ে, একজন মানুষ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। তার পদক্ষেপে দৃঢ়। তার পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়ে যাওয়া তুষারের মচ মচ শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। সে তার সামনে দলবদ্ধ অফিসারদের দিকে তাকাল। তার নিজের পকেট থেকে টেনে বার করল এক রিভলভার। দুজন সোভিয়েত অফিসার যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগিয়ে গেল তার দিকে। কিন্তু সামনের অফিসারদের মধ্যে পদ মর্যাদায় তার থেকে আরও বড় সামরিক অফিসার দেখতে পেয়ে, সে তার নিজের রিভলভার ছুঁড়ে দিল তাঁর পায়ের কাছে। ভন পাউলাস-এর দোভাষী—মাঝবয়সী একজন লোক। মুখের চেহারা রোগা। তার মুখের ওপর ঘোর বাদামীরঙের ক্ষত চিহ্ন। ওগুলো বড়ো তুষার ক্ষত।—অনুবাদ করে

ভাঙা ভাঙা বাক্যে জানাল, "কিন্ড মারশাল সোভিয়েত কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। তার অনুরোধ তার লোকজনদের সঙ্গে যেন ক্ষমা ও মানবিকতাপূর্ণ ব্যবহার করা হয়।"

এই ছিল ঘটনা, আমার মনে ছিল, ভন পাউলাস—সামনের দিকে সামান্য আনত, লম্বা, স্থির সংকল্প, উঁচু মাথা এবং পরিশ্রান্ত চোখ। তারপর তিন বছরেরও বেশী সময় পরে তার সঙ্গে ন্যুরেমবার্গে-এ নতুন সাক্ষাৎ। আর সকলের মত আমিও অধিবেশনের সাময়িক বিরতি শেষ হওয়ার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হাস্যকরভাবে আদালত কক্ষে ঢোকার মুখে দরজায় আমি সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকলাম, যেন বিচার কক্ষে যে প্রথম ঢুকবে সে যেন উপস্থিত অন্য সকলের চেয়ে বেশী কিছু দেখতে পাবে।

আসামী প্রতিবাদীদের নিয়ে আসা হল। তারপর এলেন বিচারকেরা। সবাই উঠে দাঁড়াল। এই সমস্ত রীতি নীতিতে আমরা এতই অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলাম, যে এসব আমাদের লক্ষ্যই হতো না। কিন্তু সেদিন মনে হল এসব নিতান্ত অতিরিক্ত ব্যাপার। বিচারকরা তাঁদের কামরায় বসে কি কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা সহজেই অনুমেয়—শীর্ণকায়, লম্বা আমেরিকান ফ্রানসিস বিডল, ভারী চেহারার, বড, ঝুঁকে নামা, সিন্ধু-ঘোটকের মত গোঁফ সহ ফরাসী বিচারক হেনরি ডোনেডিইউ ডে ভাবরেস, আর অবিচলিত সোভিয়েত বিচারক আইওনা নিকিতচেঙ্কো, ডাণ্ডিবিহীন চশমা চোখে যাকে সব সময়ে দেখতে যেন শান্ত মনোযোগের নির্ভুল প্রতিমূর্তি—তাঁরাও সামান্য উত্তেজিত। কেবলমাত্র লর্ড গিওফ্রে লরেন্স, ঠিক সেই পুরোন মানুষটি। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর ইয়ারফোন লাগিয়ে নিলেন তাঁর মৃদু দীপ্ত কেশহীন চাঁদির ওপর এবং আদালতের প্রধান সরকারী কর্মচারীকে সম্বোধন করে বললেন, "সাক্ষী ফ্রেডরিখ ভন পাউলাসকে, অনুগ্রহ করে নিয়ে আসুন।"

আদালত কক্ষের অন্য প্রান্তে সবুজ মর্মরে বাঁধানো ওক কাঠের দরজা খুলে গেল। প্রধান কর্মচারী ভেতরে নিয়ে এলেন একজন লম্বা লোককে। যার পরণে নাবিক নীল রঙের পরিধেয়, যার ছাঁট কাটে সামরিক আদল এবং যেটাতে তাকে ভালোই মানিয়েছে। পিছনে পিছনে এল আর এক নীরব মুহূর্ত। ঝক ঝক করে উঠতে লাগল একের পর ফ্ল্যাস-বালব।

দিনে ক্যামেরায়, ছবি তোলার শব্দ শোনা যেতে লাগল। সবাই একাগ্রভাবে দেখল সেই সামনের দিকে সামান্য ঝোঁকা লম্বা লোকটি, উঠে দাঁড়াল সাক্ষীর পাটাতনের ওপর। তার ভিতরে কি হচ্ছিল তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু বাস্তবতঃ তাকে শান্ত দেখাচ্ছিল। যাই হোক আসামীদের কাঠগড়ায় পরিদৃষ্ট হল দারুণ ভীতিকাতর ত্রস্ততা। গোয়েরিং ক্রুদ্ধ তীব্র স্বরে হেসসকে কিছু বলল, কিন্তু হেসস কেবল হাত নেড়ে থামিয়ে দিল তাকে, সাক্ষীর দিকে আড়চোখে তাকাবার সময়, মনে হল, কেইটেল আর জডল যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। ভন পাউলাসের এভাবে সামনে এসে দাঁড়ানো যেন স্তালিনগ্রাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে কোন প্রেত এসেছে ন্যুরেমবার্গে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার তিন লক্ষ সৈনিকের যে দুঃখ আর যন্ত্রণা, ভোলগার তীরে যুদ্ধে যারা নিহত বা বন্দী হয়। অবিচলিত ধীরতা সহকারে ভন পাউলাস বাইবেলের ওপর তার হাত রাখল, তার ডান হাতের দুটি আঙুল তুলল, ধীর কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, "আমি শপথ করছি যে সত্য বলব। সম্পূর্ণ সত্য বলব। সত্য ছাড়া অন্য কিছুই বলব না।"

তার সাক্ষ্য শুরু হল শান্তভাবে, কোন তাড়াহুড়ো নেই। সে কথা বলছিল চাঁচাছোলাভাবে, স্পার্টাবাসীদের ন্যায় অতি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্ট উচ্চারণে। সে কথা বলছিল জার্মান ভাষায়। সমগ্র বিচারসভা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল তার কথা। সে জার্মান ভাষায় বলা সত্ত্বেও আসামী প্রতিবাদীদের কয়েকজন তাদের নিজের'কানে কোন কারণে ইয়ার ফোন লাগিয়ে নিয়েছিল।

হ্যাঁ, যুদ্ধের আগে সে ছিল জার্মানীর সামরিক বাহিনীর উপ-প্রধান। আর সে ব্যক্তিগতভাবে বারবারোসা পরিকল্পনার খসড়া তৈরীতে অংশগ্রহণ করেছিল। হ্যাঁ, সে স্বীকার করল, যে একেবারে শুরু থেকেই এই পরিকল্পনাকে আক্রমণাত্মক আগ্রাসী অভিযানের নকসা হিসেবেই তৈরী করা হয়; প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের কোন প্রশ্নই সেখানে ছিল না। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে এটি তৈরী করা হয়। এই খসড়ার প্রধান লক্ষ্য ও রূপরেখা কি? এর প্রধান লক্ষ্য ছিল মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও উক্রাইনের সমগ্র অঞ্চল অধিকার করা। তারপর লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ ও তৈল ভূমি সমেত উত্তর ককেশাস অঞ্চল অধিকার। এবং এ সবের প্রধান কৌশলগত

উদ্দেশ্য কি? আরচানজেল থেকে আস্ত্রাখান পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রতিরক্ষা সীমানা প্রতিষ্ঠা করা ও সেটা সুসংহত করা।

সাক্ষী, মনে করে বলল যে রিবেনট্রপ যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পূর্ণ করছে, তখন জার্মান সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থদের অভ্যাস করার জন্যে দুটো দায়িত্ব বা কাজ দেওয়া হয়। দুটো কাজ বা দায়িত্বই ছিল বিষয়গতভাবে "বারবারোসা পরিকল্পনা অনুসারে আক্রমণ রচনা।" কর্নেল জেনারেল হালডার ছিল এর দায়িত্বে। সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা মানচিত্র পিন গেঁথে রাখা হত মেঝের ওপর। উপস্থিত উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসাররা তার ওপর ছোট ছোট নিশান সরিয়ে সরিয়ে চিহ্নিত করত কিভাবে তারা একের পর এক সোভিয়েত বাহিনীকে ঘিরে ধরে পরাজিত করবে। আক্রমণ রচনার নানা খসড়া তারা এইভাবে নিজেরা পরীক্ষা করে বাজিয়ে দেখত। সেনাপতিরা তাদের প্রধান লক্ষ্য বা অভীষ্ট পাওয়ার জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ পথের সন্ধান করত—আরচানজেল থেকে আস্ত্রাখান পর্যন্ত এক প্রতিরক্ষা রেখা তৈরী করা। এই পরিকল্পনার রাজনৈতিক লক্ষ্যও আদৌ কিছু গোপন ছিল না—রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

তারপর ভন পাউলাসসহ সেনাবাহিনীর প্রথম সারির অধিনায়কেরা সারা ইউরোপ ভ্রমণ করে। উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের জন্যে রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও আরো সতর্ক তথা হুঁসিয়ার হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনী থেকে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করা।

ভন পাউলাস কথা বলছিল ফৌজী ভঙ্গীতে—সংক্ষেপে ও ঠিকঠিক মত। সম্ভবতঃ তার বন্দী জীবনের তিন বছর সে সব সময় এই সব কথাই বারবার ভেবেছে সে। ওহের মাচ্যাট সাধারণ বাহিনীর অপরাধী কাজকর্মের কথা বলবার সময়, সে মাঝে মাঝে মুখ তুলে প্রতিবাদী আসামীদের দিকে তাকাচ্ছিল। আর এখন সেই সব প্রতিবাদী আসামীরা যারা এতক্ষণ চেয়েছিল তার দিকে, তারা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে স্নায়বিক কাতরতায় আঙুল মটকাচ্ছিল কিম্বা কাঠগড়ার ধারে নিজেদের আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছিল। একবারও মাথা না তুলে ঘাড় গুঁজে লিখে যাচ্ছিল সাংবাদিকরা, তাড়াতাড়িতে তাদের কারও কারও পেনসিল যাচ্ছিল ভেঙে।

মাঝে মাঝে তাদের রচিত ভারবার্তা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তারা হাত নেড়ে আদালত কক্ষের বাহককে ডাকছিল। কেউই বিচার সভাকক্ষ ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না।

ভন পাউলাস যা কিছু বলল, তা অন্যান্য সাক্ষীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে ইতিপূর্বে অনেকটাই জানা। অথবা দলিলের প্রমাণ থেকে তা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু তা-ই যখন নিজ মুখে বর্ণনা করল ফিল্ড মারশাল, তখন তা এক বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করল। ও ছিল তিন লক্ষ সেনা সমন্বিত মজবুত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বারবারোসা পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে সে রাশিয়ার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায়। তারপর অসহায় ভাবে প্রতিরোধ করতে করতে স্তালিনগ্রাদে, ভোলগার নিম্নভূমিতে এই বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বড়দিনের সময় আমরা যে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখনই আমরা জানতে পেরেছিলাম স্তালিনগ্রাদ এই শহরের নাম কতই না জনপ্রিয়। এমনকি রাজতন্ত্রী শহর লেইখটেনস্টেইন, যার কথা সবাই ভুলে গেছে সেখানকার সাধারণ লোকেরা কেবল খবর কাগজ থেকেই এই শহরের নাম জেনে নিয়েছিল। প্যারিসে আমাদের নিয়ে গিয়ে দেখানো হয়েছিল স্তালিনগ্রাদ বুলেভার্ড। সামনের ঐ মানুষটি, যাকে নাজীরা সমাধি দিয়েছিল মহাসমারোহে—যদিও তারা মনে মনে অভিশাপ দিয়েছিল তাকে—এখন জীবিত সাক্ষী হিসেবে সে তার কবর থেকে উঠে এসেছে। সে প্রতিনিধিত্ব করছে তার বাহিনীর প্রতিটি মৃত বা বন্দী সৈনিকের। ফাঁস করে দিয়েছে জার্মানীর সাধারণ সমর সেনাবিভাগের আসল রূপ—যা আন্তর্জাতিক স্তরে ডাকাতি করার জন্যে হিটলারের হাতের যন্ত্রবৎ পুতুল মাত্র—গেস্টাপো, এস. এস অথবা এস. ডি র মতই যা অনুগত।

ভন পাউলাস শোনাল বারবারোসা পরিকল্পনা বিষয়ে জডলের বলা চূড়ান্ত কথা, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমাদের আক্রমণ আর অভিযান তিন সপ্তাহের মধ্যে দেখতে পাবেন যে এটা তাসের বাড়ির মতো ভেঙে গেছে।"

আমি জডলের দিকে তাকালাম। সে তার সামনে রাখা ডেসকের ওপর ঝুঁকে মন দিয়ে একটা পেনসিলকে কেবলই ঘোরাচ্ছিল। যেন সেই কাজেই [illegible] নিমগ্ন, পুরো ডুবে আছে।

সাক্ষী, তার সাক্ষ্য দেওয়া শেষ করা মাত্র পাশ্চাত্যের সাংবাদিকরা তাদের আসন থেকে লাফ দিয়ে উঠে বিচার সভাকক্ষ থেকে বার হবার জন্যে হুড়মুড় করে দৌড় লাগালো। এত তাড়াতাড়ি বার হয়ে গিয়ে ভুল করলো ওরা। কেননা সাক্ষীকে পাল্টা জেরা করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রতিবাদী আসামী পক্ষের আইনজীবীরা। প্রথামতই সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন সেইডল। সত্যিকথা বলতে, সমর বাহিনীর এইসব প্রতিবাদী আসামী সকলেই ওঁর মক্কেল নন। কিন্তু ওনার অভ্যাসই হল সকলের ব্যাপারে নাক গলানো। আর অন্যান্য অধিকতর সুখ্যাত আইন-জীবীদের অভ্যাস ছিল এই, যে সমস্ত দায় তাঁরা নিজের কাঁধে নিতে চাইতেন না, সেইসব অনিশ্চিত দ্বিধাপূর্ণ দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে সেইডলকে এগিয়ে দেওয়া।

"ফিল্ড মারশাল, এখানে যে সব প্রতিবাদী আসামী বসে আছেন, তাদের মধ্যে কাকে আপনি যুদ্ধের প্রধান হোতা আর উসকানিদাতা বলে মনে করেন?"

এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। সাক্ষীর ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়া, সাক্ষীকে এক অপ্রতিভ জবথবু অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করা এবং আদালত, সংবাদপত্র ও পরিশেষে ইতিহাসের পাতায় তার ওপর সন্দেহের কালি ছিটিয়ে দেওয়া। অবশ্যই সেইডল ভেবেছিল যে তার প্রাক্তন সহকর্মীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভন পাউলাস সংশয়ে পড়বে ও সরাসরি কোন উত্তর সে এড়িয়ে যাবে। আর তখনই আইনঘটিত নানা প্রশ্ন বাণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে—যে বিষয়ে সেইডল অতীতে ছিল এক ওস্তাদ—তাকে নানা ভাবে অপ্রস্তুত ও নাজেহাল করা হবে।

ভন পাউলাস, আসামীদের কাঠগড়ার দিকে, যেখানে প্রতিবাদী আসামীরা বসে আছে সেদিকে তাকাল। যেন সে আলাদা আলাদা করে দেখল প্রত্যেককে। তারপর স্পষ্ট করে বলল, "এখানে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের মধ্যে—হেরম্যান গোয়েরিং, উইলহেলম কেইটল আর আলফ্রেড জডল।"

সাময়িক নীরবতা। পরাজয়ের গন্ধ পেয়ে সেখান থেকে চট্ করে সরে গেলেন সেইডল। কিন্তু তাঁর সহকর্মী, যিনি এমনিতে একজন শান্ত স্বল্পবাক আইনজীবী—যাঁর নাম আমার জানা নেই—তিনি এগিয়ে এলেন ও সরাসরি জেরায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "এটা কি সত্য নয় ফিল্ড মারশাল, যে আপনি

এখন ফ্রুনজে সামরিক আকাদেমিতে শিক্ষকের কাজ করছেন আর শত্রুর সেনাবাহিনীতে উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন?

হেসে ফেলল ভন পাউলস। "নিশ্চয়ই না। যুদ্ধের ফলাফলের দ্বারাই প্রমাণিত যে লাল ফৌজের নীচের দিকের অফিসারদের, যারা 'কমিশনড' নয়, তাদের স্কুলের কিছু শেখানোর মতো যোগ্যতা আমার নেই যে আমাকে সে কাজে ডাকা চলতে পারে।"

এই দ্বিতীয় আক্রমণও এই ভাবে তুলো ধোনা হয়ে এল। আসামী প্রতিবাদীদের আইনজীবীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজেদের মধ্যে মৃদু কলহে। প্রতিবাদী আসামীরা তাদের লিখিত চিরকুট পাঠাতে লাগল।

"সাক্ষী, ফ্রেডরিখ ভন পাউলস, এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি নেমে আসতে পরেন", ঘোষণা করলেন বিচারসভার বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।

দরজার কাছে আর এক প্রস্থ হুড়োহুড়ি। প্রহরারত রক্ষীদের ঠেলে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিচ্ছে সব। তার দপ্তরে ছুটে পৌঁছে যাওয়ার দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। 'জ্যাক লণ্ডন' কাহিনীতে যেমন দেখা যায়, সেই ভাবে স্বর্ণ সম্ভাবনার দাবীদারের মত "নিজের নিজের দাবী ঘোষণা করার জন্যে" সাংবাদিক প্রতিনিধিরা নিজের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল।

আমেরিকান সাংবাদিকরা আমায় তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে বলল, "আজকে যে এমন সাড়া পড়ে যাওয়ার মত ব্যাপার হবে, সে কথাটা আমাদের ঠিক সময়ে না জানানো মোটেই একটা ভালো বা উচিত কাজ হয়নি। ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব তাহলে কি জন্যে, কোন কাজের?"

ভন পাউলস যে গতকাল বিমানে ন্যুরেমবার্গে এসেছে একথা যে আমরাও জানতাম না, এ কথা আমরা তাদের কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। আমরা জানতাম না, এ রকম একটা ধারণাই, তাদের মনে হল একেবারে অসম্ভব।

সোভিয়েত অভিযোগকারীর পক্ষের সহকারী, লিও শেইনিন, যিনি ভালো ছোট গল্প লিখিয়ে, তিনি বিলক্ষণ জানতেন সংবাদপত্রে হৈ-হৈ পড়ে যাওয়ার মানে কি। তিনি আমায় চোখ মটকে বললেন, "আজ ওদের এক কৌটা, খুব যা হোক, আচ্ছা দেওয়া গেছে।"

আমি খুব চাইছিলাম ভন পাউলাসের সঙ্গে কথা বলতে—দুটো কারণেই—ব্যক্তিগত ও মানবিক, আর পেশাগত কারণেও বটে। সে কোথায় আছে এবং তার ঘর আমি ঠিক ঠিক জেনে নিলাম। কিন্তু হায়, না আমার উৎসাহ, না যা আমায় সব সময় সাহায্য করেছে আমার সেই *প্রাভদা* পরিচয় পত্র, অথবা এমনকি আমার কর্নেলের পদ, কোনটাই আমার কোন কাজে লাগল না। জানা গেল যে ভন পাউলাসের ছেলে আর কিছু আত্মীয় তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আর সোভিয়েত কর্নেল যিনি ভন পাউলাসের সঙ্গে এসেছেন তিনি আমায় বেশ চমৎকারভাবে ও ধৈর্য সহকারে যেন সব তর্ক আর আলোচনার সমাধান করে দিয়ে বললেন, "নিজেকে ভন পাউলাসের জায়গায় বসান। ভাবুন, আপনার ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আর স্বাধীন সময় বলতে যা বোঝায়, আপনার হাতে নিজের জন্যে তেমন সময় খুবই কম। তখন কি আপনি আপনার ছেলেকে ছেড়ে যেতে চাইবেন, একটা সাক্ষাৎকারের জন্যে? যদি সে সাক্ষাৎকার হয় *প্রাভদার* সাংবাদিক প্রতিনিধির সঙ্গেও?

এরপর, কি বলতে পারি আমি? উনি আমায় বুঝিয়ে নিরস্ত করলেন। তাছাড়া ভন পাউলাসের সঙ্গে আমি কি আলোচনা করব, আমার আলোচ্য কি? যা কিছু কৌতূহলকর, আগ্রহ সৃষ্টিকারী তা সবই তো সে সাক্ষীর পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছে। বাকী কথা বলার মত সময় এখনো আসেনি।

১০। অভিনন্দন

প্রতিদিন সকালে আমি পূর্ব নির্ধারিত সময় মত সেই পা-বিহীন বৈমানিকের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ করতাম। তার সম্পর্কে লেখা এত সহজ যে বলবার নয়। আমি তো কোন কোন সময় একবার বসেই দশ পনেরো পাতা লিখে ফেলতাম। যদিও আমার সামনে থাকত একটা পুরনো নোট বই, যার মধ্যে টুকটাক ছোট খাটো খসড়া করা আছে। এত [illegible] দিন আগে সেই খসড়া করেছি যে এখন তার অর্ধেক লেখা [illegible] পড়তে পারি না। আমি জানি [illegible]

সে আজও জীবিত কিনা। চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত সে কি লড়াই চালিয়ে গেছে, না কি কুরস্ক থেকে বার্লিন পর্যন্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর যে লম্বা পথ তারই কোথাও, কোনখানে তাকে হত্যা করা হয়েছে?

যাইহোক, তার সঙ্গে আমার কোন সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন ছিল না। সিনিয়র লেফটেন্যান্ট মেরেসিয়েভ বা মারেসিয়ভ, তার নামটা আমি সঠিক লিখতে পারিনি—সে সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। কখনও আমাদের ছেড়ে যায়নি। এমনকি যখন সিঁড়ির তলায় চালের মতো গড়িয়ে আসা ছাদের নীচে আমার ছোট ঘরে থাকতাম তখন, অথবা আদালত কক্ষে, কিম্বা প্রেসক্যাম্পে, বিভিন্ন জমায়েতে অথবা ভোজ সভায়, আর যখন ভীড়ের মধ্যে বসে যে মারদাঙ্গা চলচ্চিত্র দেখানো হত তা যখন দেখতাম, কখনই আমরা একে অপরের সঙ্গ ছাড়ি নি। আমি মন দিয়ে ভয়ঙ্কর সব সাক্ষ্য শুনতাম, তা টুকেও রাখতাম আর মনে মনে ভাবতাম নিম্ন ভলগা থেকে আসা সেই রুশ বালকটির কথা। যখন আদালত কক্ষে সবাই রুশ জনসাধারণের বিপুল কৃতিত্বের কথা বলত, অথবা যখন বলত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বীরত্বের কথা, তখন আমি তাকে পরিষ্কার আমার সামনে দেখতে পেতাম—সহজ, সরল, খোলামেলা, আন্তরিক স্বভাবের একজন বিচক্ষণ রুশ মানুষ।

আমি আমার গল্প লেখা নিয়ে একেবারে ডুবে ছিলাম। ডেভিডের পানশালা, যেখানে আমি নিয়মিত যেতাম, সেই ডেভিড আমার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে চেয়েছিল যে আমার পেটে ঘা হয়েছে নাকি।

আমি তাকে নিয়ে এত ব্যস্ত আর মগ্ন ছিলাম যে আমি বেবাক ভুলে গিয়েছিলাম ২৩শে ফেব্রুয়ারীর কথা, যা লাল ফৌজ দিবস। কুর্ট আমাকে এই দিনটির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিদিন প্রেস ক্যাম্পে গাড়ি রাখার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় আমার গাড়ি রাখত কুর্ট। সেদিন সে গাড়ি রেখেছিল আমাদের "ধালেডিয়ান আবাসনের" ফটকের সামনে। আমি যখন বার হয়ে এলাম তখন কুর্ট গাড়ির থেকে বার হয়ে এসে আমার সামনে বুক পিঠ সোজা করে টানটান হয়ে দাঁড়াল ও ফৌজী কায়দায় আমাকে কুর্নিশ করে, সযত্নে মোড়কে জড়ানো নীল স্নো ড্রপ ফুলের এক তোড়া আমাকে উপহার দেবার জন্যে বাড়িয়েছিল। [illegible] আমাকে খুব অবাক আর আশ্চর্য লাগছিল... [illegible] দিবস। [illegible]

আমি বজ্রাহত হলাম। আমি কি করে ভুলতে পারলাম? এই দিনটিকে আমরা মনে মনে লালন করি। আমি দ্রুত গেলাম টেলিগ্রাফ অফিসে, যেখানে আমাদের সেনাবাহিনীর লোকেদের জন্য এক গাদা তার অপেক্ষা করছিল। আমার জন্য দুটো তারবার্তা ছিল: একটি ছিল *প্রাভদা* থেকে পাঠানো উদ্দীপ্ত উষ্ণ সম্ভাষণ। স্বাক্ষর করেছেন সম্পাদক পোসপেলভ, প্রধান সচিব সিভোলোবভ, আর এই পত্রিকার সামরিক বিভাগের প্রধান, জেনারেল গ্যালাকতিয়নভ। আমি সবিশেষ খুশী হলাম অন্য টেলিগ্রামটি পেয়ে যেটি পাঠিয়েছে, "জুলিয়া, মামা, আন্দ্রেই আর আলিয়োনা।" ঘরে এই দিনটিকে মনে রেখেছে তারা, আর যদিও বিগত কয়েকদিন সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর কৃতিত্বের কথা বিচার সভাকক্ষে প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে, তথাপি এই দিনটি আমি ভুলে গিয়েছি।

লজ্জার কথা, আমি ঘরে ফিরে গেলাম। আমার কাজ করার জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে, অফিসারদের সামরিক পোশাক পরলাম! পিন দিয়ে গেঁথে নিলাম নানা পদক, যা আমি পেয়েছি। এই মহান দিনের জন্য যথাযোগ্য সাজসজ্জা করে আমি গেলাম 'প্যালেস অফ জাসটিস'-এ। ফৌজী নাবিকের পোশাকে আবির্ভূত হল ভিসনেভস্কি, সিনিয়র ক্যাপ্টেনের পদক সূচক তকমা আর সামরিক সম্মান যা কিছু সে পেয়েছে সবই তার পোশাকে সংলগ্ন। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ে পাওয়া পদকের পাশাপাশি সে ধারণ করে আছে দুটি সেন্ট-জর্জ ক্রস যা পুরোনো ছেঁড়া রিবনে লাগানো। ওই দুটি ও পেয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাহসী কাজের জন্য। ওকে দেখাচ্ছিল চেয়ে দেখবার মতো। ও যখন হাঁটছিল তখন ওর পাওয়া নানা সম্মানসূচক পদকে আওয়াজ হচ্ছিল টুং টাং করে। অভিনন্দনের উত্তরে সে করমর্দন করছিল দৃঢ়তা ও আবেগের সঙ্গে আর অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে "আপনাকেও অভিনন্দন", এইরকম যেমন সাধারণতঃ বলা হয়, তা না বলে তার পরিবর্তে সে বলছিল যেমন সম্মান চিহ্নিত ভূষিত একজন সৈনিক বলে থাকে, "আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সেবা করি।"

সেদিন আদালতের অধিবেশনে বিশেষ কিছু ঘটে নি, কিন্তু দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতিতে সোভিয়েত অফিসাররাই ছিল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। সব ধরনের লোকেরা—সাংবাদিক, অনুবাদক আর আদালতের নিজস্ব কর্মচারীবৃন্দ—সবাই আমাদের দিকে এগিয়ে এসে

আমাদের অভিনন্দন জানাল ও হাত মেলালো আমাদের সঙ্গে। আমরা সবাই জানতাম যে এই সাদর অভ্যর্থনা, অভিনন্দন ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জন্য নয়, সবই লালফৌজের জন্যে যার উর্দি আমরা পরে আছি এবং যার বিজয় অভিযানের কথা বিচারসভায় এত আলোচিত হচ্ছে। সুতরাং সেই দিন সোভিয়েত-সামরিক পোশাকে সজ্জিত হওয়া বিশেষভাবে সুখকর, এমনকি আমার উর্দিতেও, যা কিনা আমাকে কত জ্বালাতনই করেছে।

স্টারস এণ্ড স্ট্রাইপস-এ প্রকাশিত একটা ছোট্ট নিবন্ধ আমাদের সেদিন মজার খোরাক হয়েছিল। ওই নিবন্ধে আদৌ অস্বস্তি প্রকাশ না করে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে একথা জানানো হয় যে বিচার চলাকালীন উত্তেজিত ক্রুদ্ধ মুহূর্তে সোভিয়েত অভিযোগকারীদের পক্ষের প্রধান, হেরম্যান গোয়েরিংকে গুলি করেন বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা সমর্থিত হয় নি। এই পত্রিকার ন্যুরেমবার্গস্থ সাংবাদিকের প্রতিবেদন অনুসারে গোয়েরিং নিরাপদ এবং বহাল তবিয়তে আছে এবং বিচারের জন্য সক্ষম। সম্পাদকীয় দপ্তরে একটি ছোট্ট ভুলের জন্যে গোয়েরিং-এর বেদনাদায়ক মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়। সাংবাদিক প্রতিনিধির বিবরণে লেখা ছিল, "রুদেনকো নীতিগতভাবে গোয়েরিংকে হত্যা করেন।" ভ্রমবশতঃ সম্পাদকীয় দপ্তরের 'নীতিগতভাবে' শব্দটি ভুল পড়া হয় ও সেই ভ্রম থেকেই, এই বিপত্তি। এই হল মোদ্দা ব্যাপার। আমরা ছাড়া আর কেউ এটাতে অবাক বা আশ্চর্য হয় নি। আমি বা অন্য যেকোন সোভিয়েত সাংবাদিক যদি এই পূর্বতন রেইখ মার্শাল সম্পর্কে এইরকম কোন বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পাঠাতাম তাহলে কি ব্যবহার আমরা পেতাম তা একবার মনে মনে কল্পনা করে নিলাম।

সেদিন *প্রাভদার* জন্য কোন সংবাদ পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই দিনটি আমার চিরকাল মনে থাকবে, বিশেষ করে সোভিয়েত আইন বিভাগীয় কর্মচারীরা তাদের বিদেশী সহকর্মীদের জন্য যে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তার জন্য। অনুষ্ঠানটি ছিল ছোট, কিন্তু অভ্যর্থনা ছিল প্রাণভরা। যেন লাল ফৌজ বিচারক, আইনবিদ, অভিযোগ-কারী ও সাংবাদিকের মধ্যে বিচার সভায় যে নানা সামাজিক পার্থক্য ছিল তা যেন সাময়িক ভাবে মুছে দিয়েছে। সবাই বিজয়ী লাল ফৌজ, জেনারালিসিমো স্তালিন, হিটলার বিরোধী যৌথ মোর্চার দীর্ঘ স্থায়িত্ব কামনা করে ও নাজি পদ্ধতি ধ্বংস হোক এই বাসনা জানিয়ে মদ্যপান করল।

এই অভ্যর্থনা সভার নিকিতচেনকো আমার ও জেদিনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি প্রধান বিচারপতি স্যার জিওফ্রে লরেন্সের। তিনি ছোটখাটো কিন্তু মজবুত বাঁধুনীর স্বাস্থ্যবান মানুষ, তাঁর কপালটি চওড়া। ঝকঝকে পাতের মতো টাকের চারদিকে ছাঁটা নরম ফেঁসো তুলোর মতো চুল। তাঁর চোখে সোনার রিমের চশমা, যে চশমাটি আদালতে অধিবেশন চলাকালীন সাধারণত তার নাকের আগায় ঝুলে উঁচু হয়ে থাকত। তিনি পরেছিলেন ডিনার জ্যাকেট, কোটের কলারের মাঝখানে ফিতের ফুল। অল্পকথায় তিনি ডিকেন্সের মিস্টার পি কুইকের হুবহু প্রতিমূর্তি। যাইহোক, তাঁর, পিকউইকের চোখের স্বল্প দৃষ্টি কারো দিকে এক নজরে চেয়ে থাকলে মনে হোত যেন তীব্র ঝলকে ক্রমাগত ফালাফালা করে দিচ্ছে এবং তাঁর মুখশ্রী এমনই বুদ্ধিদীপ্ত ও সম্ভ্রম যুক্ত যে তাকালেই সরাসরি বোঝা যায় যে এই সুস্বভাবের মানুষটি সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র। আর সেই কারণেই তাঁর সহকর্মীদের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করার, সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর হাতে প্রধান বিচারকের হাতুড়ি তুলে দেবার।

স্যর জিওফ্রে বিচার চলাকালীন এই যে হাতুড়িটি ব্যবহার করতেন এই নিয়ে ঘটনাচক্রে একটি গল্প আছে, যদিও তিনি এই প্রতীকি যন্ত্রটিকে ব্যবহার করতেন কদাচিৎ। আমেরিকান বিচারক ছিলেন ফ্রান্সিস বিডল। তিনি লম্বা, রোগা, চটপটে এই মানুষটির গোঁফ আছে যেন আ লা আডলফে, মেন জো, এবং তিনি ছিলেন রুজভেল্টের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওই হাতুড়িটি রুজভেল্ট ওঁকে উপহার দেন। রুজভেল্ট যখন সেনেটর নির্বাচিত হন তখন তাঁর নির্বাচকমণ্ডলী রুজভেল্টকে ওই হাতুড়িটি উপহার দিয়েছিলেন। বিডল যখন ন্যুরেমবার্গ-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন তিনি প্রায় নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলেন তিনি আমেরিকার প্রতিনিধি হিসাবে, বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হবেন। তিনি ওই স্মারকটি ন্যুরেমবার্গে আসার সময় সঙ্গে নিয়েছিলেন। যাইহোক ইংল্যাণ্ডবাসী লরেন্স প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন ও উদার হৃদয়ে বিড্ল হাতুড়ির পুরোনো "ইতিহাস" বলে সেটি স্যর লরেন্সকে উপহার দেন। যদিও এই হাতুড়ির গল্পের শেষটা সুখকর নয়। হাতুড়ির গল্প যেই একবার দু এক জনের মুখে মুখে ফিরল অমনি আগুনের শিখার

ফলে গল্পটা ছড়িয়ে গেল 'প্যালেস্ অফ জাস্টিস'-এ, এমনকি কাগজে ছাপাও হল। তারপরেই হাতুড়িটা উধাও হয়ে গেল। কে যে ওটা তুলে নিয়ে গেল তা কেউ খুঁজে পেল না। আদালতের কর্মচারীদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁকই হল সাংবাদিকদের দোষ দেওয়া, আর সাংবাদিকরা স্বাভাবিক ভাবেই দায়ী করতে লাগল আইন বিষয়ক কর্মচারীদের। এবং অতঃপর ওটার জায়গায় লর্ড লরেন্স পেলেন একটা নতুন, এমনি সাধারণ হাতুড়ি, যা তাঁর হাতে আপনা থেকেই হয়ে উঠবে এক ঐতিহাসিক শিল্পকৃতি।

একটি আয়োজিত অভ্যর্থনা সভা যা সত্যি সত্যি কোন সাক্ষাৎকার নেওয়ার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত জায়গা নয়। কিন্তু তবুও সেদিন আর আমি মিস্টার পিকউইককে ব্যস্ত করে তুললাম। স্যাম্পেনের গ্লাস হাতে নিয়ে আমরা পরম উৎসুক হয়ে যুদ্ধ অপরাধী ও বিচার সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। আমাদের অবাক করে দিয়ে লর্ড লরেন্স তাঁর মতামত ও ভাবনা চিন্তা ব্যক্ত করতে আরম্ভ করলেন।

সারা পৃথিবীর আইনগত যা কিছু অভ্যাস, সেই ইতিহাসে এমন কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই যা এই বিচারের অনুরূপ। এই বিচার নিজেই, স্বয়ং একটি মহান আইনগত অদৃষ্টপূর্ব দৃষ্টান্ত। এই সর্ব প্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যারা স্বাধীনতাকে মনে মনে লালন করে, তারা যুদ্ধ ও আগ্রাসী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একটি মিলিত যুক্ত মোর্চা গঠন করেছে ও যুদ্ধাবসানের পর যুদ্ধহীন শান্তির কালে একসঙ্গে মিলেমিশে রচনা করেছে আন্তর্জাতিক আইন, যে আইনের ভিত্তিতে প্রধান যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হচ্ছে। হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ এটাই একটা মহান পূর্ব দৃষ্টান্ত এবং সম্ভবতঃ—মানুষ এরকমই বিশ্বাস করতে চাইবে—এই পূর্ব দৃষ্টান্ত এবং এর জন্য রচিত আইনসমূহ, ভবিষ্যতে, যে কোন আগ্রাসী আক্রমণকে নিবৃত্ত করার উপায় হিসেবে কাজ করবে।

লরেন্স এমনভাবে বলছিলেন যে তিনি কোন ভাষণ দিচ্ছেন। আমাদের দোভাষী, আনিয়া, তাঁর কথাগুলি অনুবাদ করছিল ফিস্ ফিস্ করে যাতে তাঁর চিন্তাধারা ব্যাহত না হয়। আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে বিচারের কাজ যেভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে সেই সম্পর্কে তাঁর কি মনে হয়। তিনি এ কথার উত্তরে বললেন যে সে বিষয়ে সুচিন্তিত ভাবে কিছু বলার পক্ষে

গোটা ব্যাপারটাই এখনও নিতান্ত শৈশবে, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেন। বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় নানা বিচারক যাঁরা সর্বোচ্চ গুণের অধিকারী, তাঁরা এই বিচারে জুরীর কাজ করছেন তাঁদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু তবুও দু একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে গত পাঁচমাস তাঁরা এক সঙ্গে মিলে মিশে গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করছেন। তাঁদের সকলের একটাই ঐকান্তিক ইচ্ছা : সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অপরাধের চেহারা উদ্‌ঘাটন।

কিন্তু তাঁর কি মনে হয় না, কখনও কখনও বিচার এগুচ্ছে বড্ড ঢিকে তালে? হয়ত আমরা নিতান্তই অজ্ঞ আর সাদামাটাভাবে বোকার মতো যাতা বকছি। কিন্তু আমরা সত্যিই অনুভব ও বিবেচনা করতাম যে সামান্য মাত্রা হলেও ইতিমধ্যে যা বলা হয়েছে আর সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে—প্রকৃত, বাস্তব, মূল্যবান সাক্ষ্য—তাইতো এইসব অপরাধীদের চরম দণ্ডে দণ্ডিত করার পক্ষে যথেষ্ট। ফেদিন খুব নম্রভাবে কথাটা সাহস করে বলেই ফেলল।

"না এটা আপনারা মোটেই ঠিক বলছেন না", লর্ড লরেন্স সুকৌশলে গুছিয়ে উত্তর দিলেন। "আমরা প্রতিহিংসাকারী নই, আমরা বিচারক এবং কোন অবস্থাতেই আমরা আবেগের দ্বারা চালিত হতে পারি না। আইন হচ্ছে আইন। আমরা অবশ্যই আইনের কাজ করব যুক্তিপূর্ণভাবে, স্বাভাবিক মানবিক আবেগের দোলায় কখনই বিন্দুমাত্র না দুলে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এই ধরনের বিচার এই প্রথম। একটা মিথ্যা পদক্ষেপ করে অথবা তাড়াহুড়ো করে বিচার বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই বিচারের জন্য যে সমস্ত আইন সদ্য রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই আইনের প্রতি আস্থাকে খাটো করে দেখানোর কোন অধিকার নেই। একটা মন্দ উদ্ভিদকে গোড়া শুদ্ধ উপড়ে দেবার জন্যে তার বৃন্তটাকে ছিঁড়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সেই মন্দ উদ্ভিদের সবকটি মূল নির্দিষ্টভাবে অনুভব করে জেনে সমস্ত মূল উৎপাদিত করতে হবে, এমনকি, সেই মূলের ছোট ছোট শাখাকেও, যেগুলিকে নিহিত শাখা প্রশাখা সমেত খালি চোখে ঠিক ঠিক দেখা সম্ভব নয়। কেবল কুপিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলাই যথেষ্ট নয়। মাটিগুলোকে চালনি দিয়ে ছাঁকতেও হবে, যেভাবে আমার বাগানে গোলাপ গাছ লাগাবার আগে আমি মাটি তৈরী করে থাকি। ভদ্রমহোদয়গণ

আমি আশা করি যে আমাদের মধ্যে এই যে বন্ধুসুলভ কথোপকথন এটা কোন ধরনের সাক্ষাৎকার নয়। বিচারক হিসেবে, চূড়ান্ত রায় দেবার আগে সংবাদপত্রের কাছে কোন বিবৃতি দেবার কোন অধিকার আমার নেই।"

ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টিকোণ *প্রাভদার* পাঠকদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করত, কিন্তু এই কথোপকথনের একটি বর্ণও প্রকাশ না করার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম। যাই হোক, লর্ড লরেন্সের সঙ্গে আমাদের কথোপকথন আমার মনের মধ্যে তাজা থাকতে থাকতে আমি আমার দিনলিপিতে লিখে রেখেছিলাম। কেন না আমার বোধ হয়েছিল যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতেও সমান প্রাসঙ্গিক হবে।

আমাদের সঙ্গে দুচারটে গল্প গুজব করার মত কথা বলে লর্ড লরেন্স সুচতুরভাবে তাঁর পানীয় গ্লাসের দিকে তাকালেন ও যে সমস্ত শব্দ ও বিশেষ স্বর ক্ষেপণ করে তিনি বিচারকালীন দুটি অধিবেশনের মধ্যে অন্তবর্তী বিরতি ঘোষণা করতেন, ঠিক সেই অনুরূপ শব্দ ও স্বরক্ষেপণ করে বললেন, "আপনাদের কি মনে হয় না ভদ্রমহোদয়গণ, যে এই গ্লাসগুলি নিঃশেষ করার এটাই প্রকৃষ্ট মুহূর্ত" এবং এই বলে স্যাম্পেনটি চুমুক দিয়ে শেষ করে উনি দ্রুত আর এক ঝাঁক অতিথির দিকে চলে গেলেন।

এই মনোরম সন্ধ্যার শেষে সেদিন এক মজার উপাখ্যান গোচের হয়। সারা সন্ধ্যার বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় শেষের দিকে সকল কেতামাফিক সরকারী ভদ্রতা উধাও হয়ে গিয়েছিল। ভোজসভা বেশ গুঞ্জন মুখরিত হয় এবং অতিথিরা রুশ সঙ্গীত শুনতে চান। ঠিক আছে, গান গেয়েই বা ওদের আপ্যায়ন না করব কেন? এবং আমরা সোল্লাসে গেয়ে উঠলাম—সত্যি কথা বলতে কি যাকে ঐকতান বলে আমাদের গলা কিন্তু সেইরকম মেলেনি—প্রথম "ভোলগার মাঝি", আর তারপর "স্তেনকা রাজিনের বিষয়ে গান।" আমাদের দৃষ্টান্ত প্রমাণিত হল সংক্রমণশীল ছোঁয়াচে বলে। একজন গাঁট্টাগোট্টা লাল মাথার স্কট যে এই অভ্যর্থনা সমাবেশে তার জাতীয় পোশাকে এসেছিল—পায়ে বিশেষ পট্টীবাঁধা, স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের পুরুষদের ঝালোরওয়াল ঘাগরা, তার ওপরে কালো জ্যাকেট, চকচকে বোতাম—সে একজন বাদকের কাছ থেকে বাঁশী চেয়ে নিয়ে স্কটল্যাণ্ডীয় সুর বাজাতে আরম্ভ করেছিল।

আমেরিকানরা সবাই মিলে চিৎকার করে সুপারিচিত আমেরিকান বৈমানিকদের গান, "একটি ডানায় ওড়া ও একটি প্রার্থনা," গাইল। এবং ইংরেজরা সাড়া দিল "টিপ্পেরারী" অর্থাৎ গন্তব্যস্থলের গান গেয়ে।

প্রত্যেকটি দল মিলে মিশে গেল। এখন সবাই গান গাইতে চাইছে আর ফলে গোলমাল যা হচ্ছে তা আর বলার নয়। আমি জানি না কে অনুরোধ করেছিল কিন্তু অরকেস্ট্রা হঠাৎ বাজতে আরম্ভ করল *বারিনিয়া,* একটি রুশ লোক নৃত্য। সোভিয়েত স্টেনোগ্রাফাদের মধ্যে একজন, সুন্দরী, কৃষ্ণনয়না, পিঙ্গলকেশী শ্যামাঙ্গী তরুণী, নাচতে আরম্ভ করে দিল। আর সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক রোমান কারমেন সেই সেই তরুণীর পিছু পিছু নাচের জায়গার বৃত্তের মধ্যে নেমে পড়ল লাফ দিয়ে, ও ওস্তাদের মতো রুশ নাচের সব পদক্ষেপ করতে লাগল। তারা দুজনে মিলে একটা জুটি হয়ে গেল, আর তাদের নাচ ছিল এতই জীবন্ত যে দর্শকেরা বাজনার তালে তালে তালি দিতে লাগল। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক যাকে আমরা জানতাম একজন বিশিষ্ট জুরী হিসেবে, যিনি সব সময়ই থাকতেন বেশ শান্তশিষ্ট, তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনিও নাচের বৃত্তের মধ্যে লাফ দিয়ে নামলেন ও সেই নৃত্যরতা মেয়েটির চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাঁর ইংরেজী নাচ অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে লাগলেন। নাচ খুব জমে উঠল। জ্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কারমেন, তার জামার হাতা গুটিয়ে নিল। তার ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীও ওই একই জিনিস করল, কিন্তু তার নাচের ভঙ্গী ছিল খুবই তেজদীপ্ত। তার বন্ধনীর মধ্যে আটকানো বোতাম-গুলো ফেটে গেল। সে নিজের নাচে এত মত্ত ছিল যে তার পাতলুন যে আস্তে আস্তে নীচে নেমে যাচ্ছে তা সে খেয়াল করে নি। সে চরকি পাক দিতেই লাগল আর ততই তার সুন্দর কাপড়ে বোনা ভিতরের উজ্জ্বল নীল পোশাক ক্রমশ অধিকতর দৃশ্যমান হতে থাকল। তারপর ইংরেজদের সাংগঠনিক দক্ষতার এক উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম: তার একঝাঁক স্বদেশবাসী কোনক্রমে তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হল নাচের দৃশ্যে। তারা পাশাপাশি গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে গেল সেই নাচিয়ের চারদিকে আর সেইভাবে নিজেদের শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে হলের বাইরে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

আমোদ ফুর্তি চলতেই থাকল। শেষ হল মধ্য রাত্রির পরে। আমরা

সেই সন্ধ্যা থেকে এখন পর্যন্ত সব কিছুর আনন্দে মন ভরে নিয়ে টৈ টৈ করতে করতে আমাদের বাসায় ফিরলাম। বসন্ত কালের রাত্রি এগিয়ে এল গাড়ির জানলায় ফাঁক দিয়ে। সে রাত্রির গায়ে ঋতুর শেষ তুষারের আর জেগে ওঠা মৃত্তিকার সুঘ্রাণ—বসন্তকালে যেমন সর্বদাই হয়ে থাকে, গাঢ় ভেলভেটের মত আকাশে নক্ষত্ররা যেন ঈষৎ কম্পমান ও তারা যেন পরস্পরের মধ্যে ইশারা করছে। আমরা চুপচাপ বসে থাকলাম, প্রত্যেকে আমরা নিজের মতন করে পালন করলাম লাল ফৌজ দিবস, যে উৎসব উদ্‌যাপিত হল বাড়ির থেকে অনেক দূরে। যখন আমরা স্টেইনে পৌঁছে গেছি তখন কুর্ট-এর ঠিক পাশে বসে থাকা নিকোলাই ঝুকভ আমাদের দিকে পিছন ফিরে বলল, "নিশ্চিত বুঝেছি, বুঝলে হে তোমরা, লাল ফৌজের উর্দি গায়ে দিলে সত্যি দারুণ লাগে।"

১১। "সার উইন্‌নি" ককটেল

আমার অনেক নতুন বন্ধু হয়েছে—বেশ কয়েকজন জার্মান যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই চমৎকার। এই বন্ধুরা হল স্থানীয় সেই সব পাখি। তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব শুরু হল যখন আমি আমার ছোট্ট ঘরের জানালা খুলে দিতাম আর আমার স্যাণ্ডউইচ থেকে নরম অংশের টুকরাগুলো ছুঁড়ে দিতাম বাগানে (সময় বাঁচাবার জন্যে আমি আর সান্ধ্য আহার করতে আমার ঘর থেকে বাইরে যেতাম না। তার পরিবর্তে, আমাদের যে কোন দলের সঙ্গে পানশালার মালিক ডেভিড থলে ভর্তী স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়ে দিত) কিছু কিছু টুকরো অবধারিতভাবে পড়তো জানলার চৌকাঠের ঠিক নীচের দিকে; আর সঙ্গে সঙ্গে একটি পাখি যে প্রথমেই হানা দিত, খুব উৎসাহী চড়ুই, উড়ে আসত ঠিক আমার নাকের নীচে। তার গায়ে বিশেষ চিহ্ন ছিল, আর তার লেজটা ছিল ছোট। বোধ হয় সে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে তার লেজ হারিয়েছিল। নিজের যতটা দরকার খেয়ে, সে উধাও হয়ে যেত, আর আবার ফিরে আসত এক ঝাঁক আমুদে সঙ্গে নিয়ে। সে যাই হোক, কোন টুকরোই পড়ে থাকত না, কেননা সে আগেই সব খেয়ে গেছে। সুতরাং, আমার অতিথিরা যাতে হতাশ না বোধ করে, একটা গোটা স্যাণ্ডউইচকেই তাদের জন্যে আমায় টুকরো টুকরো করতে হত। তারা

উড়ে দূরে চলে যেত মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর পুনরাবির্ভূত হত। খুব ঝটাপটি আর হৈ-চৈ করত তারা, যা শনিবার সন্ধ্যায় ডেভিডের পানশালার জটলার সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়।

সুতরাং চলতে লাগল এইভাবেই। জানালায় চড়ুইদের ভোজ। আর জানলার ওদিকে এদিকে আমি জানলার ধারে বসে কাজ করতাম। কোন পক্ষই একে অন্যের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতাম না। সেই ভোরবেলায় যখন জানলার মধ্য দিয়ে বয়ে আসত বসন্ত বাতাস, আমার বন্ধুরা ধূসর পাখার চড়ুই পাখিরা কিচির মিচির করে নাচানাচি করত কাছেই; তখন কাজ করতে যে কি ভালো লাগত। আমার গল্পের বৈমানিক অনেক আগেই যুঝে বের হয়ে এসেছে জঙ্গল থেকে, আশ্রয় পেয়েছে যৌথ ভিত্তিতে কৃষিকাজ করে এমন চাষীদের কাছে, আর শীঘ্রই সে আকাশ পথে মস্কো ফিরে যাবে। বাড়িতে লেখা আমার আগের এক চিঠিতে, যে বইটা আমি লিখছি সেটার কথা আমার বৌকে বলেছি। আর বইটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে কথা দিয়েছি যে তার জন্মদিনের আগেই আমি লেখাটা শেষ করবো। যাইহোক, যেহেতু আমার বৌ খুব চালাকি করে জন্মগ্রহণ করেছিল ১লা এপ্রিল, সে উত্তরে একটু খিমচি দিয়ে সে এই শপথকে ১লা এপ্রিল তাকে বোকা বানাবার একটা কৌতুক বলেই ধরে নিয়েছে। এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে যা বলেছি, তা আন্তরিক ভাবেই বলেছি। আর তাই ঘড়ির কাঁটার মত আমি রোজ দশ, এমনকি পনেরো পাতাও একদিনে লিখছিলাম।

এখন আমি লিখে যাচ্ছিলাম তর্ তর্ করে। গল্পটা এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যে প্রধান চরিত্রের উদ্দেশ্য আর কাজকর্ম নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কিছু ছিল না। তারা দিব্যি নিজের নিজের মত জীবন কাটাচ্ছে। তারা ছিল জীবন্ত আর সক্রিয়। তাদের সব কাজ, চিন্তা আর অভিপ্রায় বিস্তারিত ভাবে লিখে যাই এমনটাও ছিল আমার সাধ্যের বাইরে।

আজ ১২ই মার্চ, আমি সতের পাতা লিখেছি। মন্দ কাজ নয়, কি বলো হে, আমার সুন্দর পাখাওয়ালা বন্ধুরা? ঠিক আছে, তোমরা প্রাণভরে ঠুকরে ঠুকরে খুঁটে খুঁটে খাও। আমিও আজ বাইরে যাব প্রাতঃরাশ খেতে, আর তারপর যাব বিচার সভায়—সেখানে বসে বসে ভাবব, আমার বৈমানিক যখন ফিরে মস্কো পৌঁছবে তখন সে কেমন ব্যবহার করবে, আত্ম

যখন সে সামরিক হাসপাতালে যাবে তখনই বা কেমন হবে তার ব্যবহার।

যাই হোক, প্রাতঃরাশের সময় আমি প্রেস ক্যাম্পের আবহাওয়ায় যেন অস্বাভাবিক কোন কিছুর আভাস পেলাম। কোন কিছু নিয়ে উত্তেজক কোন ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমাদের পাশ্চাত্যের সহকর্মীরা আমাদের দিকে স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। যদিও, "প্যালেস অফ জাসটিস"-এ যাবার জন্য সাধারণতঃ তারা বেশী তাড়াহুড়ো করতো না, আজ কিন্তু তারা প্রাতঃরাশ শেষ করল দ্রুত, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তাদের টেবিল থেকে আর ছুটে গেল ভ্যানের দিকে। প্রেস ক্যাম্পের লাউডস্পিকারে বারবার শোনা গেল কর্তব্যরত প্রেসক্যাম্প অফিসারের গলা, "অমুক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, শ্রীযুত অমুক চন্দ্র অমুক আপনার অফিসের কর্তা ফোনে অপেক্ষা করছেন। ধন্যবাদ!"

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে অসাধারণ কোন কিছু আবার ঘটেছে। আর তাই আমিও আদালতের দিকে তাড়াতাড়ি চললাম। কুর্ট আমার সঙ্গে দেখা করল গাড়ি নিয়ে এবং সে আমার দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। আমি কি রেডিও শুনেছি। শুনিনি? ঠিক আছে, সে মন দিয়ে শুনেছে, আর খবর এই স্যার উইনস্টন চারচিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ন্যুরেমবার্গের সবাই এই নিয়েই কথা বলছে।

"চার্চিল? যুদ্ধের জন্য ডাক? কখন? কোথায়?"

কুর্ট ঠিক ঠিক জানে না। সে বেতারে সংবাদ পাঠের একেবারে শেষের দিকের শেষ অংশটুকু শুনেছে। কিন্তু প্রত্যেকেই এই নিয়ে আলাপ করছে। 'প্যালেস অফ জাসটিস'-এ রুশদের মধ্যেও নিশ্চিতভাবেও কেউ কিছু জানে না কিন্তু ঘটনাটা নিয়ে সকলেই টুকটাক নানা হিসেব বহির্ভূত আলোচনা করছে। খুব সম্ভবতঃ চার্চিল আমেরিকায় এক ভাষণ দিয়েছেন যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পশ্চিম দেশগুলিকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান হয়েছে।

বারন্দা দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল ওলেগ ত্রোয়ানাভস্কি—একজন সমঝদার যুবক যাকে আমরা এবং আমেরিকানরা বিবেচনা করতাম—ইংরাজী ভাষায় একজন বিশেষজ্ঞ বলে। বিচার চলার সময়ও বসে থাকত আমাদের প্রধান বিচারকের পিছনে এবং বিচারকদের নিজেদের মধ্যে কথা বলায় ও সাহায্য করত। একটা অনুবাদের নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে ওর

পরামর্শ ও মতামত চাওয়া হত। এখন সন্ত আসা একরাশ আমেরিকান সংবাদপত্র একহাতের বগলের তলায় চেপে ধরে আর অন্য হাতে একটা কাগজ ধরে পড়তে পড়তে সে বারান্দা দিয়ে তুরুক কদমে যাচ্ছে।

"ওলেগ, কি ব্যাপার বলতো?"

"পরে, পরে, আমার তাড়া আছে।"

"দাঁড়াও, আগে বল, হয়েছেটা কি?" বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান সংবাদ, যা সেদিনের সংবাদের শিরোনাম তা অনুবাদ করে শুনিয়ে দিল—আমার মনে হয় সংবাদপত্রটা ছিল *দি নিউ ইয়র্ক হেরল্ড ট্রিবিউন* পত্রিকার প্যারিস সংস্করণ। প্রথম পাতায় সাংঘাতিক শিরোনাম এই রকম, "চার্চিল: রাশিয়াকে থামিয়ে দেবার জন্য একত্রিত হও।"

অবশেষে আনিয়া এক পাঁজা কাগজ নিয়ে হাজির হল আর আমরা নিজেরাই ব্যাপারটা কি নিয়ে তা নিজেরা দেখতে লাগলাম। বিশ্ববিদ্যালয় শহর ফালটন্ যারা বছরে একবার পৃথিবী বিখ্যাত কাউকে তাঁর ইচ্ছামত কোন গুরুতর বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালযে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ করে আনে সেই ফালটন-এ চার্চিল একদিন আগে বক্তৃতা দিয়েছেন। চার্চিলের বক্তৃতার নিহিতার্থ ইঙ্গিতময় হয়েছে ওপরে উধৃত শিরোনামে। অন্যান্য আমেরিকান কাগজের শিরোনাম হয় এরই পুনরুক্তি অথবা প্রথম শিরোনামটাকে ভেঙ্গে দীর্ঘায়িত করা: "মস্কোর বিরুদ্ধে একটি যুক্ত মোর্চা গঠনের জন্য স্যার উইনস্টন চার্চিলের আহবান," "কমিউনিজম—আজকের বৃহত্তম বিপদ," অথবা "পাশ্চাত্য পৃথিবীকে সোভিয়েত সম্প্রসারণ রুখতেই হবে।"

চার্চিলের বক্তৃতা আমাদের অনুবাদ করে শুনিয়ে দিল আনিয়া। এটা সর্বের অভাবিত এমন কোন ব্যাপার নয়। মাসের পর মাস ধরে পাশ্চাত্যের নানা কাগজে এই একই ধরনের জিনিস অন্যভাবে বার হচ্ছে। বলা চলে শেষমেষ এই এমন ব্যাপারটা কাগজে কলমে সরাসরি প্রকাশিত হল। চার্চিল বক্তৃতা দিয়েছেন কোন রাখ ঢাক না করে সরাসরি নাম ধরে ধরে আর ভীরু বুর্জোয়াদের সামনে খোলাখুলি কমিউনিস্ট ভীতির পুরোন কিংবদন্তীকে ভাঁজ করে ঘুরিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, পুরোন কোন ছেঁড়া কাপড়ের মত।

"তোমরা কি আশা করেছিলে? চার্চিল তার গায়ের ডোরা কাটা দাগ বদলাবে? একটা বাঘ সব সময় বাঘ থাকবে," দুই পাটি চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছিটকে দেওয়ার মত বলল, ভ্ সেভোলদ ভিশনেভস্কি। "ওরা কিছুতেই শান্ত হবে না। ওরা শান্তির ভয়ে ভীত। শান্তি ওদের গলায় আটকায়, কাঁটার মত বেঁধে। তোমরা কি ভাব? একটা বাঘ মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবে?"

"এটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার," শান্ত অনুত্তেজিত ভাবে বলল ইয়ারোস্লাভ গালানিী আমরা জানতাম ও একটু মৌনী ধরনের লোক, যে কখনোই হাল্কা কথা বলে না। "আমার ওখানে স্লাভ 'এমিগ্রি,' অর্থাৎ যারা রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়ে আস্তানা গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে, সেই সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গে জানা পরিচয় আছে, যারা অন্ধ ও গোঁড়া ক্যাথলিক। ওদের কাছে শুনেছি যে গীর্জায় গীর্জায় ক্যাথলিক পাদ্রী, কমিউনিজম. অর্থাৎ সাম্যবাদকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিশ্বাসী শয়তানসুলভ আখ্যা দিয়ে, ভক্তিযুক্ত ধর্ম আলোচনায় মিনতিপূর্ণ পরামর্শ দিচ্ছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একত্রিত হবার। বড়দিনের সময় দুজন স্থানীয় বাসীন্দার খুন হওয়ার ঘটনার কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো—তারা ছিল বন্দী শিবির থেকে ছাড়া পেয়ে বার হয়ে আসা কমিউনিস্ট।"

চার্চিলের বক্তৃতা এই বিচারের উপর কোন্ ছায়া ফেলে তাই লক্ষ্য করে দেখার? রবার্ট লে, ছয় মাস আগে যে তার বন্দী নিবাসের কুটরি থেকে মিত্র শক্তির সব পশ্চিমা শক্তিকে আলাদা স্মারকলিপি দিয়ে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তাদের একযোগে সহযোগী হিসেব কাজ করার ক্ষেত্রে, তার যে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল, সেই লের কথাই কি সত্য বলে প্রমাণিত হবে? সেই সময়, বিচার সত্ত শুরু হয়েছে, আর লের এই প্রস্তাবটাকে মনে হয়েছিল এক অন্ধ-গোঁয়ার, আর এক ক্রোধান্মত্ততা। মনে হয়েছিল জার্মান শ্রমিকদের এই হত্যাকারী নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এই সব বলে শেষ খড় খুটো মুঠোতে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

এখন কার্যতঃ সেই একই কথা বলা হচ্ছে। আর একথা নিজে গায়ের ছাল চামড়ার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভয়-পাগল কোন নাজী বলছে না। বলছেন হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিত্রশক্তির অন্যতম শক্তিমান এক রাষ্ট্রের নতুন প্রধান।

আমরা বিচারক, প্রসিকিউটার, প্রতিবাদী পক্ষের আইনজীবী, যুদ্ধ অপরাধী, এদের সকলের দিকে সেদিন বিশেষ মনোযোগ নিয়ে দেখতে লাগলাম। বিচারের কাজকর্ম যে চলছে সেই বিচার কাজ চলার সব কিছুর ওপর এই বক্তৃতা কোন প্রতিক্রিয়া আনবে? দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সাময়িক বিরতির সময়, আমরা লক্ষ্য করলাম যে প্রতিবাদী আসামী পক্ষের অনেকেই আদালত ঘরে নিজের জায়গাতেই রয়ে গেলেন আর দাঁড়িয়ে খবরের কাগজের পাতাগুলো মেলে ধরলেন এমনভাবে যে দেখে মনে হবে তাঁরা কাগজ পড়ছেন, কিন্তু আসলে এভাবে তাঁরা তাঁদের কাঁধের ওপর দিয়ে তাঁদের মক্কেলদের কাগজে চার্চিলের ভাষণের বয়ান পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন। তাঁরা এরকম বহুবার করেছেন এবং কেউ কখনো কোন আপত্তি জানাননি। সুতরাং সেদিন এই ভাবে গোয়েরিং, হেসস ও রিবেনট্রপ কাগজ পড়ে নিল।

এই সব সত্ত্বেও, আমার মনে হল যে যথারীতি বিচার এগিয়ে চলল। বিচারক ও অভিযোগকারী পক্ষদের আইনজীবীদের ব্যবহারে চার্চিলের ভাষণের কোন প্রভাবই দেখা গেল না। প্রতিবাদী আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থন ও যুদ্ধ অপরাধীরা এই সব একেবারেই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিষয় ও ব্যাপার। যাইহোক, প্রতিবাদী আসামী ও সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে বেশ সজীব ও সঞ্জীবিত গোছের মনে হচ্ছিল। যুদ্ধ অপরাধীরা একে অপরের কানে কানে কথা বলছিল আর মন্তব্য লেখা কাগজ দেওয়া নেওয়া করছিল তাদের পক্ষীয় আইনজীবীদের সঙ্গে। তাদের মুখগুলো ছিল বেশ উত্তেজিত ও আনন্দভরা।

প্রতিবাদী আসামীরা একে অপরকে কি বলাবলি করছিল, তা সাংবাদিকদের মধ্যে মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল। আমরা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছিলাম যে একজন আমেরিকান রক্ষী—লম্বা, সুদর্শন, গোলগাল বুদ্ধিদীপ্তমুখ—আগে এক সার্কাসের খেলোয়াড় ছিল। এরকম বলা হতো যে তার স্মৃতি শক্তি বিস্ময়কর। তার খেলাটা ছিল এই রকম যে দর্শকদের মধ্যে থেকে যে কেউ একজন এই খেলোয়াড়ের অজানা ও সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন ইউরোপীয় ভাষায় কিছুটা অংশ জোরে পড়ে শোনাবে। আর সে, যদিও সেই ভাষার কিছুই জানে না কিন্তু যা কিছু শুনল, তার প্রতিটি অক্ষর ধরে ধরে আবার বলে দেবে। লোকেদের এখন এই সুনিশ্চিত ধারণা হল যে

এই লোকটিকে সান্ত্রীর কাজ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল যখনই প্রতিবাদী আসামীরা নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা বলছে, তা জানা দরকার। তাই তাকে পাহারাদারের কাজ দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। অনেক আমেরিকান সাংবাদিক ; যাদের মধ্যে উৎসাহী পেগি অবশ্যই আছে, এই 'জি আই'-এর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ করে নিয়েছিল। আর সামান্য অর্থের বিনিময়ে সে এদেরকে জোগাত নানা বিবরণ। আমাদের আমেরিকান সহকর্মীদের কাছে আমরা জানতে পারলাম যে তার গোয়েরিং নাকি আইনজীবীর কাছ থেকে বক্তৃতার চার্চিলের বিষয় জানতে পেরে সোল্লাসে বলে উঠেছে, "আমি কি বলেছিলাম! গত গরমকালে ভাবতে পারিনি যে শরৎকাল পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো। আর এখন যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে খুব সম্ভবতঃ আমি শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তে—এই রকম অনেক বছর, বাঁচবো। রায় উচ্চারিত হবার আগেই ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করবে।"

"আমি সব সময় এমনটাই আশা করেছিলাম। চার্চিল একটা বোকা নয়," রিবেনট্রপ মন্তব্য করল, "আমরা লালদের চেয়ে চার্চিলের অনেক কাছের লোক।"

নিউর‍্যাথ, ভন প্যাপেন ও শ্যাচট নাকি নিজেদের মধ্যে নীচের সব মন্তব্য করেছে বলে বলা হচ্ছে।

"গোল্লায় যাক। উনি কিন্তু খুব স্পষ্টভাষী ; তাই নয় কি ?'

"এখন তাঁর মালুম হচ্ছে যে তেহেরানে উনি বোকার মতই কাজ করেছেন, আর এমনকি ইয়ালটাতেও যে বাজী জেতার ঘোড়াকে সমর্থন করেননি।"

"বৃটেন চিরকাল বৃটেন থাকবে, আর ব্রিটিশদের রাজনীতিও কোনদিন বদলাবে না।"

রুডলফ হেস্‌ নাকি গোয়েরিংকে উদ্দেশ্য করে বলে, "তুমি ঠিক গুছিয়ে এর পরের জার্মান ফুয়েরার হয়ে বসবে।"

নিশ্চিত ভাবে একথা বলা খুব কঠিন যে প্রতিবাদী আসামীরা হুবহু এই সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক এই সব শব্দই বলেছিল কিনা। মুখ ফেরতা হয়ে কথাগুলো যখন আমাদের কানে এলো, তখন ইতিমধ্যেই এগুলোর কিছু বিকৃতি ঘটে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু একথা সন্দেহাতীত যে যুদ্ধ অপরাধীদের খুবই উল্লসিত দেখাচ্ছিল। তারা মনে মনে খুবই বাহবা আর তারিফ

জানাচ্ছিল চার্চিলকে, সে যেন ভ্রাতৃপ্রতিম আত্মিক শক্তি হয়ে তাদের আশা জুগিয়েছে।

কিন্তু আগের মতই শান্ত ও ঢিমেতালে এগিয়ে চলল বিচার সভার কাজ। যদিও এরকম একটা ভাবনা না ভেবে উপায় ছিল না যে ইতিহাসের চাকা আকস্মিক ভাবে অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। হয়তো দেখা যাবে বিচারকদের নিজেদের মধ্যে মতান্তর ঘটল আর তাঁরা বিচারটাকেই পরিত্যাগ করলেন হাল ছেড়ে দিয়ে, যেমন অতীতে দুবার দেখা গেছে নেপোলিয়ন আর দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়মের বেলায়। গিওরগি দিমিত্রভের কথাগুলো লাফিয়ে উঠল আমার মনে: কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই, এইরকম অদৃষ্টপূর্ব নানা প্যাঁচালো জটিল কাজ আমাদের আইনজীবীদের সামনে অপেক্ষা করছে। একটা মস্ত বিজয় জেতা হয়ে যাবে যদি বিচারটা শেষ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই বিভীষিকাময় শিক্ষা পাওয়ার পরেও কি পৃথিবীর বিচার ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি আবার কি গাড্ডায় পড়তে যাচ্ছে?

যথারীতি সেদিনের অধিবেশন শেষ হল। কিন্তু আমরা সকলে ফিরে গেলাম মনে এক ধরনের সন্দেহ সংশয় নিয়ে। ভসেভোলদ ভিশনেভস্কি, বারান্দায় তাকে ঘিরে ধরা পাশ্চাত্যের একদল সাংবাদিক প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছিল।

"ভদ্রমহোদয়গণ, চার্চিল কোনদিন বদলাবেন না। সোভিয়েত শক্তির উত্থানের শুরু থেকে আমরা তাঁকে জানি। আমাদের শিশু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবরোধ তিনিই সংগঠিত করেছিলেন ও সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে আমাদের সমূহ ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং উনি যা বলেছেন তার মধ্যে নতুন বা আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই।"

চার্চিলের বক্তৃতায় সবচেয়ে তৎপর, উদ্যমী ও সাহসী প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হল ডেভিডের কাছ থেকে। সেদিন পানশালায় পেয় ও পাওয়া যেতে পারে এমন ককটেলের তালিকায় সব নামের ওপর একটি নতুন ককটেলের নাম ছিল। আমি আগেই সেই নতুন ককটেলটির নাম জানিয়েছি: "স্যার উইনস্টন।"

এক ঝাঁক হল্লাটে সাংবাদিক নোনতা খাবার খেতে খেতে বিভিন্ন সুরা পানীয়ের উপাদান মিশিয়ে তৈরী এই ককটেল খেয়ে বস্তুটা পরখ করছিল।

সুব্রত আর আমি ভীড়ের মধ্যে কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম ও দুজনেই সেই পানীয়ের ফরমাস দিলাম, কিন্তু বস্তুটা মুখে দিয়েই আফশোস হতে লাগল। আমেরিকান সার্জেন্টের উর্দিতে এই চতুর, আমুদে, অপ-রসায়নবিদ কি নিজস্ব অনুমান মিলিয়ে এই বস্তু বানিয়েছে তা বোঝা খুব কঠিন। প্রথম চুমুক দেওয়া মাত্রই ওই মিশ্রিত তরল বস্তু যেন আমাদের জিবে হুল ফুটে গেল। সোয়াদ থেকে আমরা অনুমান করলাম যে নির্ভেজাল খাঁটি এ্যালকহলের সঙ্গে ছেলেবেলায় সর্দি কাশি হলে আমাদের ওষুধ হিসেবে যে ঝাঁঝাল পাঁচন দেওয়া হত, সেই জাতীয় কিছু মেশান আছে।

ওই পানীয় শেষ না করেই আমরা আমাদের গেলাস নামিয়ে রাখলাম। পানশালার বসার টুলের ওপর আমাদের পাশেই বসেছিল র‍্যালফ আর তানিয়া।

"কি হে, কেমন লাগছে তোমার 'সার উইনস্টি'?" ওরা যখন মুখে স্ট্র লাগিয়ে আস্তে আস্তে সেই জলন্ত তরল পদার্থ জিবে টানছে, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এই এক রকম..."তানিয়া ধরা ছোঁয়া দিল না তার জবাবে।

"একেবারে বদ, আর আরও বলবার কথা হল, মালটা নতুন কিছু নয়।" বলে উঠল র‍্যালফ। সুতরাং আমি বুঝে উঠতে পারলাম না একথা বলবার সময় কোন সার উইনস্টির কথা র‍্যালফের মনে ছিল: ইংলণ্ডের রক্ষণশীল রাজনৈতিক নেতা, না, তার সামনে গ্লাসে নানা উপাদান মিলিয়ে তৈরী করা ককটেল।

১২। জার্মানীর নাজী নং ২-এর এজাহার

আলাদা করে হেরমান গোয়েরিংকে নিয়ে *প্রাভদা* সম্পাদকদের কোন বিশেষ উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল না। উচিত যুক্তিসঙ্গত্ কারণেই একজন প্রতিবাদী বিচারাধীন আসামী হিসেবে তার ব্যক্তিগত চেহারার থেকে, যে রাজনৈতিক রীতি পদ্ধতি ওইসব কুরুচিকর কদর্য নৃশংসতা সৃষ্টি করে, সেই পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে যে গোয়েরিং, তার সম্পর্কেই তাদের আগ্রহ ছিল বিশেষ ও সমধিক। আমার মশারা পাঠক তাঁদের আগ্রহ, উৎসাহ হল নাজীবাদ, যা সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী মনস্তত্ত্বের চূড়ান্ত চেহারা তারই

সর্বশেষ বিবরণে। সে কারণ, সাক্ষীর পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো গোয়েরিং-এর এজাহার যা টানা বেশ কদিন ধরে অভিযোগকারী পক্ষের আইনবিদরা নিয়েই যাচ্ছিলেন, তা আমার সংবাদপত্রের ভাষা অনুযায়ী কোন "সাড়া" জাগায় নি।

যাই হোক, পাশ্চাত্যের সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে গোয়েরিং-এর এজাহার ছিল সাড়া জাগানোর চূড়ামণি ব্যাপার। তার এজাহার সময় সেই তিনটে সংকেত ধ্বনি বেজে বেজে ধ্বনিত হয়ে হয়ে গোটা 'প্যালেস অফ জাসটিসে' ঘোষণা করেছিল "একটি সাড়া।" জার্মানীর নাজী নং ২-এর বর্ণনা নিয়ে সাংবাদিকরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে—আসামী সাক্ষীর হালফিল স্বাস্থ্যের হাল হকিকৎ, তার ধূসর রঙের সুয়েড সুট, সেই সুয়েড সুটের ওপর যেসব অগুণতি সম্মানসূচক পদক সে পেয়েছিল, আর সেইসব পদক যা সে একদা কেবল বুকের ওপরই নয়, অন্যান্য জায়গায় লাগিয়েও বয়ে বেড়াত, আজ তার মানানসই পোশাকের ওপর একদা ঝুলন্ত সেই নানান পদকের আবছা ছোপ বা চিহ্ন—এইসব কত কথা আর কি। বারবার কেবলই তাদের পাঠকের কাছে নাজী নং ২-এর বড়ই ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা জানাত তারা, পাঠককে সেই সঙ্গে নিয়মিত অবহিত রাখত গোয়েরিং-এর আহার, নিদ্রা এইসব বিষয়েও। সেই সাক্ষীর বিস্ময়কর স্মৃতি-শক্তি এই মওকায় নিশ্চয়ই তাকে বেশ দুপয়সা পাইয়ে দিলে। ডাঃ গিলবার্ট আদালত কক্ষে আসতেন কদাচিৎ। এলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই তিনি হাওয়া হয়ে যেতেন। বোধ হয় তাঁর এইরকম কোন ভয় ছিল যে নাছোড়বান্দা সাংবাদিকরা যাদের বিশেষ কায়দা আর দক্ষতাই হল একজনের কাছ থেকে যা চাই, তা আদায় করে ছাড়া—তাঁরা হয়তো তাঁর ভবিষ্যৎ গ্রন্থের রৈ রৈ আর মার মার করা সেরা অংশগুলোই টুক করে তুলে নেবে। টেলিগ্রাফ লাইন ব্যবহার করার জন্যে ঝামেলা আর তর্কাতর্কি সর্বক্ষণ লেগেই থাকতো। সত্যি কথা কি, শেষকালে সমস্যা পর্যবসিত হত ঘুসোঘুসিতে।

গোয়েরিং-এর এজাহার নেবার প্রথম দিনে, যখন দুপাশে দুই আমেরিকান সৈন্যের পাহারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে সন্ত মাইক্রোফোনের সামনে এসেছে, সেদিনই অন্তবর্তীকালীন বিরামের সময় নীচের দৃশ্যটি ঘটল। বেশ কিছু সাংবাদিক তাদের একজন মহিলাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো

আমার কাছে। পরে জানা গেল যে এই মহিলা রাশিয়ার জনৈক রাজকুমারী, লোপুখিনা। তাঁকে প্যারিস থেকে আনা হয়েছে দোভাষীর কাজ করার জন্যে।

"এই ভদ্রলোকেরা সকলে আপনাকে এই কথাই বলতে চাইছেন যে আপনি এসেছেন এক মানবিক গুণের দেশ থেকে, আপনাদের দেশে মানুষে মানুষে সমতা আর ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করে", বেচারা গোছের সেই ছোট খাটো অভিজাত মহিলা তাড়াতাড়ি খানিকটা ভীত গলায় এই কথাগুলো বললেন। "যেহেতু বিনয় নম্র আপনার এইসব পাশ্চাত্য দেশীয় সহকর্মীরা গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন, তারা আপনার সাহায্য চাইছে···।"

আমার মুখের ওপর অসময়ে উটকো হাসি যেটা নেমে আসছিল, সেটা মুছে দেবার চেষ্টা করে আমি বললাম, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সানন্দে রাজী। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক মানবিক গুণ সমন্বিত দেশের একজন সাংবাদিক কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারে? আপনাদের সমস্যাটা কি?"

সমস্যা তো দেখা দিয়েছে সেদিনই। পাশ্চাত্যের সমস্ত সংবাদপত্র যখন ঘোষণা করে দিয়েছে যে গোয়েরিং-এর এজাহার শুরু হতে চলেছে, তখনই এল এক চোখা সাংবাদিক। সে নিউ ইয়র্কের এক বড় সংবাদপত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রতিনিধি। ওর নাকটা চকোলেটের মত, বলা যেতে পারে চকোলেট নাকা। র‍্যালা খুব। ও এখানে এসেছে একজন সচিব ও একজন স্টেনোগ্রাফার নিয়ে। গ্র্যাণ্ড হোটেলে সবচেয়ে মহার্ঘ কামরাগুলোতে ও থাকে। সংক্ষেপে, এজাহার আরম্ভ হবার ঠিক ক'মিনিট আগে, ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে সংযোগকারী এখানের দুটি টেলিগ্রাফ কোম্পানীর সবকটি লাইন ও নিজের জন্য আগাম বায়না নিয়েছে।

এই দুটো কোম্পানীর সব লাইন দিয়ে তার একান্ত সচিব পাঠাতে আরম্ভ করেছে···বাইবেল। পাশ্চাত্যে বোধ হয় এরকম নিয়ম আছে যে একটা লিখিত বয়ান যখন পাঠানো হচ্ছে তখন মাঝপথে কোনভাবেই তাতে হস্তক্ষেপ বা যেকোনভাবে থামানো চলবে না, কেবলমাত্র এই যে শব্দ সংখ্যা অনুযায়ী প্রেরককে বেশী পয়সা দিতে হবে। এরকম একটা নিয়ম মনে তো হয় বেশ গ্রহণীয়। আর এই নিয়মের সুযোগ নিয়ে আর অঢেল মুদ্রার

জোরে ওই নিজস্ব প্রতিনিধি দখল করে নিয়েছে দুটো কোম্পানীর লাইন, আর সেই বাইবেলের নানা অনুচ্ছেদের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিচ্ছে খবরের ছেঁড়া টুকরো যা সম্ভবতঃ খুব উত্তেজক নয়, তথাপি বোধ হয় আমেরিকার অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত—যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, "ন্যুরেমবার্গ-এ এখন বসন্ত-কাল। 'প্যালেস ও জাসটিস-'এর বাইরে চেরী গাছগুলি ফুলে ফুলেফুলময়। কিন্তু জার্মানীর নাজী নম্বর ২, তার জেলখানার কুটরিতে যেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলা যায়। আদালতের তলবের জন্যে সে অপেক্ষা করছে।"

বাইবেল থেকে আর একটি সংবাদের বয়ান শুরু হয়েছে এই রকম বাক্য দিয়ে: "গোয়েরিং, একদিন যার জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক রন্ধন প্রণালীর একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার ও বিরল শ্রেণীর সূক্ষ্ম সুরসিক হিসেবে, যার খাবার টেবিল ছিল বার্লিনের অন্যতম আড়ম্বরপূর্ণ সেই গোয়েরিং এখন অপেক্ষা করছে তার পরীক্ষার, খাচ্ছে, সৈনিকদের যে টিনের কৌটোয় এককালীন খাবার দেওয়া হয় সেই টিনের ঢাকনা থেকে, তুলে তুলে খাচ্ছে যবের গুঁড়ি গোলা পায়েস।" তারপর বাইবেল থেকে আর একটি অনুচ্ছেদ, তারপর: "আপনাদের নিজস্ব প্রতিনিধি গতকাল গোয়েরিং-এর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছে। তাঁর নাম এম্মি। একজন গায়িকা। নানা সংগ্রহে সমৃদ্ধ বার্লিনের কণ্ঠ সঙ্গীতে গায়িকা হিসেবে উনি একদা বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে যৌবনবতী, এখনো সতেজ ও সুন্দরী, এই একচল্লিশ বছরের মহিলা আপনাদের নিজস্ব প্রতিনিধিকে কথা সূত্রে জানান যে তিনি বেতারে তাঁর হতভাগ্য স্বামীর গলা শুনেছেন ও তাঁর স্বামীর কণ্ঠস্বর এত দুর্বল আর ক্ষীণ শোনাচ্ছিল যে তিনি ভিতরে ভিতরে বড়ই ঘা খেয়েছেন।"

সংক্ষেপে, দুটি কোম্পানীর সবগুলি টেলিগ্রাফ লাইনই, গোয়েরিংয়ের এজাহার যথার্থই শুরু হওয়া পর্যন্ত স্রোতের মত বহমান এইসব গাদা গুচ্ছের অর্থহীন সব বাজে কথা পাঠিয়েই চলেছে আর ছোটখাটো চুনোপুঁটি যে তাদের তার পাঠাবে এমন কোন ফাঁক এই নিউ ইয়র্কের হাঙর রাখেনি। আমেরিকান অন্যান্য সম্পাদক ইতিমধ্যেই এখানে কর্মরত তাদের নিজ নিজ সাংবাদিক প্রতিনিধিদের ওপর বিষম চটে, রীতিমত রুষ্ট ক্রুদ্ধ তারবার্তা পাঠিয়েছে: "তুমি উধাও হয়ে কোথায় ঘাপটি মেরেছিলে? উচ্ছন্নে যাও তুমি। এই নীরবতা কেন? গোয়েরিং সম্পর্কে সব কিছু এখুনি তার করে

জানাও।" এই হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য মনে হয় আমার কাছে আগার আগে, গোড়ার দিকে টেলিগ্রাম পাঠানোর অফিসে দেখা গিয়েছিল।

আমি সবই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আমাদের এই সহকর্মীদের সর্বান্তকরণে সমবেদনা জানানো ছাড়া, আমি এ°দের জন্যে কি করতে পারি?

সেই খর্বকায়া রাজকুমারী, অজস্র হলদে ফোঁটা চিহ্নিত তাঁর গোল মুখ আর খাড়া নাক তুলে, কল্‌কল্‌ করে বক বক করেই চললেন, "এই ভদ্র লোকেরা বলছেন যে আপনার দেশের আপনার সাংবাদিক সহকর্মীরা এবং আপনাকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে, এ°দের সাহায্য করতেই হবে। ওঁরা গভীর সঙ্কটে, ভয়ঙ্কর গাড্ডায় পড়েছেন। এমনকি ওঁরা ওঁদের চাকরীও হারাতে পারেন।"

"কিন্তু কিভাবে? আমি ওঁদের জন্যে কি করতে পারি?"

"মস্কো পর্যন্ত আপনাদের নিজস্ব টেলিগ্রাফ লাইন আছে। ঘুর পথে মস্কো হয়ে আমেরিকায় খবর পাঠানোর জন্যে এঁরা আপনাদের মস্কোর লাইন ব্যবহার করতে চায়।"

এই সমস্ত চমৎকার লোকেদের সাহায্য করার আমার ইচ্ছাও ঐকান্তিক। আমি এঁদের সমস্যা সঙ্কটও বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কি করতে পারি আমি? আমাদের লাইন তো সামরিক লাইন। গেছে কেবল বার্লিন থেকে মস্কো পর্যন্ত। অন্য প্রান্তে এই লাইন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে কোথাও বাড়ানো নেই। সেখানেই এই লাইনের শেষ। যতটা ভাল করে পারি আমি ওঁদের সব খুলে বুঝিয়ে বললাম আর সেই রাজকুমারী আমার উত্তর অনুবাদ করে দিলেন।

"কিন্তু তবু, আপনি কি আমাদের কোন পরামর্শ দিতে পারেন?"

"শপথ করে বলতে পারি, আমি জানি না কি বলব। যেটা একমাত্র করণীয় তা হল প্রেস ক্যাম্পের কোন কোণায় ওকে নিয়ে ঘুসি মেরে ওর নাক ফাটিয়ে দেওয়া।"

এক মুহূর্তের জন্যে সামনে লাফিয়ে বলা যায়, যে এই রকম একটা হঠকারী পরামর্শ দেওয়ার জন্যে আমার দুঃখিত হবার কারণ ঘটেছিল। শুধু এই মন্তব্যটুকু করলেই আমার চলবে যে সেই সময় অন্যান্য সাংবাদিক যে রোগে ভুগছিল, সোভিয়েত সাংবাদিকরা সেই দলে ছিল না।

গোয়েরিং-এর এজাহার বলবার সময় আমি মোটে দুচারটি নোট নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন জার্মানীর নাজী নং ২, "জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী দলের প্রিয়", এবং "ফুয়েরার-এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও সঙ্গী", যখন শেষকালে তার-মুখের চেহারা আরও পরিষ্কার করে দেখাতে লাগল, তখন মনে হল যে "হিটলারের পরম বিশ্বস্ত, হিটলারের পরিবারভুক্ত এই বীর ব্রতীর" ব্যক্তিত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করা কিছুটা করার মতো কাজের কাজ।

গোয়েরিংকে যখন জেরা করা হচ্ছিল, তখন জিওরগি দিমিত্রভ-এর সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হয় তা সর্বদাই আমার মনে ছিল আর আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে কি ধরনের মানুষ ছিল এই হেরমান গোয়েরিং। কি কারণে বা কিভাবে তার মতো একজন লোক জার্মানীর মত এক বিশাল দেশ যার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুবিশাল, সেই রকম দেশের অন্যতম ক্ষমতাবান নেতা হয়ে উঠতে পারে? দিমিত্রভ-এর দৃষ্টিভঙ্গীর যে সত্য, অর্থাৎ আসামীর কাঠগোড়ায় বসা ওই সব লোকের চিরাচরিত নিরিখ বা মানেব দ্বারা সঠিক বোঝা যাবে না, এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে এজাহার চলাকালীন আমি কেবলই আবও একমত হলাম। ব্যাঙ্গ কৌতুক আঁকিয়েরা এখন যেমন চিত্রিত করে, গোয়েরিং সেই রকম স্থূল আব বুদ্ধিহীন শূয়োর ছিল না। সে তার নিজস্ব ধরনে নিঃসন্দেহে একজন গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য লোক ছিল, কিন্তু সবই বাঁধা ছিল কেবল সেই ভয়ঙ্কব, আতঙ্ককর জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যে।

গোয়েরিং ছিল এই পদ্ধতির একজন প্রতিষ্ঠাতা, আবার যুগপৎ, সে স্বয়ং ছিল এই পদ্ধতির একটি মার্কামারা উৎপাদন। রক্তে মাংসে সে ছিল জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের অংশ। আর তার অপরাধী স্বভাব যা বহুভাবে নিজেকে প্রকট করেছে, তা হল জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র পদ্ধতির ভিতরে নিহিত অপরাধকামী মানসিকতার প্রকাশ।

"প্রথম মহাযুদ্ধ যখন লাগে তখন পর্যন্ত ও সেই যুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত আপনার জীবনের নানা ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই আদালতকে দিন", গোয়েরিংকে একথা বললেন প্রতিবাদী উকিল ডঃ স্ট্যাহমার।

সামরিক পশ্চাৎপট থেকে একজন যুবক প্রুসিয়ানের জীবনীতে যেমন দেখা যায় তেমনিই হল ওর জীবনী। গোড়ায় সেনাবাহিনীর ক্যাডেট। পদাতিকবাহিনীর লেফটেন্যান্টের চাকরী। বৈজ্ঞানিকের প্রশিক্ষণ লাভ।

বৈমানিকের চাকরী—বোমা ফেলার অভিযানে অংশগ্রহণ। লড়াই-এ আহত। বিমান বাহিনীতে প্রত্যাবর্তন। রিক্টোফেন স্কোয়ার্ডেন কম্যাণ্ডার। গোয়েরিং, জার্মান *বারজারদের* নায়ক তার বড় সপ্রতিভ মুখ হামেশা জনপ্রিয় কাগজে ছাপা হয়। একজন দারুণ লোক, একজন সাহসী ঈগল, একজন সত্যিকার জার্মান। সে আত্মরক্ষায় অসমর্থ প্রতিরোধহীন বিভিন্ন ফরাসী নগরের ওপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নির্লজ্জ বোমাবর্ষণকারী।

যুদ্ধ অপরাধীদের তালিকায় তার নাম ওঠে। জার্মানীর পরাজয়ে যখন সে যুদ্ধ শেষ হয়, সে বিদেশে পলাতক। নিজের কাপুরুষোচিত মুখ ঢেকে সে এই বলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে যে, ওয়েইমার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সে ভিন্ন মত পোষণ করে এবং তার বিবেচনায় সেই ব্যবস্থা তার সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী নয় বলে সে জানায়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে যখন তাকে হস্তান্তর করার বিপদ ঘনিয়ে এল তখন সে প্রত্যাবর্তন করে জার্মানীতে। ভাগ্য তাকে ও হিটলারকে একসঙ্গে পাশাপাশি করে দেয়। ঝাঁকের পাখিরা একইসঙ্গে ঘোরাফেরা করে। ল্যান্স করপোরাল অ্যাডলফ শিকলগ্রুবার, যুদ্ধের সময় যার মুখে চুনকালি পড়েছিল, তার প্রয়োজন ছিল গোয়েরিংকে। প্রয়োজন ছিল প্রুশীয় *বারজারদের* চোখের মনি, এমন একজনকে। এসবই তার প্রয়োজন ছিল তার নতুন পত্তন করা দল যাতে সদস্য ছিল—ইহুদী বিদ্বেষী ও নির্যাতনেচ্ছুরা, দুর্বৃত্ত ঠগ আর খুনেরা, সমাজবিরোধী সব নানা উপাদান—এই দলের সম্পর্কে লোকজনকে সশ্রদ্ধ করে, দলের ভাবমূর্তি তৈরী করার জন্য গোয়েরিংকে তার প্রয়োজন ছিল। গোয়েরিং-এর প্রয়োজন ছিল হিটলারকে, যাতে আবার বিখ্যাত হতে পারে। দুজন অংশীদারই জানত যে দলের নামে প্রচারিত "সমাজতন্ত্র" শব্দটা স্রেফ ভণ্ডামি, আর পার্টির যা কিছু ডাক বা আহ্বান তা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে করা হত না, করা হত জার্মান ভাষায় যাদের *মিটটেলসটেমুম* বলে, অর্থাৎ *বারজারদের* মধ্যে সবচেয়ে উন্মত্ত যারা তাদের কাছে আর সমাজ বিরোধীদের কাছে। হিটলারের পূর্বানুমান শক্তি ছিল অসাধারণ এবং সে তৎক্ষণাৎ এই প্রাক্তন অফিসারের করণীয় কাজ খুঁজেছিল। ঝটিকা বাহিনী বলে পরিচিত দলের এই সাংগঠনিক শাখার দায়ভার দেওয়া হল গোয়েরিংকে। কিন্তু গোয়েরিং-এর জন্যে হিটলারের মনে আরও গুরুতর

দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করা ছিল : রাজকীয় বিমান বাহিনীর এই প্রাক্তন তাশের টেক্কাকে সে ব্যবহার করতে চাইল লগ্নী অর্থাৎ ব্যাঙ্ক, শিল্পপতি ইত্যাদি পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও আস্থা অর্জনের কাজে। পুঁজিপতিরা তখনও এই নতুন দলের দিকে ঘোর সংশয় নিয়ে তাকিয়েছিল—হাজার হোক, দলের নামে "সমাজতন্ত্র" শব্দটা যুক্ত তো। আর তাছাড়া এই দলের সভ্যরা অধিকাংশই নক্কারজনক, জনসাধারণের আবর্জনা তুল্য অংশ। গোয়েরিং, হিটলার ও জার্মানীর পুঁজিপতি বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ় যোগসূত্রে পরিণত হল।

'মিউনিখ বীয়র-হল' ব্যর্থ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর,—যাতে চীৎকার করে ঝগড়া করার সময় গোয়েরিং আহত হয়—সে আবার বিদেশে পালিয়ে যায়। সে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করে মাত্র ১৯২৭ সালে। ফিরে আসার পর হিটলার তাকে আবার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে সব-চূড়ামণি তুল্য ধনী শিল্পপতি ও অর্থলগ্নী অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের চাঁইদের সঙ্গে যোগাযোগ করায়। ইতিমধ্যে নাজী ঝটিকবাহিনী ও গোপন রাজনৈতিক পুলিশ বিভাগ আরনস্ট রোহমের নেতৃত্বাধীনে চলে গেছে।

গোয়েরিং আবার সেই বেদীর আকারের স্তম্ভমূলের ওপর ফিরে এল। তার জীবনী থেকে এটা পরিষ্কার যে নাজী নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পরিমণ্ডল কেমন অপরাধীদের একদঙ্গল। জার্মান শিল্পপতিদের মধ্যে অতিকায় চুম্বক প্রতীম—ক্রুপস, থিইসেনস ভগলারস প্রমুখ—এদের লালন পালন করত। এদেরই সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে হিটলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি আরম্ভ করল। গোয়েরিং তার এজাহারে জানায় কিভাবে এই ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। আমেরিকান অভিযোগকারীদের পক্ষে প্রধান গোয়েরি-এর কাছে জানতে চায় যে, একেবারে শুরুর থেকেই ওয়েইমার সাধারণতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত ও উৎখাত করার কোন অভিপ্রায় তার ছিল কিনা। বিশ্ব নিন্দুকের বিষণ্ণতা নিয়ে গোয়েরিং উত্তর দেয়, "আমার নিজের কথা বলতে পারি যে এটাই ছিল আমার দৃঢ় লক্ষ্য।"

জ্যাকসন : "এবং এখন, ক্ষমতা হাতে পেয়েই আপনারা জার্মানীতে সংসদীয় ধাঁচে সরকার তুলে দিলেন।"

গোয়েরিং : "আমরা দেখলাম, যে ওটার আর কোন প্রয়োজন নেই।"

এই যুদ্ধ-অপরাধীদের কৈফিয়ৎ নাজী নীতির একেবারে সারাংশ, যে নীতি পরিচালিত হত জার্মান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হুকুমে। আইনে কি যায় আসে ? জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছায় কি এল গেল ? "আমরা দেখলাম যে ওটার আর কোন প্রয়োজন নেই"—ব্যাস, এই হল মোদ্দা কথা। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে আমেরিকান সংবাদপত্র, মোটামুটি ভাবে পাশ্চাত্যের সব সংবাদপত্রই গোয়েরিংয়ের এজাহারের এই অংশ সম্পূর্ণই অবহেলা করে গেল। আমরা যখন পশ্চিমের সব খবরের কাগজ হাতে পেলাম, তখন তাই দেখলাম। কিন্তু এই সব কাগজ গোয়েরিংকে কেমন দেখাচ্ছিল তা ছেপেছে। ছেপেছে ন্যুরেমবার্গ-এ এসে বেচারা এমনি গোয়েরিং শহরের উপকণ্ঠে কোথায় বাসাবাড়ি নিয়েছে, আর সে মনে মনে কতই না কষ্ট পাচ্ছে তার প্রিয়তম হেরম্যান যার অভ্যাস ছিল সরেস বাছাই খাবার, আহারের পর অনেক দূর পর্যন্ত বেড়ানো, মাঝে মাঝে শিকার অভিযানে যাওয়া, আর এই সব সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে কতই না কষ্ট পাচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপার অর্থাৎ কি করে নাজী দল একচেটিয়া শিল্পপতিদের ইচ্ছানুসারে দুর্বল ওয়েইমার সাধারণতন্ত্র উচ্ছেদ করল, সে কথা লিখেছ একটা সাধারণ কথার কথা হিসাবে।

আমি স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষ আগ্রহী ছিলাম ১৯৩৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভোরের দিকে যে সব ঘটনা ঘটে, গোয়েরিংয়ের এজাহারে সেই বর্ণনা শোনার জন্য। ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ যে রাত্রে রেইখস্ট্যাগ, অর্থাৎ জার্মানীর পূর্বতন আইনসভা ভবন, সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে। "রেইখ-স্ট্যাগে আগুন—গোয়েরিং এর উল্লেখযোগ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।" এই আগুন জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার একটা নিছক ছুতো। এই আগুন লাগার কিছুদিন পরেই জার্মানীতে কমিউনিস্ট পার্টি'র নিষিদ্ধকরণ আইন প্রযুক্ত হয়। আমি আগেই বলেছি যে আমি এই ব্যাপারটায় বিশেষভাবে আগ্রহী। ন্যুরেমবার্গ-এ আসার আগে আমি এই বিয়োগান্ত কাহিনীর অন্য আর এক প্রধান নায়ক জিওর্গি-দিমিত্রভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি। সন্ধ্যায় আমাদের আইনের বই-এর পাঠাগার থেকে লাইপজিগ বিচারের প্রতিলিপি নিয়ে পাতা উল্টে দেখলাম। এই গোটা বিচারটাই, গোড়ার থেকে শেষ পর্যন্ত, সাজানো। উদ্দেশ্য নাজী

দলের প্রধানের অপসারণ ও সবচেয়ে শক্তিশালী অদমিত নাজী শত্রু অর্থাৎ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনমতকে সপক্ষে আনা। আর উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রকে, "কমিউনিস্ট, বর্বরতার বিরুদ্ধে, পাশ্চাত্য সভ্যতা আত্মরক্ষার্থে গড়া নিরাপত্তা প্রাচীর হিসাবে প্রতিপন্ন করা।" লাইপজিগ বিচার চলাকালীন, জিওর্গি-দিমিত্রভ, যিনি ছিলেন একজন প্রতিবাদী আসামী তিনি ব্যবহার করে ছিলেন একজন আইনবিদ অভিযোগকারীর মতো, অভিযুক্তের মতো নয়। নিজেকে সমর্থন বা আত্মরক্ষার চেষ্টার চেয়েও তাঁর উদ্যম ছিল, তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ-কারীদের মুখোস খুলে দেওয়া। তাঁর বিচারকদের আহ্বান করে দিমিত্রভ সগর্বে বলেছিলেন, "আমি ঋণী নই, এখানে আমি পাওনাদার।" বিচারকদের প্রতি তাঁর আরও সাহসী উক্তি, "আপনারা রাজনৈতিক বিচার চেয়েছিলেন এবং আপনারা রাজনৈতিক বিচারই পাবেন।"

গোয়েরিং এখন এখানে। এই উস্কানিমূলক রেইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডে প্ররোচক ও সম্পাদক যে লাইপজিগে দিমিত্রভের দিকে তলোয়ার খুলে ধরেছিল, সে নিজেই আজ, এখানে, আসামীর কাঠগড়ায়। না, সেদিনের গোয়েরিং আজকের মতো পৃথুল ও বৃদ্ধ শূয়োর ছিল না সে ছিল সত্যিই একটি প্রতিভা যা খাঁটি নাজী পোশাকে ও ভঙ্গীতে সেদিন প্রকাশিত। গোয়েরিং ছিল ধূর্ত নীতিবিরহিত ইতর, একজন দক্ষ ফন্দিবাজ ষড়যন্ত্রকারী সব ভূমিকাতেই সে একাই অভিনয় করতে পারত রেইখস্ট্যাগে যখন আগুনের শিখা জ্বলছিল (আগুন দেওয়া হয় তারই আদেশে), সে (নিরোর মতো) এবং হিটলার একটা ব্যালকোনিতে দাঁড়িয়ে অগ্নিকাণ্ডটি অবলোকন করছিল। এর আগে দেওযা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে, আদালত নিশ্চিত ভাবে অবগত আছে যে, অনেক আগেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের ও পার্টি'র বিশিষ্ট সভ্য যাদের আগুন লাগামাত্র গ্রেফতার করা হবে, অনেক আগেই হিটলার ও গোয়েরিং দুজনে মিলে সে তালিকা তৈরী করে রেখেছিল।

"এটা কি সত্য ?" প্রসিকিউটার জ্যাকসন জিজ্ঞাসা করলেন।

"রেইখস্ট্যাগে আগুন লাগানোর আমার দিক থেকে কোন কারণ বা কোন উদ্দেশ্য ছিল না", কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় উত্তর দিল গোয়েরিং। আইনসভা ভবন পুড়ে যাওয়ার জন্য "শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার কোন আফশোস হয়নি..."

গোয়েরিং ছিল চিন্তিত ও বিচলিত। ঝটিকাবাহিনীর তিনজন, যারা গোয়েরিং-এর হুকুম অনুসারে রেইখস্ট্যাগে আগুন দিয়েছিল সেই তিন জনের নাম আদালত জানে। বিশিষ্ট গেসটাপো প্রধান হ্যানস জিসেভিয়াস মতলবটা বিস্তারিতভাবে পেশ করে। দশজন নির্ভরযোগ্য ঝটিকাবাহিনীর সভাকে মতলব অনুযায়ী কাজ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে সব কিছুর খুঁটিনাটি গোয়েরিংকে সব সময় জানানো হয় এবং গোয়েরিং-এর হুকুম অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে অগ্নিকাণ্ডের জন্য কমিউনিস্টদের দোষ দেওয়া হবে ও ধরপাকড় শুরু হবে…সেদিন রাত্রে ইচ্ছে করেই রেইখস্ট্যাগ চত্বরে অগ্নি বিষয়ক সতর্কতা বা সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি…প্রমাণ স্তূপাকৃতি হয়ে উঠল, তবু তার থেকে তখনও পিছলে বার হয়ে যাবার চেষ্টায় গোয়েরিং বলল, "যদি সত্যি সত্যিই *এস. এ* রেইখস্ট্যাগে আগুন লাগিয়ে থাকে, তাহলে আমি যে সে সম্পর্কে জানবই এরকম মনে করা ঠিক হবে না।"

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে আগুন যখন জ্বলছে, তখন সে বিষয়ে কোনরকম অনুসন্ধানের এমন কি আদৌ কোন চেষ্টা পর্যন্ত না করে কেন সে তখনই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আগুন লাগানোর অভিযোগ আনল, আর শেষ পর্যন্ত গোয়েরিংকে স্বীকার করতে হল যে ফুয়েরার সেই রকমই চেয়েছিল।

এইভাবে, প্ররোচনামূলক স্বকৃত কাজের মধ্যে দিয়ে হিটলার এবং গোয়েরিং কেবল তাদের বিরোধী কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাট-দেরই নিশ্চিহ্ন করেনি, তার নিজের সঙ্গীদেরও শেষ করেছিল। হেনরিখ হফম্যানের ঘরে আমি যে গিয়েছিলাম, সে প্রসঙ্গে বলার সময় আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে গোয়েরিং কিভাবে একজন নৈশ ক্লাবের পেশাদার বিনোদিনীর সাহায্যে বার্লিনের অন্যতম কর্তৃত্ব স্থানীয় লোক জেনারেল ব্লমবারগকে যুদ্ধ মন্ত্রীর পদ থেকে খারিজ হয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়। এই একইভাবে হিটলারের অনুচরবৃন্দের মধ্যে, তার নিকটতম প্রতিযোগী, ঝটিকাবাহিনীর প্রধান, যে ইতিমধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল সেই আরনস্ট রোহমকে সরিয়ে দেয়। একদিন যখন মজ্জায় মজ্জায় সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হিটলার খুবই খারাপ মেজাজে ছিল, সেই সঠিক মুহূর্তে গোয়েরিং তাকে সিলিসিয়ার জনৈক ঝটিকাবাহিনীর নেতার খবর দেয়, যে সম্প্রতি হিটলারের প্রতিকৃতির গায়ে গুলি মারে। তার বিরুদ্ধে যে একটা চক্রান্ত হচ্ছে নিশ্চিতভাবে একথা ধরে নেওয়ার জন্য হিটলারের পক্ষে

এইটুকুই ছিল যথেষ্ট। গোয়েরিংকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তথাকথিত "লম্বা চাকুর রাত্রি" খ্যাত অভিযান পরিচালনা করার জন্য। যে অভিযানের ফলে ষাট লক্ষ সভ্য নিয়ে গড়া ঝটিকাবাহিনীর তাবৎ সমস্ত নেতাকে এক সঙ্গে নিকেশ করা হয়। হিটলার ছিল মিউনিখ-এ। সেখানেই সে রোহমকে বন্দী ও হত্যা করার হুকুম দেয়। একই ধরনের নানা কাজে গোয়েরিং ব্যস্ত ছিল বার্লিনে। তার বিশেষ লক্ষ্য ছিল এটা দেখা যে ঝটিকাবাহিনীর যে সব লোক রেইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত, তাদের সকলের গ্রেপ্তার করা। গোয়েরিং-এর জীবন-কাহিনী এইরকম নানা প্ররোচনামূলক কাজে ঠাসা।

গোয়েরিং-এর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে অন্যান্য দেশের উপর আগ্রাসী ও অভিঘাতমূলক কাজকর্ম চালানো এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়; "বিশ্বস্ত হেরম্যান" এই সমস্ত কাজ করার হুকুম দিত সম্পূর্ণ নির্লজ্জের মত। ভিয়েনার সঙ্গে টেলিফোনে সে যে কথাবার্তা বলেছিল, প্রতিলিপি থেকে তা তুলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে পেশ করা হয়। তৎকালীন অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি ছিলেন অনমনীয় ও জেদী: তিনি আরথার সেইস্‌স-ইনকোয়ারটকে (সে এখন যুদ্ধ-অপরাধীদের মধ্যে ন্যুরেমবার্গে উপস্থিত) তৎকালীন একজন বিশিষ্ট নাজী নেতাকে বার্লিনের এত্তেলা অনুসারে ভাইসচানসিলার-এর পদে নিয়োগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। গোয়েরিংকে টেলিফোনে এই ব্যাপারটাই জানানো হয়েছিল।

গোয়েরিং ঃ "বেশ তো, তাতে কি হয়েছে? তাহলে সেইস্‌স-ইনকোয়ার্ট-এর উচিত প্রেসিডেন্টকে খতম করে দেওয়া।"

আর তখনই সে সরাসরি ফোনে জানিয়ে দিল যে নতুন অস্ট্রীয়া সরকারের গঠন কেমন হবে। সে আরও জানালো একটা ঘোষণার কথা যাতে জানানো হবে যে, যেকোন অস্ট্রীয় নাগরিক যে এই নতুন সরকারকে সমর্থন করবে না তাকে কমিউনিস্ট ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে জার্মান জঙ্গী আদালতের হাতে তুলে দেওয়া হোক। সেদিনই সন্ধ্যায় ভিয়েনায় অবস্থিত নাজীদের প্রচার কার্যের ও অন্যান্য গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রেরিত গুপ্তচর গোয়েরিংকে ফোনে জানাল, যে যেমন সরকার তাদের দরকার, তা গঠন করা হয়ে গেছে।

গোয়েরিং (ফোনে কথার মধ্যপথে বাধা দিয়ে): হাঁ, হাঁ, সরকার। এমন তোমরাই সরকার। কি বলছি মন দিয়ে শোন, কেপলার তুমি একটা পেন্সিল নাও আর সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে সেইস্‌স-ইনকোয়ার্ট, যে বিবৃতিটা দেবে সেটা লিখে নাও। তোমার কাছে পেন্সিল আছে, নাকি? লেখো: 'শ্চাসনিগ সরকারের বরখাস্তের পর যে মধ্যবর্তী অস্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সরকার অস্ট্রিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে দায়বদ্ধ এবং এই কাজে সমর্থন করার জন্য তারা জার্মান সরকারের সমর্থন চেয়ে জরুরী অনুরোধ জানাচ্ছে···এই উদ্দেশ্যে এই সরকার জার্মান সরকারকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জার্মান সৈন্য পাঠাতে বলছে।' কি বলছি বুঝতে পেরেছো? এখন এইমত কাজ করো।

চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া এবং গ্রীস এই সমস্ত দেশের অগণিত মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করার সময় গোয়েরিং এই একই উধ্যত দুর্বিনীত কায়দায় কাজ করেছে। মোটের উপর নাজী দলের কাজ করার এই হল বিশিষ্ট পদ্ধতি। আর সেই নাজী দলের প্রতিনিধি, "বিশ্বস্ত হেরম্যান", যাকে সমগ্র ইউরোপ কবলে আনার চূড়ান্ত অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য নানা অভিযান চালানোর ব্যাপারে হিটলার মনে করতেন একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি। আদালতে এসব কথা অস্বীকার করার জন্য গোয়েরিং বিশেষ কোন চেষ্টা করে নি।

যাই হোক যখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল তখনই সে বদলে ফেলল তার গলার স্বর। গোয়েরিং যে কেবল, কৌশলগতভাবে আত্মরক্ষার সূত্র ধরতে চাইল তাই নয়, সে দেখাবার চেষ্টা করল যে নিবারণমূলক ও প্রতিরক্ষার কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল। সে এমনকি একথাও বলল যে লাল ফৌজের আক্রমণ প্রতিহত করাই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। যদিও আদালত সমক্ষে এর আগেই বারবারসা পরিকল্পনার কথা সবাই জেনে গেছে, যদিও সেইসূত্রে অন্তত: বারোজন লোকের সাক্ষ্য প্রমাণাদি নথিভুক্ত, গোয়েরিং কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই পরিকল্পনা রচনা করার ব্যাপারে তার নিজের অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করল। গোয়েরিং ও তার পক্ষের আইনজীবীর মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

ডঃ স্ট্যাহমার: "সেই সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল?"

গোয়েরিং: "প্রথমে একথা শুনে আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম ও আমার মনোভাব জানাবার আগে ফুয়েরারের কাছে কয়েকঘন্টা সময় চেয়ে নিয়েছিলাম...সেদিন সন্ধ্যায়...আমি ফুয়েরারকে, সেই মুহূর্তে বা অদূর কোন সময়েও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার কথা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি।"

পাল্টা জেরা করার সময় সোভিয়েত প্রসিকিউটার পেশ করলেন তাঁর সাক্ষ্য প্রমাণ, আর শান্তিপ্রেমিক হিসেবে গোয়েরিং-এর ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে গেল।

ক্রমশ এই তথ্যও আলোকিত হল যে জার্মানীর নাজী নম্বর দুই যে কিনা তার নিজের মতো ইউরোপের মানচিত্রের রেখাগুলি বদলে, তাবৎ জনসংখ্যার ভাগ্য নির্ধারণ করতে চেয়েছিল, সে নিজেও ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর শয়তান ও চোর। ফ্যাসিবাদী জার্মানীর সবচেয়ে ধনী মানুষে পরিণত হয়েছিল সে। তার প্রাসাদ, কারিনহল, অধিকৃত সব দেশ থেকে পাচার করা মহা মূল্যবান শিল্প সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল। হের্‌ম্যান গোয়েরিং কোম্পানী নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা যা অধিকৃত ডনবস এবং ইউক্রেন অঞ্চলের বাণিজ্য শাখা খুলেছিল, সেই কোম্পানী পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন একক একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়েছিল।

উপরন্তু, উৎকোচ নেওয়ার ব্যাপারেও গোয়েরিং-এর অরুচি ছিল না। সিগারেট ব্যবসায়ের নৃপতি ফিলিপ—রীমস্‌টস্মাকে গোয়েরিং আয়কর ফাঁকি দেবার চেষ্টা করার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত করে। সেই ফিলিপ, গোয়েরিংকে একটি সত্তর লক্ষ মারকের "ছোট্ট উপহার" দেয়, মামলাটি পরিত্যক্ত হয়। এও প্রমাণিত হয় যে, নাজী নম্বর দুই অনেক ইহুদী ধনকুবের ও শিল্পপতিকে বিদেশে বিমানে করে পালাতে সাহায্য করে, কিন্তু একটি শর্তে: তাদের সমস্ত ধনসম্পদ একজনের কাছে ছেড়ে যেতে হবে, সে গোয়েরিং।

এক একটি অধিকৃত দেশের সব কিছু বাজেয়াপ্ত হয় আর সেই সঙ্গে কারিনহল-এ গোয়েরিংয়ের সব শিল্প সংগ্রহ বাড়তে থাকে। গোয়েরিং-এর

অভিপ্রায় ছিল যে সে একটা শিল্প সংগ্রহশালা গড়ে তুলবে যেটি মর্যাদায় পুভার অথবা যেকোন সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম থেকে কিছু কম হবে না। আর এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান সব ব্যক্তিগত সংগ্রহের থেকে তৈলচিত্র ইত্যাদি এনে জমানোর কাজও সে শুরু করেছিল মহা উৎসাহে। জার্মান অধিকৃত প্যারিস শহর থেকে কর্মরত একজন জার্মানের পাঠানো তারবার্তা আদালতে পেশ করা হয়—"যে বিশেষ ট্রেন রেইক মার্শাল হেরমান গোয়েরিংয়ের জন্যে যাচ্ছে, তাতে পঁচিশটি দ্রুতগামী মালবাহী কামরা ভর্তি করা হয়েছে দারুণ মূল্যবান সব তৈলচিত্র, আসবাবপত্র, প্যারিসের সুবিখ্যাত গোবেলিনের তৈরী কারুকার্যময় পর্দা, সূক্ষ্মচারু শিল্পকলার নানা নিদর্শন এবং নানা অলংকার আছে।" রোজেনবার্গকে লেখা এক চিঠিতে গোয়েরিং দম্ভোক্তি করেছে: "আমার এখন আছে......জার্মানীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা হয়ত বা তা গোটা ইউরোপের মধ্যে।"

তাহলে এই হল হেরমান উইলহেলম্ গোয়েরিং। অর্থাৎ সে যেমন ছিল। রেইখ মার্শাল, জার্মানীর বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সর্বাধিনায়ক। *এস এ.-র* প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। এই গোয়েরিংকে আদালতে পেশ করা হল।

এটা লক্ষণীয় যে জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও, বিচারচলাকালীন *একবারের* জন্যেও গোয়েরিং জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র, অথবা তার নিজের আদর্শ, এমনকি হিটলার যে তাকে মনে করত বিশ্বস্ত বন্ধু, এ সবের কোন কিছুর সমর্থনেই কিছু বলেনি। সেই মুহূর্তে আমার বালগেরিয়া যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, জিওরগি দিমিত্রভের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলি, যে লোক লাইপজিগ বিচার প্রহসনের ব্যবস্থা করেছিল, সে নিজে প্রতিবাদী আসামী হয়ে কি ও কেমন ব্যবহার করেছে। সে কেবল অভিযোগের হাত থেকে কোনক্রমে পিছলে যাবার চেষ্টা করেছে, পরিণতির মুখোমুখি হবার হাত এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, আর সমস্ত দোষ চাপিয়েছে তিনজন মৃত মানুষের ওপর—হিটলার, গোয়েববলস্ এবং হিমলার।

যদি দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দুঃসাহসী লড়াই করে, লালফৌজ, নাজী সম্প্রসারণকে না রুখত, তাহলে আজ এখন গোয়েরিং এবং তারই মতো আরও অনেকে ইউরোপের ওপর শাসন আর কর্তৃত্ব করত।

১৩। আমার নায়ক চললো

অদ্ভুত মনে হতে পারে তাহলেও এটা ঠিক যে আদালতে গোয়েরিংকে পরীক্ষাপর্ব আমার সাহিত্যগত কাজকর্মে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল, যদিও আমি যা কিছু লিখছিলাম, তার সঙ্গে গোয়েরিংয়ের কোন সম্পর্কই ছিল না। আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, যে সোভিয়েত জনসাধারণ সম্পর্কে গোয়েরিং মন্তব্য করেছিল—"প্রহেলিকাময়"। যে প্রহেলিকা বুর্জোয়া ইউরোপ কোনদিন অনুধাবন করতে পারেনি। প্রহেলিকাময়, হেঁয়ালিতে-ভরা সোভিয়েত জনসাধারণ যারা পরাস্ত করেছিল কেইটলের লুটেরা দস্যু বাহিনীকে, ধ্বংস করেছিল গোয়েরিংয়ের বিমান বহর, ডুবিয়ে দিয়েছিল রেডারের জাহাজ, আর পরিশেষে নাজী দুর্গের ওপর তুলেছিল নিজেদের পতাকা—এই মন্তব্যই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এদেরই একজন মানুষকে নিয়ে বই লেখার জন্যে বসে পড়তে। এদেরই মধ্যে একজন মানুষ সিনিয়র লেফটেন্যান্ট আলেক্সি মারেসিয়েভ, যার সম্পর্কে আমি লিখতে আরম্ভ করেছি প্রায় একমাস আগে। আদালতে যেখানে, নাজী অপরাধগুলি এক এক করে মেলে ধরা হচ্ছে, সেই আদালত থেকে ফিরেই এই সোভিয়েত মানুষটিকে নিয়ে গল্প লেখা চালিয়ে যাবার জন্যে আমি বসে যেতাম। আদালত চলাকালীন যা কিছু আমি শুনতাম, যা কিছু আমার কানে আসত, সেই সব কিছু থেকে এই বইটাই আমার মনকে টেনে নিয়ে যেত অন্যদিকে।

এই হল সেই পরাভূত, পরাজিত, ডুবন্ত ফ্যাসিবাদী পৃথিবীর কাহিনী, যার নেতাদের তলব করে ডেকে পাঠানো হয়েছে বিচারসভায়, তাদের প্রতিটি কাজের হিসেব দেবার জন্যে, যে নেতারা সোভিয়েত জনসাধারণের সরল, সৎ ও বিস্ময়ভরা জগতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, যার শেষ ফলাফল সোভিয়েতের জনসাধারণের বিজয়। গল্পটা যে কত অপরিমেয় সুখকর! নিকোলাই ঝুকভ আমার পুরোন বন্ধু আর আমার গল্পের একজন সমঝদার যে সম্প্রতি সকাল বেলায় আমার সঙ্গে দেখা হলে "হ্যালো" বলার পরিবর্তে জানতে চাইতো "তুমি লিখছো কি গল্পটা?" তাকে এখন প্রতিদিন সকালে—সে চাক বা না চাক—আমার বিবরণের অগ্রগতি শুনতেই হত, অর্থাৎ সেদিন সকাল পর্যন্ত সেই বৈমানিকের গল্প কতদূর এগিয়েছে। সে আমায় উৎসাহ দিয়ে সব সময় বলত, "দারুণ, তুমি এটা চালিয়ে যাও।"

মনে হচ্ছিল যেন আমার কলম থেকে পাতার পর পাতা উড়ে যাচ্ছে। গল্পের না কোন সারাংশ, না কোন খসড়া, কোনটাই আমার করা ছিল না। লেখা বলতে আমার নোট বইতে তার সম্পর্কে যা দুচার কথা লেখা। বহুদিন আগে ওয়েল-এ আমাদের দেখা হওয়ার পর লোকটা সত্যি কেমন লড়েছিল, তাও আমার জানা নেই। সে জীবিত আছে কিনা, না কি হেরমান গোয়েরিং-এর *রিহ্‌ঠোফেন* বিমান বহরের বাছাই সব তাসের টেক্কার মত বৈমানিকদের বিমান হানার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার জীবনাবসান হয়েছে, তাও আমার অজানা। আমার কাছে একটা নোটবই ছিল, যার মাথায় লেখা "৩য় স্কোয়াড্রনের বিমানেব বর্ষপঞ্জী" যে নোটবইতে আমি এক আগস্ট মাসে, ছোট ছোট ফলের র‍্যাস্পবেরি গাছের সুগন্ধ মাখানো রাত্রে লিখে রেখেছিলাম। সেই বৈমানিকের জীবন সম্পর্কে ওইটুকু যা আমার পথ প্রদর্শক বলা যায়।

আমি এমন শান্তভাবে একাগ্র হয়ে পরিশ্রম সহকারে লিখে যেতাম যে আমার বন্ধুরা ন্যুরেমবার্গের চড়ুই পাখিরা বোধ হয় আমাকে এইভাবে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখতো যে জানালার ওপারে একজন মানুষের অবয়ব ডেস্কের ওপর কুঁজো হয়ে ঝুঁকে নেমে আছে। তারা বোধ হয় আমাকে কোন বিচিত্র, নীরস অচেতন কোন বস্তু বলে মনে করত। আমি এখনও জানালা দিয়ে প্রতিদিন সকালে পাঁউরুটির টুকরো ছড়িয়ে দিতাম। আর তারা সেগুলো খেয়ে সাহস করে উড়ে আসতো ঘরের ভেতর। কোন অচেতন নীরস প্রাণী ভেবে আমাকে গ্রাহ্যই করত না। আমার ডেস্কের চারদিকে তারা হাল্কা করে লাফিয়ে বেড়াত। নিজেদের মধ্যে কথা বলতো একটুও গোলমাল না করে, আপাতদৃষ্টিতে তারা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করত তাদের স্বদেশীয় স্থানীয় জার্মান ভাষাতে।

আজ আমি সাধারণতঃ যখন উঠে থাকি তার চেয়ে আগে উঠে পড়ায় ওরা ভয় পেয়ে গেল। ঝুকভ, স্নান করছিল স্নান ঘরে। ও আমার কাছে জানতে চাইল যে লেখাটা কেমন এগোচ্ছে। এবং আমি উত্তর দিলাম, "লেখাটা আমি শেষ করে ফেলেছি।"

"তুমি একদম বাজে বকবে না!"

"যা সত্যি, তাই বললাম।"

দারুণ গর্ব হচ্ছিল আর আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে এই বই যা বিগত কয়েক বছর ধরে আমার মনে ছায়ার মত অনুসরণ করে একটু একটু করে আকার নিয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে। এই বইটির সবকিছুর সঙ্গে যে আমার এক ধরনের মানসিক বিযুক্তি হল, তার জন্যেও আমার কেমন খারাপ লাগছিল। একজন টাইপিস্ট থাকত ফেবার ম্যানশনে, কাছাকাছিই এক মহল্লায়। আদালতের অধিবেশন শেষ হবার পর তাকে ডেকে শ্রুতিলিখন দেবো বলে ব্যবস্থা করে ফেললাম। আগামীকাল থেকে এই কাজ শুরু হবে। প্রথম দিন সেই মেয়েটির সঙ্গে অধিবেশন শেষ হবার পর দেখা করার জন্য আমি ভেতরে ভেতরে খানিকটা আঁকু পাঁকু হওয়ার মত, যাকে বলে নারভাস হয়ে অপেক্ষা করতেলাগলাম। একটা নিয়ম হল এই যেলেখকেরা, তাদের টাইপিস্টকে বেশ সবচেয়ে মনোযোগী শ্রোতা আর বিষয়গত সমালোচক মনে করে। পাতার পর পাতা ঠাসা লেখা' ফোল্ডারের মধ্যে রাখা এক পাঁজা কাগজ, বেশ ওজন, হাতে নিয়ে রীতিমত অহংকার করে বলে, "আমি এতসব করেছি উনিশ দিনে", এইসব বড়ই সুখকর মনোরম অভিজ্ঞতা। এখন লম্বা হয়ে ঘুমোন যায়। গত কয়েক সপ্তাহে আমি খানিকটা রোগা হয়ে গেছি। আর আমাকে দেখাচ্ছেও কিঞ্চিৎ বন্য ধরনের। আমার মাথার চুল খানিকটা লতিয়েছে। লোকেরা কেউ কেউ বলছে যে আমার ওজন নাকি কমেছে। হতে পারে। কেননা আমার জামার কলার কিছু হল হল করছে বোধ হল। কিন্তু আমি কি করে ঘুমোতে পারি? আমায় তো সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি 'প্যালেস অফ জাসটিসে' গেলাম। তারবার্তা পাঠালাম আমার বৌকে। তাকে জানালাম যে আমার প্রতিশ্রুতি মত আমি গল্পটা শেষ করেছি। বস্তুটা এখন টাইপ করা হচ্ছে এবং তিনি তাঁর জন্মদিনে তা পাবেন। *ওকটিয়াবর* পত্রিকার সম্পাদক এফ. আই. প্যানফ ইয়োরভকেও আমি একটা তারবার্তা পাঠালাম। যুদ্ধের আগে ওখান থেকেই আমার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। উনি আমার প্রথম হোঁচট খাওয়া সাহিত্য প্রচেষ্টাকে খুবই উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁকে পাঠানো আমার তারবার্তার বয়ান: সাধারণের জীবন নিয়ে নতুন ধরনে এক বই লিখেছি। বারো ফর্মা। নায়ক বৈমানিক। বাস্তব চরিত্র। আপাত নাম: 'একজন সত্যিকার মানুষের গল্প।' লেখা পৌঁছে দেওয়ার সর্বশেষ সময়সীমা, ১লা এপ্রিল।

বিনীত অভিনন্দন।" আমি নিজেই জানি না যে এই দ্বিতীয় তারবার্তাটা আমি পাঠালাম কেন। সত্যি কথা বলতে কি, একটা সাময়িক পত্রের কাছে ব্যাপারটা নিয়ে এভাবে উপস্থিত হওয়ার পিছনে জোরালো কারণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—তাদের কাছে এমন কোন প্রস্তাব রাখা হচ্ছে, যা নিতান্তই অনির্দিষ্ট। কেননা গল্পটার সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে বা হবে তাই জানা নেই। কিন্তু আমি যেন ভিতরে ভিতরে অধৈর্যে টগবগ করছিলাম।

আমি যখন প্রেস ক্যাম্পে ফিরে গেলাম, তখনও আমি আমাদের 'টাওয়ার অফ ব্যাবেল', অর্থাৎ দিনান্তে বিশ্রম্ভালাপের জন্য বড় ঘরে আর গেলাম না। যদিও সেদিন সেখানে বাণিজ্যিকভাবে দারুণ সফল এক দুরন্ত ছবি দেখানো হচ্ছিল। আর সেই ছবিতে অন্যতমা অভিনেত্রী ছিলেন তিনি, যিনি প্রথম দিন আমার পাশে বসেছিলেন। পরিবর্তে আমি গেলাম পার্ক-এ। সেরকম ভিড়ে ভিড়ে নেই আর। মাটির ওপর ঘন, পুরু সবুজ ঘাস। গাছগুলি পাতায় ছাওয়া। দূরে পার্বত্য খাতের ম্রিয়মান অনুজ্জ্বল গভীরে পুষ্পিত ঝাউ চেরী গাছগুলো মিটমিট করছে সাদা কুয়াশার মত। ওখানে অনেক নীচে দিয়ে এক সুরেলা ক্ষীণ স্রোতস্বিনী নৃত্যছন্দে বয়ে গেছে।

আমি ছোট ছোট পথ ধরে নিজের মনে হেঁটে পায়চারী করতে থাকলাম। সেই মাতাল করা রসাল বসন্ত বাতাসে শ্বাস নিলাম বুক ভরে আর ভাবতে লাগলাম আমার নায়ক রুশ ভদ্রলোককে নিয়ে এ রকম একজন লোকের পক্ষে কি সম্ভব ছিল গোয়েরিং-এর বোমারু বিমান বহরে উঠে পড়া? ওদেরও তো সাহসী বৈমানিকের কিছু অভাব ছিল না। কুট'ও লড়াই করেছিল ভালই। জার্মানরা কুটে'র মত তাদের সামনের সারীর সৈনিকদের 'আয়রণ-ক্রশ' দেয়নি। তার জলন্ত বিমান যুদ্ধ-সীমান্তের ওপার থেকে উড়িয়ে এনে নিজের দিকে এনেছিল আর তারপর বের হয়ে এসেছিল প্যারাস্যুটে করে। কিন্তু সে নিজেই স্বীকার করছে যে দুটো আদিম তাগিদ তার পিছনে কাজ করেছিল। ভয়, তার খুব ভয় হয়েছিল যে যেখানে আমাদের রুশ সৈন্যরা আছে, সেখানে দিয়ে উড়ে আসার সময় তাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। আর ইচ্ছা, তার তীব্র ইচ্ছা হয়েছিল বেঁচে থাকতে আর জার্মান প্রতিরক্ষা রেখায় পৌঁছুতে। কুট', যদিও সে বেশ চমৎকার লোক, সেকি পারতো, আবার বিমান চালানো

শুরু করতে, আবার বিমান চালানোর ফেরার জন্যে এমন অতি-মানবিক চেষ্টায় ফিরে আসতে আর মৃত্যুর মুখে চূড়ান্ত বিপদের মধ্যে এভাবে বার বার ঝাঁপ দিতে—পারত? প্রশ্ন উঠেছিল : কিসের জন্যে আর কাদের জন্যে সে লড়ছে।

বহুদিন আগে যখন নাৎসীবাহিনীকে করসুন-সেভচেনকোভস্কায়া, অঞ্চল থেকে উৎখাত করা হয়, তখন দ্নিপার নদীর পশ্চিম তীরে কিছু কথাবার্তা আমার মনে আছে। ঘটনাচক্রে আমি মারশাল পি. এ রোতমিসত্রোভের সাঁজোয়া বাহিনীর সঙ্গে সে রাত্রি অতিবাহিত করেছিলাম। আমরা ঘুমিয়েছিলাম একটা বিদ্যালয়ে। সেইখানেই ছিল সেই সাঁজোয়া বাহিনীর সদর দপ্তর। মেঝের খড়ের গদির বিছানায় যিনি শুয়েছিলেন, তিনি একজন গাট্টাগোট্টা চেহারার লেফটনান্ট কর্নেল। তাঁর চওড়া মুখের বর্ণ তাম্রাভ। ভ্রূ আর নাকের মাঝখান দিয়ে টকটকে মাংসল বাস্তব ক্ষত চিহ্ন। আমরা সামরিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলাম। আলোচনা করছিলাম. যে জার্মান বাহিনীকে যদি এক জায়গায় সংহত করাও হয়, তাহলে আংশিকভাবেও তারা ঘিরে থাকা সোভিয়েত বাহিনীর ব্যূহ থেকে বার হতে পারবে কিনা। এ বিষয়ে নানা মত ছিল। লেফটনান্ট কর্নেল বিশ্বাস নিয়েই বলল : বলতে "তারা তা করতে পারবে না। আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি।"

"জার্মানরা যখন আক্রমণ করে, তখন তারা খুব শক্তিশালী", লেফটনান্ট কর্নেল বললেন ভাঙা ফ্যাঁস ফেঁসে গলায়। "আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধী যুদ্ধ করার সময়ও ওরা শেষ তক লড়তে পারে। কিন্তু ওদের নিয়ন্ত্রণ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যেমন এখন হয়েছে, তাহলেই ওরা হয়ে যায় একটা ভেড়ারপাল, তখন একটা ভেড়াও থাকে না ওদের চালাবার জন্যে। কি করছে না জেনে বুঝেই তারা মাথা খুঁড়তে থাকে; ঢু মারতে থাকতে এখান ওখানে। আর কাঁদতে কাঁদতে বলে '*হিটলার কাপুট!*' আমার চিন্তাধারা কি তুমি বুঝতে পারছো? আমরা যখন এই ব্যাপারগুলো ওদের *ভেটারলান্ডে* করবো তখন সেখানে কোন লড়াই হবে না। যুদ্ধ ওদের সংগতির বাইরে। ওদের নৈতিক মূল্য বোধ, নীতি বোধই আলাদা..."

সেই লেফটনান্ট কর্নেল শত্রুপক্ষকে বিলক্ষণ চিনতেন। শত্রু

পরিবেষ্টিত জায়গা থেকে দুবার তাকে নিজেকে বাঁচাতে হয়েছে। বহু যুদ্ধ লড়েছেন উনি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করাই তাঁর প্রতি উচিত আস্থা। তথাপি আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে তাঁর এইরকম চিন্তার কারণ কি।

"কারণ ওদের মধ্যে নেতৃত্বের পরিচালনা করার কোন ধারণা নেই। মারো, আগুন লাগাও, লুঠতরাজ করো,—এগুলো কি কোন ধারণা?" 'এই বুড়ি, ওই মুরগী আমাদের দাও, আণ্ডা লাও...' এসব তাদের টেনে নিয়ে যেতে পারে, কেবলমাত্র তখনই, যখন তাঁরা আক্রমণমুখী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর ওদের কিছুই বাকী নেই, "Hände hoch" ছাড়া।

লাল ফৌজ যখন জার্মান ভূমিতে প্রবেশ করল, তখন এই আলোচনা আমি প্রায়ই মনে করতাম। আমরা যে সমস্ত শহর অধিকার করেছিলাম, সেই সমস্ত শহরে জানালাগুলো থেকে শ্বেত চাদর ঝোলানো। টহলদারি সোভিয়েত সৈনিকদের কিছু করার ছিল না। ওয়্যারওলফস শোনা গেল, তারা নাকি বার হয়ে আসত ডঃ গোয়েবলস-এর এক একটা আবিষ্কার হবার জন্যে। প্রথম সুযোগেই, সমস্ত লোক, সৈনিক অসামরিক লোকেরা, বেশ সংগঠিতভাবে আসত সোভিয়েত অধিনায়কের দপ্তরে। যারা অস্ত্র বয়ে নিয়ে আসত, তারা সেগুলো সমর্পণ করতো নির্দেশিত জায়গায়।

যখন একজন, যে পরিবেশে সে বড় হয়েছে, সেই পরিবেশেই সে বড় হয়ে পরিণত হয়, পূর্ণবয়স্ক হয়,—তখন তার কাছে সেই পরিবেশের সব কিছু মনে হয় নিতান্ত সাধারণ, সব জিনিসই সহজ। কিন্তু যদি একজনের জীবনে তুলনা করার সুযোগ আসে, তাহলে তার নিজ ঘরে, তার বেড়ে ওঠার আবাল্য পরিবেশে যে জিনিস তার নজরে কোন দিন পড়েনি, তাই সে হঠাৎ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। সেক্ষেত্রে সোভিয়েতের সাধারণ মানুষেরা যে কত তফাৎ, তা বোঝা তাদের সংস্পর্শে এসে—নীতিগত ভাবে কত বেশী খাঁটি, কত বেশী সদয়, আরও কত বেশী সাহসী, তুলনামূলকভাবে সাধারণের নজর থেকে যে নিজেকে অনেক বেশী সরিয়ে রাখতে চায় এবং অবশ্যই, আরও অনেক শক্তিধর......

সেই বাগানে প্রাচীন ওক আর এলম গাছের মধ্যে ঘনিয়ে এলো বসন্তকালীন মনোহারী চমৎকার সন্ধ্যা। প্রেস ক্যাম্পের জানালা দিয়ে

আসছে, উচ্চগ্রামের জ্যাজের আওয়াজ। পার্বত্য গিরিখাতের কাছে ঝিলিক দিচ্ছে সেই নির্ঝরিণী। আর সেই উত্থানের ভিতর দিকে গভীরে কোথাও ডেকে উঠল একটা প্যাঁচা। আমার জুতোজোড়া বসন্তের ভিজে ভিজে ঘাসে পুরো ভিজে গেছে. আর ওভারকোট ফুঁড়ে টের পাচ্ছি ঠাণ্ডার কনকনানি। তবু আমার বাসায় ফিরতে মন চাইছিল না। আমার সেই পা-বিহীন বৈমানিক আলেক্সি মারেসিনেভ, তাকে আমি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছি। আমার ঘর ফাঁকা। আমি জানতাম না। আমি ঘুমোতে পারবো কিনা।

ভালো কথা, একটা মজার ঘটনার কথা বলতে ভুলে গেছি। আমেরিকান সাংবাদিকরা, যাদের সঙ্গে আমি আগে কথা বলেছিলাম, তারা সত্যি সত্যিই একচেটিয়া কারবারী যে সবগুলো টেলিগ্রাফের লাইন নিজের জন্যে বেঁধে রেখে, অন্যদের বিচার চলার সময় তার পাঠানো থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে নিবৃত্ত করেছিল, সেই একচেটিয়ার মুখের ওপর সত্যি ঘুষো চালিয়েছি। কদিন লোকটার থুতনিতে বাঁধা ছিল প্লাসটার আব ছিল একটি চোখে। সামনের পাটি'তে একটা দাঁত খোওয়া গিয়েছিল তার। সেটার জন্যই তার সাধারণ অন্ধের মত হাসির যে মজা সেটা চলে গিয়েছিল। অবশ্যই সে সকলকে বলেছে কিভাবে সে পা হড়কে সিঁড়ির কারপেটের ওপর পড়ে যায়। গল্পটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য করে বলার সে এত প্রাণপণ চেষ্টা করতো যে গল্পটা মনে হত অতীব অসাধু। যাইহোক ধরে নেওয়া যাক, "যার যার নিজের নিজের।"—এই চিহ্ন টাঙানো থাকতো ডাচাউ বন্দী শিবিরের প্রবেশ পথগুলোর ওপরে। শোনা যায় এই বাণীর রচয়িতা হিটলার স্বয়ং।

১৪। ছুটির কটা দিন আগে

ইস্টার এসে গেল। অবিশ্বাস্য আবহাওয়া ছিল বসন্তের। আমার বন্ধুরা, সেই চড়ুই পাখিরা সপ্তমে গলা তুলে কিচমিচ চালিয়েই যাচ্ছে। ঠিক যেন কোন রবিবার সন্ধ্যাবেলায় স্থানীয় পানশালায় একঝাঁক জার্মানদের মতো। পার্কের মধ্যে রৌদ্রস্নান ছোট্ট পাহাড়ী টিলা যেন এক সমুদ্র স্নো-ড্রপ-ফুলে ফুলে ছাওয়া। কোথাও কোথাও তা এত পুরু, যে সবুজ ঘাসের

আস্তরণকে হালকা নীলাভ লাগছিল। এখনও অক্ষত ঘন্টাঘরগুলো থেকে ভেসে আসছে সার সার এক সুরে বাঁধা ঘন্টাধ্বনি। সকালে তার সেরা পোশাকে সেজে এলো কুর্ট। নিখুঁত ইস্ত্রী করা। পোশাক থেকে, কাপড় সাফাই এর জন্যে ব্যবহার করা তরল বেনজিনের কড়া গন্ধ আসছে ঝলকে ঝলকে। সে টেবিলের ওপর ঝাড় দেওয়া তোয়ালেতে জড়ানো কোন কিছু বেশ সমারোহ করে রাখল। ওটা ইস্টার কেক। আমাদের বাড়িতে আপেল জ্যাম কেকের মতো অনেকটা। কুর্টের বাড়িতে পরিবারের সকলের যথেষ্ট খাদ্যবস্তু জুটত না। আর তা ছাড়া এখানে এই জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া। এই সব জানা ছিল বলেই, আমি যেন কোন রাজকীয় উপহার পেলাম, এভাবে তুলে নিলাম কেকটা। সৌভাগ্যবশতঃ, আমেরিকান অফিসারদের *পি. এক্স*-এ কেনা এক বাক্স চকোলেট আমার কাছে ছিল। তাই কুর্টের মার উদার উপহারের বিনিময়ে তা আমিও দিতে পারলাম।

সেদিন আমি ও কুর্ট কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের সঙ্গ ছাড়া হলাম। ইস্টারের ছুটির জন্য ট্রাইবুনালের কাজকর্ম বন্ধ। একদল সোভিয়েত সাংবাদিক, যার মধ্যে আছেন য়ুরি করোলকভ, মিখাইল গুস, সেরগেই ক্রুশিনস্কি, নিকোলাই লানিন, বোরিস আফানাসিয়েভ আর আমি— ছুটির কদিন চেকোস্লোভাকিয়ায় কাটানোর জন্যে আমাদের চেক বন্ধুদের জানানো আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমুদে, রসিক ও বিজ্ঞ চেক সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাদের দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তারা উত্তম সাংবাদিক। প্রচুর ঘুরেছে তারা। তাদের আন্তর্জাতিক নানা যোগাযোগও প্রচুর, আর তাই তারা আমাদের মধ্যে দানিল ক্রামিনভকে বাদ দিলে আর সকলকে বেশ সাহায্য করতে পারতো। আমাদের কারোরই বিদেশে বসবাস করার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। ন্যুরেমবার্গে, চেকোস্লোভাকিয়ার আইন বিভাগীয় প্রতিনিধিদের যিনি প্রধান, তাঁর দপ্তর, আমাদের ছাড়পত্র সংক্রান্ত ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে দিল, আমাদের মুদ্রার বিনিময়ে দিল কোরুনি, অর্থাৎ চেক মুদ্রা। আর ইস্টারের দ্বিতীয় দিনে, ভোরবেলায়, আমরা ন্যুরেমবার্গের পূর্ব দিক গামী স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধের পরে, আমায় প্রায়ই বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছে, আকাশ পথে। মোটর গাড়িতে, মেঠো পথে ও খোলা মাঠের ওপর

দিয়ে হেঁটে গেছি। স্লোভাক অভ্যুত্থানের সময় এমনকি আমাকে ঘোড়ার পিঠে চেপে দূর পাল্লা যেতে হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর সময় থেকে আমার রেলগাড়িতে চড়া হয় নি। অনভ্যাসের জন্যে একটা কামরায় ওঠার ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত লাগছিল আমার। আর আমার লজ্জার কথা কি বলবো, আরামদায়ক একটা কোণে আমি দেখতে না দেখতে ঘুমিয়ে গেলাম। বোধ হয় এতদিন ধরে আমি রেলের চাকার ছন্দোবদ্ধ ঝমাঝম শুনিনি বলেই।

গোটা দলটা পাশাপাশি দুটো কামরায় ছিল। একটা কামরায় রুশরা। অন্যটায় চেক ও শ্লাভকরা। যখন একটা আচমকা ঝাঁকিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, তখন দুটো কামরায় সবাই মিলেমিশে গেছে। চেকশ্লাভাক আর রুশরা হয় পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে গেছে, কিংবা মেঝেয় বসে গেছে। তারা মহা উৎসাহে নিজ নিজ স্বদেশীয় ভাষায় গাইছে সেই পৃথিবী বিখ্যাত সঙ্গীত *ক্যাতিয়ুশা*। চেকদের মধ্যে প্রাগ বেতার কেন্দ্রের একজন বেতার শিল্পী ছিল। সেই যুবকটির গলা ভারী সুন্দর। *ক্যাতিয়ুশা*, শুরুতে সে ধরল। তারপর সবাই এত আনন্দে আর মনেপ্রাণে তার সঙ্গে গলা মেলাল যেন মনে হয় এই সঙ্গীতের দোলায় মিলে গাড়ির দুলুনি, ঝাঁকি সব কিছু হচ্ছে। তারপর আমাদের বিদেশী সহকর্মীরা তাদের নিজেদের একটা আমোদ ফূর্তি আর দুষ্টুমিভরা গান ধরল। গানের কথাগুলো এমন জীবন্ত যেন কথা নিয়ে খেলা করছে। আর গানটার ধুয়োটা দারুণ। আমরা সুরটা তুলে নিলাম। আর ধুয়োর অংশটায়, সোৎসাহে আমাদের গলা খুলে, তারস্বরে আমরাও গাইতে লাগলাম।

জানালার বাইরে, পূর্ণ প্রস্ফুটিত বসন্ত। শেষ পর্যন্ত তুষার থেকে বার হয়ে এসে শীতের সবুজ শস্য শিখার মত ঝকঝক করছে। আর ভিজে ভিজে প্রাচুর্যভরা মৃত্তিকার ওপর ঝুঁকে নেমে আসা গোলাপী আর সাদা মেঘের মত সরে সরে যাচ্ছে কুসুমিত কানন। যুদ্ধ এখানকার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই অঞ্চলকে আদৌ ছোঁয়নি বলা যায়। গ্রামের পর গ্রাম আর ছোট ছোট সহরে ঘরবাড়ি। খাড়া বাড়ির মাথায় গড়ান ঢাল দেওয়া ছাদ। কাঠের দেওয়ালগুলো রঙ করা। গীর্জা ঘরগুলোর অত্যুচ্চ মোচার খোলার শীর্ষ সদৃশ চূড়াগুলি নীল আকাশ ফুঁড়ে দিয়েছে যেন। দেখে মনে হয় চারদিক কোন উৎসবের জন্যে পরিষ্কার সাজান। স্টেশনগুলোয় যেখানে খাবার দেওয়ার কাউন্টারগুলো খালি। এবং

নিজের নিজের রোববারের সেরা পোশাক পরা লোকেরা, দেখে মনে হয় তারা ক্ষুধার্ত। যত্র তত্র আমরা দেখতে পেলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর দেখলে শ্রদ্ধা হয়, এমন অনেক ভিক্ষুক রয়েছে। আমাদের কাছে ছিল কেবল কিছু মুদ্রা। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের দূরদৃষ্টি আমাদের চেয়ে বেশী। তাদের দরকারী জিনিস ভরা কাঁধে ঝোলান থলেতে ছিল পথে খাবার জন্যে খাদ্য আর কয়েক বোতল *স্লিভো-ভাইস* এবং *বোরোভিকা*। যুদ্ধের সময় থেকে আমার আর ক্রুশিনস্কির মনে আছে যে এই দুটো একেবারে দারুণ পানীয়। পেটে পড়লেই মানুষ দিলখোলা আর বন্ধুত্বভাবাপন্ন হয়ে যায়। আমরা দুজন ছাড়া, দলের আর কোন রুশসাংবাদিক এর আগে চেকোস্লোভাকিয়া যায় নি। আমরা সেই দেশকে জানতাম, আর সেই দেশে যাচ্ছি বলে খুব উত্তেজিতও। ঠিক যেন ভালবাসার নারীর সঙ্গে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাতের কালে যেমন মধুর উত্তেজনা হয়।

আমরা সীমান্ত পার হয়ে গেলাম। লক্ষ্যই করি নি, কখন পার হলাম সীমান্ত। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে কোনও পরিবর্তন নেই বললেই চলে। সেই মসৃণ ঢালের পাহাড় আর পর্বত। একই ধরনের গ্রামের পর গ্রাম। গ্রামে ছোট ছোট ঘর বাড়ি। বাড়িতে টালি ছাওয়া ছুঁচলো ছাদ সব। একই ধরনের ছোট শহরের পর শহর। খোয়া দিয়ে বাঁধানো অপরিসর সব রাস্তা। আর সাদা মাটা বাহারের বাহুল্য বর্জিত সব দোকান। কেবল রেল কর্মীদের পোশাকগুলো বদলেছে। আর যেন হঠাৎই মনে হচ্ছে যে শহর আর গ্রামগুলো কেমন খাঁ খাঁ করছে, ফাঁকা, সেখানে যেন বসবাসকারী মানুষ নেই: এই সীমান্ত অঞ্চলের জার্মান অধিবাসীরা এখানকার বাসা তুলে দিয়ে জার্মানী চলে গেছে। নতুন অধিবাসীরা এখনো এসে এখানে বাসা বাঁধে নি।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে আমি কিভাবে যোগাযোগ বিভাগীয় এক বিমানে ইতিপূর্বে প্রাগে এসেছিলাম। বিমান নেমেছিল সোকোল স্টেডিয়ামে। জান ডারডা, যে সেই ভ্রমণের আয়োজন করেছিল, সে ছিল সঙ্গে। ডারডা বলেছিল যে প্রাগে স্থানীয় সাংবাদিকরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, আর আমরা তাঁদেরই অতিথি হব। আর প্রাগে যেসব সাংবাদিক আসবেন সাক্ষাৎ করতে, তাঁদের মধ্যে থাকবেন মেরী

মাজেরোভা। চেক সাহিত্যের নানা ধ্রুপদী রচনার বিশিষ্ট লেখিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের পুরোন বন্ধু।

"সেরগেই, কিভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হল, তোমার মনে আছে ?" আমি ক্রুশিনস্কির কাছে জানতে চাইলাম।

"তা কি ভুলতে পারি ? রুশদের যে তিনি কত ভাল বোঝেন, তা তিনি দেখিয়েছিলেন। আমি তাঁকে চিরকাল মনে রাখবো।"

সত্যি কথা বলতে কি, সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, তার থেকে অন্যভাবে আমরা তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। দুদিন ধরে ওর-পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পথ চলে, পথের পিছনে গ্রীস আর সবুজাভ ধুলো রেখে, সোভিয়েত সাঁজোয়া গাড়িগুলো তখন প্রাগ শহরের প্রধান স্কোয়ার-এ ঘড় ঘড় করছে। সেই চত্বরের এক ধার থেকে অন্য ধারে সেগুলো যাওয়া আসা করছে, যেন অশ্বের স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে কোন ক্লান্ত, ভালো- স্বভাবের কোন বন্য-জন্তু, কোনক্রমে নিজেদের পথ করে করে চলেছে কোলাহল আর উৎসব মুখর ভীড়ের মধ্য দিয়ে। কঠোর দর্শন কিন্তু উৎফুল্ল সাঁজোয়া বাহিনীর চালক বসেছিল বাইবের দিকে। লাজুক ভঙ্গীতে সে প্রত্যাভিবাদন জানাচ্ছিল। যেমন দাঁড়ের ওপর আসে পাখি, তেমনি জাতীয় পোশাকে সজ্জিতা বালিকারা উঠে আসছিল সাঁজোয়া গাড়ির ওপর। তারাও অস্ত্র-সজ্জিত যান বাহনের ঘড ঘড শব্দের মধ্যে দিয়ে পথ চলছিল। বাতাস মুখরিত ছিল রুশ আর চেক ভাষায় "হুর্ রে" ধ্বনিতে। যুদ্ধ শেষ—পৃথিবীর অন্যান্য নগরের চেয়ে যা একদিন পরে প্রাগ শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধ শেষ।

ক্রুশিনস্কি আর আমি কনুই ডংশাচয়ে ঠেলা দিয়ে, পথ করে করে ভীড়ের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিলাম। অসম্ভব ক্লান্ত আমরা লিপস্টিকের দাগে দাগে আমাদের সারা মুখ তেল তেল করছে। লোকেরা আমাদের কাঁধে চাপড় মারছিল। ঝাঁকাচ্ছিল আমাদের হাত ধরে। মেয়েরা চুম্বন করছিল আমাদের। আমাদের ধুলো ভরা গালে দগদগে দাগ পড়ে যাচ্ছিল তার। আমরা দেখলাম এক কোণে দাঁড়িয়ে একজন ছোট খাটো কিন্তু শক্ত সামর্থের এক মহিলা। মাথার ওপর টুপি—সুন্দর, গোল মুখখানা বেড় দিয়ে ফিতে বাঁধা। টুপির তলা থেকে ছোট খড়ের আঁটির মত তাঁর কোঁকড়ান চুল বের হয়ে আছে। যেমন একটা ছোট বালকের কপালের ওপর পড়ে থাকে।

তাঁর সম্পূর্ণ পোশাকের মধ্যে টুপিটা তো একটি মাত্র বর্ণনা। তিনি একের পর এক নানা মাপের ছোট ছোট স্কারট আর ছুঁচের কাজ করা বিনুনির মত লেস লাগানো ব্লাউজ পরেছিলেন। তাঁর পায়ে ছিল ডোরাকাটা মোজা। তাঁর সামনে মাটির ওপর রাখা ছিল একটা বিরাট পাত্র আর ছোট ছোট মাটির পেয়ালা। তিনি সামরিক পোশাক পরা রুশদের থামিয়ে পানীয় দিচ্ছিলেন। তিনি যখন আমাদেরও থামালেন, আমরা স্বাভাবিক আপত্তি করিনি। দুজনেই এক কাপ করে পানীয় চোঁ করে গলায় ঢেলে দিলাম। যখন আমরা পান শেষ করে পয়সা বার করার জন্যে পকেটে হাত দিয়েছি, সেই মহিলা হাত নেড়ে চমৎকার রুশ ভাষায় বললেন, "না, না। আপনারা আমাদের অতিথি। খুব প্রিয় অতিথি আমাদের। আমরা আপনাদের জন্যে সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে থেকেছি।"

লাল ফৌজের প্রাগ-এ প্রবেশের বিষয়ে আমাদের যে বিবরণ, তাতে এটি এক অবিশ্বাস্য সুন্দর স্পর্শের মত ফুটে উঠল। ক্রুশিনস্কির পছন্দ ছিল যা কিছু লিখবে তা হবে যথাযথ ও সঠিক। ও একটা ছোট আকারের টুকচি লেখার খাতা বার করে সেই ভদ্রমহিলার পদবী জানতে চাইল।

"মেরী মাজেরোভা", উনি বললেন।

"মাজেরোভা? আপনি কি লেখিকা মেরী মাজেরাভার কোন আত্মীয়া?" আমরা দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম। কেননা আমরা জানতাম যে এই নামের লেখিকাকে—ওনার নাম আমাদের দেশে বিশেষ পরিচিত ছিল—প্রাগ শহরেই কোথাও থাকেন।

"আমিই সেই লেখিকা, মেরি মাজেরোভা", তিনি বললেন এক মুখ হাসি নিয়ে। তাঁর মুখের সার সার সাদা সুন্দর দাঁতের সারি দেখা গেল। "আপনারা কি আমার নাম শুনেছেন?"

এই চমৎকার মানুষটির সঙ্গে এইভাবেই আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। হয়েছিল বন্ধুত্ব। আর আমার মনে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে ভাব মূর্তি—সেই উষ্ণ-হৃদয়, জীবন্ত, আশীর্বাদ ধন্য এক দেশ, দীর্ঘ দিন যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আর রুশদের বন্ধু—উনি সেই ভাবমূর্তির চিরকালীন অবিচ্ছেদ্য অংশ।

চেকোশ্লোভাকিয়া তার সব সবুজ পাহাড়, ক্ষেত, বন আর তরুবীথিকা নিয়ে, আবার আমাদের সামনে প্রসারিত। সীমান্ত অঞ্চলে যেমন বোধ

হচ্ছিল এখন আর চারপাশে চেয়ে বাভারিয়ার মত বলে মনে হয় না। কিন্তু এই অঞ্চলেরও আছে অতুলনীয় অনেক কিছু, যেটা বলা যায়, নিখাদ স্লাভাক চরিত্রের সঙ্গে তুল্য।

আমরা যখন রেল স্টেশনে পৌঁছলাম তখন প্রায় এক বছর আগে প্রাগে ওয়েনসেসলাস স্কোয়ারে যা কিছু হয়েছিল, ঠিক যেন তাই আবার হচ্ছে। একজন ছোটখাটো, গাট্টা গোট্টা মহিলা, মিষ্টি মুখ, বড় আর উজ্জ্বল কালো কালো চোখ, দাঁড়িয়ে আছেন এক দল সাংবাদিকের সঙ্গে, আর হাসি হাসি মুখে আমাদের নীরবে স্বাগত জানাচ্ছেন—মেরি মাজেরোভা। যখন হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা আর পরস্পরকে অভিবাদন বিনিময় সাঙ্গ হল, উনি তাঁর সবকিছু পোরা ঝোলা থেকে কাঁচের বড় সুরাপাত্র আর অনেক মগ বার করে তাঁর চারপাশে আমাদের সকলের হাতে দিলেন। আর ঠিক আগের বারের মতোই আমাদের সেই মগে ঢেলে দিলেন অতুলনীয় *স্লিভোভাইস*। প্রাগের বাসিন্দারা মজা করে বলে যে এই বস্তু মধ্যযুগে অপরসায়নবিদরা আবিষ্কার করেছিল। আর তাদের মাল বানানোর কারখানা নাকি হ্লাডকানি শহরের বাইরের দিক আশ-পাশে এখনো দেখা যায়।

"রুশ বন্ধুদের কি ভাবে আপ্যায়ন করতে হয় আমি জানি", একটি মগ নিজের ঠোঁটের দিকে তুলে ধরার সময় তিনি বললেন।

এই ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ায় আমাদের ইস্টারের ছুটিতে ভ্রমণ শুরু হল। মৎস্যাকৃতি দ্রুতগামী কালো টাটরা মোটর গাড়িতে সব চেপে আমরা, এই অতিথিপরায়ণ, আরামদায়ক কবোষ্ণ দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়ালাম। বিখ্যাত বোহেমিয়ান কাঁচের কারখানায় আমরা দেখলাম কিভাবে কাচের ওপর বিভিন্ন বর্ণের ফুল, গাছপালা, মানুষ আর পশুপাখি এবং সুন্দর কাচের ফুলদানী আর ঝকমকে পান পাত্র। আমরা অবতরণ করলাম মাটির তলায় রাখা সুরাভাণ্ডার ঘরে। সেই পলজন চোলাই কারখানায়, যেখানে ফিতে বাঁধা গোলাপের মত গাল, আজকের অপরসায়নবিদরা প্রস্তুত করে পৃথিবী বিখ্যাত পানীয়। মেরি মাজেরোভা নিজে সঙ্গে করে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন লৌহ আর ইস্পাত কেন্দ্র ক্লাডনো—"আমাদের কালো ক্লাডনো," যেমনটি উনি বলেছিলেন। তিনি আমাদের দেখালেন 'সেই ওপেন-হার্থ ফারনেস'। যেখানে তাঁর পিতা এক সময়ে ঢালাই-এর কাজ

করতেন, আর সেখানকার লোকেরা তিনি একজন বিপুল খ্যাতির অধিকারিণী লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও, আজও তাঁকে 'মেরি' বলে ডাকে। যে সমস্ত গীর্জা মধ্যযুগে নির্মিত হয়েছিল, আমাদের তা দেখানো হল। আর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ইহুদীদের এক সুপ্রাচীন কবরস্থানে, যে জায়গাটা প্রাগের ঠিক মাঝখানে, কিন্তু চারপাশে হালের নানা সব অট্টালিকার জন্যে, এই সমাধিক্ষেত্র প্রায় ঠাওরই হয় না। বিভিন্ন ভোজসভায় আমরা আপ্যায়িত হলাম সম্মানিত অতিথি হিসেবে। অনেক গৃহস্থ বাড়িতে ঘরোয়া অতিথি হবার সৌভাগ্যও হল আমাদের।

চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী একদিন আপ্যায়ন করলেন আমাদের। হাসিখুশী, বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ। উনি মজা করে বললেন যে পররাষ্ট্রনীতি উনি খুব একটা ভালো বোঝেন না। আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে উনি তাঁর সহকারী, তিনিও একজন স্লোভাক, ক্লেমেনটিসকে বলেছিলেন। সেই মন্ত্রী নিজে আনন্দ করে আমাদের দেখালেন কি ভাবে পলজেন বীয়র, এইধরনের অন্য সব বীয়রের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। তিনি পাঁচ ক্রাউন মূল্যের একটা ওজনের ধাতুর মুদ্রা সটান রেখে দিলেন ফেনিয়ে ওঠা বীয়রের চূড়োয়, আর আমাদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে বীয়রটা যদি খাঁটি পলজন হয় তাহলে মুদ্রাটা ডুবে একেবারে তলায় যাবে না, ওপরে থাকবে। আমাদের পুরোন বন্ধু, জডেনেক নেজডলি, একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক, সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘ দিনের বন্ধু এবং আরও অনেক লেখক আর শিল্পীর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন হল।

জেনারেল লুদভিক স্ভোবোদার সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল বিশেষভাবে আমার পরম অভিলাষিত। যুদ্ধ আমাদের দুজনকে ছুঁড়ে দিয়ে অনেকবার পাশা-পাশি করেছিল, নানা সীমান্তে। মেরি মাজেরোভার মত তিনিও আমার কাছে ছিলেন চেকোশ্লোভাক মানুষদের শ্রেষ্ঠ গুণের প্রতিমূর্তি। এখন তিনি চেকোশ্লাভ সাধারণতন্ত্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। কিন্তু এই উচ্চ পদ সত্ত্বেও, তিনি ঠিক সেই আগের মানুষটি আছেন। তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন তাঁর দপ্তরের দরজার মুখে, ঠিক যেমনটি তিনি অনেক দিন আগে কোন সীমান্তে তাঁর বাহিনীর চৌকিতে সরল অনাড়ম্বরভাবে অভ্যর্থনা করতেন, সেই ভাবেই।

"সুস্বাগতম, আমার বন্ধুরা" এই বলে তিনি করমর্দনের সময় হাত চেপে ধরছিলেন।

যখন আমার পালা এলো উনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মনে আছে, আপনি আর কমরেড লিদভ আর আমি কিছুটা বিলম্বে, হলেও জানতে পেরেছিলাম যে বুজুউলুক শহরের কাছে এক চেকোস্লোভাক বাহিনী তৈরী হয়েছে। আর তারা এখন আমাদের সীমান্তে, খারখভ সন্নিহিত অঞ্চলে তার প্রথম লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হচ্ছে। *প্রাভদার* জন্যে এ ছিল এক দারুণ গল্প যা আমরা পাশ কাটাতে চাই নি। সেদিন সকাল থেকে তুষার ঝড় শুরু হওয়া সত্ত্বেও ভেসিওলোয়েত বাহিনীর সদর দপ্তরে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা এক বিমান চালককে বুঝিয়ে রাজী করিয়েছিলাম।

বিমান ছাড়ার সময় কোন সমস্যা হল না। কিন্তু নামা? সে এক মহা ঝামেলা। নীচে মাটির ওপর দাগগুলো তুষার ঝড়ে মুছে গেছে। যদিও গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি, আধঘণ্টা ধরে চক্কর মারছি বাতাসে আর চেষ্টা করছি তুষার ঘুর্ণীর মধ্যে দিয়ে নীচে অবতরণ ক্ষেত্রের জমিতে কোন চিহ্ন খুঁজে পেতে। অবশেষে, সেই তুষার চাদরের মধ্য দিয়ে বিমান চালক আধা ধ্বংস হয়ে যাওয়া এক ঘণ্টা-ঘরের মাথা সে লক্ষ্য করতে পারল। সে যতটা চারপাশে ভূমিচিত্র দেখে, তার চেয়ে বেশী তার স্মৃতির মাধ্যমে সেই ঘণ্টা ঘরের অবস্থান বুঝতে পারল। বিমান নামাল গ্রামের বাইরে আর তারপর বিমানটাকে নিয়ে এল সেই গ্রামের স্কুলের একেবারে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত। একজন অফিসার দাঁড়িয়েছিলেন গাড়ি-বারান্দায়। বাতাসে, শূন্যে আমাদের কৌশলী লাফ ঝাঁপ দেখছিলেন। কিন্তু তাঁর মাথার টুপিতে চেকোস্লাভ সিংহ, লাল নক্ষত্র নয়। তাঁর গায়ে একটা সাধারণ ভেড়ার চামড়ার সামরিক কোট, যা কোমরের কাছে বন্ধনী দিয়ে আঁট করে বেশ চেপে আটকানো। আমরা তাঁর পদমর্যাদা দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু তাঁর খর্বকায় কিন্তু ঋজু, মর্যাদামণ্ডিত চেহারায় এক ধরনের গাম্ভীর্য ছিল, যার জন্যে—যদিও আমরা দুজনেই মেজর—আমরা দুজন সামরিক কায়দায় পা ফেলে এগিয়ে গেলাম সোজা তাঁর কাছে ও সামরিক কেতা অনুসারে হাজির করলাম নিজেদের।

"কর্নেল সভোবোদা, চেকোস্লোভাক বাহিনীর কমাণ্ডার", উত্তরে

এই কথাগুলি তিনি রুশ ভাষায় আমাদের জানালেন। তারপরই তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন পরিচিতের মত, কিন্তু কোন অতি পরিচিত ঘনিষ্ঠের মত নয়। এটাই ফৌজী ব্যবহারের দস্তুর। উচ্চ পদমর্যাদার সামরিক অফিসারদের নিজেদের মধ্যে কথা বলার এই রীতি।

এই বিগ্রেডের কাছে বিমানে উড়ে আসার আগে, আমরা স্বাভাবিকভাবেই সভোবোদার জীবনী সম্পর্কে বেশ খানিকটা জেনে, পরিচিত হয়ে এসেছি—আর সে জীবনকাহিনীও অবাক করা। তিনি জাতিতে—চেক। অস্ট্রীয় বাহিনীর এক তরুণ অফিসার ছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি রুশ পক্ষে যোগ দেন। সে সময় তিনি ছিলেন এক প্ল্যাটুন, সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক। যুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি দুটি সেন্ট জর্জ ক্রস পদকে সম্মানিত হন……হিটলারের সশস্ত্র সৈন্যরা যখন বোহেমিয়া মোরাভিয়া দখল করে, তখনও সংরক্ষিত বাহিনীর অফিসার ও অধিনায়ক সভোবোদা, তাঁর অস্ত্র সমর্পণ করেন নি। পোল্যাণ্ডের ভূমিতে জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি তাঁর বাহিনীকে নিয়ে পোল্যাণ্ডের একদিকের সীমানা পার হয়ে, আসেন। যখন হিটলারের বাহিনী পোল্যাণ্ড অধিকার করে নেয়, তখনও সভোবোদা আত্মসমর্পণ করেন নি। এবার, আবার সীমানা অতিক্রম করে আসেন সোভিয়েত ইউনিয়নে, রুশ ভূমিতে, দু দেশের একই শত্রু, জার্মানীর সঙ্গে লড়াই চালাবার জন্যে। এতদিনে তাঁর স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে। তাঁর সেনাবাহিনী সুশিক্ষিত, অস্ত্র সজ্জিত, সংখ্যাগত শক্তির দিক থেকে তা এক রেজিমেন্টের সমান। উক্রাইনের মাটিতে সেই বাহিনী, সোভিয়েত বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়ার জন্য যুদ্ধ সীমানার খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। লিদেভ আর আমি এসেছি একেবারে ঠিক মুহূর্তে। আর সভোবোদা যিনি নিজের সৈন্যদের নিয়ে খুবই গর্বিত, তিনি তাঁর বাহিনীর রণকৌশলগত অবস্থানের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দিলেন।

"এই গ্রাম সকোলোভো থেকে, আমরা শুরু করব চেকোশ্লোভাকিয়াকে শত্রুমুক্ত করার লড়াই" তিনি তাঁর হাতে যে চামড়ার হলদে দস্তানা ছিল, হাতে টেনে আঙুলগুলো সামনের দিকে ঝুলিয়ে, জোর দিয়ে এই কথাগুলি বললেন।

যে যুদ্ধ হল তা ভয়ংকর। পুনঃ অভ্যুত্থিত চেকোশ্লোভাক বাহিনী এর

থেকে পেল এক পরম গৌরবময় নাম। সেই নাম বেঁধে দিল বাহিনীর সকলকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আর তারা সোভিয়েত সেনার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়তে লড়তে বাঁধা পড়ল তাদের সঙ্গে রক্তের সূত্রে। জেনারেল সভোবোদা, চেকোস্লোভাকিয়ার বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আমাদের জানালেন যে এই যুদ্ধের সম্মানে একটি পদক দেওয়া হয়েছে আর সেই পদকটিকে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই, এই বাহিনী মনে করে এই বাহিনীর সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় সামরিক সম্মান।

মন্ত্রীর দপ্তরে কফি পান করতে করতে, চমৎকার শরৎকালের অন্য আর এক সকালের কথা আমার মনে এল। কারপাথিয়ান পর্বতমালা স্বর্ণ, কমলা আর লাল রঙে ছিল উজ্জ্বল। যদিও সেই কনকনে ঠাণ্ডা বোঁধা সকাল সব কিছুই ঢেকে রেখেছিল হাল্কা ধূসর শিশিরে। চেকোস্লোভাক বাহিনীর বিভিন্ন শাখা, তাদের জাতীয় পোশাকে সজ্জিত ছিল সেই পর্বতমালায়, যেখানে বন ও গাছপালা খুব পাতলা। লুদভিক সভোবোদ যে স্বপ্ন দীর্ঘদিন মনের মধ্যে লালন করেছেন, সেই স্বপ্ন সত্য করাব পথে তাঁর অধিনায়কত্বে এই বাহিনী উক্রাইন, মোলদাভিয়া আব পোল্যাণ্ডেব মধ্যে দিয়ে লড়াই করতে করতে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসেছে। এখন তারা তাদের স্বদেশের সীমান্তে। বাতাস স্ফটিকের মত স্বচ্ছ আর প্রাণ-জুড়োন। কত কাছে চেকোস্লোভাকিয়া। সীমান্তের ওপারে যেন হাত বাড়িয়ে ডুকলা পাহাডেব ঢালে কাঠের খুঁটিটার গায়ে আদর করে হাত বোলান যায়। তখনো সূর্য ওঠে নি। ভোরবেলার অপ্রত্যক্ষ আলোয় কেবল ডুকলার অস্পষ্ট চূড়ো দেখা যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে আক্রমণ হানা হবে সেই রেখা বরাবর সৈনিকেরা নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িযে। তারা দারুণ উত্তেজনায় চাপা স্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। সন্ত্রস্ত হয়ে ধূমপান করছিল। চারদিকে একটি প্রচারপত্র ছড়ানো হয়েছে, তাতে লেখা: "চেকোস্লোভাকিয়া অদূরে। আমরা যেন আমাদেব মাতৃভূমির উপযুক্ত হই।" কেবল একজন শান্ত—জেনারেল লুদভিক সভোবোদ। তাঁর চলা ফেরায় কোন অস্বাভাবিক দ্রুততা নেই, পদক্ষেপ দৃঢ়। তাঁর কণ্ঠস্বর স্থির সঙ্কল্প। কেবল তাঁর যে এক অভ্যাস, হাতের দস্তানা হাতে রেখেই সামনে দিকে টানা, সেটাই বিশ্বাসঘাতকতা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তাঁর সৈনিকদের মত তিনিও মনে

মনে ভীষণ অস্থির……এই ঐতিহাসিক লড়াই-এর আগে জেনারেল কি *প্রাভদার* পাঠকদের জন্য অনুগ্রহ করে কিছু বলবেন? না, এখন নয়, সন্ধ্যায়……লড়াই-এর শেষে…চেকোস্লোভাকিয়ার মাটিতে, যদি, অবশ্যই… কিন্তু তিনি ভেঙে বললেন না "যদি অবশ্যই", অর্থাৎ কি। সত্যিকার কোন সৈনিক কখনো তা বলে না। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার সৈনিক।

"ঠিক আছে, আমাদের সাফল্য কামনা করুন।"

আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি সাফল্য কামনা করলাম এই সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত সেনাপতির। সাফল্য কামনা করলাম তার সৈনিকদের, যারা অনেকেই আমার বন্ধু। সাফল্য কামনা করলাম তাঁর বাহিনীরও—প্রতিটি দলের উড্ডীন জাতীয় পতাকার সঙ্গে সোভিয়েত সামরিক সম্মানসূচক রিবন বাঁধা। আধঘন্টার মধ্যে গোলন্দাজ বাহিনীর ভারী কামানের গোলার আগুন আর গুম গুম আওয়াজে পর্বতমালা কেঁপে উঠল। বাইনাকুলার দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম ধূসর সব মূর্তি, সেই অনাবৃত, খোলা, লালচে পাহাড়ের গা বেয়ে চার হাত পায়ে হামা দিয়ে কষ্ট করে উঠছে। পাহাড় আমাদের সামনের দিকে, সীমান্ত রেখার ওই দিকে, চেকোস্লাভিয়ার সীমানায়। পাহাড়ের দুই ঢালের মিলিত প্রান্তরেখায় কামানের ধোঁয়ার নীল ওড়না পরানো। ওখানেই জার্মান মেশিনগানগুলো বসানো আছে। সেই ধূসর মূর্তিগুলো কেবলই ওপরে, আরও, আরও ওপরের দিকে উঠেই চলল, নিজেদের মাঝখানে তারা বহন করে নিয়ে চলেছে একটা লাল, নেভি আর সাদা বিন্দু—তাদের পতাকা। আক্রমণকারীদের মধ্যে সেই পতাকা দুলতে লাগল। যে সৈনিক সেটি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, সে পড়ে গেল, তবু পতাকা এগিয়ে চলতে লাগল…অন্য কেউ নিয়ে যাচ্ছে…তৃতীয় জন…পঞ্চম …ইতিমধ্যে সেই ধূসর মূর্তিগুলোর অনেকেই চড়া রোদ বেঁধা পাহাড়ের গায়ে পড়ে গেছে, তবু সেই পতাকা পাহাড়ের দুটি ঢালের সর্বোচ্চ চূড়ায়, সেই পতাকা উড়ছে। উড়ছে স্বদেশের শত্রু অধিকার মুক্ত প্রথম মাটির কয়েক কিলোমিটারের ভিতরে।

দূর পাহাড়ের সুরক্ষিত অবস্থান থেকে শত্রুপক্ষীয় গোলন্দাজ বাহিনী হিংস্রভাবে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করেই চললো। ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া এখানে ওখানে যেন তরঙ্গায়িত হতে থাকল। পুরো পাহাড় যেন ঢেকে গেল আবছা বাদামী ধোঁয়ায়, কিন্তু সেই ধোঁয়ার

মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল একটি বিন্দু : চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় পতাকা উড ডীন, চেকোস্লোভাকিয়ার শত্রু মুক্ত ভূমির ওপর।

আমি এক ঝলক জেনারেলের দিকে তাকালাম। যুদ্ধের আঁচে তার মুখ তখন রক্তবর্ণ। তার মাথায় তখন আর টুপি নেই। বাতাসে তার একগোছা পাকা চুল এলোমেলো। তাঁর মুখ আগের মতই শান্ত। কণ্ঠস্বরে সেই আগের দৃঢ়তা আর স্থির সঙ্কল্প নিয়েই তিনি সংক্ষিপ্ত সব আদেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর হালকা রঙের দুই চোখ, অশ্রু সজল বোধ হয় তিনি নিজেও ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। যখন কাছাকাছি কোথাও বিস্ফোরিত হলো কোন মাইন, উৎক্ষিপ্ত হল মাটি, তিনি সেদিকে এক ঝলক ফিরেও দেখলেন না, এমন গভীর নিমগ্নতায় তিনি সেই যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন···

···এইসব আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম চেকোস্লোভাকিয়ার মন্ত্রী যিনি সোভিয়েত সাংবাদিকদের সম্মানে সাদর ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, তার দপ্তরে ছোট ছোট পেয়ালায় দেওয়া কফিতে চুমুক দিতে দিতে।

সাধারণতঃ যেমন পেয়ে থাকে তার থেকে আলাদা এক উপহার পেয়েছিলাম আমরা, আমাদের এই ভ্রমণের শেষে। যে সব অজস্র চেক ও স্লোভাক পত্রপত্রিকা আর স্মারক আমরা যাবার সময় সেখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলির কথা বলছি না।

রুদে প্রাভোর সম্পাদকীয় দপ্তরে এখনো অপ্রকাশিত এক গ্রন্থের প্রুফ উপহার হিসেবে আমাদের দেওয়া হয়। জুলিয়াস ফুসিক নামে এক সাংবাদিক গ্রন্থটির রচয়িতা। যুদ্ধের আগে লেখক, মস্কোতে এই পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি গুপ্ত প্রতিরোধের যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে গেস্টাপোদের কাছে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হয়, যারা তাঁকে কারারুদ্ধ করে, বিচার করে ও মৃত্যুদণ্ড দেয়। একটা পুরোন জেলখানায় তিনি ফাঁসির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও তিনি ছিলেন একজন লড়াকু কমিউনিস্ট ও সাংবাদিক। সিগারেটের কাগজের ওপর তিনি তাঁর হাজত বাসের সব কথা লিখে, সেখানের এক চেক প্রহরীর মাধ্যমে সেই কাগজগুলো পাঠিয়ে দেন। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি লিখেছিলেন।

কারারক্ষী সেই চেক যে লেখা কাগজগুলি গোপনে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সে পাণ্ডুলিপিগুলি ফুসিকের বন্ধুদের হাতে তুলে দেয়। আর এইসব লেখা নিয়ে এই গ্রন্থ, যার নামটা কানে শোনায় কিছু অন্যরকম: *ফাঁসি কাঠ থেকে পাঠানো একটি সাংবাদিক বিবরণ।* অদ্ভুত, কিন্তু যথার্থ।

"বোরিস, কমিউনিস্ট দুনিয়াতে এই বইটির সম্ভাবনা প্রচুর", মেরি মাজেরোভা বললেন, "আমি জানি সোভিয়েতের জনসাধারণ তাদের আদর্শের প্রতি নিবেদিত আর তারা বীর…তারা এই বইটির কদর বুঝবে। তোমরা ইতিমধ্যেই আমাদের *ব্রেভ সোলজার সচওএইক* পড়েছো, এখন আমাদের চেক লেখক জুলিস ফুসিককে তোমাদের জানা চাই।" মুদ্রকের প্রাপ্য প্রুফ কপি; তাঁর ছোট্ট হাতে সেটি ভাঁজ করতে করতে তিনি বললেন, "তার সম্বন্ধে তোমাদের সত্যিই জানতে হবে।"

আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই উপহার গ্রহণ করলাম ও কথা দিলাম যে সেটি আমরা মস্কো পাঠিয়ে দেবো। সেরগেই ক্রুশিনস্কি, যে চেক ভাষা সামান্য জানত, সে প্রুফ কপিগুলো ট্রেনে পড়তে পড়তে তার মধ্যে পুরো ডুবে গেল।

"চমৎকার বই", ক্রুশিনস্কি বলল। ও কিন্তু সহজে কোন কিছুর প্রশংসা করত না, আর উচ্ছ্বসিত সব মন্তব্য ছিল ওর অপছন্দ।

আপাততঃ ও যা বলছে তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে……

তাহলে, ইস্টারের ঘন্টা ধ্বনির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের স্মৃতিতে আমরা সাগ্রহে আমাদের ভাণ্ডার ভরে নিলাম। ন্যুরেমবার্গে, 'খালোডিয়ানদের আস্তানায়' সিঁড়ির নীচে আমার ছোট ঘরে যখন আমি আবার ফিরে এলাম তখন ছুটিতে এই ভ্রমণের কোন স্মৃতি সর্বোজ্জ্বল তা বোঝার চেষ্টা করলাম। সে বস্তু হল আমি স্থির বুঝলাম, আমাদের দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বের অনুভূতি। সেটাই এই ভ্রমণকে আলোকিত করে আছে।

সে যাই হোক, তাদের আমরা কে? আমরা কেবল কয়েকজন সাংবাদিক। যাদের অনেকেই হঠাৎ সুযোগ পেয়ে সে দেশে বেড়াতে গেছি। যে দেশ আমরা নিজেরা দেখে এলাম, যে দেশ দেখতে পৃথিবীর অন্য কোন যেকোন দেশের চেয়ে বেশী সংখ্যক সাংবাদিক পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে আসে। আমাদের কাছে ডলার নেই, পাউণ্ড নেই, সুইস ফ্রাঙ্ক নেই অথবা

চাহিদা আছে এমন কোন মুদ্রা আমাদের কাছে নেই—যেগুলির প্রাপ্তিযোগ সম্ভাবনা একজন অতিথির প্রতি মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের গায়ে ছিল লাল ফৌজের ওভারকোট, আর সেটাই খুলে দিয়েছিল লেখকদের বাড়ি, শিল্পীদের স্টুডিও, ক্লাব আর মানুষের হৃদয়—সব দরজা।

লাল ফৌজ তার বিজয় বৈজয়ন্তীর মাধ্যমে আমাদের সোভিয়েত জনসাধারণের জন্যে যে সম্ভ্রম আর ভালবাসা এনে দিয়েছে, অবরোধ মুক্ত দেশগুলোয় যে মানবিক ব্যবহার এনে দিয়েছে আমাদের প্রতি, সেগুলি যখন বিবেচনা সহকারে বুঝতে পারা যায় তখন এটাও হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে যুদ্ধের পরও প্রমাণ করতে হবে যে এ ভালবাসা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাপ্য। প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের এইকথা অনুধাবন করা চাই যে সে যখন কোন বিদেশের মাটিতে, সেখানে সে তার দেশের দূত, প্রতিনিধি।

১৫। কুমীরের কান্না

ইস্টারের ছুটি শেষ। আমরা আবার ওক কাঠের প্যানেল লাগানো বিচার সভা কক্ষে। শামুকের গতিতে হামা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিচার। কবে যে তা শেষ হবে, তা এখনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হাতল-ওয়ালা আরামদায়ক চেয়ারগুলোয় আমরা আবার বসেছি। একের পর পর এক সাক্ষী আসছে সাক্ষীর পাটাতনে, আর দোভাষীদের নানা কণ্ঠস্বর গুন গুন করছে নানা ইয়ার ফোনে।

সেদিন সাক্ষীর পাটাতনে দাঁড়াল নাজী দলের বৈদেশিক নীতির বিষয়ে কমিশনের তথা রেইখ মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী, যোয়াচিম ভন রিববেনট্রপ। হিটলারের ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফার, হেইনরিখ হফম্যানের সংরক্ষণাগারে রাখা রিববেন ট্রপের ছবি দেখেছি। সে ছবিগুলো তখনকার, রিববেনট্রপ যখন তার জীবনের শীর্ষে। একটা ছবিতে দেখা যায় সে নিখুঁত সান্ধ্য পোশাক পরে আছে, পোশাকের ছাঁটকাট দর্শনীয়। অনেক সামরিক সম্মান লাগানো তার ভাঁজ করা কলারের ওপর, আর বাটনহোলে, অর্থাৎ কোটে যেখানে ফুলের কুঁড়ি লাগানো হয়, সেখানে ঝুলছে নাজী দলের স্বর্ণ পদক। তার মুখে দৃষ্টিকটু ভাবে আত্মতৃপ্তির হাসি, হাতে শ্যাম্পেনের পাত্র। আর একটা ছবিতে দেখা যায়—যখন সে মিউনিখ চুক্তি সম্পাদন করছে—সে

শর্তমূলকভাবে আত্মসমর্পণকারী ভালাডিয়েরকে দেখাচ্ছে কোথায় সই করতে হবে। এই ছবিতে রিববেনট্রপের ভঙ্গী তর্জন গর্জন করে শাসানোর। আর এক ছবিতে হাঙ্গেরীর একনায়ক এ্যাডমিরাল হোরথির—কোন নৌবহর ছাড়াই যে একজন এ্যাডমিরল—কাছ থেকে সামরিক সম্মানসূচক কিছু গ্রহণ করছে। সংক্ষেপে, রিববেনট্রপ ছিল একজন আত্মতুষ্ট ফুলবাবু, ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে যার প্রচুর দর্প ছিল।

প্রতিবাদী আসামী রিববেনট্রপের সঙ্গে রেইখ মন্ত্রী অমাত্য যোয়াচিম ভন·রিববেনট্রপের মিল ছিল যৎসামান্য প্রায় না থাকার মতোই—সে এখন শীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, ভীত। আর বিচারকবৃন্দ, বিভিন্ন অভিযোক্তা এমনকি সাক্ষীদের দিকেও চায় যেন দুঃখী দুঃখীভাবে, কত অনুগ্রহভাজন। রিববেনট্রপের এজাহার যখন আমরা মন দিয়ে শুনছিলাম তখন মনে পড়ে যাচ্ছিল ভারতীয় প্রবাদ যে কুমীর যখন তার শিকারকে গোগ্রাসে গেলে, তখনও সে দরদর করে চোখের জল ফেলে, কাঁদে।

বেশী দিনের কথা নয়, তৃতীয় রেইখের সবচেয়ে ক্ষমতাবান কুটনীতিবিদ হিসেবে নাজী বৈদেশিক নীতির অবদান স্বরূপ সারা পৃথিবীতে এই লোকটা জুগিয়েছি নানা প্রবোচনামূলক ইন্ধন, আলোচনার সময় অবলম্বন করেছে এড়ানোর কৌশল, আর প্রতারণা করেছে নির্লজ্জের মতো। এতদিনে আইন ঘটিত নানা ব্যাপারে আমরাও আর বালকটি নেই। প্রতিবাদী আসামীর পক্ষে উকিলরা নানা সাক্ষ্য উপস্থাপন করলেন, তার থেকেই আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম, প্রতিবাদী পক্ষের আত্মরক্ষার্থে মূল কথাটা কি হতে পারে। পৃথিবীতে শান্তি ছাড়া আর কোন স্বপ্ন সে দেখেনি। শান্তি কপোত হিসেবে এই নাজী শকুনকে পেশ করার চেষ্টা নিতান্তই সূতো বার হয়ে যাওয়া জীর্ণ পোশাকের মত হবে। এই মতলবেরও একটা দূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল: রিববেনট্রপকে চুণকাম করে, নাজীদের সমগ্র কুটনীতির যে মূল কথা ও উদ্দেশ্য সেটিকেই সার্থক প্রতিপন্ন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব দায় আর দোষ নাজী আগ্রাসনে যে সব দেশ বলি হয়েছে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর চাপানো।

প্রতিবাদী আসামীর আত্মরক্ষার সমর্থনে, সাক্ষীদের চিত্রনাট্য সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার পর, রিববেনট্রপের পক্ষের আইনবিদ সয়টার, এই রাস্তাতেই

মিথ্যার পর মিথ্যার মার্কামারা অদ্ভুত অযৌক্তিকতা তার ফলে উদ্ভূত হাস্যকর রগড় সত্ত্বেও, তাঁর সাক্ষীদের বয়ান পেশ করলেন।

জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রকের পূর্বতন রাষ্ট্র সচিব ব্যারন ভন স্টীনগ্র্যাচটের বয়ান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে হিটলার, গোয়েরিং আর হেস্‌স ছিল মার্কামারা নাজী, অর্থাৎ—সাক্ষী যেমন সাহসে ছাতি ফুলিয়ে বলল—তারা ছিল ভুঁইফোড, দুর্বৃত্ত আর বদমাস, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে যারা অপরাধী। কিন্তু যোয়াচিম ভন রিবেনট্রপ—না। ভগবান না করুন! তেমন কেউ নয়, তেমন কিছু নয়! উনি নাজী দলে যোগ দিয়েছিলেন পরের দিকে, আর তাও কূটনীতিবিদ হিসেবে, নিজের জীবনের উন্নতির জন্যে। স্টীনগ্র্যাচটের বয়ান অনুসারে রিবেনট্রপের মন্ত্রক ছিল পুরাতন জার্মানীর ছোট আশ্রয়স্থল। যেখানে,—নাজী নীতি সত্ত্বেও—লোকেরা ছিল কাইজারের শাসনকালীন জার্মানীর অনুরূপ যারা তাদের সর্বশ ক্তে চেষ্টা করতো শান্তি আর ভালো প্রতিবেশীসুলভ সখ্যতার নানা নীতি কার্যকরী করতে।

এই সরলমনা সাক্ষীর দেওয়া এজাহার আদালত ঘরে উদ্রেক করল হাসি আর বিস্ময়ের খোরাক, আর কাঠগড়ায় অনেককে করল অত্যন্ত অস্থির, উদ্বিগ্ন, বিচলিত এবং উত্তেজিত। রিবেনট্রপের পড়শী হেস্‌স আর কেইটেল ঘন ঘন রিবেনট্রপের দিকে ঝুঁকে ক্রুদ্ধভাবে তার কানে কানে কিছু বলতে লাগল। কাঠগড়ার ওপর তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তার কানে কানে যে ফিস ফিস করা ধমক দিচ্ছিল, তাতে বেচারা রিবেনট্রপের কানে লাগছিল নিশ্চয়ই কেননা সেই সারল্যের প্রতিমূর্তি সাক্ষী, তার ভূমিকা—যে ভূমিকা সয়টার তাকে দিয়েছিল—তা পালন করতে গিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি অভিনয় করে ফেলছিল।

মনে মনে যে হিসেব করে যে সূত্র ধরে এগোচ্ছিলেন সে হিসেবের গোলমেলে সবদিক যথেষ্ট ফুটে ওঠা সত্ত্বেও রিবেনট্রপের আইনবিদ সেই সূত্র ধরেই চললেন। পরের সাক্ষী, মারগারেট ব্ল্যাঙ্ক। সেই মহিলা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালকে জানালেন যে প্রতিবাদী আসামী ছিলেন বিশেষ দয়ালু, কঠোর পরিশ্রমী একজন মানুষ, ভালো স্বামী এবং পিতা, যিনি স্বেচ্ছায় দরিদ্র লোকেদের সাহায্য করতেন। পৃথিবীতে শান্তির জন্য সর্বান্তঃকরণে তিনি দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘুরেছেন এবং অনেক সময় সরলভাবে সেই মহিলাকে বলেছেন জার্মানীর আগ্রাসী নীতি নিয়ে তাঁর মনের নিদারুণ

যন্ত্রণার কথা। তাঁর মানসিক যন্ত্রণা এত তীব্র ছিল যে যখনই জার্মানী কর্তৃক এক নতুন আগ্রাসী অভিযান সংঘটিত হত তিনি ঘুমোতে পারতেন না, ঘুমের বড়ি খেতেন, সেই সব ঘুমের বড়ি যে শরীরের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা জেনেও।

আমরা বসে বসে এইসব ঝুড়ি ঝুড়ি অর্থহীন বাজে কথা শুনছিলাম। শুনে মজা লাগছিল, আবার আপত্তিকরও মনে হচ্ছিল, কথাগুলোকে। এই সাক্ষী তার এজাহার দিচ্ছিল কখন? না, যার আগেই অভিযোগকারী পক্ষ নাজীদের গোপন আলমারী থেকে নামিয়ে আনা শত শত দলিল পেশ করেছেন, যা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করে যে ইন্ধন জোগান ও ধ্বংস করার চেষ্টার কাজে রিবেনট্রপের কৌশল আর পরিকল্পনা—মিথ্যা চুক্তি, মিথ্যা অঙ্গীকার সেইসব দলিলে প্রমাণিত যে হিটলারের আগ্রাসী সব নীতি, কেমন নির্দ্বিধায় রিবেনট্রপ বয়ে বেড়াত।

তারপর রিবেনট্রপ নিজেই দাঁড়াল সাক্ষীর পাটাতনে—রিবেনট্রপ, নাজীবাদের অন্যতম জঘন্য প্রতিনিধি। রিবেনট্রপ, সেই ভণ্ড কপটাচারী এবং অভিনেতা, যে একটা দেশের পর আরেকটা দেশ, গোগ্রাসে গিলে খেয়েছে, আর সেই একই সময়ে মারগারেট ব্ল্যাঙ্কের কথা অনুযায়ী তার শিকার বা জীবন্ত বলিদের পরিণতি দেখে চোখের জল ফেলেছে।

রিবেনট্রপকে একটি মেষশাবক করে দেখানোর জন্যে, তার পক্ষের আইনবিদদের চেষ্টা দাঁড়াল না। দাঁড়াচ্ছে না যে তা সবাই স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। কিন্তু আসামীর আত্মরক্ষার পক্ষে চিত্রনাট্যটি নতুন করে লেখার পক্ষে তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর তাই, নাজীদের প্রতিটি আগ্রাসী আক্রমণ যে তাকে কি গভীর হতাশা আর তীব্র মানসিক বিষণ্ণতা দিয়েছে, সেইসব কথাই রিবেনট্রপও খুব ফলাও করে বর্ণনা করতে লাগল। এইসব কথায় উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের ঠোঁটের কোণেই যে ব্যাঙ্গের হাসি ফুটে উঠছিল তাই নয়, কাঠগড়ার ওপর রিবেনট্রপের প্রাণের বন্ধুরাও তেমনই হাসছিল।

তথাপি এই মার্কামারা মিথ্যুক বিষণ্ণভাবে এই জবাবদিহি করে বলল যেসব দেশ, যাদের সঙ্গে জার্মানী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল অথবা যাদের সঙ্গে জার্মানীর বন্ধুত্ব ছিল, সেইসব দেশ যদি জার্মানী আক্রমণ করে থাকে, তবে তাহলে সে সেই আক্রমণ করেছে—এই ধরনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা

করবার জন্যে। এছাড়া, রিবেনট্রপ কৈফিয়ত দিল যে জার্মানীর আর কোন বিকল্প ছিল না। বদমাশ ভণ্ডদের এই পালের গোদা, জেনে বুঝে, ইচ্ছা করে কথা বলছিল কলা কৌশলহীন হাস্যকর সরলতায়। এর আগে দেওয়া অজস্র সাক্ষ্য, পেশ করা সত্য ঘটনা, দলিল, নানা প্রমাণ, ইত্যাদির কোন কিছুর দিকে দৃকপাত না করে, রিবেনট্রপের আইনজীবী এক আদিম নক্সা ধরে এগোবার চেষ্টা করল, যার পথরেখা নিম্নরূপ—

পোল্যাণ্ড? আমরা কি করতে পারতাম? আর কি করা যেতে পারত? রিবেনট্রপ নিজে এবং আর আর সব জার্মান কূটনীতিক নিজেরা তাদের ক্ষমতা ও আওতার মধ্যে যা কিছু ছিল সব খাটিয়ে এই একগুঁয়ে জেদী, অবাধ্য দেশ যারা জার্মানীকে আক্রমণের হুমকি দিচ্ছিল, তাদেরকে বোঝাবার, সংযত করার বহু চেষ্টা করেছে। পোলরা সীমান্ত আক্রমণ করে, আর শেষ পর্যন্ত হিটলারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। জার্মানীকে রক্ষা করার জন্যে সে তার সৈন্য পাঠিয়েছিল। আর এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া তার ওপর অর্থাৎ রিবেনট্রপের ওপর ছিল বিভীষিকাময়। কিন্তু পোল্যাণ্ড যদি তার পরামর্শ আর নানা সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে থাকে, তাহলে সে কি করতে পারে? এই ঘটনার পর, মানুষের সভ্যতা যে বিপদের মুখোমুখি, সেই বিপদের কথা ভেবে ভেবে তার রাতের পর রাত, সে বিনিদ্র কাটিয়েছে, এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারে নি।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স? যাতে জার্মানী পোল্যাণ্ডকে বিনা প্রতিরোধে, নিঃশব্দে গিলে খেয়ে হজম করে ফেলতে পারে তার সুযোগ দেওয়ার জন্যে, এক্ষেত্রেও সে নিজে এবং তার ফুয়েরার এই দুটো একগুঁয়ে আর জেদী দেশকে যতভাবে সম্ভব বুঝিয়েছে। যখন এই দুটো দেশ তাদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যে চুক্তি ছিল, সেই চুক্তিকে মান্য করল আর যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানীর বিরুদ্ধে তখন হিটলার যে কত হতাশ আর রিবেনট্রপ যে কত দুঃখ বোধ করেছিল!

নরওয়ে ডেনমার্ক? ওহহো, যোয়াচিম রিবেনট্রপ তার সেই শৈশব কাল থেকে ভাবপ্রবণ। এক ধরনের কোমল দরদ বোধ করত সে। সেখানকার লোকেরা কঠোর পরিশ্রমী, আর তারা নোরডিক শোণিতসম্ভূত, নিশ্চয়ই। কিন্তু কি আপনি করতে পারেন? এইসব দেশের সঙ্গে সম্পাদিত জার্মানীর সব চুক্তি ভেঙে ফেলতে বাধ্য করা হল জার্মানীকে। আর সেই দেশ দুটিকে নিজ অধিকারে ও অধীনে আনতেও বাধ্য হল

জার্মানী। কেন? একটা বড় মাপের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী যদি এই দুই দেশে সংঘটিত হয়, তাহলে এইসব চমৎকার নরওয়ে অধিবাসীরা আর কঠোর পরিশ্রমী ডেনমার্কবাসীরা, তাদের মাটিতে অভিনীত যুদ্ধ-নাটকের চূড়ান্ত অন্তিম দৃশ্যে যে অবস্থায় পড়বে ত'র থেকে তাদের বাঁচাবার আর তাদের রক্ষা করার জন্যেই তাদের সঙ্গে জার্মানীর এই চুক্তি ভঙ্গ, তাদের দেশ অধিকার করা।

লুক্সেমবার্গ? মানতেই হবে এটা দুঃখের ব্যাপার একটা। জার্মানীকে লুক্সেমবার্গ অধিকার করতে হয়েছিল, অধিকার করাটাই জরুরী হয়েছিল বলে। জার্মানীর সৈন্যবাহিনীকে পার্শ্বদেশকে আঘাত হানার জন্যে যদি বৃহৎ শক্তির মধ্যে যে কোন একটা শক্তি এই ক্ষুদ্র প্রতিরক্ষাহীন দেশটিকে অধিকার করে নিয়ে কার্যসিদ্ধির ধাপ হিসেবে ব্যবহার করার চিন্তাও করতো, তাহলে কি হতো? এসবই তো আগে থেকে ঠিকমত সাজিয়ে রাখতে হবে। ব্যাপারটা দুঃখের। কিন্তু লুক্সেমবার্গ অধিকার করা সত্যিই জরুরী ছিল জার্মানীর পক্ষে।

পররাজ্য আক্রমণ, লুক্সেমবার্গ অভিযানের এই ব্যাখ্যায় হাস্যরোল উঠল আদালত কক্ষে। চারপাশের হল্লা থামাবার জন্যে স্যার লরেন্সকে তাঁর হাতুড়ি ব্যবহার করতে হল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ অভিযান যে নানা দিক থেকে একান্তই নিছক জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এরকম একটা পরিস্থিতি বাস্তবায়িত, মূর্ত করার জন্যে বিশেষভাবে কঠিন চেষ্টা করেছিল রিববেনট্রপ। ফরিয়াদী পক্ষ ইতিমধ্যেই অজস্র সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছে—দলিল, চুক্তির খসড়া, পররাষ্ট্র দপ্তরের চাল চলন বিষয়ে হিটলারের সভাপতিত্বে নানা গোপন অধিবেশনের,—যেগুলি ওজনে ভারী। সেইসব প্রমাণ টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিয়েছে, নাজীদের বানানো যুদ্ধ আটকানোর কল্প কাহিনী। নাজীদের গোপন সিন্দুক থেকে টেনে আনা দলিলে একথা তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ অভিযান বাস্তবে সংঘটিত হবার অনেক আগে, গোয়েরিং সে বিষয়ে তার "সবুজ খসড়া" লেখার কাজ শেষ করেছে। খুঁটিয়ে রচনা করা হয়ে গেছে বারবারোসা পরিকল্পনা। "সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযান"-এর সে নক্শা ফিল্ড মারশাল আর জেনারেলরা বিশদভাবে সাজিয়েছে

মানচিত্রের ওপর, হিটলার সত্যিকার আক্রমণের অনেক আগেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ পরিকল্পনা অনুমোদন করে নিজের স্বাক্ষর দিয়েছে।

কিন্তু তবুও, আঁকড়ে থাকল সেই "লাল জুজু"'র সম্পর্কে পুরোনো কল্প কাহিনী, যে কাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, এই আদালতে একেবারেই আড়ালে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে একগুঁয়ে জিদ নিয়ে কেবলই বলতে থাকল "সেই চিরকালীন ভীতি"'র কথা যা হল পূর্ব দেশ থেকে আক্রমণ। সে তার বিবৃতির পক্ষে এই যুক্তি দেখাল যে যদিও সে স্বীকার করে যে জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রক বা সেই মন্ত্রকের প্রধান হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জার্মানী অভিযানের অভিপ্রায় প্রমাণ করে এমন কোন সত্য ঘটনার নজীর নেই—কিন্তু হিটলারের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, যা কোনদিন ভুল করতো না আর হিটলার এরকমই বুঝেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নই হল জার্মানীর প্রধান শত্রু। এইভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ অভিযানে পাঠাতে জার্মানী বাধ্য হল। এই কথা স্বীকার করে, রিবেনট্রপ আবার কুমীর-কান্না কাঁদতে আরম্ভ করল। যেদিন জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ চালাল, সেই দিনটি, তার জীবনে অন্ধকারতম দিন। সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি, ঘরময় পায়চারী করে ফিরেছে, ব্রোমাইড খেয়েছে, তাতেও যখন কাজ হয়নি তখন জোরালো ঘুমের ওষুধ খেয়েছে, যে সব সে নিজের হৃদ যন্ত্রের ও স্বাস্থ্যের জন্য এড়িয়ে যেত। পৃথিবীতে শান্তি, যা রাখার জন্যে সে মনে প্রাণে চেষ্টা করেছে, পৃথিবীতে সেই শান্তির অবসান, ভাগ্যের শয়তানী মোচড়ের আগে তার ভিতরে ঝড় বয়ে গেছে, নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়েছে সে।

তারপর সাক্ষীকে পাল্টাজেরা করার জন্যে একের পর এক উঠে দাঁড়াল অভিযোগকারী পক্ষের আইনজীবীরা। তাদের প্রশ্নবাণ আর বাঁকা কণ্ঠে সমুচিত প্রত্যুত্তর এই ভদ্র দর্শন মস্ত বড় নাজী শয়তান লোকটার মুখ থেকে সাজগোজ করা ভণ্ডামীর সব প্রসাধন চিহ্ন মুছে দিল দ্রুত ও নিঃশব্দে। বিভিন্ন গোপন সব সভায় আর অধিবেশনে তারই দেওয়া ভাষণের অংশ উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে তুলে, তার দেওয়া নির্দেশ, তার দেওয়া হুকুম, নানা লিখিত বিবরণ, টেলিফোনে তার কথাবার্তার রেকড, এইসব দিয়ে রিবেনট্রপকে যেন দেওয়ালে ঠেসে ধরে পেরেক ঠোকা হল। রিবেনট্রপের আত্মবিশ্বাস শুকোতে আরম্ভ করেছিল। এই নিরীহ

কপোতের পাখার পালকগুলি খসে পড়ছিল একটা একটা করে। আর এইসব থেকে বার হয়ে এল শকুনের রক্তাক্ত ঠোঁট : জেরার শেষে, রিবেনট্রপ বাধ্য হল গোড়ায় যে সব কথা বলেছিল, শেষের দিকে ঠিক তার বিপরীত কথা বলতে। এবং পরিশেষে, সোভিয়েত পক্ষের মুখ্য অভিযোক্তার সহকারী আইনজীবী য়ুরি পকরোভস্কির পেশ করা অকাট্য প্রমাণের চাপে রিবেনট্রপ স্বীকার করল যে যখন সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তির কথাবার্তা বলছে ও অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করছে, তখনই সে জানতো যে নাৎসী দলের মূল নেতৃত্ব ও সেনাবাহিনীর সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনা আছে ও তারা সে ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নাৎসী জার্মানীর বিশ্বাসঘাতক বৈদেশিক নীতির এই দালালের সব ভণ্ডামি—বস্তুতঃ যা সে ছিল—সব মুখোশ খুলে দেওয়ার পর জেরায় জেরায় বার হয়ে পড়ল রিবেনট্রপ রূপী মানুষটার চেহারা—গোয়েরিংয়ের মত সেও এক নির্মম হৃদয়হীন চোর। পাঁচটা জমিদারী হয়েছিল তার। জার্মান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণে ছিল তার প্রাসাদোপম নানা অট্টালিকা। বিভিন্ন শহরে ছিল তার মানানসই নানা মাপের বাসা বাড়ি। এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সে পদ্ধতিগতভাবে আর অবিচ্ছিন্ন ভাবে কেবলই দাবী করত যে যুদ্ধ করার শর্তে জার্মানীর তাঁবেদার সব রাষ্ট্রে আর তার অধীনস্থ লোকেরা জার্মানী অধিকৃত সব রাষ্ট্রে ইহুদী জনসাধারণকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে কাজে লেগে থাকবে। যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সে জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র ইতালীকে বাধ্য করে ড্রাকোনিয়ান পদ্ধতি নিতে। এই পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্গত "মৃতের এলাকা" গঠন করা ও নির্বিরোধী শান্তিপূর্ণ জনগণের সম্পূর্ণ হত্যা। রিবেনট্রপ নিজে হিটলারের কাছে লিখিত আবেদন করেছিল *এস এস* "ডেড হেড" বিভাগে তাকে তালিকাভুক্ত করার জন্যে, প্রার্থনা করেছিল *এস এস* সেনাপতির পদমর্যাদা। এবং পরিশেষে এই শাখার সম্মান পদক দিয়ে হিমলার, রিবেনট্রপকে ভূষিত করে ছিল। সেই সম্মান পদক হল এক বিশেষ ধরনের ছোরা।

রিবেনট্রপের কূটনৈতিক "ক্রিয়াসমূহ" ফাঁস হয়ে গেল, আদালত কক্ষে হাস্যরোল আর দেখা গেল না, তার জায়গায় এলো সকলের ক্রোধ, ঘৃণা আর বিরাগ। হাস্যরোল অবশ্য আবার উঠল, যখন য়ুরী পকরোভস্কি, পররাষ্ট্র

মন্ত্রকের রিবেনট্রপের অধীনস্থ প্রোটোকল বিভাগের প্রধান আর রুমানিয়ার একনায়ক আইওন এনটোনেসকুর কথাবার্তার প্রতিলিপি আদালতে পেশ করলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল প্রথম চার্লস সম্মান পদক। রিবেনট্রপ যাতে ওই সম্মান পদক পায়, তার জন্যে ওই কূটনৈতিক কর্মীর চেষ্টা, এই সব বিশিষ্ট সম্মান চিহ্নের জন্যে লালায়িত ছিল রিবেনট্রপ। দুজন অংশগ্রহণকারীই, ঘোড়ার মেলায় যেমন তুমুল দর কষাকষি করে, যেমন "তুমি আমাদের ওটা পাইয়ে দাও, বিনিময়ে আমরা তোমাকে ট্রান্সিলভানিয়া দোব।" পরে অবশ্য জানা গেল যে অন্য আর একটা সম্মানের পরিবর্ত হিসেবে রিবেনট্রপ ইতিমধ্যেই হাঙ্গেরীয় একনায়ক এ্যাডমিরল হোরথিকে ট্রান্সিলভানিয়া দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রিবেনট্রপ সেই সম্মানটি পরে পায়। দুজনের কথাবার্তার আদবকায়দা বিচার করলে বোঝা যায়, যে কোন অর্থেই এ্যানটোনোকিউ-এর ব্যবসা বুদ্ধি কম ছিল না, সে সাফ জবাব দিয়েছিল "ট্রানসিলভানিয়া নেই—সম্মান পদও নেই।"

"ঠিক আছে, সম্মান পদকটা আমায় পাইয়ে দাও, রেইখমন্ত্রী তোমার জন্যে যা কিছু পরে করবে।"

"না, আগে যা ও পারে তাই করুক, তারপর ওর সম্মান পদক পাবে"।

বহুক্ষণ ধরে কেবলই অনেক দর কষাকষি করে দুজনে নিম্নলিখিত মীমাংসায় এলো—আপাততঃ এ্যানটোনস্কি রিবেনট্রপকে সম্মান পদকটা পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু প্রাপকের ওটা ব্যবহার করার অধিকারী হওয়ার জন্যে লাগসই যেসব কাগজপত্র লাগবে বিশেষ বাহক মারফৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে তখনই, যখন রিবেনট্রপ ট্রান্সিলভানিয়ার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে। সংক্ষেপে, সম্মান পদক আদায় করার জন্যে রিবেনট্রপের ব্যবহার ছিল এখানে ন্যুরেমবার্গের মেয়েদের সঙ্গে আমেরিকান সৈনিকরা যেমন ব্যবহার করতো, সেইরকম। ভালবাসা আর স্নেহের প্রতীক হিসেব জোড়া মোজার একটা দেওয়া হত প্রথমে, তারপর উচ্চপদস্থ দুই পক্ষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা আরও বাড়লে, দেওয়া হত অন্যটা।

সেই নাজী কুমীর, যে শুরুতে তার যে সব শিকার, যাদের সে গোগ্রাসে গিলেছিল, তাদের জন্যে যে কুমীর কান্না কেঁদেছিল, সেই কুমীরের আসল চেহারা প্রকাশিত হয়ে পড়ল, যা করুণার যোগ্য, হাস্যকর আর ঘৃণ্য। যথারীতি তার নিজস্ব কৌশল প্রকাশ করে সে আদালতে নিজেকে ঘিরছে

চেষ্টা করেছিল ধোঁয়ার পর্দায় কিন্তু সেই পর্দা হটে গেল দ্রুত, আর ওর মুখের সত্যিকারের চেহারা গোপন করার কিছুই থাকল না।

সেই আমেরিকান সৈনিক যার স্মৃতি শক্তি ছিল উল্লেখযোগ্য, আর যে আসামী প্রতিবাদীদের নিজেদের মধ্যে বলা কথা মাথায় পুরে রাখত সে সাংবাদিকদের জানাল যে গোয়েরিং ইচ্ছে করে জোর গলায় হেস্‌কে বলেছিল, "এই রেইখ মন্ত্রীর শাশুড়ী, যিনি একজন খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা, তিনি মনে করতেন যে তাঁর এই জামাইটাই সবচেয়ে উজবুক, আর তিনি এই ভেবে খুব অবাক হতেন যে তাঁর সেই উজবুক জামাই তার নিজের জীবনে এমন দারুণ উন্নতি করলো কি করে।" এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ভদ্রমহিলা কেমন নির্ভুল চিনেছিলেন ওকে।

১৬। একজন "মোলদাভীয় বোয়ারের" দুঃসাহসিক অভিযান

সেই সকালে 'প্যালেস অফ জাসটিসে' আমার সহকর্মীরা বেশ ভালো একটা মজা করল আমার সঙ্গে! তারা বলল, "তোমার একটা টেলিগ্রাম এসেছে, *ওকতিয়াবর* কাগজ থেকে। পাঠিয়েছে তোমার বন্ধু পানফিওরভ। তুমি যে গল্পটা পাঠিয়েছো তা ওই কাগজে প্রকাশ করা যাচ্ছে না, কেননা ওদের হাতে ইতিমধ্যেই অনেক লেখা জমে আছে, তাই ওরা লেখাটা অন্য একটা কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে কাগজটার নাম *দি ওয়্যান ওয়ার্কার*।"

এ কথা কি বিশ্বাস্য? বোঝাই যাচ্ছে যে ওরা বঁড়শিতে টোপ ফেলেছে। আমিও কম চালাক নই। ভান করলাম যেন আমি এ ব্যাপারে উদাসীন, কোন মাথা ব্যাথা নেই আমার। বললাম যে আমি এরকমটাই আশা করেছিলাম, সুতরাং গিয়ে টেলিগ্রাম আনার কোন দরকার নেই।

যারা মজা করতে চেয়েছিল, তারা যখন দেখল যে কোন ফল হল না, তখন ওরা কেবলই বলতে থাকল যে আমি যেন গিয়ে টেলিগ্রামটা নিয়ে আসি। আমি তাদের জানিয়ে দিলাম যে তারা জাহান্নমে যেতে পারে। ওদের মধ্যে একজনের বোধ হয় কোনরকম বিবেক দংশন হল। সে টেলিগ্রামটা এনে দিল। তাতে লেখা—

"মস্কো থেকে *প্রাভদার* সাংবাদিক প্রতিনিধি কনে'ল পোলেভয়কে। *ওকতিয়াবর* পত্রিকার সম্পাদকেরা আপনার গল্পটি পড়েছেন। চমৎকার লেখা। অভিনন্দন। সামান্য সম্পাদনার দরকার। পসপেলোভের সঙ্গে কথা বলেছি, আপনি কাজের জন্যে মস্কো আসবেন, তাতে সে সম্মতি দিয়েছে। পত্রিকার জন্যে ইতিমধ্যে হাতে অনেক লেখা জমে গেছে, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার লেখার জন্য জায়গা খুঁজে নেওয়া হবে। সাদর সম্ভাষণ। আপনার দ্রুত প্রত্যাবর্তনে অপেক্ষায়। পানফিওরভ, ইলিয়েনকভ, সাননিকভ, রুমিয়াস্তসেভা।"

দারুণ খবর! তবু যদি ওরা মজা করার জন্যে কিছু করে থাকে, এই সন্দেহে টেলিগ্রামটাকে খুঁটিয়ে দেখলাম। না, এতে কোন ভেজাল বা গোলমাল নেই। আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুন্যালের সূচক সংখ্যার ছাপ এতে রয়েছে। আমি ওটা সাবধানে লুকিয়ে রাখলাম।

সেদিন ডেভিডের পানশালায়, আমরা, সমস্ত দেশ থেকে আসা সব সাংবাদিকের জন্যে একটা জমায়েতের আয়োজন করেছিলাম। যেহেতু সেখানে কোন দোভাষী ছিল না, বিদেশী সংবাদপত্র কর্মীরা বুঝতে পারেনি যে আমরা কেন উৎসব করছি। কিন্তু তারাও সানন্দে টোস্টে যোগ দিল ও মদ্যপান করল। আমার বই-এর কথা তখন সবাই ভুলেছে। মোলদাভীয় কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে আমাদের এক সোভিয়েত সহকর্মী, মোলদাভীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিক প্রতিনিধি, যে এখন—অক্লান্ত *স্টারস এণ্ড স্ট্রাইপস* পত্রিকাকে ধন্যবাদ—একজন খুব জনপ্রিয়, বহুল পরিচিত লোক 'একজন "মোলদাভীয় বোয়ার।' হ্যাঁ মহাশয়, একজন বোয়ার। এই কথাটিই ঠিক, বেশী নয়, কমও নয়।

এই পরিচ্ছদের শিরোনামের একটা নিজস্ব গল্প আছে। মোলদাভীয় সাংবাদিকটি ছিল মানুষ হিসেবে সরল। বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে যে কোন ব্যাপার নিয়ে তার তুলনা করলে সে কষ্ট পাক এমন ইচ্ছা তার ছিল না। ফেবার ম্যানসনে প্রতিবার খাবার পর নিজের জায়গা ছেড়ে আসার আগে নিজের প্লেটের তলায় একটা অকুপেসন মার্ক, অর্থাৎ কম মূল্যের মুদ্রা, বকশিস হিসেবে রেখে আসত। এটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত মুদ্রায় অকুপেসন মার্ক হল আধ রুবলের সমমূল্য। এটা যে আসলে কত বোঝা যাবে এই সত্য থেকে যে আমাদের

দোকানে এক কিলোগ্রাম চীজের দাম পড়ত সত্তর রুবল। এখানে, আমেরিকান ডিভিসনের ছাদের প্রথম তলায় ডলারই সব সেখানে একটা অকুপেসন মার্ক, সম মূল্যের সোনার দামের সমান। এই করে, আমাদের মোলদাভীয়বন্ধুটি প্রচুর খাতির পেত পরিচারক ও পরিবেশকদের কাছ থেকে। তার এই খাতির ছিল এমনকি য়ুরি কোরলকভের চেয়ে বেশী, যদিও সে খাবার ঘরে কর্মচারীদের মধ্যে তার এক "যুদ্ধক্ষেত্রের কমরেড" খুঁজে নিয়েছিল, সে বন্ধু হল একজন জার্মান। যে স্ট্রারায়া রাশাতে লড়াই করেছিল, যদিও অন্য পক্ষভুক্ত হয়ে।

আমাদের মোলদাভীয়া বন্ধু, অজস্র মার্কিন সাংবাদিকের বন্ধুত্ব লাভ করেছিল। সেই নীল বড় ঘরের এক কোণে তাদের দেখা যেত প্রতি সন্ধ্যায়। আর দেখা যেত ডেভিডের পানশালার একজন ককটেল পরিবেশিকা তার অভব্য ছোট পোশাকে আর টুপি মাথায় সে তাদের চারপাশে ঘুরছে ফিরছে, আর পানীয়, স্যাণ্ডউইচ, বাদাম এ সব এনে তাদের টেবিলে রাখছে।

আমরা বিলক্ষণ জানতাম যে আমাদের বন্ধুটি ইংরেজী, ফরাসী অথবা জার্মান কোন ভাষাই বলতে পারে না। তবু, যে কোণটিতে সে থাকত, সেই কোণটিতে হ্যাঃ হ্যাঃ করে অনেকের উচ্চ হাসি আর হৈ-চৈ কথার খুব আওয়াজে ভরা থাকত। আমরা শুধু বুঝতে পারতাম "ঠিক আছে" গোছের মন্তব্য, যার সঙ্গে নানা অর্থপূর্ণ প্রকাশভঙ্গী থাকত।

"ভলোদিয়া, কি ব্যাপার বলো ত, তোমার কাছে ওরা কিসের টানে আসে? ঠিক যেন মধুর টানে মৌমাছি?" আমরা ওকে জিজ্ঞাসা করতাম।.

"শপথ করে বলছি, তোমরা বিশ্বাস করো, আমি জানি না। তবে ওরা সব ভাল লোক আর কি।"

"তুমি কি ওদের মদ খাওয়াও, নাকি?"

"না, আমরা দামটা সবাই ভাগ করে দি। তাই জানি।"

আমাদের বন্ধুটিকে নিয়ে মাতামাতির ভিতরের ব্যাপারটা কি, তা আমাদের জানিয়ে দিল *পানি* ম্যারিসিয়া। পোল্যাণ্ডের মেয়ে ম্যারিসিয়া। দেখতে ভালই কিন্তু ঠিক চেয়ে দেখলে, কেমন ভাল লাগে না। ও আগে এ্যানডারস বাহিনীতে ছিল। দরজার পাশে, ইংরেজ সেনাবাহিনীর পোশাকে বসে সে প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের খাবারে জন্যে টিকিট বিক্রী করত।

কাজটি ভারী সৌজন্যপূর্ণ। আমাদের অনুমান সে কেবল টিকিট বিক্রীই করত না। কেননা আমরা শুনেছিলাম যে প্রেস ক্যাম্পে মেয়েটির বাবাও আছে। মেয়েটির বাবা মাথায় লম্বা, চেহারায় সামরিক ছাপ, আর এই রকমই শোনা ছিল যে তিনি নাকি কোন কাগজের সাংবাদিক প্রতিনিধিও, যদিও সে কাগজটার নাম কি, তা কেউই জানত না। এবং তার মাও এখানে, চোখে পড়ার মত সোনালী চুল, বালি খড়ির মত শরীরের গঠন যাকে ম্যারিয়ার বড় দিদি বলে খুব সহজে চালানো যেত। এই দুজন, প্রধানতঃ কাজ করত "বিগ উইগ"রা যেখানে থাকত, সেখানে, গ্র্যাণ্ড হোটেলে। আর সেখানে তারা কেবলই রুশদের চারদিকে লেগে থাকার মত ঘুর ঘুর করত। যদিও তাদের সরকারী কাজকর্মের দায়িত্ব কি ছিল, তা আমি বলতে পারবো না।

এই পোলিস মেয়েটির "পরিবার" নিয়ে গল্প এতই হাল্কা নষ্টামিতে ভরা আর আদিম, যে যখনই সে আমাদের সঙ্গে গভীর আলাপ জুড়তো, তখনই তার মোদ্দা যা বলবার ছিল তা হল তার নিজের চোখ, তনু আর নিখুঁত গাত্রবর্ণ সম্পর্কে অসস্র তারিফ। যদিও সে তেমন অতিশয় আকুল কোন সমঝদার পায় নি। তার চেষ্টায় এখন পর্যন্ত বিশেষ কোন ফল হয় নি। খালি, মাঝে মধ্যে কোন কোন ভদ্রলোক তার কাছ থেকে আহারের জন্য টিকিট কিনে পয়সা দিয়ে খুচরো নিতে ভুলে যেত।

সে যাক গে, আমাদের মোলদাভীয় বন্ধুটির জনপ্রিয়তার গোপন কারণ খুঁজে বার করতে, এই মেয়েটি কিন্তু আমাদের সাহায্য করেছিল।

"*পান* কর্নেল", ম্যারিসিয়া বীয়রের টিকিট ছিঁড়তে ছিঁড়তে বেশ একটা সাড়ম্বর ভঙ্গী করে জানতে চাইল আমার কাছে, "একথা কি সত্যি যে মোলদাভীয়া *পান* একজন বোযার?"

"একজন *বোয়ার*? *বোয়ার* কাকে বলে?"

"এটা একটা রুশ শব্দ...আপনি জানেন,মোলদাভিয়া থেকে আসা একজন জমিদার, প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক।"

তারপর সেই মেয়েটি আমাকে বলল যে সকলের দৃঢ় ধারণা এই যে আমাদের ওই সরল মোলদাভীয় প্রতিবেদক বন্ধুটি সত্যিই অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক, একজন ধনী, যার একটা জমিদারী আছে, দাক্ষা ক্ষেত আছে, সুরা উৎপাদনের কারখানা আছে, আর কেবল খোদায় মালুম, যে তার আরও

কত ধনসম্পদ আছে। যদি কেউ প্রতিবার আহার করার পর বকশিস্ হিসেবে একটা মার্ক রেখে যায়, আর কয়েক চক্কোর মদ্যপানের জন্যে দিলখোলা হয়ে দাম দেয়, তাহলে এমনটিই ঘটে থাকে!

যাইহোক, এই "মোলদাভীয় নোয়ার"-এর উচ্চাশাপূর্ণ জীবন তখন সবে মাত্র শুরু। এর কদিন পরেই চারদিকে এমন রটনা শোনা গেল যে একজন আমেরিকান সামরিক বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যে মেয়েটি টিকিট বিক্রী করে, তার বিয়ে। গোটা প্রেস ক্যাম্প এই বিয়ে নিয়ে কথা বলছে। এই সময় একদিন ক্যাম্পের প্রধান, মেজর ভীন, আমাকে ডেকে থামিয়ে এই প্রস্তাবটি দিলেন, যেহেতু প্রেস ক্যাম্প-এর একজন সহকর্মী, ওর নাম কি, বিয়ে করতে যাচ্ছে, এরকম স্থির করা হয়েছে যে সে উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠানে তাদের আপ্যায়ন জানানো হবে। আর সেই বিবাহ অনুষ্ঠান কক্ষে আমন্ত্রিতদের আসনে নিয়ে গিয়ে বসানোর জন্য মিত্র শক্তির প্রতিটি পক্ষকে একজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ঠিক আছে, এ তো নিশ্চয়ই যে বিবাহ সব সময়েই এক চমৎকার অনুষ্ঠান। সুতরাং আমরাও প্রতিনিধি পাঠাব ঠিক করলাম। কিন্তু মুসকিল হল যে সেই মনোরম কনেকে যেহেতু আমাদের মধ্যে কেউই পছন্দ করত না, কে যে যাবে, তা স্থির করা মুসকিল হয়ে পড়ল। হঠাৎ আমাদের মনে হল যে আমাদের মোলদাভীয় সহকর্মীর পাশ্চাত্যের সাংবাদিকদের মধ্যে যে জনপ্রিয়তা আছে, সেটা কাজে লাগান যাক। সে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব বেশ সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করল, কিন্তু তা হলেও 'তার যা ক্ষমতা তার থেকেও ছাপিয়ে গেল —বলতে কি, প্রায় দ্বিগুণেরও বেশী।

স্থানীয় প্রথা অনুসারে, বিবাহের ব্যয়, অতিথিদের বহন করতে হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে কনে অতিথিদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কনের হাতে থাকে, ঝোল খাওয়ার জন্য বড় ঢাকনাওয়ালা থালার মত একটা পাত্র। আর প্রতিটি অতিথি আপ্যায়ন মূল্য হিসেবে যতটা পারে তা কনের হাতের সেই বস্তুটিতে রাখে। মারসিয়ার বিয়েতে সব অতিথিই হয় পাঁচ, নয় দশ মার্ক দিল। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি এমন কিপটেমি বরদাস্ত করতে পারল না, সে তার পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে বেশ কয়েক শ মার্ক মূল্যের নোট বার করে দিয়ে দিল।

প্রতিক্রিয়া যা হল, তা অভিভূত হয়ে যাওয়ার মত। চোখের পলকে সে সেই বিবাহ সভার মধ্যমণি হয়ে গেল। এমন কি সেই কমবয়সী "পিতা মাতা"ও দ্বিতীয় আসনে সরে গেল। যখন সেই নবীন দম্পতী গীর্জায় গেল, তখন কনের মাথায় সোনার মুকুট ধরে থাকার সম্মান দেওয়া হল "বোয়ার"কে। একজন ছবি তুলিয়ে এই মুহূর্তে ছবি নিল আর এই দেখবার মত সমাবেশ সহ তার ছবি ছাপা হল *স্টারস এনড স্ট্রাইপস* পত্রিকার প্রথম পাতায়—যাজক ধীরে ধীরে কনেকে উপদেশ দিচ্ছেন, দীপ্ত আর ঝকঝকে কনের বিয়ের সাজ, আমেরিকান ক্যাপ্টেন আপাদমস্তক সামরিক পোশাকে নিখুঁত সজ্জিত আর আমাদের বন্ধুটি তার হাতে স্বর্ণ-মুকুট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ছবির নীচে একটা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে এই বিবাহে 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' হয়েছেন একজন মোলদাভীয় লাখপতি, মানে কথার কথায় যাকে বলা হয় *বোয়ার*।

কাগজে এই ছবি বার হতে না হতে, আমাদের বন্ধু বেচারা 'বোয়ার'কে তার ঔদার্যের আর ছেবলামি তুল্য ছেলেমানুষির মূল্য দিতে হল। তার সব বন্ধুরা ওকে ধরে বসল, যাদের সুরসিক কৌতুকপ্রিয়তার কোন শেষ ছিল না।

আমোদ ফুর্তি হচ্ছে খুব। আমার কিন্তু সব সময় হুঁশ ছিল যে আমার জামার বুক পকেটে পানফিওরভ-এর তার বার্তা। আমার গল্প গৃহীত! আর মস্কো যাত্রার একটা সম্ভাবনা রয়েছে, প্রতিবাদী আসামী পক্ষের প্রধান আইনজীবীর জেরা করার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর।

চমৎকার, ভারী চমৎকার। এইরকম সব মুহূর্তে, আমি পার্ক-এর খোলা টাটকা তাজা বাতাসে চলে যেতাম, যেখানে নির্জনতার মধ্যে আমি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারতাম আমার সুখ। এখন বসন্তের মদির গন্ধে সেই পার্ক এমন ম ম করছে যে সেই "সার উইনুনি" ককটেল খাওয়ার চেয়েও মাথা অনেক বেশী মাতালের মত টলে টলে ঘুরে যায়। আহ্ হা, আমার সেই পদবিহীন বৈমানিককে নিয়ে আমি তাহলে কিছু করতে পেরেছি। কি চমৎকার! আর লেখা বাছাই সম্পর্কে পানফিওরভ বেশ কড়া, আর সাহিত্য জগতে সবাই বিলক্ষণ জানে যে *"অকতিয়াবর"*-এর কখনো পাণ্ডুলিপির ঘাটতি হয় না।

পায়চারী করতে করতে যুদ্ধের ঠিক আগে, *অকতিয়াবর*-এ আমার যে

প্রথম সাহিত্য প্রচেষ্টা প্রকাশিত হয়, আমার তা মনে পড়ল। সংবাদপত্রের আমি একজন অতি সাধারণ প্রতিবেদক ছিলাম। নিজের সংবাদপত্রের কাজ করা ছাড়া কোনদিন পেশাদার লেখক হবো, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তবু অসীম স্বাচ্ছন্দ্যে তর তর করে আমি আমার প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘের কাহিনী লিখেছিলাম। এটা সেই সময় যখন আর সব কিছুকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্যে সমাজতন্ত্র সব দিক থেকে সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট ও তার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বারবারই এখানে ওখানে শ্রমিকদের নিজেদের সোৎসাহী উদ্যোগের নানা দৃষ্টান্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। একজন সাময়িক সংবাদপত্রের কর্মী হিসেবে আমি পুরনো শহর কালনিন-এ কাজ করছিলাম। এইখানে রেলের জন্যে কামরা তৈরীর কারখানায় শ্রমিকদের এমন এক সোৎসাহী উদ্যোগের দৃষ্টান্ত দেখার সৌভাগ্য আমার হল। সেই শ্রমিক ছিল রেলওয়ে বগী তৈরীর কারখানায় একজন কামার। সেই কামারশালের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশ কিছু সময়ের। সেই কামারশালের সব সেরা যে কামার সে তখন সারা দেশে এই কাজের ব্যাপারে সেই সময়কার সেরা কৃতিত্ব স্থাপন করেছিল। কিন্তু আমাকে যে ঘটনা এত অবাক করেছিল, সেই ঘটনাটি যখন ঘটে, তখন সেই কর্মকার অকুস্থলে ছিল না—সে নিম্ন ভোলগা অঞ্চলে ভ্রমণ করছিল আর অন্যান্য শ্রমিকদের কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। তার জায়গায় কাজে এসেছিল অন্য আর একজন। সে লোকটিকে দেখতে খানিকটা হিংস্র, ভবঘুরে বেদের মত, ছন্নছাড়া ধরনের লোক, যার বদনাম ছিল প্রচুর। হঠাৎ এই লোকটি একটি কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, যে কৃতিত্ব বহুদূর ছাপিয়ে গেল এমনি তার শিক্ষককেও। কারখানার নির্দেশক একেবারে যাকে বলে থ। কারখানার নানা সংগঠন একেবারে, যাকে বলে, বিস্ময়ে হতবাক।

এই লোকটি এবং তার অসম্ভব কর্ম কৃতিত্বে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে আমি সেই কর্মকারটির কাজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য গেলাম। অকস্মাৎ যে নাটক আমার সামনে উদ্ঘাটিত হল তা এই যে একসঙ্গে সমবেত হয়ে কাজ করার সদয় প্রভাবে, একটি শক্ত, কিছুটা অনির্দিষ্ট আর এলোমেলো এবং আপাত অহংকারী একজন লোক ধীরে ধীরে নতুন জন্ম লাভ করেছে, আর প্রকাশ করেছে তার যোগ্যতা, দক্ষতার সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠ দিক।

আমি এমন অনেক মালমশলা জোগাড় করলাম যা এক কথায় দারুণ। কিন্তু সম্পাদকরা সংবাদপত্রে আমাকে লেখার জন্য যেটুকু জায়গা দেবেন, তাতে এ কুলোবে না। সুতরাং সেই বিষয়বস্তুর ওপর আমি আবার কাঁট ছাঁট করতে লাগলাম। সেই কারখানা অবস্থান সম্পর্কে যে ইঙ্গিত ছিল, আমি সেটা তুলে দিলাম। নামগুলো বদলে দিলাম সব। আর খবরের কাগজে দেওয়ার জন্যে যে লিখিত রূপরেখা করেছিলাম সেটিকে পরিণত করলাম এক কাহিনীতে, নাম দিলাম : *দি স্মিথি*।

আমি আমার গল্পটা নিয়ে গিয়ে দিলাম "*ওকতিয়াবর*" পত্রিকার প্রধান সচিব কে। তিনি মানুষটি খুব কমবয়সী কিন্তু ভারী গম্ভীর ধরনের। মুখে সিং-এর মতো রীমের চশমা। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন, আমার লেখা নিলেন, আর আমায় বললেন যে আমি যেন তাড়াতাড়ি কোন জবাব আশা না করি, কেন না তিনি সেটি প্রথম পড়ে তুলে দেবেন পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের হাতে। তিনি খুবই আস্থাসহকারে আমায় এও জানালেন যে এই পদ্ধতিই সেরা, কেন না সম্পাদকের অনুমতি ছাড়া কিছুই করা হয় না আর নতুন নতুন শক্তিমান লেখক খুঁজে বার করার জন্যে সম্পাদকের আগ্রহ দারুণ। সে যে আমায় দীর্ঘদিন উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে বলে সাবধান করেছিল, সেটি ছাড়া, দেখা গেল আর সবই সত্য হল। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি পানফিওরভ-এর কাছ থেকে এক উষ্ণ তারবার্তা পেয়েছিলাম। গল্পটি আগ্রহ সঞ্চারী, আর তিনি চান যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার সুবিধামত যে কোন সময় এসে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, মস্কোতে আমি কবে সশরীরের হাজির হচ্ছি তা যেন ফোন করে জানিয়ে দি।

আমার সুবিধামত যে কোন সময়! ঠিক পরদিনই, আমি তাঁর দপ্তরে পৌঁছে গেলাম। চওড়া কাঁধ, দশাসই মানুষ তিনি। আর তাঁর সুদর্শন, মুখে রুশ দেশীয় মানুষের মুখাবয়বের সব বৈশিষ্ট্য মাখানো। একটা বড় হাতলওয়ালা চেয়ারে ডুবে অথচ সোজা হয়ে বসেছিলেন পানফিওরভ আমার লেখার পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে ছিল না, কিন্তু আগাগোড়া কাহিনী তাঁর মনে আছে। চরিত্রগুলোর নাম প্রধান প্রধান নানা ঘটনা সবই তার মনে আছে। তিনি স্মৃতি থেকে সব লেখাটার

সমালোচনা করলেন—ভালো সমালোচনা। আমার কাছ থেকে তিনি কিছুই জানতে চাইলেন না, যেন তিনি চিন্তা করতে করতে সরবে কথা বলছেন আর আমায় পরামর্শ দিচ্ছেন। উনি ওনার নিজের জন্য ও আমার জন্য চা আনতে বললেন। একটু দেখানোর জন্যেই হবে হয়তো, রুশ দেশীয় পুরোণ ভঙ্গীতে এক দলা চিনি চায়ে ফেলে দিয়ে, পিরিচে ঢেলে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। আমি চা এমন কিছু ভালবাসি না। কিন্তু একটু-করো লেবু ডোবানো সেই চায়ের উপস্থিতি আমাকে মনের দিক থেকে পানফিওরভের অনেক নিকটে নিয়ে গেল, আর আমার জড়তা ভেঙে গেল। আমি কথা বলতে লাগলাম।

"আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার গল্পটা তৈরী করে নিতে চাই, তোমায় সাহায্য করতে চাই—আর তাই, তোমার পাণ্ডুলিপি আমরা বহির্বিভাগ বিষয়ক একজন সম্পাদককে দিয়েছি। ইতিমধ্যে আমি তোমাকে যা কিছু বললাম, তা নিয়ে মোটামুটি ভেবে নাও।"

বহির্বিভাগ বিষয়ক সম্পাদক কাকে বলে, সে সম্পর্কে আমার তখন কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু আমি তাঁর নানা পরামর্শ আর নির্দেশের সঙ্গে একমত হয়ে আর কালিনিনে ফিরলাম হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় আমার কাজ সেরে আমি মস্কো ফিরলাম বহির্বিভাগ বিষয়ক সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বলবো কি, আমার পাণ্ডুলিপির যে দশা তিনি করেছেন, তা দেখে রাগে আমি কাঁপতে লাগলাম—আগাগোড়া বাজে হাতের লেখায় ভর্তী, একটা অনুচ্ছেদও সম্পূর্ণ অক্ষত নেই। পুরো অধ্যায়কে অধ্যায় কাটা আর মারজিনে, বড় বড় সব লেখা ঢোকান। না, এ মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি একটা কাগজে মন্তব্য লিখে, পানফিওরভের জন্য তা রেখে দিলাম—এই বহির্বিভাগ বিষয়ক সম্পাদক যা করেছেন, একটা সব্জী বাগানে কোন শূয়োর ঢুকে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করতে পারতো না। আমি পাণ্ডুলিপি আমার বগলের তলায় নিয়ে স্থান ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম। সেই কমবয়সী ও বড় বড় চশমার কাঁচ লাগানো গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটি যে আমার প্রথম আগমণের সময় আমার সঙ্গে ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিল, আমায় ডেকে বলল যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের অনুমতি ছাড়া ফেরত দিতে পারে না। তার গলার স্বর বেশ দায়িত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল। মোটের

ওপর, আমি একজন সাংবাদিক, আর আমার এটা বোঝা উচিৎ।
সে তখুনি পানফিওরভকে ফোন করে জানাল যে রাগে আগুন হয়ে এক-জন যুবক লেখক তার পাশে বসে রয়েছে। "পানফিওরভ আপনাকে তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বললেন," তিনি আমাকে বললেন। তারপর টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে তিনি একটুকরো কাগজে পানাফিওরেভের বাড়ির ঠিকানা আমায় লিখে দিলেন।

বাসে আমার পাণ্ডুলিপির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমার মনে হল যে সেই বহির্বিভাগ বিষয়ক সম্পাদক, আমি প্রথমে যতটা ভেবেছিলাম, অতটা··· ······রক্ত পিপাসু কোন জন্তু নয়। যে সমস্ত সুপারিশ তিনি করেছেন তার অনেকগুলির সঙ্গেই আমায একমত হতে হল। এমন কি লিখন রীতি চলনের দিক থেকে তিনি যে সব সংশোধন করেছেন, তাও মনে হল যানানসই ভাবে যুক্তিযুক্ত। আমি যখন পানফিওরেভের বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন আমি ইতিমধ্যেই অনেকটা শান্ত হয়ে গেছি। পানফিওররভ ও তাঁর স্ত্রী—মধ্যবয়সী সুন্দর ও সরল মুখ ভদ্রমহিলার—বসে চা খাচ্ছিলেন। তিনি সাদরে চা ঢেলে আমায়ও এক পেয়ালা দিলেন যেন আমি পুরোন পরিচিত কেউ, একবার দেখা করার জন্যে হঠাৎ চলে এসেছি।

"তোমার কি চাটা খুব কড়া লাগছে? আমার স্বামী আবার কড়া আর গরম চা পছন্দ করেন।"

আমার সারা জীবনে চা যে এত ভঙ্গিময় করে, আয়োজন করে, উপভোগ করে পান করা যায়, তা এই বাড়িতে যেমন দেখেছি, তেমনটি আর কোথাও দেখিনি। চিনির দলা আস্তে আস্তে সামান্য দাঁতে কাটতে কাটতে পানফিওরভ পেয়ালার পর পেয়ালা চা খেতে লাগলেন। তাঁর দুই হাঁটুর ওপর একটা তোয়ালে বিছানো। থেকে থেকে মুখে লেগে থাকা মিষ্টির দানা তিনি মুছে নিচ্ছিলেন আর কখনো কখনো ঘাড়ের কাছে হাওয়া দিচ্ছিলেন, আমার পাণ্ডুলিপি নিয়ে একটা কথাও উচ্চারিত হল না। আমদের চা খাওয়া যখন শেষ হয়ে গেল তখন পানফিওরভ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুনতে পেলাম যে আজ সম্পাদকীয় দপ্তরে তুমি নাকি এক কাণ্ড করে লোক জমিয়ে ফেলেছো। ওই রকম ব্যবহার করার কোন কারণ নেই। আমি তোমায় একজন ভালো বহির্বিভাগ বিষয়ক সম্পাদক দিয়েছি। আমার অনেক তরুণ লেখককে তিনি সাহায্য করেছেন, যারা গত ক'বছরে

গুকভিয়্যাবর-এর নিজের নিজের জায়গা করে নিয়েছে। তারা সবাই তাঁর প্রতি খুব কৃতজ্ঞ। ভাষার ব্যাপারে ওঁর যে কান আর এ ব্যাপারে ওর যা রুচি, তা আর সকলকে ছাড়ানো। আমার একটা নিয়ম আছে, যদিও এটা কোন লেখকের রুচির ওপর কখনোই চাপিয়ে দেওয়া হয় না। তুমি স্থির জেনো তোমার পাণ্ডুলিপি নিয়ে উনি যা কিছু করেছেন, তা পরামর্শ মতোই। এখন উনি যা কিছু তোমার লেখার কেটে দিয়েছেন, তার মধ্যে যে অংশ তুমি রাখতে চাও রাখো, আর যে সব অংশ উনি লিখে দিয়েছেন, তার মধ্যে তুমি যা বাদ দিতে চাও, তোমার পছন্দ নয়, তা বাদ দাও……কেবল দয়া করে এটা তাড়াতাড়ি করো, কেননা বর্তমান সংখ্যার পরের সংখ্যাতেই তোমার গল্পটি ছাপা হবে।"

আমরা পুরোন পরিচিতের মত পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমার অন্তঃকরণ প্যানফিওরভের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। উনি যেন আমার ধর্মপিতার মতো। এখন এই টেলিগ্রাম পেয়েছি, সেই তাঁর কাছ থেকে। সুতরাং আমার কাজ বৃথা যায় নি। এবং শেষ পর্যন্ত, আমার নায়ক দিনের আলো দেখবে।

দুদিন পর আমাদের যে বিমান ছাড়বে তাতে মস্কোতে বাড়িতে, যেখানে আমার স্ত্রী আর বাচ্চারা আছে, সেখানে যাবার জন্যে আমার কি ইচ্ছা করতে লাগল; কতকগুলো কারণে, আমি তাদের কথা ইদানীং প্রায়ই মনে মনে ভাবছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বিচারের কথা ভাবতে আমার আর মন চাইছিল না। কিন্তু আমি কি করতে পারি? অনেক অনেক দিন ধরে এটার প্রতিই নিবেদিত, দায়বদ্ধ ছিলাম আমি।

১৭। ইয়ারোস্লাভ গালানের ভবিষ্যদ্বাণী

ইদানীং উক্রাইনীয় লেখক ইয়ারোস্লাভ গালানের সঙ্গে আমার বিশেষ সখ্যতা হয়েছিল। গালানের চেহারা আপাতদৃষ্টিতে বিষণ্ণ আর সবকিছু থেকে যেন অবসর নিয়েছে, এমন ধরনের। আসলে ও একজন বিরল শ্রেণীর মানুষ যার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত আর তার মন বিশ্লেষণশীল। কারকো বিশ্ববিদ্যালয় আর ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়াশোনা করেছিল। অনর্গল বলতে পারত রুশ, পোলিস ও জার্মান ভাষা। ফরাসী ভাষাও ও জানত,

আর বুঝতে পারত ইংরেজী ভাষা। এর ফলে বিচারসভায় আর প্রেস ক্যাম্পে চারদিকে কলকল করা বহু লোকের সঙ্গে সে সরাসরি কথা বলতে পারত আর এরই ফলে আমাদের চারদিকে যা কিছু হচ্ছে, তা আমাদের থেকে অনেক পরিষ্কার ও সঠিকভাবে ও দেখতে পেত। সে তার দূরদৃষ্টির সাহায্যে অনেক বিষয়ে সম্ভাব্য পরিণতিও আগাম বুঝতে পারত।

গালান আর আমি দুজনে একসঙ্গে প্রায়ই ফেবার পার্কে বেড়াতাম। আলোচনা করতাম আমাদের দেখা আর শোনা নানা বিষয়ে। তার দূরদৃষ্টি দেখে আমি বারবারই চমকে উঠতাম। স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে চারচিলের ফুলটোনে দেওয়া ভাষণকে আমি অতি সামান্য তাৎপর্যের একটা অপ্রীতিকর ঘটনার বেশী কিছু বলে গোড়ার দিকে বিবেচনা করি নি। চার্চিল একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ। প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে বঞ্চিত; সস্তা চমক সৃষ্টি করে খবরের কাগজে নাম দেখে খুসী হত, যেমন খুশী সে সব সময়েই হয়েছে। আর এইভাবে বেশ টক ঝাল মিষ্টি মাখিয়ে, তার অভ্যাসগত সোভিয়েতবাদ বিরোধী একটি বক্তৃতা দিয়ে, সে পৃথিবীকে তার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে। যে মনোযোগ সে আকর্ষণ করেছিল, তার সম্মানে নানা উপাদান মিশিয়ে প্রেস ক্যাম্পে এল "সার উইনি" ককটেল, ব্যস্, হয়ে গেল।

"ভুল করছো", আমি যেমন বলেছিলাম, তা শুনে গালান বলল। "কোনভাবেই চার্চিল এমন বাজে খরচা করবার বিজ্ঞ মানুষ নয় যে স্রেফ আত্মপ্রচারের জন্যে এসব করবে। রুজভেল্টের মৃত্যুর পরে, সারা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় সে-ই সবচেয়ে বিশিষ্ট নেতা। সবকিছুই চার্চিল আগে থেকে বিলক্ষণ হিসেব করে দেখে নিয়েছে—কোথায় দেওয়া হচ্ছে এই বক্তৃতা, সেই বিশেষ জায়গা, অর্থাৎ আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা মঞ্চ, এই স্থানটার কথা ভেবেছে। আর কোন সময় দেওয়া হচ্ছে এই ভাষণ? ঠিক তখনই যখন পাশ্চাত্য পূর্ব ইউরোপে সফল না হয়ে, উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে একজন নেতার জন্যে। কাজ করার আগে অপেক্ষা করছে সেই নেতার কাছ থেকে সংকেতের জন্যে। তার বক্তৃতার ফল যথেষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী জেহাদীদের নেতা তার ভেরী বাজিয়ে দিয়েছে, আর দৃশ্য অদৃশ্য নানা 'ব্ল্যাক নাইটের' দল নেমে পড়েছে।"

দেখা গেল ইয়ারোস্লাভ গালান যা বলছে, তাই ঠিক। ট্রাইবুনালে

প্রতিবাদী আসামীদের ব্যবহারে আমরা তার প্রমাণ দেখতে পেলাম। ওদের আইনজীবীদের কাঁধের ওপর দিয়ে চার্চিলের কণ্ঠ,তাটি পড়ে যেন ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুকে বল পেয়েছে। যুদ্ধের শেষ কদিন মাটির নীচে বাঙ্কারে বসে বসে হিটলার যে আশা করেছিল, আত্মহত্যা করার আগে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, এখন তা সত্য হতে যাচ্ছে—সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করছে চার্চিল, গতকাল যারা ছিল মিত্র, আজ তারা একে অপরের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে তৈরী। কুকুরেরা যখন নিজেরা কামড়া-কামড়ি করে, তখন একটা বেড়াল বেড়ার ওপর চুপচাপ উঠে নিরাপদে বসে থাকতে পারে।

"তোমার কি মনে হয়, যে এটা বিচারের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া আনবে? তারা শেষ পর্যন্ত বিচার শেষ করবে তো?"

"আমি কি বলতে পারি?" গালান তার গম্বুজের মত মাথা আমার দিকে হেলিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল আপনা থেকে। "আপাততঃ, এটা বিচারের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া আনে নি, কিন্তু ভবিষ্যতে…কে বলতে পারে? তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে প্রতিবাদী আসামী পক্ষ তাদের কৌশল কেমন বদলেছে! আগে অভিযোগকারী পক্ষের সাক্ষীর সঙ্গে ওরা আপস করার চেষ্টা করত, যেমন চেষ্টা করেছিল ভন পাউলাসের সঙ্গে। কিংবা চেষ্টা করতো সাক্ষ্য, প্রমাণে এইসব খণ্ডন করতে। কিন্তু এখন ওরা চেষ্টা করছে যেকোন উপায়ে ব্যাপারটাকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে। যেমন ধরো, স্ট্যাহমার, ইস্টারের ছুটি বাড়িয়ে তিন সপ্তাহ করার জন্যে অনুরোধ করে করে আদালতকে একেবারে জ্বালিয়ে দিল। এখন রিবেনট্রপের উকীল জিদ করছে যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী নানা সাক্ষীকে এত্তেলা পাঠিয়ে আদালতে ডেকে পাঠাতে হবে।"

"তবুও আদালতের কাজকর্মে এখন পর্যন্ত কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি।"

"না। এখনও পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু যেসব অঞ্চল পশ্চিমা মিত্রবাহিনীর অধিকারে রয়েছে, সেখানে পরিস্থিতি বেশ লক্ষণীয়ভাবে বদলে গেছে। তোমরা যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় *পিলজোভাইস* আর *বোরোভিকা* খাচ্ছিলে, আমি তখন বাভারিয়ায় একটু ঘুরেছি। ওখানকার পরিস্থিতি গোলমেলে, বেশ গোলমেলে।"

সে জানাল মিউনিখ-এর চারদিকে সব ছোট ছোট শহরে, এমন কি

ন্যুরেমবার্গ-এও প্রত্যেক বর্ণের উক্রাইনিয়ান জাতীয়তাবাদীরা কিভাবে তাদের শক্তি সংগ্রহে লেগেছে—বেনডেরর লোকেরা, মেলনিক-এর লোকেরা, ইত্যাদি। পূর্ব ইউরোপীয় *পি. ও. ডবলিউ.* শিবিরে শিবিরে ঘুরছে সেই সব লোক যারা যুদ্ধের খাতায় নাম লেখার জন্যে লোক নেয় অথবা সেই সব আমেরিকান, যার লোকদের তাতিয়ে বেড়ায়। ঘরের লোককে বলার মত প্রচুর অর্থের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তারা, আর তাদের মাথায় বোঝাই করে দিচ্ছে সব নানা অর্থহীন ধারণা, যেমন—বাড়ি যেও না, বাড়ি ফিরে গেলেই তোমাদের ওপর নির্যাতন করা হবে। তোমরা থাকো, থেকে যাও মুক্ত পৃথিবীতে, এখানেই তোমরা পাবে প্রাচুর্যের সঙ্গে সবচেয়ে ভালভাবে বাঁচার আব কাজ করার পরিস্থিতি। ওরা খোলাখুলি ঐসব বলছে।

"মোট কথা এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে হুদো হুদো অসংখ্য উক্রাইনীয়, বাইলোরুশীয় আর বালটিকদের নিকৃষ্ট অবশ যারা এক সময় *এসএস* শাখার অধীনে নিজের স্বদেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তাদেরকে যে আমেরিকানবা বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, তার পিছনে উদ্দেশ্য যে স্রেফ লোকের ভালো করা নয়, তা তো বোঝাই যাচ্ছে।"

ইয়ারোস্লাভ গালান,—একজন লভভ কমিউনিস্ট, পোলিশ কারগারে একাধিকবার, থাকতে হয়েছে এই সব দেখে মনে মনে কিছু চিন্তিত। অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীনও কাজ চালাতে পারে, এমন একজন প্রধান কর্মী হিসেবে, সে নির্ভয়ে চলে গেছে সদ্য গড়ে উঠছে এমন সব প্রতিবিপ্লবী সংগঠনের মাঝখানে, ক্যাথলিক জমায়েতে। সুতরাং চারপাশের সব কিছু তার ভালভাবে জানা। ভবিষ্যৎ নিয়ে তার যে এই মন মরা ভাব, তার ভিত্তি রীতিমত ভারী আর নানা চাঞ্চল্যকর সত্য ঘটনায়।

গালানের অভিমত এই যে, এই সমস্ত সংগঠন-এর আচার আচরণ আর নানা সঙ্কেত ছিল আদিম তথা বন্য। যুদ্ধের ঠিক পরে, কারপাথিয়ান পাদ্রী, ফিওফ্যান-এর মৃত্যুর কথা সে আমায় বলল। মানুষটি ছিল সৎ আর চমৎকার। যুদ্ধের সময় মিউকাচেভ মঠ-এ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সে সময়, সদ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এক চক্কোর ঘুরে এসে, উনি ক্যাথারিয়ান সংবাদপত্রগুলিতে, তাঁর সোভিয়েত ভ্রমণ বিষয়ে একের পর এক ছোট ছোট লেখা লিখছিলেন, যেগুলির শিরোনাম ছিল: *চমৎকার দেশে*

এক ভ্রমণ"। ফিওফ্যান মানুষটি ছিলেন, সেই ধরনের যাঁদের অন্তরে অনেক কিছু প্রতিবিম্বিত হয়। তা ছাড়া তিনি ছিলেন বিরাট পড়াশোনা করা বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। তাঁর সমস্ত নিবন্ধে তিনি একথা লেখেন যে "নির্ভেজাল" খৃষ্টধর্ম থেকে নানা ধারণা ও ভাবনাকে, কমিউনিজম আজকের দিনে প্রয়োগ করার উপযুক্ত করে বিস্তারিত ও উন্নীত করেছে। তিনি তাঁর নিবন্ধে এমন এক দেশের কথা লেখেন, যেখানকার শ্রমিকরা এখন শোষণ ও শোষণকারী এই দুই-এর হাত থেকেই মুক্ত। এবং তিনি জোরের সঙ্গে একথা বলেন যে যদি যীশুখৃষ্ট—যিনি সক্রোধে তাঁর মন্দির থেকে বণিকদের বহিষ্কার করে বলেছিলেন যে স্বর্গরাজ্যে একজন ধনীর প্রবেশ করার চেয়ে, একটা ছুঁচের ফুটোর মধ্যে দিয়ে একটা গোটা উটের চলে যাওয়া সহজতর —বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনিও বলশেভিকদের বাহবা দিতেন।

তারপর গালান আমাকে বিশপ ফিওফ্যান-এর ভয়ঙ্কর মৃত্যু সম্পর্কে জানাল। একদিন ডাকে পাত্রী একটা চিঠি পেলেন, তাতে এক ত্রিশূল চিহ্ন আঁকা। তিনি অবশ্য জানতেন এর মানে কি—বেনডেরা সংগঠন থেকে এটি একটি হুসিয়ারী। যাইহোক, তিনি এসব নিয়ে মাথা ঘামালেন না, কিংবা তিনি নিজেকে "ঈশ্বরের হাতে" ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন পর দেখা গেল যে সেই মঠের এক ঘরে ফিওফ্যান মরে পড়ে আছেন। শত্রুদের হত্যা করার জন্যে জাতীয়তাবাদী উক্রাইনীয় নেতারা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করত, সেই বর্বরতায় তাকে খুন করা হয়েছে। লোক সমাজ থেকে বহিষ্কৃত সেই সব দস্যুরা, সবাইকার নজর এড়িয়ে সেই মঠে ঢুকে পড়ে, পথে করে পৌঁছায় বিশপের ঘরে। জোর করে মুখে কিছু ঢুকিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে তাঁকে বেঁধেছে। একটা আঙটার বেড় দিয়েছে তাঁর মাথা ঘিরে। সেই আঙটায় একটা দণ্ড, দণ্ডে খোঁচা লাগানো। সেই খোঁচাটা লেগে আছে তাঁর মাথার এক জায়গায়। তারপর তারা মোচড় দিতে আরম্ভ করেছে দণ্ডটায়। তারা মোচড় দিয়েছে আস্তে আস্তে। ফিওফ্যানের তীব্র যন্ত্রণা তারা চেখে চেখে উপভোগ করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর মাথার খুলি ফেটে গেছে।

"এখন আমেরিকানরা এইসব খুনেদের খাওয়াচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে, পয়সাকড়ি দিচ্ছে", গালান বলল। "এই সব ফাঁস করে দেওয়ার কথা আমি ভাবছি…মালমশলা যোগাড় করছি আমি।"

"ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে তুমি ভয় পাও না? বিপদের ভাবনা তোমায় সংকিত করে না কি?"

"এই আবর্জনার গাঁজলা যারা হিটলারের পক্ষপুটে ছিল আর এখন ট্রুম্যানের আশ্রিত, তাদের চারদিকে যে রঙীন কল্পনার কুয়াশা তা দূর করা আমার কর্তব্য।"•

হাঁ, অজ্ঞাতবাসী এই কমিউনিস্ট কর্মী যা বলেছে, তা অবশ্যই যথার্থ। পশ্চিমে, বিশেষতঃ নাৎসী আন্দোলনের পীটস্থান বাভেরিয়ায় এমন অনেক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছে। একই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা প্রচুর ঘটছে ন্যুরেমবার্গে—যা একদা নাৎসী আন্দোলনের জন্মস্থান ছিল আর আজ আমেরিকান সামরিক বাহিনীর প্রথম ডিভিশনের প্রধান সৈন্যশিবির। সেই বাহিনীর নেতৃত্ব, ন্যুরেমবার্গে নানা সোভিয়েত বিরোধী শক্তির অনেক কিছু সম্পর্কেই স্রেফ দুচোখ বুঁজে আছে।

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এসব কোন কিছুই বিচারের ব্যাপারে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া আনেনি। নানা মার্কিন সংবাদপত্র কর্মী আমাদের সহকর্মীদের সঙ্গে, আমাদের ভালো সম্পর্ক ছিল, আমাদের যাতায়াত বা গতিবিধির ওপরও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়নি, যদিও এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা আমি কোনদিন ভুলবো না। একদিন ট্রাইবুনালে হাজির হয়ে টের পেলাম যে আমার প্রবেশপত্র আনতে ভুলে গেছি। আমাদের "খালেভিয়ান আবাসে" কুর্ট আমাকে সাঁ করে নিয়ে গেল। আমার ছোট্ট ঘরের দরজা খোলা, আর আমার ঘরে দুজন লোক—একজন আমেরিকান পদস্থ সামরিক অফিসার ও সামরিক পোশাকে একজন মেয়ে। সে আমার স্যুটকেস খুলে, ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে আমার টুকিটাকি নানা জিনিস বার করছিল। মেয়েটি হাতে ছোট কলের মত কিছু ধরেছিল, যাতে চাপ দিয়ে ফোয়ারার মত কিছু বার করা যায়।

• ইয়ারোস্লাভ গ্যালান তার অভিপ্রায় মত কাজ করেছিল। সে তার নানা গ্রন্থে প্রতি-বিপ্লবীদের আসল চেহারা তুলে ধরে। *"সোনালি ঈগলের পক্ষপুটে* (বিয়োগান্ত কাহিনী), *ঊষাকালে প্রেমভালবাসা* (নাটক), *অন্ধকারের পিতা* (গল্প-সংকলন) ইত্যাদি গ্রন্থ সে লিখে। জাতীয়তাবাদীরা তাকে পড়াশোনার করার ঘরে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে।

ওরা যখন বুঝতে পারল যে আমি ফিরে এসেছি তখন ওরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটাকে সামাল দেবার একটা বুদ্ধিও সেই সঙ্গে আবিষ্কার চট পট বের করল। সে সেই যন্ত্রটাকে দিয়ে কিছু বাষ্প করে ছড়িয়ে ধোঁয়ার মত করে ফেলল, যার গন্ধ কার্বলিক এ্যাসিডের মত।

"আমরা বীজাণু নাশ করার কাজ করছি" ও বলল এবং তারপর তারা চলে গেল।

এই ঘটনার পর, আমি আমার দোভাষী এ্যানিনাকে ইংরেজীতে এই কথাগুলি লিখে টাঙিয়ে রেখে দিতে বললুম, যার মর্মার্থ: "ভদ্রমহোদয়গণ, পরের বার যখন আপনারা আমার জিনিসপত্র পরীক্ষা করবেন, তখন সেটা বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে করুন, যে জিনিসটি যেখান থেকে নিয়েছেন, আবার সেটি সেই জায়গায় রেখে দিন, আর কার্বলিক এ্যাসিড ছড়াবেন না। ধন্যবাদ।" এই সংকেত বাক্যটি এখনও আমার ঘরে ঝুলছে, আর আমি অবশ্য স্বীকার করব যে এর পর মনে হয় যে আমার ঘরে "বীজাণু নাশক" কিছু কাজকর্ম হয়নি।

খোদ আমেরিকান সৈন্যবাহিনীতে যা ঘটেছে, সেই সম্পর্কে একটা ছোট ঘটনা। একদিন সন্ধ্যায় আমরা যখন "থার্মোজয়ান আবাসে" ফিরছি, তখন চৌহদ্দি ঘিরে লোহার বেড়ার পিছনে আমরা গান শুনতে পেলাম। দুজন সৈনিক যারা এখন পাহারায় রত, তারা বেড়ার গায়ে নকসা কাটা জাফরিতে বন্দুক রেখে, এই গরম আবহাওয়াতেও আগুন জেলে পাশাপাশি বসে, এক ধরনের মিষ্টি রাখালিয়া সুরে গান গাইছে। গানটির মধ্যে কেবল বার বার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে এই কথাগুলি: "মিঃ ট্রু-ম্যান"। মন দিয়ে গান শোনার জন্যে গালান থেমে দাঁড়াল।

গান থামলে গালান ভোঁস ভোঁস করে উঠল "এটা নতুন কিছু মনে হচ্ছে। আমি তো এরকম আগে কোনদিন শুনিনি"। সে আমাকে বোঝাল যে আমেরিকান সৈনিকরা ট্রুম্যানের কাছে দরবার করে বলছে যে ইউরোপ এখন তাদের ক্লান্ত, বিষাদ, তিক্ত-বিরক্ত লাগছে; সুতরাং তাদের বাড়ি যেতে দেওয়া হোক। আর ট্রু-ম্যান যদি তা না দেন তাহলে তারা নিজেরাই বাড়ি চলে যাবে।

"বুঝতে পারছো, তারা এই রকমই বোঝে, অনুভব করে," গালান বলল। নিজের নিজের ঘরে যাওয়ার জন্যে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার

আগে, আমি তাকে আর একবার বললাম। "সাবধান ইয়ারোস্লাভ, নিজের সম্পর্কে হুসিয়ার থেকো।"

"আমি একজন কমিউনিস্ট," সে উত্তর দিল। তারপর যোগ করল, "অসাবধানে থাকার সময় এখনো আমাদের হয়নি।"

১৮। একজন সৈনিক, যন্ত্র-মানব অথবা একজন দাগী অপরাধী

প্রতিবাদী আসামীদের মধ্যে জার্মানীর সশস্ত্র বাহিনীর (ও.কে.ডব্লিউ) পূর্বতন প্রধান সেনানায়ক ফিল্ড মারশাল উইলহেলম কেইটল, তার সম্ভ্রমপূর্ণ চেহারার জন্য অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল। সে ছিল লম্বা, রোগা, সর্বাঙ্গে পেশাদার সৈনিকের ছাপ, মানানসই দেহ সৌষ্ঠব, একটু লম্বাটে মুখ, ভারী চোয়াল যার জন্যে তাকে বেশ স্থির সংকল্প ও সাহসী মনে হত—সংক্ষেপে, তাকে দেখাত একজন সৈনিকের মতো। আদালতে পালন করার জন্যে যে ভূমিকা সে বেছে নিয়েছিল, আর যেটা সে তার পক্ষের আইনবিদদের সঙ্গে ঠিক এই ভূমিকা পালনেরই মহড়া দিয়েছিল—সেটা হল যে পুরনো, সৎ একজন সৈনিক যে তার দেশের সেবা করেছে কোন ভাবনা চিন্তা বা প্রশ্ন না করে, যে তার ওপরওয়ালাদের নির্দেশ পালন করে গেছে, তা সে নির্দেশ বা হুকুম যা-ই হোক না কেন।

তার সম্পর্কে যখন এই অভিযোগ আনা হল যে সে এমন অনেক আদেশ দিয়েছে যা দণ্ডনীয় অপরাধযোগ্য, তখন সে বলল, "আমি একজন সৈনিক।"

ইতিহাস, বহুদিন আগেই কেইটেলকে কাঠগড়ায় তুলেছে। যখন জোর চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, যখন জার্মান প্যানজাররা মাড়িয়ে চলেছে ফরাসী দ্রাক্ষাক্ষেত, গ্রীকদের বাগান, বিমান থেকে যখন নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্যারাসুট অভিযানকারীদের বেলজিয়াম জলাধার নদীর বাঁধ ও ডাচ খাল ভেঙে ফেলার জন্য, যখন যুগোস্লাভ, বাইলোরুশীয় উক্রাইনীয় শহরগুলো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যখন নাৎসীদের বড় বড় দল সশব্দে ছুটে যাচ্ছে মস্কোর দিকে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পূর্ণ করে পৃথিবী থেকে মস্কো শহরের নাম তুলে দেওয়ার জন্য, তখনই লোকেরা বার্লিনের জেনারেল কেইটেলের নাম জেনে গেছে। জেনে গেছে তাকে

সেই লোক হিসেবে, যে হিটলারের স্বপ্নকে রূপান্তরিত করেছে সামরিক অভিযানে। যে ফুয়েরারের পৈশাচিক ক্রোধোন্মত্ত উক্তিগুলোকে অস্ত্রসজ্জিত জার্মান সেনাবাহিনীর কাছে সুসংগঠিত আদেশে পরিণত করেছে।

যুদ্ধের আগে কেউই কেইটেলকে একজন যুদ্ধ বিষয়ক কৌশলবিদ বা যুদ্ধের কৌশলবেত্ত হিসেবে জানত না। সামরিক কোন সাফল্যও তার ছিল না। যুদ্ধের সময় অবশ্য, সে অবশ্য পলকে খ্যাতিমান হয়ে যায়, স্মরণাতীত কাল থেকে সামরিক কর্তব্য আর সম্মান বলে যা কিছু চিহ্নিত সেইসব কিছুকে পরম অবজ্ঞায় পদদলিত করার জন্যে। লিখিত ও অলিখিত যুদ্ধের সবরকম নিয়ম ভেঙে ফেলার জন্যে, আর বর্বরতার সীমা নেই এমন সমস্ত সৈন্যের দঙ্গল দিয়ে যুদ্ধকে লুঠতরাজ আর রক্তাক্ত হৈ চৈ ভরা পানভোজনের উৎসবে পরিণত করার জন্যে।

বিচার চলাকালীন "রাহাজানীকারী দস্যু" "সমাজ পরিত্যক্ত সমাজ বিরোধী দস্যু" আর "খুনে" ইত্যাকার শব্দ যদি "জার্মান সৈনিক" আর "জার্মান অফিসারের" সমার্থক স্বাভাবিক প্রতিশব্দে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে দায়ী উইলহেলম কেইটেল। যুদ্ধের অনেক আগে, যখন জার্মান সৈন্যদের সোভিয়েত ভূমি আক্রমণ অভিযান কেবল পরিকল্পনার স্তরে আছে, তখন বিশেষভাবে যে সমস্ত বাহিনীকে "পূর্বদিকে আক্রমণ অভিযান" সংঘটিত করার জন্যে গড়ে তোলা হয় তাদের জন্যে কেইটেল এক হুকুমনামা তৈরী করে, যে হুকুমনামা যুদ্ধের সব নিয়মকে অগ্রাহ্য করে এই নির্দেশ দেয় যে যেকোন সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী বা সাধারণ নাগরিককে শেষ করে দিতে হবে। এই হুকুমনামা সৈন্যদের সীমাহীন অধিকার দিয়েছিল যেকোন হত্যা বা সাদা কথায় খুন করতে, শহরের পর শহর আর গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে।

জার্মান বাহিনীর যে সমস্ত শাখা পোল্যাণ্ড যুদ্ধ সীমান্তে লড়াই করছিল তাদের অধিনায়কদের কেইটেল হুকুম দিয়েছিল নাগরিকদের হত্যা করার, "কোন দয়া মায়া না করে, প্রয়োজনের হুকুমে, জার্মান-দৃঢ়তা সহকারে।" সে আরও হুক্‌ম দেয় যে যুদ্ধবন্দীদের যেন মাটিতে পোঁতা 'মাইন' খুঁজে বার করার কাজে লাগান হয়, তাতে "জার্মান সৈন্যদের জীবন নিরাপদ হবে।" আর সে কেবল অনুমতিই দেয়, নির্দিষ্ট নানা ক্ষেত্রে, হুক্‌ম দিয়েছিল যে বাহিনী যখন আক্রমণ অভিযানে যাবে তখন তাদের সামনে পর্দা টাঙানোর

মতো যেন সামনে সার সার নিরস্ত্র নাগরিকদের এগিয়ে দেওয়া হয়। আর এ সবই করতে হবে "প্রয়োজনের হুকুম মতো।" বহুদিন ধরে যে নিয়ম মেনে আসা হচ্ছে যুদ্ধের সেই নিয়মকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই কেইটেলই হুকুম দেয় যে "কৌশলগত" জার্মান সৈন্যরা শত্রুপক্ষের ফৌজী উর্দি পরবে ও শত্রু সীমানার ওপর দিয়ে অলক্ষিতে প্রবেশ করে, শত্রু সেনার পিছন দিকে চলে যাবে।

পরিশেষে, শত শত হাজার, এমনকি লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবন্দীকে নাজী ক্রীতদাস শ্রম শিবিরের প্রভুদের হাতে তুলে দেয় কেইটল, সেখানে তাদের বাধ্য করা হয় যুদ্ধের জন্যে সব কারখানায় কাজ করতে, আর জার্মান সেনাবাহিনীতেও শারীরিক শ্রমের কাজ করতে।

অভিযোগকারী পক্ষ ও সেই পক্ষের নানা সাক্ষী, এই সবই প্রমাণ করে, বিভিন্ন সময়ে কেইটল যেসব কাগজপত্রে সই করে, সেই সব দলিল আদালতে পেশ করে। আত্মরক্ষার জন্যে, কেইটল সেগুলির যতগুলি সম্ভব সরাসরি অস্বীকার করে। যখন অস্বীকার করতে পারে না, তখন মেনে নিয়ে বলে: "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, তাই হবে। হ্যাঁ, আমিই এমন করেছিলাম, ঠিকই।" তারপর সে সব সময় যোগ করতো, "এইভাবে ফুয়েরার হুকুম জারি করেছিলেন। আমি একজন সৈনিক। যদি আমি এই সব আদেশের সঙ্গে একমত নাও হই, তাহলেও আমি আদেশ অনুযায়ী অবশ্যই কাজ করবো।"

তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা, সামরিক ছাপ, কপালের পাশ ঘেঁষে পাকা চুল, এই সব সত্ত্বেও, কেইটেল, "হিটলারের ফিল্ড মার্শাল"কে দেখাত বড়ই করুণ। করুণ আর ঘৃণ্য।

উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের উর্দিপরা এই "পুরোন সৈনিক" স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে সামরিক বাহিনীতে তার সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে সে কখনো একবারের জন্যেও নিজে কোন যুদ্ধ করে নি। সে সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরের অভ্যর্থনা-কক্ষে কাজ করেছে কিংবা বড় জোর কোন ছাউনিতে বড় জোর "এ্যাডি. ডি. ক্যাম্প" হিসাবে কাজ করেছে। ওপরওয়ালাদের কাছে কখনো কোন প্রশ্ন না করে মাথা পেতে সব হুকুম মেনে নেওয়ার কেইটেল-এর যে ক্ষমতা, তাতেই খুশী হয়ে হিটলার তাকে পুরস্কার হিসেবে দেয় ফিল্ড মার্শালের সামরিক পোশাক আর তাকে

হিটলার নিয়োগ করে সামরিক উচ্চপদে। সাম্রাজ্য লোভী রেইখতন্ত্র যেন পিতামাতা আর তার লুটতরাজপটু বস্তা সন্তান এই কেইটেল, অল্প বয়স থেকে জার্মান সমরবাদের ঐতিহ্যে শিক্ষিত কেইটেল, "কমপক্ষে এক হাজার বছরের জন্যে" সারা পৃথিবীতে জার্মান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ব্যাপক গণ-হত্যা সংক্রান্ত নাৎসীদের সব ক্রোধোন্মত্ত উক্তি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছিল। কমাণ্ডার হিসেবে তার যে দক্ষতার ঘাটতি তা সে পুষিয়ে দিয়েছিল জার্মান বাহিনী এক বিশাল লুটেরা দলে যাদের লুঠতরাজ করার সহজাত প্রবৃত্তি ছিল।

একজন ভাল অভিনেতাও ছিল, কেইটেল। যদিও তার উর্দিতে কাঁধে লাগান কোন ডোরাকাটা চিহ্ন ছিল না বা পাওয়া কোন সামরিক সম্মান পদক ইত্যাদি ছিল না, তাহলেও সে বসেছিল সামরিক ভঙ্গীতে। সে কথার উত্তর দিচ্ছিল সংক্ষেপে ও পরিষ্কার করে। আর তার ঘষা মাজা চেহারা, ক্ষুরের ধারের মত একপাশে কাটা চুলের সিঁথি থেকে ছিম ছাম করে ছাঁটা গোঁফ পর্যন্ত সব কিছু যেন বলছিল যে তার আত্মসম্মানে লাগায় সে ক্ষুব্ধ ও গোঁসা করেছে।

"আমি একজন পুরনো সৈনিক। যে আদেশ আমি পাবো তা নিয়ে অবশ্য আমি আমার মত কিছু ভাবতে বসবো না। আমি কেবল সেই সব আদেশ পালন করব।"

"আমি হলাম সেই লোক, যে কেবলমাত্র হুকুম তামিল করেছে, যুদ্ধে কোন সক্রিয় অংশই নেয়নি।"

এই দুটোই ছিল তার আত্মরক্ষার স্বপক্ষে তুরুপের তাস। আর এই দুটো কথা সে এত ঘন ঘন বার বার বলছিল যে কথা দুটো কতবার বলছে তা আমি আর দুশিনন্ধি গুণতে আরম্ভ করেছিলাম। দেখা গেল, এজাহার দেবার সময় নিজেকে "আমি একজন পুরনো সৈনিক" বলে কেইটেল উল্লেখ করেছে কম সে কম সাতাশ বার। এছাড়া সে অন্ততঃ এগারো বার আদালতকে বলেছে যে বহুক্ষেত্রেই যে সব সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, সেই সেই সভা চলার সময়, সে বসে থাকত বাইরে হিটলারের অভ্যর্থনা কক্ষে, অর্থাৎ অভ্যর্থনার কাজ করত সে, সুতরাং যে সব সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে নেওয়া হত তাতে তার কোন ভূমিকাই ছিল না।

তার পক্ষের আইনজীবীরা ঘুরে ফিরে কেবল এই তাসগুলোই দেখিয়ে

ফেলতে লাগল। এমন কি তারা এমন কথাও বলতে চাইল যে কেইটেল যে হিটলারের বিশ্বাস অর্জন করেছিল, তার প্রিয় হয়েছিল, তার কারণ এই নয় যে সে হিটলারের সব সামরিক পরিকল্পনা পরমোৎসাহে পালন করত। তার ফুয়েরার-এর পেয়ারের লোক হবার কারণ এই যে হিটলার যখন জার্মান অধিকৃত সব দেশে ভ্রমণে যেত তখন কেইটল ফুয়েরার-এর প্রিয় ওয়েগনার বাজাতো পিয়ানোয়, আর রাষ্ট্রীয় সব অভ্যর্থনা সভায় মহিলাদের আদর আপ্যায়নে সে দুরন্ত ছিল—এই সব কারণেই নাকি হিটলার-এর প্রিয় পাত্র হয়।

যাইহোক, প্রতিবাদী আসামী ও তার পক্ষের কৌশুলিরা, যারা ভেবেছিল যে "পুরনো সৈনিক" হিসাবে চিত্রিত করলেই রেহাই পাওয়ার জন্যে কেইটলে-এর একটা নিরাপদ রাস্তা বা অবলম্বন হবে, তারা যতই সে কথা কেবলই বলছিল, ততই কিন্তু একজন আসল "পুরনো সৈনিকের" চেহারা থেকে কেইটল-এর যথার্থ চেহারা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল। আদালত এবং সারা পৃথিবীর সংবাদপত্র জগৎ দেখতে পাচ্ছিল যে কেইটল আসলে ছিল আর পাঁচটা নাজী সামরিক নেতার মতই মার্কামারা একজন, যার লজ্জা এবং বিবেক বলে কিছু ছিল না। সে কেবল একজন আজ্ঞাবাহী আদেশ পালক মাত্র ছিল না, সে ছিল হিটলারের আগ্রাসী আক্রমণ পরিকল্পনার একজন স্থপতি আর লুঠ মার করার জন্যে যুদ্ধ বাধানোর ব্যাপারে ফুয়েরার-এর একজন সক্রিয় সহকারী।

সেই পুরাতন নাজী সৈন্য তার এজাহার দেবার সময় যথেষ্ট সাবধান ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তখনো উইলহেলম কেইটেলই রয়ে গিয়েছিল। যখন সে লিখিত বয়ান থেকে পাঠ না করে মুখে মুখে সরাসরি প্রশ্নোত্তর দিচ্ছিল, তখন সে এই সমস্ত বাণী দিয়ে আদালতকে যেন পানভোজনে চরিতার্থ করছিল, যথা, "ডাকাতি আর সামরিক জয়ের স্মৃতিচিহ্নের জন্যে অভিযান এই দুটোই মূলতঃ একই জিনিস। কেবল দুটোর পারিভাষিক শব্দাবলীই যা আলাদা।" অথবা: "যুদ্ধের সময় এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার যে জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত হবার মত কোন সময় আমাদের সেনা-নায়কদের ছিল না। আর এসব নিয়ে মাথা ব্যথা করা সেনা নায়কদের দায়িত্ব কর্তব্যও নয়।" অথবা "যুদ্ধের সময় নিষ্ঠুরতা কেবল একটা কথার কথা, কেননা যুদ্ধ নিজেই নিষ্ঠুর।" কেইটল

যেভাবে নিজেকে সমর্থন করছিল, তাকে ক্ষিপ্ত জিদ বলা যায়। কিন্তু যখন অভিযোগকারীর পক্ষের আইনজীবীরাও তাকে চেপে ধরল ও সে যখন সেই জেরা থেকে অব্যাহতি পেয়ে কোনভাবে পাশ কাটাতে পারল না, তখনই তার যত কিছু ভান আর ভনিতা স্রেফ জঘন্যভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল। মাত্র কিছুক্ষণ আগে রেগে সক্রোধে যা সে অস্বীকার করেছিল, চোখের পলকও না ফেলতে সে সেই সব কবুল করল। অভিযোগকারী সোভিয়েত আইনজীবীদের জেরার সময় কেইটেল-এর গায়ে সম্ভ্রম উদ্রেককারী যে শেষ পলেস্তারাটুকু চড়ানো ছিল, তাও খসে গেল। অধিকৃত অঞ্চলসমূহে আত্মগোপনকারী ও পার্টিজানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যে আদেশ সেনাপতি কেইটেল দিয়েছিল, তার সেই নিজের আদেশ তাকে দেখিয়ে দিল রুদেনকো। এই আদেশে এই কথাই বলাছিল যে যেকোন অসন্তোষকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য ও সেটাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে প্রথম সুযোগেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী। আর অধিকৃত অঞ্চলসমূহে কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোরতম পদ্ধতি প্রয়োগও বিশেষ দরকার…। একথা মনে রাখা দরকার যে অধিকৃত সমস্ত দেশে মানুষেব প্রাণের কোন মূল্যই নেই। সচরাচব দৃষ্ট নয়, এমন দারুণ ও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার মাধ্যমেই ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

কেইটেল-এব আদেশের এই অংশ পড়ে রুদেনকো, কেইটেলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে পার্টিজানদের প্রতিরোধের মোকাবিলা করার উপায় হিসেবে কেইটেল শিশু ও নারী সহ অসামরিক জনসাধারণকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিল কিনা।

"না", ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিল কেইটেল।

রুদেনকো ঃ "এই হল তোমার আর একটি আদেশ. যা আমি তোমাকে দেখাতে চাই। এটা ভাল করে দেখে নাও, তারপর বলো তুমি এটাতে তোমার স্বাক্ষর করেছিল কিনা, এটা তোমার নিজের সই কিনা।"

কেইটেল ঃ "হ্যাঁ।"

রুদেনকো ঃ "এই বিশেষ বাক্যটা, যা আমি এখানে দাগ দিয়ে রেখেছি, সেটির দিকে আমি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই. যেখানে লেখা, 'সুতরাং এই যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে অবাধ ও সীমাহীন অধিকার দেওয়া হচ্ছে, সাফল্য করায়ত্ত করার জন্য

দরকার হলে শিশু ও নারীদের বিরুদ্ধেও বাধাহীনভাবে তারা যেকোন ব্যবস্থা নিতে পারে।' এই বাক্যাংশটি দেখছ কি ?"

কেইটেল : "হ্যাঁ, আমি এটা দেখতে পেয়েছি।"

রুদেনকো : "এ কথাগুলি কি তোমার দেওয়া হুকুম ?"

কেইটেল (আনমনাভাবে) : "হ্যাঁ, একথা যদি আদেশে লেখা থাকে… …আমি এগুলোর কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলাম। আমি অজস্র কাগজে সই করেছিলাম আর পরে এগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম।"

এই সমস্ত আদেশও সে ভুলে যেতে পেরেছিল !

হিটলারের পেয়ারের এই কৌশল রচয়িতার মূর্তি সম্পূর্ণ করার জন্যে আর একটি কথোপকথন আমি এখানে তুলে দেবো, যা আমার মনে তখনো তাজা। শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্ম প্রতিহত করার জন্য জার্মানদের যে বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ ছিল, তার প্রধান এ্যাডমিরাল ক্যানারিসের লিখিত এক সরকারী মন্তব্য রুদেনকো আদালতে পেশ করলেন। সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত মাত্রাতিরিক্ত ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার সম্বন্ধে হয়ে ; সঠিকভাবে বলতে গেলে এই সমস্ত নিষ্ঠুরতার রটনা পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে, ক্যানারিস বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী শিবিরগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থায় এই অবাধ খামখেয়ালীপনাকে সংযত করা হোক।

রুদেনকো : "প্রতিবাদী আসামী কেইটেল, এই দলিলটি পেয়ে তোমার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল ?"

কেইটেল : "এ্যাডমিরাল ক্যানারিসের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমি একমত ছিলাম।"

রুদেনকো : "এই দলিলের পাশে তুমি কি লিখেছিলে, সেটা আমি তোমাকে একটু মনে করিয়ে দেবো। তুমি লিখেছিলে : এটা হল পৃথিবী সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গীকে সমূলে ও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন ও বিলোপ করার ব্যাপার। সুতরাং ব্যবস্থাদি যা নেওয়া হচ্ছে ও যা কিছু পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে তা আমি বুঝি ও এই সবেতেই আমার নিজের অনুমোদন আছে।' প্রতিবাদী আসামী, এটা কি তোমার নিজের নাম সই ?"

কেইটেল (চোখের পাতাটিও না ফেলে) : "হ্যাঁ, এটা আমার সই।"

এইভাবে কেইটেলের বহিরাবরণের তথাকথিত "পুরাতন সৈনিক"-এর

চেহারার পলেস্তারা একের পর এক খসে খসে পড়তে লাগল। জেরার শেষে ফিল্ড মার্শালের উর্দিতে ঢাকা এই কশাইয়ের পুরো চেহারা উন্মোচিত হয়ে গেল, যা ঝিলঝিলে, শয়তানী আর কাপুরুষোচিত। যেমন ফাঁদে পড়া ধেড়ে ইঁদুর।

তাদের চোখের সামনে সংঘটিত এই চেহারা বদল, এই রূপান্তর নিয়ে খালেডিয়ানরা সন্ধ্যাবেলার রীতিমত সোরগোল করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আমরা গোয়েরিং, হেস্‌স অথবা রিববেনট্রপকে নিয়ে এত তর্ক বিতর্ক করি নি, যতটা তর্ক আমরা করেছিলাম এই ফিল্ড মার্শালকে নিয়ে যে নিজেকে একজন পুরাতন সৈনিকের ছদ্মবেশে সাজিয়ে প্রতারণা করার চেষ্টা করেছিল। তর্ক কেন্দ্র বিন্দু থেকে একটা আইনগত, নৈতিক ও মানবিকতা সম্বন্ধীয় দায়িত্ববোধের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছিল। আদেশ পালন করার ব্যাপারে, একজন সৈনিক (তা সে একজন নগণ্য সাধারণ বা পদস্থ সৈনিক হোক) অথবা একজন অসামরিক কর্মী (যেকোন শ্রেণীর একজন পদস্থ) তার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হুকুম অনুসারে কাজ করার সময় তার নিজের কোন দায়িত্ব আছে বলে অনুভব করে? যদি সে বুঝতে পারে, যে আদেশ সে পালন করছে সেই আদেশ ভুল ও অপরাধ সদৃশ তাহলে তার কি সে আদেশ পালন করার অধিকার থাকা উচিত অথবা সেই আদেশ পালনে তার কি সাহসী হওয়া উচিত? সে কি দায়ী? এবং যদি সে দায়ী হয়, একটা আদেশ যেটা ভুল আর নিঃসন্দেহে যে আদেশ পালন করা মানেই অপরাধ সংঘটিত করা, সেই ধরনের হুকুম তামিল করলে সে কিভাবে অপরাধী হয়? এরকম কোন আদেশ পেলে তার কি প্রতিবাদ করা অথবা সে আদেশ পালনে অস্বীকার করা উচিত?

আমাদের রক্ত ফুটতে আরম্ভ করেছিল।

"ওহে, আমায় বোঝাও তো, কি কারণে ও দায়ী নয়?" গর্জন করে উঠল য়ুরী কোরোলকভ। "যদি ওইভাবে চিন্তা করা যায়, আর সাজানো যায়, তাহলে তো একে একে সব নাজীকে ছেড়ে দেওয়া যায়। তারা সবাই ফুয়েরারের পিছনে লুকিয়ে বলতে পারে: আমরা নই। যা কিছু দায়-দায়িত্ব সব এই ফুয়েরারের। আমরা কেবল ওর আদেশ, ওর হুকুম তামিল করেছি...এটা আমাদের দোষ নয়, আমরা দায়ী নই...আর এইভাবে, যেকোন ডাকাতির ব্যাখ্যা করে খালাস পাওয়া যেতে পারে।

"কিন্তু যুক্তি তর্কের তোয়াক্কা না করা যে ফৌজী বদ্ধমূল ধারণা আছে, জানোইত—একটা আদেশ হল আদেশ", সাহস করে বলল মিখাইল গুস। যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল, "সেই সামরিক ডগমা'র কি বলবে?'

"এটা আগাগোড়া শেষ পর্যন্ত একটা ভুল, দুষ্ট আর পচা ডগমা", চীৎকার করে যেন তেড়ে আসছে এইভাবে বলল ক্রুশিনস্কি। যে আদেশটাই মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ, নিজের বিবেক আর বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে সেই আদেশ পালন করলে, আদেশপালনকারী নিজেই অপরাধীতে পরিণত হয় এবং এর জন্য সে নিজে সম্পূর্ণ দায়ী। সামরিক, অসামরিক যেকোন ব্যাপারের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। দায়িত্বশীল লোকেদের চিন্তাশূন্য যান্ত্রিকভাবে তাদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকরী করার ফলে কত ক্ষতি হয়েছে, কি অপরিসীম দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে মানুষ আর এখনও সহ্য করছে! কেইটেল চেষ্টা করেছে এটাই দেখাতে যে সে একজন পুরাতন সৈনিক। তাই নাকি? এরপর সে ভাণ করবে যে সে একজন যন্ত্র-মানুষ—একটা ভয়ঙ্কর, মস্তিষ্কহীন যন্ত্র-মানুষ, যে কেবল অনুগত হয়ে তার চালকের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে যায়। কিন্তু সত্যি সত্যিই ও কি, ও কে? একজন জঘন্য অপরাধী। একজন জাঁদরেল, হিসেবী অপরাধী যে কেবল নিজের আখের আরও ভালো করবার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যু মুখে পাঠিয়েছে। ঠিক? এই ট্রাইবুনালে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন গৃহীত হয়েছে তার সঙ্গে আর একটি আন্তর্জাতিক আইন রচিত ও গৃহীত হওয়া দরকার: যে লোক অপরাধ সংঘটিত হয় এমন কোন আদেশ পালন বা কার্যকরী করছে তার বিষয়ে। তুমি কি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত? তাহলে সারা পৃথিবীতে জীবন অধিকতর নিরাপদ হবে। সেই আইনে এই লেখা থাকবে: যেকোন লোক, যে আদেশ পালন করছে সে আদেশ কর্তার সঙ্গে যুগ্মভাবে দায়ী।"

"কিন্তু প্রতিটি আইনের কোন না কোনভাবে এই ধরনের একটি ধারা যুক্ত থাকেই", খুব শান্তভাবে বলল গ্যালান। এতক্ষণ পর্যন্ত গ্যালান তর্কে বা আলোচনায় কোন অংশগ্রহণ করে নি। "এমনকি বুর্জোয়া শাসনাধীন পোল্যাণ্ডের আইনেও এমন একটা ধারা ছিল। কিন্তু কথা হল, একনায়কতন্ত্র যখন হুকুম করে, একনায়কের অধীনে কেউ কি একবারও এসব আইনের দিকে তাকিয়ে দেখে?"

বিকেলের দিকে আমি আর ক্রুশিনস্কি পার্কে একটা লম্বা পায়চারী করতে গেলাম। সেই পার্কে প্রতিটি বৃক্ষের উজ্জ্বল, সুরভিত পাতায় নবীন স্ফুটমান বসন্ত দীপ্ত হচ্ছিল। সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত গলা তুলে কিচির মিচির করছিল পাখিরা। সুমিষ্ট সুঘ্রান বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সবুজ শ্যাম দূর্বাদল থেকে। মখমলের মত ছত্রাক সবুজ ঘন ঘাসের বিছানা ঢাকা খুব মিহি তুষারের সমতল পাতের মধ্য দিয়ে এখানে ওখানে মুখ বার করে উঁকি দিচ্ছিল। আমরা আমাদের মাথার টুপি খুলে তার মধ্যে এই ভিজে ভিজে, বসন্তকালীন সুগন্ধী ছত্রাক ভরলাম। ছত্রাকগুলো আমাদের আঙ্গুলে সামান্য মুচমুচ শব্দ করে ভেঙে যাচ্ছিল। দুজনে এই সব ছত্রাক দু টুপি ভর্তী সংগ্রহ করে আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলাম। এ সব ছত্রাক তুললাম কেন? এ সবের মানে কি? কাকে দেব এসব?

পথের পাশে একটা জায়গায় আমরা খুব সাবধানে আর যত্ন করে সেগুলো নামিয়ে রাখলাম এই আশায় যে এসবের যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে এমন কেউ এগুলি দেখতে পেয়ে যাবে। তারপর আমরা আমাদের ডেরায় ফিরে এলাম। যদিও সুগন্ধী ছিল সেদিনের সন্ধ্যা, বেড়ার মধ্যে একজন রক্ষী আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল দলা দলা জলজ উদ্ভিদ। খোলা জানালা দিয়ে তখনো ভেসে আসছিল নানা উত্তেজিত কণ্ঠ। দায়িত্ব বিষয়ে তর্ক তখনো চলছে।

সেরগেই ক্রুশিনস্কি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে রাগত ভাবে বলল, "মাথামুণ্ডু কি নিয়ে ওরা তর্ক করছে। এতো নিশ্চিতভাবে পরিষ্কার একজন একনায়কের উত্থান মানে সব আইন খতম। ব্যবহারের নৈতিক অনুশাসন, সংস্কৃতি কৃষ্টি একনায়কের উত্থানের সঙ্গে শেষ। যুক্তির শাসন তখন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়। আর কেইটেলের মত সম্ভ্রান্ত দর্শন লোকেদের, যারা আদেশ পালনে অরাজী অনিচ্ছুক নয়, এমন লোকেদের বোল বোলাও হয় তখন, তারাই তখন কর্তৃত্বের পদে যায়। আমি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের কথা বলছি না। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব মহান ও এক সুবিধাজনক উপযোগী উপায়। আমি বলছি হিটলার, মুসোলিনি, আর পিলসুডস্কির মত একনায়কদের কথা। যত নষ্টের গোড়া তো এরাই।"

১৯। তিনটি সঙ্কেত ধ্বনি আবার বাজল।

১লা এপ্রিল। প্যালেস অফ জাসটিসে পৌঁছে আমি আমার স্ত্রীকে তার জন্মদিনের অভিনন্দন পাঠানোর জন্য টেলিগ্রাফ অফিসে চললাম। যুদ্ধের কটা বছর আমাদের এমন অস্থির উত্তেজনায় কেটেছিল যে তার একটি জন্মদিনেও আমরা একসঙ্গে থাকতে পারিনি। আমি এখনও তার কাছ থেকে দূরে। তবু যাক, যে উপহার তাকে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম তা তাকে শেষ পর্যন্ত দিতে পেরেছি। কাহিনী লেখা হয়ে গেছে, মনোনীত ও গৃহীত হয়েছে। সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটাই আলাদাভাবে তাকে সুখী করবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে মাথার ওপর ধনুকের মত বাঁকানো বারান্দা দিয়ে আমি চলেছিলাম, এমন সময়, হঠাৎ আমাদের সকলের অতি পরিচিত সেই সংকেত ধ্বনি তিনবার হল। তিন···তিন···আবার তিনবার। আর একটা সাড়া! কি? কোথায়? আদালতের সেদিনের সকালের অধিবেশন তখনও শুরু হয়নি। তাহলে নিশ্চয়ই 'প্রেস-রুম'-এ হবে। অতিরিক্ত যেসব জেরা ইত্যাদি হত, আদালতের সেই সংক্রান্ত দলিল, সকালের দিকে 'প্রেস রুম'-এ টেবিলে রাখা থাকত। যুদ্ধের দামামা শুনলে যেমন হয়ে থাকে, সাংবাদিকদের ওপর এই তিনটে সংকেত ধ্বনির প্রতিক্রিয়া ছিল সেই রকমই। মুহূর্তে আমরা সকলে প্রেস রুম-এর দিকে ছুটদিলাম।

ঘরটায় ভীড় আর হট্টগোল। নানা রকম বিস্ময়সূচক ধ্বনি, প্রশ্ন আর সজোর হা হা হাসিতে ঘরের বাতাস পূর্ণ। আমি কনুইয়ের মৃদু ঠেলায় পাশ কাটিয়ে পথ করে করে টেবিল পর্যন্ত পৌঁছুলাম আর অন্যান্য কাগজপত্র থেকে আলাদা করে যে ঘোষণাটি পড়েছিল, তা তুলে নিলাম। এটা কি বস্তু! এই ঘোষণায় বলা হয়েছে যে আদালতে মারটিন বোরম্যান সাক্ষ্য দেবে। নাজী দলের যে দলীয় ব্যবস্থা পরিষদ, বোরম্যান ছিল তার প্রধান, দলের সাধারণ সম্পাদক এবং হিটলারের প্রত্যক্ষ পরামর্শ দাতা, যাকে তখনও বিচার সভায় হাজির করা যায়নি, তার অনুপস্থিতিতেই ট্রাইবুনালের আইনগত নির্দেশনামার ১২নং ধারাভুক্ত অভিযোগ পরীক্ষিত হচ্ছিল।

আদালতে ইতিমধ্যে পেশ করা নানা উপাদান ও মালমশলা থেকে প্রতিভাত হয় যে বোরম্যান ছিল নাজীবাদের অন্যতম জঘন্য ব্যক্তিত্ব—

হিটলারের অনুচরবৃন্দের মধ্যে একজন, মোসাহেব, প্রথম শ্রেণীর অত্যাচারী আর লক্ষ লক্ষ নরহত্যার নির্লজ্জ কসাই—হিটারের অনুগামীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভের জন্য গোয়েরিংয়ের সঙ্গে ছিল তার অবিরত প্রতিযোগিতা। আমরা জানতাম যে এই ভয়ংকর লোকটা জার্মান ব্যবস্থা পরিষদের বাইরে ভূগর্ভস্থ কক্ষে হিটলারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিল, যতক্ষণ না হিটলার নিজেকে একটা বিছের মত শেষ করেছিল। আর তার পরই বোরম্যান অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথাও তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। যেন সে পাতলা হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

এখন মারটিন বোরম্যানকে বন্দী করা হয়েছে। এগারো মাস আগে আমি বার্লিনে যে সব জিনিস দেখেছিলাম, সে সবের স্মৃতি আমার সামনে ঝলকে উঠল। গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের গুম গুম আওয়াজ। আমার পায়ের নীচে এ্যাসফল্ট কাঁপছে, যেন মাটির গভীরে অদৃশ্য সব যন্ত্রপাতি কাজ করে যাচ্ছে। আমার সামনে রেইখ.পরিষদ ভবন অস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। ভবনটি তৈরী প্রাচীন গ্রীক ছাঁদে। হিটলারের প্রিয় স্থপতি এ্যালবার্ট স্পিয়ার এই ভবনটির নক্সাকার। গোয়েবলসের ছাপাখানা অর্থাৎ প্রচার দপ্তর এটাকে অভিহিত করত "জাতীয়-সমাজতান্ত্রিক পারথেনন," কিন্তু এই ভবন আর কোন ভাবেই 'পারথেনন'-এর মত ছিল না। যেমন ছিল না হিটলার নেপোলিয়নের মত যার সঙ্গে নিজের তুলনা হিটলার পছন্দ করত।

তখনও যুদ্ধ চলছে বার্লিনে। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই জাঁকজমক ভরা, দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিষদ ভবনের ভেতর, অবজ্ঞা ভরে মাড়িয়ে যাচ্ছে তাদের পায়ের তলায় কাগজপত্র আর নানা আদেশ আর সম্মান পদক ভর্তী বাক্স তোরঙ্গ। লম্বা লম্বা অমসৃণ কোঁড়ানো লোমওয়ালা, হতবুদ্ধি-দৃষ্টির এক কুকুর এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। কুকুরটার গলায় একটা লোহার ক্রুশ ঝোলানো। কেউ রগড় করার জন্যে ওর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। হিটলারের দপ্তর থেকে বাগান যাওয়ার পথে ছিল একটা চত্বর। বাগানে একটা অর্ধাচন্দ্রাকৃতি ফোয়ারা ছিল এখন যা পাথর কুচিতে পরিণত। সেই গুল্মাচ্ছাদিত ফোয়ারার মধ্যে লুকোন ছিল সিমেন্টের এক ঘন ক্ষেত্র। সেই ঘনক্ষেত্রে ছিল এক বিশাল, বল্টু-আটকানো ধাতুর দরজা। হিটলার তার জীবনের শেষ কয়েক মুহূর্ত ভূগর্ভস্থ যে কক্ষে কাটিয়েছিল এটাই সেই মাটির তলার বাঙ্কারে যাবার দরজা।

আমার বন্ধু, *প্রাভদার* আর একজন নিজস্ব সাংবাদিক প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট কর্নেল সেরগেই বোরজেনকো আর আমি সেই সিমেন্টের আস্তরণের দিকে এগিয়ে গেলাম. কিন্তু প্রহরারত একজন সান্ত্রী আমাদের পথ আটকে বলল, "এখানে প্রবেশ নিষেধ।" আমরা রক্ষীদের যিনি প্রধান, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম।

বোরজেনকো হল সেই সব গৌরবদীপ্ত সাংবাদিকদের একজন, যে যুদ্ধের সময় কেবল তার নিজের কলম ছাড়া আরও কিছু দিয়ে যুদ্ধ করেছিল। *প্রাভদার* নিজস্ব সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে সে একবার একটা ছোট দলের সঙ্গে গিয়েছিল। সে দলটি অবতরণ করছিল ক্রিমেন সমুদ্র তটে। সেই ন্যাড়া সমুদ্রতট আর খুব সরু ছোট্ট খাঁড়ি—সেনাবাহিনীর লোকেরা বলে, "এটা একটা পিনের মাথার থেকে বড় নয়"—অবতরণ করার সময় ভাগ্যের এক মোচড়ে অবতরণকারী দলটির অধিনায়ক মারা গেলে, বোরজেনকো দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে। দিনের পর দিন, সে এই "পিনের মাথা"-র মত জায়গাটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাদি সংঘটিত করে। আর রাতে, যখন শত্রু পক্ষের সৈন্যরা লেপতোশকের আচ্ছাদনে যেত সে তখন *প্রাভদার* জন্য তার লেখা তৈরী করত। সেই লেখাকে সে সেনাবাহিনীর তার-অফিসে পাঠাত সেই সব নৌকো করে, যে নৌকোগুলো তাদের জন্য লোক আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতো। এটা একটা যাতা ব্যাপার নয়, এমন ধরনের এই কৃতিত্বের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বোরজেনকো বীরের সম্মান লাভ করে। *প্রাভদার* সাংবাদিক প্রতিনিধির পরিচয় পত্রের ওজন স্বভাবতই অনেক। কিন্তু তার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় বীরের সম্মানসূচক তারকা চিহ্ন তখন সব জায়গাতেই নাড়া দেওয়ার মত একটা প্রভাব সৃষ্টি হয়। এই দুটি কারণে, সেদিন সব রকম বাধা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমরা হিটলারের শেষ আশ্রয়ে যাবার অনুমতি পেয়েছিলাম।

ভূগর্ভে, মাটির নীচে অনেকগুলি তলা। দেখে মনে হয় যেন মাটির ওপর তরল সিমেন্ট ঢেলে করা এক অতিকায় মৌচাক। বিদ্যুৎ ছিল না। লিফট কাজ করছিল না। বাতাস চলাচলের যে ব্যবস্থা, সেটাও কাজ করছিল না। মাটির তলায় ছিল স্যাঁতসেঁতে আর গুমোট ভাব। সেই মেজর (তার নামটা ছিল বেশ খটমটে আর মনে রাখার পক্ষে অসম্ভব), হাতের

ইলেকট্রিক টর্চ জেলে আলো ফেলে আমাদের সেই ছিপ ছিপে সিঁড়ির ধাপে ধাপে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। মাঝে মাঝে গোলা বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল। টর্চের উজ্জ্বল আলোয় সেই সিঁড়ির পাশের ধূসর রঙ দেওয়াল আলোকিত হয়েছিল। তারপর একটা কুলুঙ্গি। সেখানে নীরব একজন রক্ষী দাঁড়িয়েছিল। তারপর এক বিশাল দরজা। আমরা এক, দুই করে তিনটে তলা নেমে গেলাম। তারপর এক ধরনের বারান্দায় আমরা পৌঁছে গেলাম। গ্যাস-সেলটার যেমন হয়, তেমনি রবারের আস্তরণ লাগানো একটা দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে, আর আমাদের পায়ের তলায় ভাঙা বোতলের কাঁচ মচমচ মুড়মুড় করতে লাগল। বাতাস ভারী ও স্থির। অন্ধকারে আবছা দেখা যায় একটা বিশাল টেবিল, কালো কালো দাঁড়ি দেওয়া ছোপ লাগানো পুরু সবুজ কাপড় ঢাকা ফ্রেমে বাঁধানো শিল্পীর আঁকা চিত্র ঝুলছে দেওয়ালে—পুরোনো মিউনিখ স্কুলের ভালভাল ছবি এই সিমেন্টের খাঁচায় দেখে মনে হয় যেন জলদস্যুর কবলে মহান ও সদাশয় সব বন্দী।

"হিটলার তার সামরিক পরিষদের বৈঠক করত এখানে", অন্ধকারে অদৃশ্য সেই মেজর বলল। "আমরা এখানে তিনজন অফিসারকে বন্দী করি। তারা এমনি মদে চুর হয়েছিল যে তারা নিজেদের নাম পর্যন্ত মনে করতে পারছিল না।"

পাশের ঘরে জলছিল, এ্যাসিটিলিন, অর্থাৎ গ্যাসের আলো। সেখানে দুজন অফিসার:ও সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, একজন মহিলা লেফটেনান্ট নানা ফাইলের মধ্যে ডুবে ছিল।

"এখানে সরকারী মহাফেজখানা ধরনের ছিল। ওরা সবকিছু পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওদের সময় আর পেট্রোল, দুটোই ছিল না", সেই মেজর বলল।

আমাদের পরিচয় জানতে পারার পর অফিসাররা সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি বঙ্কিম হেসে বলল, "তোমাদের দেরী হয়ে গেছে। তোমাদের পত্রিকা থেকে দুজন গতকাল এখানে এসেছিল: বোরিস গোরবাতভ আর মার্তিন মেরঝানভ। তারা সব লিখে নিয়ে গেছে।"

কত দ্রুত কাজ করে আমাদের সহকর্মীরা, সেই ভেবে তাদের ওপর হিংসা হল। হাঁটতে লাগলাম। আরো নীচের দিকে একতলায় ধারালো

ধাতব কিছুতে আমার মাথা ঠুকে গেল। টর্চের আলোর রশ্মি এসে পড়ল। এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী ঈগল। তার বাঁকানো নখরে স্বস্তিকা আঁকা কাপড় জড়ানো। কেউ ঈগলটাকে ঠুকে নামিয়েছিল। সেটা একদিকে কাত হয়ে একটা পেরেকে ঝুলছে। পালিশ করা ঝকঝকে দরজাটাকে তার একটা ডানা আড়াল করেছে।

"এটা ফুয়েরারের ব্যক্তিগত ঘর। এখানে সে আত্মহত্যা করে", সেই মেজর বলল।

আমরা একটা ছোট্ট প্রহরাকক্ষের মধ্য দিয়ে গেলাম। সেখানে একটা কাউচ, একটা ছোট টেবিল আর অনেক টেলিফোন রাখা। কালো কালো ওভারকোট আর ফৌজী টুপি দেওয়ালে ঝুলছে। পাশের দরজা দিয়ে বেশ বড় একটা ঘরে এলাম। আবার এ ঘরের দেওয়ালে অনেক আঁকা ছবি রয়েছে। একটা টেবিল, বার্লিনের একটা মানচিত্র, দুটো আরাম-কেদারা, আর একটা কাউচ। কাউচের উঁচু জায়গাটাতেও কালো কালো ছোপ।

"রক্ত?"

"হ্যাঁ, রক্ত", মেজর উত্তর দিল।

"কিন্তু ও কি নিজে বিষ খায় নি"

"হ্যাঁ, একদলের কথা অনুযায়ী ও নিজে বিষ খেয়েছিল ওর স্ত্রী আর কুকুরের সঙ্গে। কিন্তু আমরা পরে এরকমও শুনতে পাচ্ছি, যে তার দেহরক্ষী পরে তার মৃতদেহে গুলি করে। আর যাই হোক, ফুয়েরার কি করে একটা ইঁদুরের মত সরলভাবে বিষ খেতে পারে? সে বড় লজ্জার। ও হিটলারের মৃতদেহে একটা গুলি মারে। তারপর পিস্তলটাকে তার পাশে ফেলে রেখে দেয়। এখানে একটা পিস্তল পড়েছিল।"

আমরা আরও নীচে নেমে গোয়েবলসের বাস করার ঘরে গেলাম—বেশ বড় ঘর, পরিষ্কার আর বাসপোযোগী করে রাখা। দেওয়াল বরাবর দু থাকে বিছানা রাখা। যদিও ঘরের ছাদের নীচে ঝুল। পোড়া পশমের সঙ্গে মৃত্তিকা অভ্যন্তরের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ জড়ানো। টালি ছাওয়া মেঝেয় ঢাকা কার্পেটে দুটো লম্বা লম্বা পোড়া দাগ।

"ও এখানে তার পাঁচ মেয়েকে বিষ খাওয়ায়। আর তারপর একই সঙ্গে সে ও তার স্ত্রী বিষ পান করে।" মেজরের পোশাকে আমাদের

ভার্জিল বলল, "আমরা দেখলাম এই সমস্ত শয্যায় তার মৃত মেয়েরা শুয়ে আছে। বাচ্চাদের মুখগুলিতে মহা শান্তি, যেন তারা ঘুমোচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় যে বড় দুটি মেয়ে নিশ্চয়ই বাধা দিয়েছিল, তারা বিষ খেতে চায় নি। তাদের শরীরের অবস্থান দেখে বুঝতে পারা যায় যে তাদের জোর করে বিষ খেতে বাধ্য করা হয়। এই সেই মেয়েরা।"

সেই মেজর মেঝে থেকে একটা পারিবারিক ফটো তুলে নিল। সেই ফটোতে জোসেফ গোয়েবলসকে দেখাচ্ছে ছোট, তার মস্ত উজ্জ্বল ঝকঝকে মাথা উল্লুকাকৃতি। সে একজন বড় সুন্দরী মহিলার সঙ্গে আড়ষ্টভাবে বসে আছে। তাদের ঘিরে যুবতী সুন্দরী পাঁচটি মেয়ে। মেয়েগুলির মুখে তাদের মায়ের আদল। গোয়েবলস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু তার পরিবারের অন্যরা নীল নয়না স্বর্ণকেশী।

"এই বড় মেয়েগুলিকে জোর করে বিষ ইনজেশন ফুঁড়ে দেওয়া হয়", মেজর আবার বলল।

আমরা পাশের ঘরে গেলাম। দেওয়ালে হরিণের শিঙ আর শিকারীদের বন্দুক ঝুলছে। একটা পুরো শিকারীর পোশাক, একটা সবুজ টুপি বিছানায় পড়ে আছে। টুপিটায় বন মুরগীর পালক লাগানো।

"ওরা বলে যে এটা মারটিন বোরম্যানের ঘর।"

"সে কোথায়?"

"সে নিখোঁজ।" মেজর উত্তর দিল, "যে সমস্ত বন্দীকে আমরা এখানে ধরেছি তারা বলল যে ও এখানে শেষ পর্যন্ত ছিল আর তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

"যখন এত কড়াভাবে জায়গাটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে; তখন সে কি করে বার হতে পারে?"

"আমি জানি না। নানাজনে নানা রকম বলছে। কেউ বলছে, তার মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। আবার কেউ বলছে ও পালিয়েছে। পরের কথাটাই মনে হয় অধিকতর সম্ভব। এটা লিখবেন না দয়া করে। মোটের ওপর এটা তো কানাঘুঁষো। ব্যাপারটার প্রমাণ দরকার। এমন তো হতে পারে যে ইচ্ছে করে এই সব ভুল সংবাদ রটানো হচ্ছে।"

মারটিন বোরম্যান পালিয়েছে! হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী শেষ বিচারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে পালাল! আমার মনে আছে রেইখ

পরিষদের মাটির নীচে ভূগর্ভে সেই কথা শুনে আমরা কেমন বাক্যহারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। বিচার চলাকালীন যখনই বোরম্যানের নাম উচ্চারিত হচ্ছিল, আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাঠগড়ার ওপর ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকাচ্ছিলাম। এই সাপ কি বুকে হেঁটে পালিয়ে সত্যিই মাটির কোন ফাটলে লুকিয়েছে?

তারপর এই তিনটি সঙ্কেত আর প্রেসের জন্যে এই খবর যাতে জানানো হয়েছে যে মারটিন বোরম্যানকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এটা একটা সত্যি জবর খবর।

কিন্তু এই প্রেস-ঘর জোড়ালো হাসিতে ফেটে পড়ছে কেন? আমি আমার পাশে দাঁড়ান য়ুরী কোরোলকভ-এর দিকে অপাঙ্গে তাকালাম। কিন্তু তারও গোল মুখে চওড়া হাসি, মুখে মিটমিটে অভিব্যক্তি।

"আরে বন্ধু, আজ ১লা এপ্রিল!"

"আচ্ছা, আজ ১লা এপ্রিল। তাতে কি?"

"ঈশ্বরের দোহাই, শেষ পর্যন্ত পড়ো।"

সত্যি কথা বলতে কি, এই ইস্তাহারের শেষ পর্যন্ত আমি খেয়াল করিনি। এই দারুণ খবরে আমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, আর আমার মধ্যে এমন হুড়মুড় করে নানা স্মৃতি তোলপাড় করছিল যে খবরটার একেবারে শেষে একটা তীর দিয়ে "পরের পাতায় দ্রষ্টব্য" লেখা আমি খেয়াল করিনি। উল্টো দিকে; বড় বড় অক্ষরে লেখা "এপ্রিল ফুল! ধন্যবাদ।"

আমরা খুব হাসলাম। ট্রাইবুনাল-এর সাংবাদিকদের ব্যুরোতে আমাদের বন্ধুরা এই কৌতুক করেছে। আমরা হাসলাম। কিন্তু এখনো আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে এই সাপের চিরকাল লুকিয়ে থাকার মত গভীর কোন ফাটল আছে কি না।

২০। রাত্রি এবং কুয়াশা

ন্যুরেমবার্গ বিচার কক্ষে, রেইখ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান দপ্তরে ও গেসটাপো প্রধান আরনেস্ট কালটেনব্রুননার, যে এস এস ওবেরগ্রুপেন ফুয়েরার সেই লোক দেরী করে যেদিন প্রথম আবির্ভূত হল, সেদিন থেকে আমি এই ভয়ঙ্কর লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম।

প্রতিবাদী আসামীদের মধ্যে তাকে দেখা ছিল রীতিমত এক উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার, আর যেদিন সে হাজির হল সেদিনও প্যালেস অফ জাসটিসে সেই সঙ্কেত ধ্বনি তিনবার বেজেছিল। এই লোকটা, যে ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ লক্ষ লোককে নিশ্চিহ্ন করার হুকুম দিয়েছে, নিজের অপরাধের জবাবদিহি করার সময় যখন তার এল, তখন সে পরিণত হল এক বিকারগ্রস্ত কাপুরুষে। সামরিক হাঁসপাতালে আহতদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সে প্রথমে রেহাই পাবার চেষ্টা করে। তবু ধরা পড়ে যাওয়ার আতঙ্কে এক রাত্রে সে হাসপাতাল থেকে পালায় আর পাহাড়ের মধ্যে একটা জঙ্গলে ছোট্ট কুঁড়েতে আত্মগোপন করে। কিন্তু এইবার তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী তাকে তুলে দেয়, অঞ্চলের অধিকারী কতৃত্বে'র হাতে।

ন্যুরেমবার্গ এ সে সব সময় ভয়ে কাঁপত, তার কুঠরিতে খালি পায়চারি করে বেড়াত, আর বন্দীশালার ডাক্তারের সামনে কেবলই ঝর ঝর করে কাঁদত। তারপর কেবল আতঙ্কিত থাকার কারণে তার একটি স্ট্রোক, হয়। না, রুডলফ হেস্‌স যেরকম করেছিল, এটা সেরকম কোন আগে থেকে ভেবেচিন্তে ঠিক ঠাক করে ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজেকে অন্য কিছু বলে চালাবার চেষ্টা নয়। বন্দীশালার সিনিয়র ডাক্তার ডাঃ কেলি, যিনি কালটেনব্রুননার-এর চিকিৎসা করতেন তিনি সাংবাদিকদের জানিয়ে ছিলেন যে সাংবাদিকরা যেন মনে না করে যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে কালটেনব্রুননার হত্যা করেছিল তারা তাকে স্মৃতিতে তাড়া করে বলে তার এই অসুখ। অথবা একথাও মনে করারও কোন কারণ নেই যে নিজের কৃত কুকর্মের জন্য সে বিবেক দংশনে ভুগছে। এ হল এক নিছক অন্ধ, পাশব ভীতি যা তার মস্তিষ্ককে অবশ করে দিচ্ছে, আটচল্লিশ বছর বয়সী, ছয় ফুট লম্বা এই লোকটা যদিও দেখতে একটা ষাঁড়ের মতই শক্তিমান ছিল।

সেই সঙ্কেত ধ্বনি তিনবার বাজল। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট জায়গা উপচে উঠল নিমেষে। কাঠগড়ায় প্রতিবাদী আসামীরা যথারীতি নিজের নিজের আসনে বসে আছে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে চওড়া কাঁধের একটা বড়সড়ো লোককে। লোকটার গাল কেটে চলে গেছে একটা জরুল। আর তার মস্ত মুখের আদল কসাইয়ের কুড়ুলের মত। বিচার চলাকালীন যে লোকটার সম্পর্কে আমরা নানা ভয়ংকর সব গল্প শুনেছি, সেই ভীতিপ্রদ

লোকটার দিকে চেয়েছিলাম। কালটেনব্রুননার পাতা দুটো বেঞ্চের মধ্যে কিছুটা অনিশ্চিতের মত হাঁটল, হতবুদ্ধি এক বোকার মত হাসল আর হাতটা বাড়াতে গেল গোয়েরিংয়ের দিকে। কিন্তু গোয়েরিং আচমকা অন্য দিকে ফিরে গেল। হেস্‌স ভান করল যেন সে বাড়িয়ে দেওয়া হাত লক্ষ্যই করেনি। শ্যাচট্‌ ফানক, ভন প্যাপেন, আর স্পীয়র এদের দলটা সব সময়েই অন্যদের থেকে আলাদা বসত। তারা ওর দিকে পিছন ঘুরে পিঠ দিয়ে বসল। এই সব দুষ্কৃতকারী, যারা প্রত্যেকে নিজের বিবেকের কাছে ওই লোকটার জন্যে শত শত হাজার হাজার মানুষের জীবন নেওয়ার জন্যে দায়ী, তারা এই সর্বশক্তিমান গোপন-পুলিশের প্রধানের প্রতি দেখানোর মত অনুকম্পা দেখাল, যাকে শেষের দিকে তারা প্রত্যেকেই ভয় পেতে আরম্ভ করেছিল।

প্রতিবাদী আসামীদের মধ্যে একজনও চায়নি যে, এমনকি কাঠগড়াতেও কালটেনব্রুননার তার পাশে বসুক। সামরিক বিভাগের যে সমস্ত পুলিশের দায়িত্ব ছিল অন্যান্য প্রতিবাদী আসামীদের মাঝখানে কালটেনব্রুননারকে বসিয়ে দেওয়া, তারা রীতিমত এক ধরনের বলপ্রয়োগে টানা-হ্যাঁচাড়া করে ফানক আর রোজেনবার্গের মাঝখানে কালটেনব্রুননারকে বসাতে পারল। দেখে শুনে মনে হয় যেন কালটেনব্রুননার যেন সপ্ত শয়তানদের মধ্যে প্রধান নির্বাচিত হয়েছে।

প্রথমে, তার সম্পর্কে অন্যদের প্রতিক্রিয়ায় সে একটু বিপর্যস্ত হল। কিন্তু সে সেটা কাটিয়ে উঠল তারপর। বেশ দৃঢ় পদক্ষেপে সে উঠে এল ওক কাঠের কাঠগড়ায় এবং আর কাউকে কোন সম্ভাষণ না করে সে বসে পড়ল নিজের জায়গায়। ওর পেশা ছিল ওকালতি। সে ভেবে রেখেছিল যে আদালতে নিজের আত্মরক্ষা সে নিজেই করবে। আর সেই মত নিপুণ-ভাবে ও চেষ্টা চালাল, তার হাতে নিহত অসংখ্য মানুষের যে রক্ত লেগে রয়েছে তা ধুয়ে ফেলার।

যখন এই প্রকাণ্ড, গোল কেঁধো, ভয় দেখানো কটমটে ধূসর চোখের লোকটা পাটাতনে উঠে দাঁড়াল, তার পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী ডঃ কফ্‌ফম্যান মাইক্রোফোনে হড়বড় করে ঘোষণা করল, "আমি আরনেস্ট কালটেনব্রুননারের আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজ আরম্ভ করছি। তার বিরুদ্ধে বিশাল অভিযোগের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, আমার আর এ

কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হবে না যে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজ সম্পাদন করা আমার পক্ষে কত কঠিন দায়িত্ব।"

প্রতিবাদী আসামী পক্ষের আইনজীবী ভাষণের এই মুখবন্ধের সঙ্গে একমত হতেই হয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকমাস ধরে এই ট্রাইবুনাল চলছে। আর এই কয়েকমাস ধরে এমন একটি অধিবেশনও যায়নি, যাতে নাজীদের চিড়িয়াখানার সবচেয়ে রক্তপিপাসু আর নক্কারজনক জানোয়ার হেনরিখ হিমলারের নাম উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হিমলার এই বিচার এড়িয়ে গেছে। যখন তাকে বন্দী করা হয়, তখন নিজের জিবের তলায় যে বিষ-বড়ি সে লুকিয়ে রেখেছিল, সে দাঁতে কামড়ে কেটে ফেলে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় হিমলারের জায়গা নিয়েছে "ক্ষুদে হিমলার" বা *হিমলা-রচেন*। কালটেনব্রুননার জার্মানীতে ওই নামেই পরিচিত ছিল। এখন সে তার উপরওয়ালার হয়ে জবাবদিহি করবে। দলিলপত্রে ইতিমধ্যে প্রকাশিত যে এই 'ক্ষুদে হিমলার,' যাকে ন্যুরেমবার্গে তার বড় কর্তার জায়গা নিতে হচ্ছে —কেননা তার বড় কর্তা আত্মহত্যা করে বিচার থেকে অব্যাহতি নিয়েছে সেই *হিমলারচেন*-এর জার্মানীতে প্রতাপ ছিল কত, আর লোকজন কেমন কাঁপতো তার নামে।

কালটেনব্রুননার যে সমস্ত ভীষণ ও ভয়ঙ্কর সব অপরাধ করেছে, তা এতই অগণিত যে সেগুলোর মধ্যে কেবল প্রধান অপরাধগুলোর একটা তালিকা করাও অসম্ভব। সে এবং হিমলার নাজী আদর্শবাদের চূড়ান্ত ইঙ্গীতবাহী উৎস বিশেষ। সারা জার্মানী ও পরে অধিকৃত নানা দেশ ও অঞ্চল জুড়ে বন্দী শিবিরের জাল বিছিয়েছিল তারা দুজন। এই ছড়ানো জাল, একটা গ্রাফ অর্থাৎ চিত্ররেখার সাহায্যে, ট্রাইবুনালের একটি অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়। ইউরোপের ম্যাপ জুড়ে শত শত ফুটকি দেওয়া। আর কোথাও কোথাও একটা ঝাড়ের দলার মত একটার সঙ্গে একটা জোড়া। দেখে মনে হয় যেন চিত্ররেখার সাহায্যে মহাদেশের শরীরে যে পচনশীল ঘা, তা-ই ওই ফুটকির দলাগুলো বোঝাচ্ছে। এই ঘা যার পরিধির মধ্যে আছে জার্মানী, অস্ট্রিয়া আর বেলজিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত পোল্যাণ্ড, মধ্যে ফ্রান্স, সোভিয়েত বালটিক সাধারণতন্ত্র, বাইলোরাশিয়া এবং উক্রাইন। এমন ভয়ের কারণ ঘটেছিল যে এই মৃত্যুক্ষত, ভবিষ্যতে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে

গ্রাস করবে। আমরা এখন কালটেনব্রুননার দিকে তাকালাম, যার মুখের আদল কড়ুলের মত আর মুখের চামড়ার বর্ণে স্বাস্থ্যহীনতা, আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে এই লোকটা স্বপ্ন দেখেছিল যে একদিন আসবে যখন সারা পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়ে যাবে এইরকম এক দগদগে ঘায়ে আর যাদের দৃষ্টিভঙ্গী ওর থেকে আলাদা ও বিরোধী তাদের, সেইসব মানুষকে ঠেলে ঠেলে পোরার জন্যে ও সারা পৃথিবীকে পরিণত করবে এক বন্দীশিবিরে।

আমরা আর একটা মানচিত্র দেখেছিলাম, যেটা আসলে "কাজের অগ্রগতি"র বিবরণ। এই বিবরণ পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে আরো নিন্দুক ছিদ্রান্বেষী আর আতঙ্ককর। আমরা যারা এই বিচার চলার দীর্ঘ কয়েক মাসে অবাক করে দেওয়া নানা ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, এতে চমকে কেঁপে কেঁপে উঠেছি। মানচিত্রের ওপর যেখানে বড় নগর-গুলোকে দেখানো হয়েছে ছোট ছোট বৃত্তের মধ্যে; সেগুলো ছাড়াও মান-চিত্রে দুটি ছোট শবাধার রাখা—একটি আকারে বড় ও সাদা রঙের এবং অন্যটি একটু নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ও কালো। জাতিভিত্তিক হারে নাজীরা জনসংখ্যা হ্রাস করানোর পরিকল্পনা করেছিল। আর এই মানচিত্রে তাদের পরিকল্পনার মাত্রা বোঝানো হয়েছিল। শবাধারগুলোকে এক ধরনের আঁকা ছবি বলে বুঝতে হবে, যাতে বোঝানো হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী কতকগুলি মানুষ নিঃশেষ হবার জন্যে নির্দিষ্ট এবং আজ পর্যন্ত কত সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কিয়েভ, খারকভ, ক্রাসনোডার, ভিলনিয়াস শহরের ধারে ধারে বড় বড় কালো শবাধার রাখা। অপেক্ষাকৃত ছোটশবাধার রাখা ওরশা, মিনস্ক, ভিতেবস্কের ধারে। বিবরণে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে এ সমস্ত শহরে পার্টিজান আন্দোলন ব্যাপক ও উন্নত, তাছাড়া ঘন অরণ্যের জন্যও জনসংখ্যার নিঃশেষকরণের হার নির্দিষ্ট পরিকল্পিত সংখ্যার অনেক নীচে।

এখন, এখানে সেই লোক যে এইসব পরিকল্পনার খসড়া করেছে আর এক জায়গায় করেছে এইসব বিবরণ। ইতিপূর্বে দেওয়া সাক্ষ্যে প্রকাশিত যে কালটেনব্রুননার মানুষকে খতম করার এক সর্বাত্মক পরিকল্পনা করেছিল আর তার সাংকেতিক নাম দিয়েছিল *নাচট উণ্ড নেবেল* অর্থাৎ রাত্রি এবং কুয়াশা। যে পরিকল্পনা প্রথম প্রযুক্ত হবে জার্মানীতে, তারপর জার্মানী

কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহে। এই পরিকল্পনা অনুসারে শত শত হাজার হাজার মানুষকে রাত্রিবেলায় গ্রেপ্তার করা হত আর তারা তৎক্ষণাৎ বেবাক অদৃশ্য হয়ে যেত অন্ধকার আর কুয়াশার পাতাল গহ্বরে, যেখানে তাদের ফেলে দেওয়া হত নাজী গেস্টাপো হত্যাকারীদের সীমাহীন ক্ষমতার হাতে, যাদের নাম ছিল এসডি এবং এস. এস.।

এই পরিকল্পনা অনুসারে হিমলার ও তার দক্ষিণ-হস্ত আরনেস্ট কালটেন-ব্রুনার এক ধরনের বিশেষ গোপন শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছিল (যার উল্লেখ আমি ইতিমধ্যেই বহুবার করেছি)। সেটা ছিল এক মরণ শিল্প, মানুষকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করাই ছিল যেটার একমাত্র লক্ষ্য। এই নাজী বিশেষ শিল্প কারখানার সংখ্যা ছিল তিনশোর বেশী। প্রথমতঃ ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগ, যেগুলোর ক্ষমতা ছিল প্রত্যহ একশো মানুষকে নিকেশ করার। এগুলোকে কুটির শিল্প বলা যায়, যেখানে নাজীদের পুরনো পদ্ধতি অনুযায়ী মাথার পিছনে গুলি মেরে মানুষকে হত্যা করা হত। এছাড়া ছিল দৈত্যাকার পাশাপাশি শিল্প-কারখানার সমষ্টি, যেমন অসউই-সিম, বুচেনওয়াল্ড এবং মউথাউসেন—যেখানে হত্যা করার পদ্ধতি ছিল যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক। এইসব জায়গায় মৃতদেহ চুল্লাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কনভেয়র ব্যবস্থা ছিল। পুড়িয়ে ফেলার আগে মৃতদেহগুলোকে টুকরো টুকরো করার জন্যে বিশালকার সব ছুরি ছিল। ছিল হাড়গুঁড়ো করার বিশেষ যন্ত্র। আর এইসব কিছু থেকে নানাভাবে নিষ্পেষণ করে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যেত জমিকে উর্বরা করার জন্যে সার।

এই মৃত্যু শিল্প, যা হিমলার সৃষ্টি করেছিল, তা মনুষ্যশরীরের নষ্ট ও বাতিল সবকিছু থেকে তৃতীয় রেইখের অর্থনৈতিক উপযোগিতার পক্ষে বহু কিছু উৎপাদন করত, যার কথা আমি আগেই বলেছি। মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হিমলার কোন কিছু নষ্ট হওয়াকে আদৌ বরদাস্ত করত না। বিচার শুরু হওয়ার গোড়ার মাসগুলোতেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে বিশেষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। সেইসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল এই শয়তান সদৃশ শিল্প কারখানায় কিভাবে মৃত মনুষ্য শরীরের সব অংশকে উৎপাদন উপযোগী করে কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করা। এইসব বিশেষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানাত কিভাবে মানুষের ছাল চামড়াকে চাঁচাছোলা করতে হবে, মানুষের মৃতদেহ থেকে

কিভাবে সাবান তৈরী করতে হবে, মানুষের চামড়া থেকে কিভাবে তৈরী হবে পায়ের জুতো, চুলের ফিতে, কাঁটা ইত্যাদি নানা দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য টুকিটাকি নানান কিছু।

হেনরিক হিমলার ও তার সহকারী আরনেস্ট কালটেনব্রুননার যে একদা ভিয়েনায় এক নগণ্য উকিল ছিল, তারা দুজন মানুষ ও মানবতার জন্যে কার্যতঃ যেসব বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, তা এমন কি দান্তে, যিনি তাঁর সুন্দর কল্পনা শক্তির দ্বারা নরকের ছবি চিত্রিত করেছিলেন, তা তাঁরও অধিগম্য ছিল না।

হিমল্যার ও কালটেনব্রুননার-এর নিয়োজিত লোকেরা কুয়াশা এবং অন্ধকারের আস্তরণের আড়ালে, গবেষণাগারে, রাসায়নিকের সাদা পোশাক পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাত, বন্দী শিবিরের বন্দী মানুষদের ওপর। অবাধ মানুষদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যে সমস্ত বিষ ও বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই সব বিষ ও গ্যাসের প্রতিক্রিয়া তারা যাচাই করত ঠাণ্ডা মাথায়, পদ্ধতিগত নির্দেশ অনুসারে সেইসব কিছু বন্দী মানুষদের ওপর প্রয়োগ করে। এই সমস্ত করা হত শান্তভাবে আর হতভাগ্য বন্দিদের দুঃখ কষ্ট লক্ষ্য করত, লিপিবদ্ধ করত চিকিৎসকেরা এমন এক শান্ত অনুত্তেজিত ভঙ্গীতে যা একমাত্র রাক্ষসদের পক্ষেই সম্ভব। এইসব গবেষণার ফলাফল নিয়ে লেখা হত বিজ্ঞানের বই। মাত্র কয়েকজন সেই বই পড়ত, যেমন একজন পড়ুয়া হল ওই কুড়ুল মুখো লোকটা।

পরিশেষে, অধিকৃত অঞ্চলে জনসংখ্যা শূন্য করার আর একটা উপায় ও পদ্ধতিও ছিল—গ্রাম, ঘর-বাড়ি, শহর, নগর, এইসব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেওয়া। এটাও ছিল একটা শিল্প। এই শিল্পের ছিল নিজস্ব সব যান্ত্রিক পদ্ধতি, ছিল এই সব কাজের জন্যই ভালোভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত লোক, যারা ছিল তথাকথিত প্রয়োগবাহিনী, এস ডি, যাদের নিজস্ব দায়-দায়িত্ব ছিল—শান্তিপূর্ণ সব ধরনের ঘরবাড়ি আবাসন চুরমার করে দেওয়া, মৃত্যু এলাকা সৃষ্টি করা, ভয়, বিভীষিকা ছড়ানো, লুণ্ঠন করা। আর এই সব করে "রাত্রি ও কুয়াশা"র দখলীকৃত অঞ্চলকে আর প্রসারিত করা। এই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থার খোদ কর্তা যিনি তার নাম আরনেস্ট কালটেনব্রুননার। ট্রাইবুনাল এই সব কিছুই সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ, প্রামাণিক চিত্র ও বস্তুগত নিদর্শন থেকে এই সবই অবগত আছে, যেসব

কথা মনে পড়লে মেরুদণ্ড পর্যন্তও কেঁপে ওঠে। তার এই সমস্ত দুষ্কর্মের জন্যে কৈফিয়ত দেওয়ার সময় এখন তার হয়েছে। এইবার কালটেনব্রুননার তার এজাহার দেবে। কি বলতে পারে এই মানুষরূপী রাক্ষসটা, যার দিক থেকে কাঠগড়ায় বসে থাকা তার বন্ধুরাও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে? মানবতার বিরুদ্ধে তার কৃত ভয়ঙ্কর সব অপরাধের স্বপক্ষে, তার বিরুদ্ধে নানা সাক্ষ্য আর নিদর্শনের যখন স্তূপ হয়ে গেছে; অগণিত দলিল যাতে অসংখ্য সাক্ষ্য প্রমাণ করছে তার অপরাধ ও কুকর্ম, তখন কি বলতে পারে সে?

মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে ও সেটা হাতে করে ধরল। তারপর সেটা কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বোঝার জন্যে সেটার গায়ে নখে করে আঁচড় কাটল এবং নিশ্চিত হয়ে সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরে, যে গলায় বহুদিন আগে ভিয়েনার আদালতে তার আসামীদের সমর্থনে সে নিঃসন্দেহে কথা বলত, সেই কণ্ঠস্বরে সে বলল, "হের রেইচটার প্রথমে আমি এই ট্রাইবুনালকে এই কথা জানাতে চাই যে আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলির গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করি। আমি জানি, যে আমি—বিশেষভাবে যেহেতু হিমলার, মুলার ও ফোল আর জীবিত নেই—আমাকেই এখানে, একা এককভাবে, সারা পৃথিবী ও এই ট্রাইবুনালের কাছে সব কিছুর হিসাব দিতে হবে। আমি অবগত আছি ও উপলব্ধি করছি যে এই বিচার কক্ষে আমায় সত্য বলতে হবে। সত্য বলতে হবে যাতে এই আদালত ও সারা পৃথিবী, এই যুদ্ধের সময় জার্মানীতে কি চলছিল তা বুঝতে ও চিনতে পারে এবং সাধুতার সঙ্গে সব কিছুর বিচার করতে পারে।"

এই সবকিছু সে বলল অকম্পিত ঝিম ধরানো গলায়। কাঠগড়ায় অন্যান্য প্রতিবাদী আসামীরা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে একে অপরের সঙ্গে কানাকানি করতে লাগল। সাংবাদিকদের জায়গায় সাংবাদিকরা অস্বাভাবিক দ্রুততায় আঙুলের টুসকিতে লেখার খাতার কাগজ ওল্টাতে লাগল। প্রতিবাদী আসামী প্রথমেই যে কথাগুলো বলল, মনে হয় তা একটা মুখবন্ধ বা ভূমিকা যার মধ্যে কিছুটা ফুটে উঠল তার আত্মরক্ষার কৌশল। এ কথার অর্থ ও সব কিছু স্বীকার করবে। সে অন্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে ও তাদের শেষ করে দেবে। সে নির্ভর করবে অন্তরের হাহাকারের ওপর, কিংবা যেটা

আরও স্বাভাবিক, তার আন্তরিক হাহাকারের ভাণের ওপর, যার ওপর নির্ভর করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও নিজের প্রাণ বাঁচাবে।

গোড়ার দিকে আমরা তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু আমরা যেমনটি ভেবেছিলাম আরনেস্ট কালটেনব্রুননার অত সিধা সরল লোক নয়। বিষণ্ণ ঝিম ধরা কণ্ঠে প্রারম্ভিক কথাগুলো বলেই সে তার কৃত অপরাধগুলোকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করল ও যে কোন ভুল কাজ ও কৃতকর্ম সংক্রান্ত গোটা ব্যাপারটিকেই নেতিবাচক করে তুলল।

সে সব কিছু অস্বীকার করল শান্তভাবে, নিল'জ্জের মত লজ্জাহীন ভাবে। যে সমস্ত সাক্ষ্য সে স্বকর্ণে শুনেছিল, সে সমস্ত সাক্ষ্য ও বস্তুগত প্রমাণ ইত্যাদিকে খণ্ডন করার বা অনুমোদন না করার চেষ্টা পর্যন্ত না করে, উদ্ধত ভাবে সেগুলোকে অস্বীকার করল। বিভিন্ন স্মারক লিপিতে ও কেষ্ট-বিষ্টুদের কাছে নথীভুক্ত তার নিজের নানা কথা, প্রকাশ্যে বলা তার নানা কথা, উক্তি, আর নানা দলিলের ওপর তার নিজের স্বাক্ষর পর্যন্ত সে অস্বীকার করল।

এই রকম জানা গেল যে হিমলারের উপ-প্রধান, নিরাপত্তা বিভাগ ও গোপন পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্তা ও সেই সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ ও ও বিদেশে গোয়েন্দা বিভাগের সরকারী প্রধান, বন্দীশিবিরগুলো সম্পর্কে একটা কথাও জানতো না, গণহত্যা, মৃত্যু কূপ, অথবা ঘড়ির কাঁটা ধরে দিনরাত কাজ করে যাওয়া মানুষের শব দাহ করার জন্য চিতা-চুল্লীর কথা, তার প্রয়োগ বাহিনীর কথা পর্যন্ত কানে শোনেনি। সে এখানে এই বিচার-কক্ষে আসার পরে, তবেই তাদের কথা শুনেছে। মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা? এখানে এসেই সে কথা সে প্রথম শুনল। এই ধরনের কোন কিছুর উল্লেখ সে শুনে থাকবে, কিন্তু সে কথা সে বিশ্বাস করেনি, কেননা সে রকম কিছু হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ খবর করতেই সে খুবই ব্যস্ত ছিল।

সে আদালতের কাছে এই মর্মে মিনতি জানাল যে সে একটি সম্ভ্রান্ত ক্যাথলিক পরিবার থেকে এসেছে ও সে নিজে একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক এ কথা যেন বিবেচনা করা হয়। সে কি এই রকম সব অ-ঈশ্বরীয় কারবারে অংশ নিতে পারে? *ন্যাচট উণ্ড নেবেল?* ওয়েগনারের লেখা একটি রচনায় আদালত এত মনোযোগ দিচ্ছে কেন? হিটলার অবশ্য ওয়েগনারীয় অপেরা ভালবাসত আর প্রায়ই সে সব শুনত। ডঃ জোসেফ

গোয়েবলস ছিল একজন রোম্যান্টিক লোক আর তার বক্তৃতার মধ্যে সুযোগ পেলে এই সব নানা শব্দ সে লাগাতে কসুর করতো না, কিন্তু সে, আরনেস্ট কালটেনব্রুননার ছিল একজন উকীল, সে জানত শব্দের মূল্য কি। রাত্রি এবং কুয়াশা? এতো শুনতেই উদ্ভট। কখনো কোন রাত্রি এবং কুয়াশার উল্লেখ পর্যন্ত সে শোনেনি।

কালটেনব্রুননার যখন তার সুনিয়ন্ত্রিত গলায় কথা বলছিল তখন অন্যান্য প্রতিবাদী আসামীরা একটু শান্ত হয়ে গেল। মোটের ওপর সাড়া পড়ে যাবার মত কোন কিছুই ফাঁস হবে না। কেবল হেস্‌স, কালটেনব্রুননারের দিকে তাকিয়েছিল বিদ্রুপাত্মকভাবে। তার বড় বড় চোখ, কালো গভীর কোটর থেকে ঠাট্টার দৃষ্টিতে ঝকঝক করছিল।

যখন কালটেনব্রুননার স্বীকার করল যে তৃতীয় রেইখের শাসন ব্যবস্থায় কখনো সখনো আইনকে অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকতে পারে, আবার এই কথা বলার সময়ে সে এক নিঃশ্বাসে ঘোষণা করল যে সে ভিয়েনার সম্ভ্রান্ত আইনজীবী পরিবারের চতুর্থ বংশধর, সে নিজে একজন আইনজীবী এবং সে নিজে সব সময় আইনকে সব কিছুর উর্ধে তুলে ধরেছে, "আর সব সময় বিবেচনা করেছে যে মানুষের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তার স্বাধীনতা।" এই সব কথা যখন সে বলছিল তখন নীরব ব্যাঙ্গের হাসিতে আসতে আসতে দুলছিল হেস্‌স-এর খুলির মত মাথা যা সে গোপন করার কোন চেষ্টাও করেনি।

তার বিরুদ্ধে নথিভুক্ত সাক্ষ্য থেকে একটা দলিল দেখানো হল কালটেনব্রুননারকে যার মধ্যে তার স্বাক্ষর ছিল। এই সূত্রে নিম্নলিখিত সওয়াল জবাব, বিচারে প্রতিটি শব্দ যেমন বলা হয়েছিল, হুবহু তুলে দিচ্ছি—

অভিশংসক ঃ "এই স্বাক্ষর কি তোমার?"

কালটেনব্রুননার ঃ "হ্যাঁ, এটা আমারই······মনে হয়।"

অভিশংসক ঃ "তুমি কি এটা সই করেছিলে?"

কালটেনব্রুননার ঃ "না।"

(হাস্যরোল। আদালত কক্ষে গোলমাল। লর্ড লরেন্স তার হাতুড়ি তুলে নিলেন আর তার চশমার ডগা দিয়ে দর্শক আসন ও সাংবাদিকদের বসবার জায়গার দিকে কঠিনভাবে তাকালেন। প্রতিবাদী

আসামীরা নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলছে। তাদের মুখে চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়, বিদ্রূপ, এমনকি প্রশংসাও)।

অভিশংসক : "কিন্তু এটা তোমার স্বাক্ষর। এই মাত্র আদালতকে তুমি সে কথা বলেছো।"

কালটেনব্রুননার (সেই এক শান্ত কণ্ঠে) : "হ্যাঁ, এটা আমার। কিন্তু আমার মনে হয় এটা জাল সই। এই দলিলের কথা তো আমার মনে পড়ে না। আমি জানি না। আমি এই আদালতে আসার পরই কেবল এটার কথা শুনেছি। এটা সম্ভব যে এটা আমার নামে ছাড়া হয়েছিল, যা আমার জানা নেই।"

(আদালতে তুমুল হাস্য। কাঠগড়ায় নড়চড়া। লর্ড লরেন্স তাঁর হাতুড়ি তুললেন।)

লর্ড লরেন্স : আপনাদের কি মনে হচ্ছে না, ভদ্রমহোদয়গণ, যে আদালতে বড় বেশী গোলমাল হচ্ছে ?

আদালতের বাইরে জার্মানদের মধ্যে কালটেনব্রুননারের জেরার খবর ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিভাবে, তা আমার জানা নেই।

"আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?" কুর্ট বলল, রাস্তা থেকে তার চোখ না সরিয়ে।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"একথা কি সত্যি যে, কালটেনব্রুননার বলেছে যে বন্দী শিবিরে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, তা সে জানত না ?"

"অন্ততঃ, সে কথাই তো ও বলার চেষ্টা করছিল।"

"হায় ভগবান !" বলে উঠল আমার ড্রাইভার। তার বিকৃত মুখ তির তির করে কাঁপতে লাগল ঘাবড়ে গিয়ে।

"তুমি জানতে চাইছ কেন ?"

"আমার মার ছোট ভাইকে ডাচাউ-এ হত্যা করা হয়। এখানে ফেবার পেনসিল কারখানার, রাসায়নিক বিভাগের ও ছিল একজন মিস্ত্রী।"

"ও, কি কমিউনিস্ট ছিল ?"

"আমি জানি না। সম্ভবতঃ নয়। কিন্তু ওই রাসায়নিক বিভাগের শ্রমিক সংগঠনে ও ছিল একজন সক্রিয় কর্মী। আপনার কি মনে হয়,

কালটেনব্রুননার যা কিছু করেছে, সে সবের দায়িত্বের হাত থেকে সে অব্যাহতি পেয়ে যাবে?"

"আমি কি করে জানবো? আদালতই এ ব্যাপারটা স্থির করবে। আমার মনে হয় না যে ফাঁসি কাঠে ঝোলা থেকে ও বেঁচে যাবে। কুর্ট, তোমার মত তোমার দেশের অন্যান্য লোক এ সম্পর্কে কি মনে করে?"

সব সময়ে ছলাকলাহীন মানুষ কুর্ট, এ কথার সরাসরি উত্তর দিল না। "সব রকম ধরনের লোক জার্মানীতে বসবাস করে, কনে'ল", প্রাক্তন লুফটওয়াফে লেফটনান্ট উত্তর দিল কূটনীতিবিদের মত।

প্রেস ক্যাম্পে ডেভিডের পানশালায় সেদিন অস্বাভাবিক রকম হৈ চৈ। যে ঘৃণা গোয়েরিং লুকোয় নি তার প্রকাশ বা রিববেনট্রপের আগাগোড়া কাপুরুষতা যতটা না ছাপ ফেলেছিল, মনে হল কালটেনব্রুননারের এই উত্তেজনাহীন ঠাণ্ডা মাথার বেহায়াপনা সাংবাদিকদের মধ্যে তার থেকে বেশী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক:রছে।

"ও হল একটা সত্যি সত্যি সেকস্পীয়ারের নাটকের শয়তান।" বলে উঠল সাধারণ স্বল্পবাক ও সংযত স্বভাব র‍্যালফ। "এর সঙ্গে তুলনা করলে তৃতীয় রিচার্ড হল নিতান্ত এক ক্ষুদে শয়তান।"

ডেভিড, তার নিজস্ব দক্ষতায় নানারকম মদ্য একটার সঙ্গে আর একটা মেলাচ্ছিল। সেদিন তার খদ্দের অঢেল। তার "সার উইননি" ককটেলের চাহিদা সেদিন বিস্তর। আর নিকেলের পাত লাগানো সেই মিশ্রিত পানীয় ভোজবাজির মত কেবলই ক্রমাগতভাবে তার হাতে তৈরী হয়েই যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ডেভিড আদালতে ছিলনা, কিন্তু সেদিন একেবারে শেষতক যা কিছু হয়েছে, তার সব খুঁটিনাটি সে জানে।

"হ্যালো, কনে'ল। ওই গেস্টাপো মক্কেলকে আপনার কেমন লাগল?" একজন খদ্দেরের গেলাসে খানিকটা মেঘ মতন পানীয় ঢেলে দিতে দিতে ও জিজ্ঞাসা করল। "তাহলে, কথা হল ও কিছু জানত না। যা কিছু ঘটেছিল, সবই ওর অজান্তে ঘটেছিল। লোকটার হিম্মৎ আছে বলতে হবে।"

আমার মনে হল, যে ডেভিডের স্বরে বিস্ময়ের ছোঁয়া পাচ্ছি।

২১। বিচার সাতমাসে পড়ল

দানিল ক্রোমিনভ, মিখাইল গুস ও আমাদের অন্যান্য সহকর্মী যারা নানা বিদেশী ভাষা জানত আর পাশ্চাত্যের নানা সংবাদপত্র পড়ত, তারা বলল যে এক একটা মাস যেমন পার হচ্ছে তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কাগজ-গুলোরও এই বিচারের ব্যাপারে কৌতূহল কমছে। এখন কেবলমাত্র সাড়া পড়ে যাওয়ার মত ব্যাপার যেমন কালটেনব্রুননারের জেরা বা নানা সাংবাদিকদের খুচখাচ সংগ্রহ করে তুলে আনা সংবাদ, যেমন গোয়েরিং অথবা হেস্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—যে সমস্ত সাক্ষাৎকার আমাদের পাশ্চাত্যের সহকর্মীদের কেউ কেউ অভিযোগকারীর পক্ষের আইনবিদ বা সরকারী প্রতিনিধি কাউকে ধরে, তাদের মাধ্যমে জুটিয়ে নিত—এইসবই সংবাদপত্র জগতে মাঝে মাঝে যা একটু ঝলকানি তুলত। সেই তিনটে সংকেত ধ্বনি দীর্ঘদিন আর বাজে নি। বিচারকক্ষে সাংবাদিকদের বসার দিকটা বেশ খালি। আর নিজস্ব সাংবাদিক প্রতিনিধিদের কাজকর্ম মনে হয় ডেভিডের আমুদে পানশালায় স্থানান্তরিত হয়েছে। বিচারের শুরু থেকে যারা আছে, তারাও সাময়িকভাবে অন্যত্র সরেছে। পেগি গাড়িতে করে চলে গেছে তার কোন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে। যাবার সময় দেমাক করে বলে গেছে যে গোয়েরিংয়ের কদাকার মুখ দেখে দেখে তার ঘেন্না ধরে গেছে তাই সে চলল মনটে কারলো, যেখানে সে রাউলেট জুয়ার টেবিলে তার উপার্জন করা সব পয়সা ফুঁকে দেবে।

র‍্যালফ চলে গেল প্যারিস। সে সঙ্গে নিয়ে গেল তার নীল নয়না তানিয়াকে।

এরিখ, যে বেশ চমৎকার কাছের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল সে বিমানে চলে গেল বৃটেন। তাকে বিদায় জানানোর সভায় সে আমাদের এক বোতল চমৎকার হোহাইট হর্স হুইসকি দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল ও মজা করে বলেছিল—

"কোন উপায় নেই আমার। মরোণোন্মুখ (তোমরা যেমন বলে থাক) পুঁজিবাদী দুনিয়ার, আমি এক মন্দভাগ্য শিশু। চাহিদা ছাড়া কোন যোগান হতে পারে না। আমি আমার পরিজনকে কেবল নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ভক্ষণ করাতে পারি না, বুঝলে হে। তোমরা সবাই ভালো

ছেলে হতে পার, আর ভালো ছেলের মত সাংবাদিকদের ফাঁকা জায়গার লাগাতার বসে থাকতে পার কেননা তোমাদের বাঁধা মাইনে আছে, কিন্তু নিষ্ঠুর পুঁজিবাদ আমাকে খাওয়াবে না, যদি না আমি ভূমিকম্পের মত সব সংবাদ দি। সুতরাং, ভদ্রমহোদয়গণ, সুসময় না আসা পর্যন্ত, বিদায়।"

সোভিয়েত জনগণ যারা নাজীদের কাছ থেকে এত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করেছে আর শেষ পর্যন্ত যারা একক লড়াই করে নাজীদের যুদ্ধে পরাজিত করেছে, তারা তখনো বিচারে আগ্রহ হারায়নি। আমাদের পাঠানো বিবরণ আগের মতই ছাপা ও পড়া হত। বিচার কক্ষের ডানদিকে নির্দিষ্ট সাংবাদিকদের বসবার এলাকায়; যেখানে আমরা সাংবাদিকরা বসতাম, সেই জায়গাটা, চারপাশের সার সার খালি শূন্য বসবার আসনের মধ্যে দেখাত যেন ঘনবসতিপূর্ণ পেনিনসুলা। কিন্তু এটাই তো সাংবাদিকতা: এমন শান্ত, মাপা পদক্ষেপে ঢিমে তালে ব্যাপার কি সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে চলে। আর তাছাড়া—লুকিয়ে লাভ কি বাপু?—আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করেছিলাম, বিশেষভাবে দুপুরের আহারের পরে, এখানে ওখানে আমাদের কোন কোন সাংবাদিকের মাথা তন্দ্রায় ঝুলছে আর কারও কারও মাথাতো একেবারে নির্লজ্জের মত ঝিমোচ্ছে।

এই শান্ত চুপচাপ সময়টার সঙ্গে খুবই সাফল্য সহকারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল ভসেভোলদ ভিসনেভস্কি। সে একজোড়া কালো চশমা জোগাড় করেছিল। আমরা সবাই যেরকম সাধারণ চশমা ব্যবহার করি, সেরকম চশমা নয়। এ হল আমেরিকান নকশা করা বড় বড় কালো কাচের চশমা, যা বানানোই হয়েছে এই সমস্ত টানা লম্বা সব অধিবেশনের জন্যে। চশমার কালো কাচগুলোর ভিতর দিকে কোথাও বড় বড় একজোড়া খোলা চোখ আছে। যেসব ভাগ্যবান এ হেন চশমা চোখে দিতে পান তাঁরা ওই ভেতরে আঁকা চোখ দিয়ে আড চোখে কিংবা চোখ কুঁচকে তাকাতে পারেন বা স্রেফ ঘুমোতে পারেন। তার চারপাশে বসে থাকা লোকেরা দেখতে পাবে তার মনোযোগী সাগ্রহ অভিব্যক্তি। ভিসনেভস্কি বিচারকক্ষে ঢুকবে যেন আগে থেকেই কি একটা মনে মনে চিন্তা করতে করতে আসছে এই রকম একটা ভাব নিয়ে। বসে পড়বে সামনের সারিতে। তার ডানদিকে রাখবে বিভিন্ন দলিলের ফরাসী অনুবাদ, ইংরেজী ভাষার করা অনুবাদ রাখবে তার বাঁ দিকে? আর তার রুশ ভাষায় লেখাগুলো

একেবারে ঠিক তার সামনে। লেখার জন্যে ছোট নোট বই বার করবে, তার কলমটিকে নিখুঁতভাবে বাগিয়ে ধরবে তার ওপর, আর তারপর নিদ্রা দেবে। দারুণ দক্ষতার সঙ্গে ও এই ব্যাপারটা করত। তুমি যদি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েও থাকো, তাহলে তুমি দেখবে একজন সম্পূর্ণ মনোযোগী সাংবাদিক যে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছে আর মনোযোগ সহকারে শুনছে। বিরতির সময় তার আশপাশের লোকেরা যখন বিবেচনাপূর্ণ দক্ষতায় তাকে জাগিয়ে দিত, তখন মনে হত যেন ভিতরের দিকে কোন যান্ত্রিক সংযোগ সঙ্কেত আছে তার। বেশ তাজা জোরালো গলায়, ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধে সে বলে উঠত, "স্কাউণ্ড্রেল'-এর দল…বেজন্মা…রাক্ষস সমস্ত…" অথবা এই ধরনের কিছু। আব এইসব কথা সব সময় হত লাগসই। কেননা বিচারের যে কোন অবস্থাতেই এমন সব কথা বলা চলতে পারত।

সবাই ওকে পাগলের মত হিংসে করত, কিন্তু ঠিক এমনি একটি কালো চশমা কেউ জোগাড় করতে পারেনি। যদিও এখন আমার খোলাখুলি প্রকাশ করে বলা উচিৎ যে বিচার চলার এই শান্ত পর্যায়ে বাণিজ্যের দেবতা, পায়ে পাখনা লাগানো হারমেস, বিচারের দেবী, থেমিসকে, চুপি চুপি কনুই-এর গোঁতা মেরে নিঃসাড়ে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, বাণিজ্যিক ব্যাপারেব রমরমা সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছিল। আমেরিকান অফিসার আর জুনিয়র অফিসাররা, দেশের বাইরে কাজ করার জন্যে তাদের যে অধিকার, সেগুলি দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছিল। তারা যে সময় কাজ থেকে ছুটি নিত, তখন তারা ইউরোপের নানা জায়গায় বেড়াত আর ইউরোপের নানা কালো বাজাব থেকে তাদের ডলার অথবা স্থানীয় মুদ্রার বিনিময়ে মোটামুটি কম দামে কিনত নানান জিনিস—,যেমন সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি, জার্মান ফাউনটেনপেন, ফরাসী সুগন্ধী। তারপর বিনিময় মুদ্রার পার্থক্যের মান অনুসারে তারা এগুলোকে বেচে দিত, তথাকথিত *"জাসটিসপালাসট্ বাজার"*-এ। এটাকে সেমিয়ন নারিন-ইয়ানি নামেই উল্লেখ করত।

আমায় স্বীকার করতেই হবে, যে একদিন এ হেনহৈ চৈ ওয়ালা লেনদেনের আমিও এক শিকার হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার পরিচিত একজন আমেরিকান লেফটেনান্ট আমার সঙ্গে পানশালায় বসেছিল। সে আমায় আকারে ইংগিতে বোঝাল যে সে বিমানে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

সে ঝট করে তার ম্যানিব্যাগ খুলে একটা ছবি দেখালো—তাতে সে নিজে, একজন স্বর্ণকেশী স্ত্রীলোক—তার স্ত্রী—ও ডোরাকাটা জামা পরা দুটি বালক। তারপর সে তার জামার কব্জির কাছের বোতাম খুলে ফেলে আস্তীন গুটিয়ে তুলল। তার তলায় ছিল চমৎকার দেখতে দশটা বা ওই সংখ্যক কিছু হবে, হাত-ঘড়ি। আমি কোন কিছু না ভেবে মাথা নাড়লাম, যাতে এমন দেখাল যে ঘড়িগুলো যথার্থই আমার ভালো লেগেছে। তখন সে প্রত্যেকটা ঘড়ির দিকে আলাদা করে আঙ্গুল তুলে দেখাতে লাগল। মনে হয় সে চায় যে আমি জানাই যে ওগুলোর মধ্যে কোনটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আমার সঙ্গে এই নীরব আলাপ আলোচনাকারীকে আমি তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। একটা ঘড়ি, যেটার বড় কাঁটাটা লাল, আমি সেটার দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালাম। ও ঘাড় নেড়ে জানাল "ঠিক আছে।" তারপর একটা কাগজের রুমালের ওপর ও লিখল "১৫০ মার্ক"। দেরীতে হলেও, ততক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম যে ঘড়িটা সে আমায় বেচতে চায়।

ঘড়িটা চমৎকার, দামও ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু আমার ঘড়ির দরকার নেই। আমার একটা পকেট-ঘড়ি আছে। যেটা আমার কাছে বেশ পবিত্র কিছু। মস্কো রাষ্ট্রীয় ঘড়ি কারখানা থেকে প্রথম এই ধরনের যে ঘড়ি নির্মাণ ও উৎপাদন হয়, আমার ঘড়িটি তার একটি। যদিও এ ঘড়ি সব দিক থেকে সুবিধাজনক নয়, তাহলেও যুদ্ধের আগে, আমার স্ত্রীর প্রথম পাওয়া শিক্ষিকার কাজের মাহিনায় কেনা—এটি আমার জন্য তার উপহার। আমি যখন যুদ্ধের সময় বাইরে গেলাম, তখন ঘড়িটা রাখার বাক্সের ডালার ভিতর দিকে আমি আমার স্ত্রী আর ছেলের ছবি বসিয়ে নিয়েছিলাম আর যুদ্ধের পুরো চার বছর কোন সময়ের জন্য আমি এটাকে আমার কাছ ছাড়া করিনি। যুদ্ধের সময় এক একটি মাস যেমন পার হয়ে যেত আমি এই ঘড়ির ডালার গায়ে এক একটা খাঁজ কেটে রাখতাম। আর যখন আমার মনে হত যে যুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এই পয়মন্ত ঘড়ির জন্যে আমি বেঁচে গেছি; তখন সেটার গায়ে আঁচড়ে আমি তারিখ লিখে রাখতাম। ন্যুরেমবার্গে এই ঘড়ি আমার সঙ্গে আছে। এটিকে ঘিরে আমার যে ভাবপ্রবণ মানসিক দিক আছে, তা আমি এই বিদেশী অফিসারকে কি করে জানাব, যে, আমি যতদূর বুঝতে পারছি, বাড়িতে তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের

কাছে যাওয়ার সময় তার দরকার বলে আমার কাছে কিছু জিনিস বিক্রী করতে চায়। তখন আমি ইংরেজী ভাষার যেসামান্য কটি শব্দই নিশ্চিত ভাবে জানতাম—"হ্যাঁ," "না," "ভাল", আর "আপনাকে ধন্যবাদ"—সেই লোভ জাগানো ঘড়িটাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে আমি আমার জানা তিনটি শব্দ বললাম, "না, আপনাকে ধন্যবাদ।"

সে কাগজের রুমালের ওপর আর একটা অঙ্ক লিখল—এবার লিখল "১২৫"। এই চমৎকার লোকটিকে আঘাত না দিয়ে আমি কি করে বোঝাই যে দামটা কোন ব্যাপার নয়। ইতিমধ্যে সে হাতে করে ঘড়িটাকে লোফালুফি করছিল আর বলছিল "চুম্বক ধরে না", যা শুনে, আমি যতটা ধারণা করতে পারলাম, এর মানে হল "চৌম্বক কোন শক্তির কাছাকাছি গেলেও ওটার কোন ক্ষতি হবে না"। সে আরও বলল, "জল নিরোধ"। আমি "জল" শব্দটা বুঝলাম। সুতরাং গোটা মানেটা কি বোঝাতে চাইছিল তা-ও মোটামুটি বুঝতে পারলাম।

"না, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ", আমি বললাম। যাতে বেশ জোরালো শোনায়, আমি আগের কথার সঙ্গে এইভাবে আরও দু একটা শব্দ যোগ করে দিলাম।

ডেভিড আমাদের এই বাণিজ্য বিষয়ক কথাবার্তা লক্ষ্য করছিল—একটু দূর থেকে। সেই লেফটেন্যান্ট তখন ডেভিডকে আমাদের জন্য দু গ্লাশ বীয়র দিতে বলল। সে একটা গ্লাশ আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, আর একটা গ্লাশের মধ্যে সেই হাত ঘড়িটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। আমি যখন বীয়র খেলাম, তখনো দেখলাম যে অন্য গ্লাশে ডোবানো হাত ঘড়ির কাঁটাটা ওই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও ঘুরছে! এখন, আমি আগে যা বলেছি তার সঙ্গে আরও নানা কথা জুগিয়ে আবার জানালাম যে ওটা কেনার আমার কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু আমার কথায় বোধ হয় আগের সে দৃঢ়তা ছিল না। সেই নাছোড় লেফটেন্যান্ট গ্লাশ থেকে আঙুলের বঁড়শি দিয়ে ঘড়িটা তুলে নিয়ে তার রুমাল দিয়ে সেটাকে শুকনো করে মুছল, তারপর সেটাকে দুম করে ছুঁড়ে দিল ঘরের এক কোণে। তারপর সেটাকে তুলে এনে আমার সামনে রাখল। ঘড়িটা তখনো চলছে। এর পর আমার করার মত আর কি

বাকী থাকতে পারে? আমি বললাম, "ঠিক আছে।" তারপর টাকা বার করবার জন্যে পকেটে হাত দিলাম।

এই লেনদেনের শেষটা বেশ সুখেরই হল, কিন্তু আরও কিছু ছিল, যার শেষটা এর থেকে অনেক কম সুখের। একবার তো হাসিতে ফেটে পড়ে, য়ুরী কোরোলকভ ট্রাইবুনালে রুশদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে মেঝের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। জানা গেল যে টেলিগ্রাফ অফিসে যাবার জন্যে ও যখন বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল তখন এরকম একটা ঘড়ি বিক্রী হতে ও দেখেছে! সেক্ষেত্রে বিক্রেতা ছিল আমেরিকান সামরিক পুলিশ বিভাগের একজন সৈনা আর ক্রেতা ছিল একজন সোভিয়েত সৈন্য। রুশ সৈন্যটি প্যালেস অফ জাসটিসের বাইরে মিত্র পক্ষের অন্যান্য দেশের নানা বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে ভাগ করে রক্ষীর কাজ করছিল। যে জিনিসটা বিক্রী হচ্ছিল সেটাও একটা সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি। সেই ঘড়িটাকে ঝাঁকান হল, ছুঁড়ে দেওয়া হল, তা সত্ত্বেও সেটা চলতেই থাকল। কোরোলকভ যখন অফিস থেকে ফিরছিল তখন দেখল যে বিক্রেতা আর ক্রেতা দুজনে পরস্পরের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে, বিমর্ষ মুখে পায়ের নীচে মাটির দিকে দেখছে।

"কি হল হে, তোমাদের?" কোরোলকভ জানতে চাইল।

"দেখ, কনে'ল ও আমাকে একটা ঘড়ি বিক্রী করেছিল। ঘড়ির বিষয়ে ওর দেওয়া বিজ্ঞাপন আমি বিশ্বাস করেছিলাম, আর সেইমত আমি ঘড়িটার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। এখন তো দেখতেই পাচ্ছ কি হয়েছে।"

ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়া একটা ঘড়ি মেঝেয় পড়ে। ঘড়ি তো, সামান্য তুচ্ছ জিনিস। এরকম কথা আমার কানে এসেছে যে আমাদের যেসব আইনজীবীদের মাঝে মাঝে কাজের ব্যাপারে মস্কো যেতে হয়, তাদেরকে তাদের বিদেশী সহকর্মীরা নানা রকম বাণিজ্যের মোটা মোটা প্রস্তাব দিয়েছে—তাদের জন্যে সাইবেরিয়ার পশম, খোদাই করা প্রাচীন মূর্তি, *ছোট ছোট শিল্প মূর্তি* এইসব আনার জন্য। আর এই বিদেশী সহকর্মীরা যখন দেখেছে যে তাদের রুশ সহকর্মীরা ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে এইসব আনতে অস্বীকার করেছে, তখন তারা বুঝতেই পারে নি এমন অস্বীকার করার হেতুটা কি। মোদ্দা কথা হচ্ছে, ব্যবসা হল ব্যবসা...

প্যালেস অফ জাসটিসের বিশাল বিশাল দেওয়ালের মধ্যে ঠায় বসে

থাকা সত্যি বড় কঠিন হয়ে পড়ছিল। বাভারিয়ার গ্রীষ্ম ঋতু চলে এসেছে ইতিমধ্যে। লাইলাক ফুল ফুটেছে। পপলার, গাছের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। এই ক্লিষ্ট, যুদ্ধে ছিন্ন-ভিন্ন শহরটিতেও এমন সময়, চোখ জড়িয়ে আসে তন্দ্রায়, মনে হয় চোখ বন্ধ করে রোদে চুপ করে শুয়ে থাকি। আদালতে নাজীদের কৃত অপরাধ যে একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে একের পর এক কেবলঃ খুলে ধরা হচ্ছে, তা আর দেখতে মন চায় না।

সেদিন, খুব ছবিটবি দেওয়া একটা আমেরিকান পত্রিকা আমাদের হাতে এল। পত্রিকাটির নিজস্ব-সাংবাদিক প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফার বিচারকক্ষে ছিল। এই সাময়িক পত্রিকাটি গোড়ার দিকে বিচারের খবর দিত বিস্তৃত ও বড করে। তারপর এই পত্রিকায় এই সংক্রান্ত খবর কেবল মাঝে মাঝে ছোট ছোট বিজ্ঞপ্তিতে নেমে এল। এই সংখ্যাটিতে কিন্তু একরাশ ছবি ছাপা হয়েছে এই শিরোনাম, "বিচার যখন সাত মাসে পড়ল।" একরাশ ছবি, দুপাতা জুড়ে ছাপা হয়েছে···দুপাতা ভর্তি নিদ্রিত সাংবাদিক প্রতিনিধি। প্রত্যেক প্রতিনিধির নীচে তার নাম, আর যে দেশ থেকে আসছে সেই দেশের নাম লেখা। ব্যস, আর কিছু নেই। সেখানে প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি আছে—আমেরিকানদের গোটা দলটা সেখানে উপস্থিত, ছবিতে দেখা যায় আমেরিকানদের নেত্রী পেগী তার ধাতু নির্মিত আরামকেদারায় বিড়ালছানার মত ঘুমোচ্ছে। র‍্যালফ, দুচোখ বন্ধ করে ঝিমোচ্ছে। তার চওড়া কপালে আঙুলগুলো ন্যস্ত। দেখে মনে হয় যেন পৃথিবীর তাবৎ সমস্যার সমাধানে সে ব্যস্ত। এক জন গ্রিকের দৈহিক শ্রমরত অবস্থায় যেভাবে চমৎকার করে দেখানো হয় তেমনিভাবে দেখানো হয়েছে বিশালাকার চেক, সাংবাদিক ভিনসেন্ট নেকাসকে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময়। আর সেই ছবিতে নেকাসের পাশেই আমাদের বন্ধু জান ড্রাডা। ড্রাডার সিংহের মত মাথা তার বুকের ওপর বিশ্রামরত, আর সেই অবস্থায় তার দুই পুরু ঠোঁট সে চেপে আছে।

অল্প কথায়, এই ছবিতে কাউকেই ভুলে যাওয়া হয় নি। কিন্তু এইসব ছোট ছোট পাশপোর্ট সাইজ নানা ফটোর মধ্যে একটা ছবি ছিল যেটার আকার একটা পোস্টকার্ডের মত। এই ছবিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক পোশাকে আমাদের এক বন্ধুকে দেখা যাচ্ছে। এ হচ্ছে সেই লোক যে আগে এক ককটেলের নামে অমর হয়ে গেছে। তার প্রকাণ্ড

চেহারা নিয়ে সে আরামকেদারায় ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে, আর তার দুই পুরু ঠোঁট সামান্য হাঁ হয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছে মহাভোজ খাওয়ার পর গারগানচুয়ার মত। এইসব ছবিতে আমাদের এক সহকর্মীর প্রতি এতখানি ও এত বেশী মনোযোগ দেখে কারও কারও মনে হয়েছিল যে এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর এক ধরনের আক্রমণ ও সোভিয়েত সামরিক পোশাককে অপমান করার চেষ্টা। তাদের নিশ্চয়ই রসবোধ বা পরিহাস-জ্ঞান নিতান্তই স্বল্প ছিল। তারা দাবী করল যে, ন্যুরেমবার্গ সাংবাদিক সমিতির অন্যতম সভাপতি হিসেবে আমি, এর প্রতিবাদ করি।

সৌভাগ্যবশতঃ মিখাইল খারলামভের কিছু রসবোধ ও পরিহাস-জ্ঞান ছিল। ওই সারসার ঘুমন্তদের মধ্যে যাদের ছবি ছাপা হয়েছিল ও তাদের পিছনে লাগল। পরে ও আর আমি এক ধরনের "জমায়েত" করলাম, আমাদের সব সাংবাদিক, প্রতিনিধি আর চিত্রকর শিল্পীদের নিয়ে। আমাদের জমায়েত হল খুব আনন্দের। সেখানে আমরা সকলে একমত হয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেমন প্রথমতঃ আমরা কেউ মধ্যাহ্ন ভোজের সময় বীয়র পান করব না, আর দ্বিতীয়তঃ, যদি কেউ দুর্ভাগ্য হেতু ঘুমিয়েই পড়ে, তাহলে তার পাশে যে আছে, সেই তাকে জাগিয়ে দেবে। আর একটা দারুণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এটা হল বসার ব্যবস্থা সম্পর্কে। স্থির হল, এখন থেকে বসা হবে এমনভাবে যে মধ্যবয়সী নামকরা অনেকে— যাদের অনেকেরই ঘুমন্ত অবস্থার ছবি পত্রিকার নিদ্রিতের চিত্রশালায় উঠেছে—এমন জায়গায় বসবেন, যে তাঁদের পাশেই বসবে অল্পবয়সী 'খ্যালা-ডিন'রা। তারা মাঝে মাঝে তাদের কানে লাগানো ইয়ার ফোন এঁটে অন্যের সঙ্গে বদলা বদলি করবে, আর এই করার ফাঁকে অন্যকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে তারা কেবল ইয়ার ফোনের তারে টান দিয়ে ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার কাজটা সেরে ফেলতে পারবে।

আপনাকে মানতেই হবে যে এটা একটা দারুণ ব্যবস্থা। আমরা সবাই মিলে ভেবেচিন্তে এটা বার করার জন্যে বেশ গর্ববোধ করলাম। কিন্তু প্রথম দিনেই যখন এটিকে কার্যকরী করা হল, তখন দেখা গেল যে জায়গাটিকে আমরা ভেবেছিলাম সবচেয়ে নিরাপদ আর মজবুত, সেখানেই সর্টসারকিট হয়ে এটি গেল বিগড়ে। ভিতর থেকে জাগ্রত মনোযোগী দুটি

চোখ ভীষণ চাতুর্য আর কায়দায় অাঁকা কালো চশমার সেই ভাগ্যবান মালিকের ছবি ঘুমন্তের চিত্রশালায় বাদ গিয়েছিল। যাইহোক, সেদিন বিকেলের অধিবেশনে তার পাশে বসা তারই দোভাষীর সঙ্গে সে কিছু নিয়ে ঝগড়া করেছিল। আর সেদিন যখন আবার অধিবেশনে বিরতি ঘোষিত হল, তখন সেই মহিলা তাকে জাগিয়ে দিতে "ভুলে গিয়েছিলেন।" আদালতের বিচারকরা ও সংলিষ্ট সকলে চলে গিয়েছেন। সাংবাদিকরা এখানে ওখানে ছড়ানো। যুদ্ধ-অপরাধীদের পথ দেখিয়ে বিচারকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবু সেই খালি প্রেস-বক্স-এ আমাদের বন্ধু বসেই আছে। তার নোট লেখার খাতায় কলমটি সেই লেখার মতন করে লাগানো। শান্তিতে ঘুমোচ্ছে, আর তার মুখে সেই রকম মহা চিন্তিত একটা ভাব যেন গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে ভিতর থেকে সে জড়িয়ে গেছে।

সেই মহিলা যিনি তাকে পিছনে ফেলে গিয়েছিলেন। তাঁব তো বিবেক দংশন হতে শুরু করেছে। তিনি যখন আবার বিচারকক্ষে ফিরে এলেন, তখন নীচের দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করলেন। আদালত কক্ষেব দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একজন *জি আই*। সোভিয়েত ইউনিয়নের নৌ সেনার ঝকমকে সামরিক পোশাকে সজ্জিত একজনকে নিজের কাজে এমন অখণ্ড মনোযোগে বুঁদ হয়ে বসে থাকতে দেখে সে স্পষ্টতঃ এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছে। এমনই অখণ্ড মনোযোগ যে মানুষটি নিস্পন্দ বসে আছে, কোন নড়াচড়া পর্যন্ত নেই। সেই *জি. আই* তার কাছে এগিয়ে গেল, আর তারপর বিস্ময়ে সে থেমে গেল। বসে থাকা মানুষটির মৃদু নাসিকা-গর্জন তার কানে এসেছে। ঠিক সেই সময় সেই দোভাষী বালিকা পৌঁছে গিয়েছে, যখন সেই সৈনিক তখন তার হাতের দণ্ডটি দিয়ে ধীরে সুস্থে তাঁর আরাম কেদারার পিছন দিকে আঘাত করলো।

আমাদের বন্ধুটি ঘুম থেকে উঠেই এইভাবে শুরু করলেন, "কি ?" তারপর যা সে বলে থাকে, সেইভাবে যথারীতি বলল, "কি ধরনের পোকামাকড় এরা।" যাইহোক, সে যখন দেখল যে তার সামনে ভ্যাবাচাকা মেরে যাওয়া একজন *জি. আই* দাঁড়িয়ে আছে, তখন সে খুব তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র তুলে নিয়ে আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

২২। মস্কো, এক ঝলক দেখা

হঠাৎ দেখলাম আমার বাড়ি। বেগোভায়া স্ট্রীট; মস্কো। এখানে বসে আপাতঃ আমার এই সব লেখালেখি চালাচ্ছি। আমি এখানে চলে এসেছি, যেন ভোজবাজী। যে সংবাদপত্রে আমি কাজ করি, সেখান থেকে পাঠানো একটা তারবার্তাই আমাকে মস্কো নিয়ে এসেছে। যুদ্ধের সময় তার পাঠানোর রীতি মত, টেলিগ্রাফ অফিস থেকে আসা তারটির বয়ান ছিল এইরকম: "এমিথিস্ট থেকে সাফেরি। *প্রাভদার* সাংবাদিক পোলেভয়কে। এই তার পাওয়া মাত্র মস্কোতে ফিরে আসুন। ভ্যাসিলি ভেলিচকো আপনার জায়গায় দায়িত্ব নেবে। পোসপেলভ সিভোলোবভ, জেনারেল গালাকতিওনভ।"

তার পেয়ে আমি কিছুটা চিন্তিত হয়েছিলাম। মস্কোতে ফেরা? কোন কথাবার্তা নেই, এমন হঠাৎ? কেন? সম্পাদকীয় দপ্তরে নতুন প্রধান সচিব হয়েছেন সিভোলোবভ। জেনারেল গালাকতিওনভ হলেন পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের সামরিক বিভাগের প্রধান এবং সরকারীভাবে আমি তাঁর সহকারী। কিন্তু সহকারী ওই সরকারীভাবেই। যে গত তিন বছর আমায় এই পদে নিযুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি সপ্তাহও আমি সম্পাদকীয় দপ্তরে কাটাইনি। এমনকি সেখানে আমার নিজস্ব কোন ডেসকও ছিল না। খানিকটা সংশয়াচ্ছন্ন আর উদ্বিগ্ন হয়ে আমি বাড়ির দিকে উড়ে গেলাম। ভ্যাসিলি ভেলিচকো ছিল একজন যুদ্ধ সংক্রান্ত সাংবাদিক প্রতিনিধি। *প্রাভদার* কর্মীদের মধ্যে সে অন্যতম সেরা। সে একজন চটপটে প্রচারবিদ। যুদ্ধ সীমান্তে ও যখন কাজ করত তখন টেলিগ্রাফ অফিসে মজা করে বলত যে ওর পাঠানো সংবাদ আর বিবরণ যখন পাঠানো হয় তখন টেলিগ্রাফের তারগুলো তীব্রতায় যেন ভোমরার মত গুঞ্জন করত। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পক্ষে ও চমৎকার, কিন্তু আমার জায়গায় কাউকে দেওয়া হচ্ছে কেন? আমি কি দারুণ কোন গলতি করেছি? আসল ব্যাপারটা কি?

কুর্ট গাড়ি চালিয়ে আমায় বিমান বন্দরে পৌঁছে দিল। ওকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। যে সমস্ত বন্ধু আমায় বিদায় জানাতে এসেছিল তারা তাদের পরিবারের জন্য আমার সঙ্গে দিল পাঁজা পাঁজা চিঠি আর অজস্র স্মারক।

"অত ভেবো না হে বুড়ো কর্তা। সব ঠিকই আছে, দেখবে। তোমাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না; তোমার খবরের কাগজ তোমায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে না", বিমানে চড়ার সিঁড়িতে ওঠতে উঠতে আমি এইসব শুনতে পেলাম।

"তাড়াতাড়ি ফিরে এস। তোমাকে ছেড়ে তোমার থেকে আলাদা হয়ে থাকা গোয়েরিং সহ্য করতে পারবে না। তুমি যদি না দাও, ওর মুখে রসুনের গন্ধ ছুঁড়বে কে?"

ঝর ঝর করে বলা এইসব ছোট ছোট সখ্যতাপূর্ণ উচ্চারণের মধ্যে, আমার বিশেষভাবে মনে আছে সেরগেই ক্রুশিনস্কির গানের মত কথা: "সূর্যাস্তের আগেই তুমি বাড়ি পৌঁছে যাবে। সত্যি বলছি, আমার তোমাকে হিংসে হচ্ছে।"

মস্কোতে ওর আর আমার ফ্ল্যাট বাড়ি একই ব্লকে। আমি জানতাম যে ও ওর স্ত্রী আর দুই ছেলেকে খুবই ভালবাসত। যুদ্ধের সময় অন্যান্য সব শিশুদের মত, তার দুই ছেলেও বাবাকে ছাড়াই বড় হয়েছিল। সে তার পরিবারকে খুব ভালবাসত, আবার সাংবাদিক হিসেবে সে তার কাজকেও ভালবাসত। তাই ক্রুশিনস্কি কেবলই ঘুরে বেড়াত, আর তার পরিবারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হত খুব কম।

আমি কেমন যেন মনমরা হয়ে মস্কো পৌঁছুলাম। কিন্তু দেখা গেল যে এই তলব এক সুখকর পরিণতির জন্য। সর্বশক্তিমান ফভোদর প্যানফিয়োরভ আমার সেই পা-বিহীন বৈমানিককে নিয়ে কাহিনী প্রকাশ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। তিনি তার নিজস্ব উৎসাহী ভঙ্গীতে *প্রাভদা* সম্পাদক পিয়োতর পোসপেলভকে বুঝিয়েছেন যে পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাবার আগে লেখাটার চূড়ান্ত সম্পাদনার জন্যে লেখককে কয়েকদিন মস্কোতে দরকার। যেহেতু ন্যুরেমবার্গে বিচার অধিবেশন এখন মোটামুটি নিস্তেজ, ঝিম-ধরা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমাকে অল্প কদিনের জন্য মস্কোতে ডেকে পাঠানো খুব জরুরী। এইসব বুঝিয়ে উনিই ওঁকে রাজী করিয়েছেন।

যুদ্ধের সময়কার অলিখিত আইন অনুসারী সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম দেখা হওয়ামাত্র আমি ও আমার স্ত্রী, আমার মাধ্যমে পাঠান অন্যান্য সাংবাদিক প্রতিনিধিদের চিঠি ও স্মারক তাদের প্রাপকদের প্রথম বিলি করলাম। এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালিত হলে তবেই, সেদিন রাত্রের কিছু পরের দিকে আমি

প্রাভদা দপ্তরে গেলাম। রাত্রিবেলায় যখন জোর কাজকর্ম হচ্ছে তখন আমি হেঁটে হেঁটে সেখানে ভেতরে ঢুকলাম। তৃতীয় পাতা তখন সত্ত ছাপতে পাঠানো হয়েছে, আর প্রথম পাতাটা শেষবারের মত ঠিকঠাক করে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে কাজের তুরুক গতি ও গুরুত্ব সত্ত্বেও, যুদ্ধের সময় যারা এই পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রাণস্বরূপ ছিল, তারা প্রত্যেকে পোসপেলভের অফিস ঘরে এসে জড়ো হয়েছে। কেবল লিওনিদ ইলিচভ যেখানে *ইজভেস্তিয়া'*-র সম্পাদক, তার জায়গায় এসেছে নতুন প্রধান সচিব মিখাইল সিভোলোবভ। কিছুদিন আগেও সিভোলোবভ ছিলেন একজন যুদ্ধ সংবাদদাতা, বিভিন্ন অরণ্যে অবস্থানকারী পার্টিজানদের যুদ্ধের বিবরণ পাঠিয়ে যিনি বহুল পরিচিত। আর কড়া মেজাজের কর্নেল লাজারেভের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পাকা চুল, সম্ভ্রান্ত জেনারেল গালাকতিওনভ। ওখানে প্রধান সহকারী কর্নেল ইয়াখলাকভ ছিলেন, এ মানুষটি খুব কৌশলী, আর গলাটা তার গুরুগম্ভীর গমগমে, ছিলেন "শিল্প বিভাগীয় কর্তা", অর্থনৈতিক শাখার প্রধান সেনিয়া গেরসবারজ। আর ছিলেন মস্কোর সাংবাদিকদের পূর্বতন রাজা লাজার ব্রন্তমান।

"তারপর বলো, ন্যুরেমবার্গে এখন কেমন চলছে? প্রতিবাদী আসামীদের আচরণ আর ব্যবহার কি ধরনের? ওরা কাদের মত, ওরা কেমন?"

আমি অকস্মাৎ বুঝতে পারলাম যে বিচারের সবকিছু মস্কো কী তীব্রভাবে খেয়াল রাখছে। যখন আমি ন্যুরেমবার্গের জন্যে প্রথম যাত্রা করি, তখন ব্যক্তিগত একান্ত কথোপকথনে পসপেলভ আমায় বলেছিলেন, "এটা খালি যুদ্ধ অপরাধীদের একটা সাধারণ বিচার নয় যা যুদ্ধ শুরু হবার সময় থেকেই হয়ে আসছে। ফ্যাসীবাদের যে আদর্শ, সেই গোটা আদর্শবাদটার বিচার হবে এটা। আমরা সোভিয়েত কমিউনিস্টরা প্রথম পৃথিবীকে ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করেছিলাম। কিন্তু কেউ তখন আমাদের কথায় কান দেয় নি। এখন এটা প্রমাণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সেই সাবধানবাণী ছিল ঐতিহাসিক আর এটাও দেখানো গুরুত্বপূর্ণ যে ফ্যাসিবাদ পৃথিবীকে কি এনে দিয়েছিল। কেবল দায়ী লোকেদের শাস্তি দেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ নয়, পাশব আর নৃশংস আদর্শবাদকে দণ্ডদানও সমান গুরুত্বপূর্ণ।"

এখন উনি সোৎসাহে জানতে চাইলেন প্রতিবাদী আসামীরা মানুষ হিসেবে কেমন, আর ওরা কেমন ব্যবহার করছে।

"ওরা স্রেফ, তুচ্ছ চোর", ফাজিল বাক্যনবিশের মত উত্তর দিলাম আমি।

পলেপেলভ, এতক্ষণ তাঁর ঘরের একপাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত শান্তভাবে পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ আমার আরাম কেদারার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"তুচ্ছ চোর? তাই নাকি?" ওনার চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওরা হল তুচ্ছ চোর? বেশ, তাহলে আমরা কে? তুমি যেমন বলছ, এইসব তুচ্ছ চোরেরা যদি আমাদের ঠেলে মস্কো আর নিম্ন ভোলগায় পাঠিয়ে থাকে, তাহলে আমরা কি? এঁ্যা?"

ততক্ষণে আমার মালুম হয়েছে যে আমি বোকার মত কথা বলেছি।

"না," পোলপেলভ তাঁর চশমা খুলে কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন, "তুচ্ছ চোরেরা মাত্র দুদশক সময়ে জার্মানীর মত এক মহান জাতির চোখের ওপর পশম বিছিয়ে দিতে পারতো না, কিংবা যে সব ভয়ঙ্কর বিভীষিকাপূর্ণ সব মৃত্যু যন্ত্র, যে সবের কথা তোমরা লিখেছো, তুচ্ছ চোরেরা মাত্র বারো বছর সময়ে সে সব গড়ে তুলতে পার তো না। তারা এইরকম একটা যুদ্ধও তৈরী করতে পারত না। না, এই লোকগুলো তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আর নিজের নিজের রাস্তায় অসাধারণ। এই 'চোরেরা' পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রীভূত সারাংশ—তার চূড়ান্ত চেহারা। এরা হল তাই। আর এরা যদি কাপুরুষের মত বিচার সভায় হাজির হয়, ব্যবহার করে তাহলে সেটা তারা করছে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের জন্য। কেবল মাত্র মহৎ আদর্শ ও মহৎ ধারণাই মহৎ মানুষের জন্ম দিতে পারে, ভণ্ড জুয়াচোরদের সব সময় শেষেই খুঁজে পাওয়া যায়।"

"আপনি যা বলছেন তা একেবারেই যথার্থ," আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আমি আমার কথাটা ঠিক ভাবে বলতে পারিনি। আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আদালতে ওরা একেবারে নগণ্য তুচ্ছ চোরের মত ব্যবহার করছে। যা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নানা রকম ঘোর প্যাঁচ চালাকি করে সেটাই অস্বীকার করছে। আর যেন নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে নিয়েছে ওরা। সেই চুক্তি মত অনুপস্থিত তিনজন—হিটলার, হিমলার, গোয়েবলস এই তিনজনের ঘাড়ে সব দোষ আর দায় চাপাচ্ছে।

"তোমাদের পাঠানো বিবরণে, এ সবই পড়েছি," তাঁর ডেসকের একটা ধারের ওপর বসে সম্পাদক বলে চললেন। ডেসকের ওপর সন্ত আসা ছাপানো কিছু প্রুফ কপি রাখা। "অকাট্ট সব প্রমাণের মুখে ওরা কেমন কাপুরুষের মত ব্যবহার করেছে, সে সব কথা তুমি খুবই ঠিকঠাক লিখছো। ওই যে ঘটনাটা, নাম সই, নিজের স্বাক্ষরকে স্বীকার করছে, তারপর আবার অস্বীকার করছে, সেটা বড় মজার। কিন্তু এটাই ওদের মার্কমারা ব্যবহার। লিপজিগ বিচারে জিওরজি দিমিত্রভ ছিল একজন অভিযোগকারীর মত। এমনকি বুর্জোয়া রাজনীতিকরা তার সাহস, যুক্তি আর জ্ঞানের তারিফ করেছিল। সিংহ গর্জন করে আর একটা ইঁদুর কেবল কিচ কিচ করে। এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সব কিছু বলা কওয়া হয়ে যাবার পর, এমনকি কালটেনব্রুননার—দৃষ্টান্তস্বরূপ তার কথাই ধরা যাক—একটা তুচ্ছ চোরের থেকে একটু বেশী বা কম। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে লোকটা ছিল এক নিখুঁত সংগঠক। আর তার শয়তানী মস্তিষ্ক যে যন্ত্র সৃষ্টি করেছিল, পৃথিবীর জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্যে তার উদ্ভাবিত যন্ত্র কাজ করত সংক্ষেপে, সঠিকভাবে ও অনুগতভাবে। সুতরাং, প্রিয় কমরেড পোলেভয়, তোমার এটা বুঝতে হবে আর আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এ সব বিষয়ে লিখতে হবে। সৈনিকদের খুশী করার জন্যে আমুদে গল্পের সময় পার হয়ে গেছে। আমাদের বিরোধীদের যদি আমরা ঠিকমত দেখাই আর সেই দেখানোর কাজটা আমাদের সমস্ত দক্ষতা দিয়ে, যদি বাস্তবসম্মত ভাবে করি তাহলেই জনসাধারণ বিলক্ষণ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করবেন যে কি মর্মান্তিক দুঃখ ও চরম বিপদ থেকে লাল ফৌজ আমাদের দেশ ও পৃথিবীকে রক্ষা করেছে।"

সে রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে আমি আবার বিষয়টা নিয়ে ভাবলাম। একদা বালগেরিয়ায় জিওরজি দিমিত্রভের সঙ্গে কথপোকথনের পর এইরকম চিন্তা করেছিলাম। যে কাজে ব্যাপৃত আছি আমরা, যে কাজ করার জন্য এত পরিশ্রম করতে হয়, তার গুরুত্ব আর দায়িত্বের কথা ভাবছিলাম আমি। যে সমস্ত দেশ নাজী জার্মানীর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল, তারা কার্যতঃ, হিটলারের সহযোগী চেলা চামুণ্ডাদের বিচার করছে না, ধীকার জানাচ্ছে নাজী আদর্শবাদকে—এক পাশব নৃশংস রাক্ষুসে আদর্শবাদ—এবং এর প্রতিটি দিক যার প্রাত মানুষ বিমুখ, বীতশ্রদ্ধ হতে পারে, তার সব কটি পৃথিবীর সামনে বারংবার খুলে

মেনে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "জনগণকে পরবর্তী এক হাজার বছরের জন্য" যে বিপদ ও বিভীষিকা পৃথিবীর দিকে উঁচিয়ে এসেছিল, যতবার সে কথা মনে পড়বে, ততবার যেন মনুষ্যজাতি ভয়ে কেঁপে ওঠে। একটু অনুকূল পরিস্থিতি পেলেই, এমনকি টাটকা নানা বিপর্যয়ের কথা ভুলে যাওয়াই মানুষের প্রবণতা। কিন্তু যে বিপদ থেকে মনুষ্যজাতি বেঁচে গেছে, সে কথা তাকে সব সময় মনে রাখতে হবে। এই কথাটা বার বার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলাটা দরকার। আর এই দায়িত্বের জন্যই, তুলনামূলক ভাবে এই লম্বা বিচারের আপাত ক্লান্তিকর একঘেয়ামির দিকটা নগণ্য হয়ে গেছে।

ফুটন্ত লেবু ফুলের মধু-গন্ধে গ্রীষ্ম রাত্রি বেশ ভারী। একঝলক উষ্ণ দক্ষিণ বাতাস শান বাঁধানো ফুটপাথের উপর দিয়ে পপলারের পাতার ছোট ছোট গোল্লাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর আমার জুতোর মচমচ শব্দ কাছেই কোথাও থেকে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মস্কোতে এই ঘরে ফিরে আসা যে কি মধুর!

আমার ঘরের দরজার ঘন্টাতে টেপার জন্যে হাত দেওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল। আমার স্ত্রী সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তার গায়ে তার সবেধন পিস্ত-রঙের হাউসকোট। জার্মান পানজাররা যখন আমাদের গ্রামের বাড়ি আক্রমণ করে তখন আমাদের ছোট্ট ছেলেকে কোলের মধ্যে নিয়ে সেখান থেকে পালাবার সময় এটাই সে কোনমতে তুলে নিতে পেরেছিল। তার মিষ্টি, গোল মুখেও—গোঁসা।

"আমি ভেবেছিলাম, প্রথম রাত্রিটা তুমি বাড়িতে আমাদের সঙ্গে কাটাবে। আমরা তো এখনও ঠিকমত তোমাকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতেও পাই নি।"

সম্পাদকীয় দপ্তরে আমাদের যেসব কথা হয়েছিল, আমি তাকে সেইসব বলতে শুরু করলাম। কিন্তু ওর মুখখানি যেন আরও দুঃখিত দেখাল।

"ইস্‌স···আস্তে, বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে। তুমি কি ভুলে গেছো যে তোমার দুটো বাচ্চা আছে?"

বাচ্চারা সত্যিই ঘুমোচ্ছিল—দু'বছর বয়েস, এক মাথা কোঁকড়া চুল ফুটফুটে দেখতে আমাদের ছেলে। আর আমাদের মেয়ে—কালো চোখ, কালো চুল। মেয়ে হয়েছে এক বছর আগে, আমাদের বিজয় দিবসের ঠিক আগে। আমাকে ছাড়াই ও বড় হয়েছে; উৎসাহে টই-টই, ভীষণ চঞ্চল

আর বড়ই দুঃখের যে ও আমার অপরিচিত—এক ক্ষুদে প্রাণী। আমি অনেকদিন ওদের দেখি নি। বোধ হয় তাই আমার মনে হত যে ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হচ্ছে। আর প্রতিবারই আমি যখন বাড়ি যেতাম, আমার কাছে ওদের নতুন, অপরিচিত মনে হত। আমি অবশ্যই একজন খারাপ স্বামী, একজন মন্দ পিতা। কিন্তু এইতো সাংবাদিকের জীবন। আর এ জীবন আমি কোন কিছুর বিনিময়েও বদলাবো না।

পরের দিনটা আমার পুরো গেল আমার বই নিয়ে কাজ করতে। বইয়ের নাম "একজন সত্যিকার মানুষের মানুষের গল্প",—সাময়িক দ্বিধার পর সম্পাদকরা মেনে নিয়েছিলেন। সবাই দারুণ বিবেচক আর মনোযোগী হয়ে বসেছিলেন—গদ্য রচনা সংক্রান্ত বিভাগীয় প্রধান ভ্যাসিলি ইলিয়েনকভ এবং ফিয়োদর প্যানফিয়োরভ স্বয়ং।

"ব্যাপারটা কি, এটা কিরকম ধরনের ব্যবহার—সম্পাদকদের দরজায় বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালালে। এখন আমরা যা খুশি তাই করি", প্যানফিয়োরভ যেন আমায় ধমক দিলেন। আসলে খোস মেজাজে থাকলে আমি হাজির হলেই উনি এভাবে আমার পিছনে লাগতেন। "না, ও ভালো মানুষ শোন, তোমার এই পিতৃমাতৃহারা ছানাকে আমরা বড় করব না, তোমায় নিজেই তা করতে হবে।"

গতকাল *প্রাভদা* সম্পাদকীয় দপ্তরে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তা মনে রেখে আমি অপরাধীর মত বললাম, "আমি বিচারের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।"

"বিচার···হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তা তুমি চিন্তা করো না, তারা তোমাকে ছাড়াই সব কটা গোয়েরিংকে ঠিক সাজা দিতে পারবে। কিন্তু তুমিই হলে একমাত্র লোক যে পাঠকদের জন্যে বই তৈরী করতে পারে। তুমি যদি এই বইটাকে অবহেলা কর, তাহলে সেটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার হবে।" তারপর তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন, যদিও মস্ত ঘরখানার সেই মুহূর্তে আর কেউ ছিল না। তারপর তিনি ফিস ফিস করে বললেন, "সবাই জানে আর সবাই অনুমোদন করেছে। তোমার এ নিয়ে খামোকা চিন্তা করার কিছু নেই। পিয়োতর পোসপেলভ রাজী হয়েছেন যে যতদিন না তোমার বইটা নিয়ে কাজ শেষ হয়, ততদিন তুমি মস্কোতে থাকবে। বুঝেছো তো পরিষ্কার?"

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মস্কোর বাঘা বাঘা লোকদের প্রভাবিত

করার ব্যাপারে প্যানফিয়োরভের যাদুকরী শক্তির কথা সকলে জানত। আলাদা আলাদা করে "প্রত্যেকে" বলতে কারা, তা বার করার আমি চেষ্টাও করলাম না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে কেবল একবারের জন্য এবং সমাজতন্ত্রের সকল নৈতিক ধারার বিরুদ্ধে, আমি নিজেকেই সর্বাগ্রে রাখলাম।

বাড়ি ফিরে আমি দেখলাম, যে আমার পরিবারের সকলে হৈ-চৈ করে উঠল। আমার মা ও আমার স্ত্রী, আমায় সশ্রদ্ধভাবে জানালেন যে আলেকজান্দার ফাদেয়েভ ফোন করেছিলেন ও আমি যাতে তাঁকে ফোন করি, তার জন্য তাঁর ফোন নাম্বার জানিয়ে দিয়েছেন। শুনে আমি খুব খুশী হলাম ও অবশ্যই তাঁকে তখুনি ফোন করলাম।

"আমার স্ত্রী ও আমি তোমার ওখানে যাব ভাবছি। অসুবিধে আছে?"

আমার অসুবিধে? সাহিত্য জগতে এই সুখ্যাত লেখকের চেয়ে বেশী মান্য আমি অন্য কাউকে করি না। আমার যৌবনে, তাঁর লেখা উপন্যাস *দি রাউট* ছিল আমার কাছে বাতিঘরের মত, যার দিকে লেখক হবার ইচ্ছা নিয়ে আমি তাকাতাম। কালিনিন সীমান্তে, আমাদের দুজনকে পাশাপাশি এনে দিয়েছিল যুদ্ধ। সেখানে ফাদেয়েভ *প্রাভদা*-র সাংবাদিক প্রতিনিধি ছিলেন। সেসব দিন ছিল সত্যিই কঠিন। গোটা সৈন্যবাহিনী সমেত, তখন শীতকাল, রজহেভে আমরা চারদিক থেকে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের খাদ্য ছিল জেনারেল বেলভের "অশ্বারোহী বাহিনী" অর্থাৎ এই অশ্বারোহী বাহিনীর যে সমস্ত ঘোড়া শরৎকালের শেষ দিকের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, সেইসব ঘোড়ার জমে যাওয়া, হিমায়িত জঘন্য মৃতদেহ। অন্যান্যদের সঙ্গে আমরাও সেই মৃত ঘোড়াদের দেহ থেকে ছোট ছোট মাংসের টুকরো কেটে বার করে নিতাম, তারপর সেটাকে লোহার শিকের আগায় গেঁথে ঝলসে নিতাম শিবিরের আগুনে। এটা হল পুরোন উদেঘেই পদ্ধতি। ফাদেয়েভ এটা সুপারিশ করেছিল। বাহিনীর মধ্যে এই পদ্ধতির নামকরণ হয়েছিল "ঝলসানো, পদ্ধতি ফাদেয়েভ।" ওহো, সেই সামান্য পচে যাওয়া মাংস! কিন্তু তবু সেটা খাওয়া চলত, বিশেষ তুমি য দি তাতে একটু রসুন মাখিয়ে নিতে পারতে। বিমান থেকে আমাদের জন্যে রসুন ফেলে দেওয়া হত, আর প্রতিদিন এক কোয়া করে রসুন পেত প্রত্যেকে।

আমরা আলেকজান্দার সেখানে সমস্ত সামরিক সাংবাদিকেরা সরাসরি জানতে পেরেছিলাম ফাদেয়েভ কেমন ধরনের লোক। আমরা সবাই তাঁকে ভালবাসতাম—লম্বা, সুদর্শন, আত্মবিশ্বাসী, সদয়, সব সময় আশাবাদী একজন মানুষ যিনি ভীষণ কঠিন মুহূর্তেও শান্ত ও উজ্জ্বল আশার আলো বিকীর্ণ করতে পারতেন। রজয়েভ-এর কাছে এইসব রাত্রি দূর অতীতে অপসৃত। ক্রশের মত পরস্পরকে কাটা উজ্জ্বল আলোয় ঝলকে ঝলকে ঝলসে উঠত রাত্রির আকাশ; গুম গুম করতো কর্কশ বুলেটের শব্দ—কেন না যে বনটায় আমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছিল, তার চারদিকে আগুন লাগানো হয়েছিল। এ সবই এখন ইতিহাস। এবং তখন থেকে—না, ঠিক কথা বলতে, ভেলিকিয়ে লুকি যুদ্ধের পর থেকে—এই মানুষটিকে আমি দেখিনি। এখন তিনি জানতে চাইছেন, "আমি কি তোমার বাড়ি আসতে পারি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। দয়া করে আসুন। আপনি এলে আমাদের বাড়ির সবাই খুব খুশী হবে।"

উনি সস্ত্রীক আসবেন বলে আমার স্ত্রী আর মা যে কি করবেন আর কি করবেন না, তাই নিয়ে মহা ব্যস্ত আর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আমার স্ত্রী একজন শিক্ষয়িত্রী। সপ্তম এবং দশম পর্যায়ে তাকে ফাদেয়েভের "রচনা" পড়াতে হয়। তাঁর উপন্যাস *দি ইয়ং গার্ড* (*অতন্দ্র প্রহরী*), যা *কমসোমোলসকায়া প্রাভদায়* ছাপা হয়েছিল, তা আমাদের যুবকদের আদর্শের প্রতীক হয়ে গিয়েছিল। আমার মা ছিলেন একজন পুরোন বলশেভিক এবং এক কারখানার চিকিৎসক। তিনি সারা জীবন আমাদের যে নিজের শহর, যেখানে বস্ত্রশিল্প কারখানা "প্রোলেতারকা"র হাসপাতালে কাজ করে কাটিয়েছেন। ডাক্তারদের মাঝে মাঝে নতুন নতুন শিক্ষা নেবার জন্যে আর পুরোন ব্যাপারগুলোকে ঝালিয়ে নেবার জন্যে যেসব পাঠক্রম আছে, সেগুলোতে যোগ দেওয়ার জন্যে তিনি মাত্র কয়েকবার কালিনিন ছেড়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি কোন জীবন্ত লেখককে দেখেননি। বহু বহুদিন আগে আমার মা দেখেছিলেন লিওনিদ আনদ্রিয়েভকে যাঁর গায়ে ছিল লাল জামা আর পায়ে বেদুইনদের জুতো। আর ছাত্রদের এক রাজনৈতিক সভায় মা দেখিয়েছিলেন ভিকেনেতি ভেরেসায়েভকে, তাঁর নাকের ওপর ছিল ডাক্তারদের ভাঙিবিহীন চশমা।

অল্প কথায়, আমার বাড়িতে তুমুল হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল, আর সবাই

নানারকম ভাবতে লাগল। তারা চিন্তা করতে লাগল, অতিথিদের তারা কি দেবে। জানা গেল যে ১লা মে থেকে ভোদকার একটা বড় বোতল যা আমার ছুটির দিনের বরাদ্দ র‍্যাশন থেকে পাওয়া গেছে, তা আছে। মুখরোচক সব নানা চাটনি, চানাচুর, এ সবের কি করা যাবে? ওরা সব টাকা কড়ি এক জায়গায় করে আমায় তা দিয়ে পাঠাল খাবারের দোকানে। পুরোন দোকানটার নাম "ইলিসেইভস্কি"। আমায় টাকা দিয়েছে এক তাড়া, অথচ কেনার জন্যে মা যে আমায় ফর্দ দিয়েছে তাতে মাত্র কটি জিনিস লেখা: দুশ গ্রাম সসেজ, একশো গ্রাম চীজ, পাঁচটা ডিম...তাহলে এত টাকা দিল কেন?...আমি সেই পরিচ্ছন্ন দোকানে ঢুকে টাঙানো নানা জিনিসের মূল্যতালিকা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি সেই বড় বড় চাদরের মত একশো রুবলের নোটগুলো গুণতে লাগলাম খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েই। স্বারেমবার্গ-এ থাকার সময় আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে অনেক ব্যাঙ্ক নোটের ওপর নানা বাধানিষেধ জারী করায়, সেগুলোর দাম শূন্য হয়ে গেছে। আমার মা তাঁর গোটা হস্তাক্ষরে, সামান্য যে কটা জিনিস লিখেছেন, দেখা গেল আমার আনা গোটা নোটের তাড়াই তাতে লেগে যাবে।

যাইহোক, দোকানে টাকা পয়সা যেখানে নেওয়া হয়, সেখানে লম্বা লাইন। নীচে বর্ণিত দৃশ্যটি আমি স্বচক্ষে দেখলাম—মানুষের লাইন খুব লম্বা। সবাই বেশ উত্তেজিত। আর সেই লম্বা লাইনের শেষের দিকে ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান একজন পঙ্গু ব্যক্তি। তার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আর লাইনের একেবারে সামনের দিকে, যেখানে টাকা পয়সা নেওয়া হচ্ছে সেখানে সম্ভ্রম জাগানো চেহারা, মাঝবয়সী লেফটানেন্ট জেনারেল। চমৎকার মাপসই সামরিক উর্দিতে তাঁকে অন্যদের মধ্যে আলাদা করে স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। সেই পঙ্গু লোকটি কাতর হয়ে বোঝাচ্ছিল যে তার ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। সে যা চাইছিল, তা হল সিকি বোতল ভোদকা সে লাইনের লোকেদের কাছে এই বলে আবেদন করছিল, "আমার বন্ধুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা সবাই ঠিক করেছি তাকে বিদায় জানানো উপলক্ষে একটু পান ভোজন করব! আর আমাকে তা আনার জন্য মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে বাইরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" লাইনের সব চুপ। লেফটান্যান্ট জেনারেল একবার চারপাশে তাকালেন,

তারপর এগিয়ে গেলেন ক্যাশ রেজিস্ট্রারের কাছে যাবার জন্য লাইনে দাঁড়ান ক্রাচ বগলে, সেই পঙ্গুর কাছে। তাকে বললেন "আপনি আমার জায়গায় দাঁড়ান।"

সেই পঙ্গু লোকটি লাফিয়ে লাফিয়ে সানন্দে ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে এগিয়ে গেল। লাইনের সবাই বোবা হয়ে গেছে। তারপর লাইনের কয় জন মিনমিনে গলায় বলল সেই লেফটান্যান্টকে তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে যেতে বলল। তিনি কিন্তু শান্তভাবে, ধৈর্য সহকারে আর তেমনি সসম্ভ্রমে সেই পঙ্গুর জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। অনেকে গলা তুলে তাঁকে সেই একই অনুরোধ করতে থাকলে তিনি 'আ' শব্দটিকে সামান্য গড়িয়ে দেওয়ার মত করে বললেন "আহত প্রাক্তন যোদ্ধারা আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আমার কোন তাড়া নেই……কেননা, আমি তো এখনো মজুতের দলে……"

আমায় যত টাকা দেওয়া হয়েছিল তাতে কেনা ফর্দ অনুযায়ী সব রকম খাবার কেনা ঝোলান থলিটা হাল্কা আর ছোট। ঘরে ইতিমধ্যে টেবিল পাতা হয়ে গেছে, আর তাতে আমাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যে কটি চীনে মাটির পাত্র আমরা চেয়ে এনেছি, সে গুলি সাজানো। আর আমার ছুটির র‍্যাশন থেকে পাওয়া কতকগুলি জিনিস, যেগুলি আমি বাড়ি না আসা পর্যন্ত আলাদা করে রাখা হয়েছিল, সেগুলি টেবিলের ওপর রাখা। একটা হলদে টেবিল ক্লথ দিয়ে টেবিল ঢাকা। সেই ঢাকাটি জার্মানরা এসে যাবার আগে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ঢাকাটির এখানে ওখানে সেই লেগে যাওয়া মৃত্তিকার দাগের ছোপ লেগে আছে। এসব সত্ত্বেও আমার স্ত্রী ও মা এভাবে টেবিল সাজিয়ে বেশ গর্বিত। আতিথেয়তা বলে তাঁদের অতিথিদের কাছে কিছু তো দেবার আছে।

ফাদেয়েভ এলেন সঙ্গে তার স্ত্রী। লম্বা, মেদহীন ছিপ ছিপে চেহারার এক মহিলা। তাঁর কণ্ঠস্বর গভীর ও ধ্বননশীল। আমি তাঁর আবির্ভাবকে এমনকি "রাজকীয়" বলে আখ্যাত করতেও পারতাম। এই মহিলার নাম আনজেলিনা স্তেপানোভা। তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারের একজন অভিনেত্রী। ওঁকে আমি ও আমার স্ত্রী আগে কেবল মঞ্চে দেখেছি *দি থ্রি সিস্টারস্* নাটকে ইরিনার ভূমিকায় অভিনয় করতে। আমার সামান্য অস্বস্তি হতে লাগল। ফাদেয়েভ হল, সবার ওপর, একজন সৈনিক। তাঁকে আমরা খাই

খেতে দিই না কেন - সবই তাঁর পক্ষে গ্রহণীয় কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু একজন অভিনেত্রীকে...

যাই হোক তারপর আমি আর একবার জানলাম যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শক্তি কত। আমরা যে উদ্বেগ নিয়ে ফাদায়েভ দম্পতীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম, ওনারা আসা মাত্রই তা আপনা থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। সেই বিখ্যাত থিয়েটার থেকে আসা অভিনেত্রী আমার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর মত কথাবার্তা চালানোর জন্যে একটা বিষয় পেয়ে গেলেন—মস্কো শহরে উপকণ্ঠে একজন শিক্ষয়িত্রী হল আমার স্ত্রী। তারা দুজনেই জননী। আর ফাদেয়েভের ছেলে মিশাও আমাদের আলিওনা-র মত একই সময়ে জন্মেছে, যুদ্ধের একেবারে শেষে। কি করে বাচ্চাদের সব চেয়ে ভালো করে বড় করা যায় এই নিয়ে উদ্দীপিত এক আলোচনা শুরু হয়ে গেল—একটা বাচ্চার পুতুল ব্যবহার করা উচিৎ, না উচিৎ নয়, কোন বয়সে বাচ্চার কথা বলতে, হাঁটতে আরম্ভ করা উচিৎ, বাচ্চাদের পেটের গোলমাল কি করে বন্ধ করা যায়, আর কতখানি টাটকা তাজা বাতাস বাচ্চাদের দরকার।

সেই পুরোন কায়দায় আমার মা ফাদায়েভের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তিনি কথা বলছিলেন সাহিত্য নিয়ে, বিশেষ করে বলছিলেন ফাদেয়েভের *দি ইয়ং গার্ড* বইটির কথা, যে লেখাটা মা *কোমসোমোলস্কায়া প্রাভদা* থেকে খুলে রেখে দিয়েছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ আলোচনা ও সব কিছু খুব একটা ভালো চলছিল না। ফাদেয়েভ এক ধরনের বিরস মুখ নিয়ে সব কথাতেই হ্যাঁ করে যাচ্ছিল। এ সময় একটা ঘটনা ঘটল, যেটাকে "করুণ" বলা যায়, কিন্তু তাতেই পরিস্থিতিটা অনেকটাই ভালোর দিকে চলে গেল। কালিনিনে আমাদের যা কিছু জিনিসপত্র ছিল, তার মধ্যে কেবল একটা জিনিস বাঁচানো গিয়েছিল, আর সেটা মস্কোতে আনা হয়েছিল। সেটা একটা পুরোনো "টারকিশ" ডিভান। তাতে একটা ছেঁড়া কমলা রঙের ঢাকনা দেওয়া। এই ডিভানের স্প্রিংগুলো অনেক আগেই বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। এখন ওটার মধ্যে ঠাসা ছিল খবরের কাগজ। ওই খবরের কাগজগুলো আমার মা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, কেননা ওগুলোতে আমার লেখা আঁকা আর নানা আলোচনা বার হয়েছিল। ফাদেয়েভ ডিভানে বসে-ছিলেন আর বলতে কি তিনি ক্রমশঃ ডিভানের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমার সমস্ত লেখা একজন সত্যকার, জীবন্ত ধ্রুপদী সাহিত্যের ওজনকে ধরে রাখতে পারে নি।

অপ্রস্তুত আমার মা, নিজের দুই হাতের পাতা চেপে ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু তখনই আমরা ফাদেয়েভের হাল্কা গলায় ছোট্ট হাসি শুনতে পেলাম "হা, হা, হা"। এই হাসি সব সময়েই বোঝায় যে তাঁর মেজাজ খোশ। আমাদের উদ্বেগ সঙ্গে সঙ্গে উধাও হল সেই অদ্ভুত ডিভানের ওপর সাবধানে বসে আমরা যুদ্ধের দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলাম। কথা বলার সময় আমরা কেবলই একে অন্যকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিতে লাগলাম এই সব বলে, "আপনি জানেন......", "আপনার মনে আছে ?" "তুমি নিশ্চয়ই ভোলো নি, তাই না ?" ইত্যাদি।

ভাজার চাটুতে ডিম আর সসেজ এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে মুখে দিলে খিদে বাড়ে। তা ছাড়া আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম সেই বোতলের, যার ভিতরের মাল আমরা তাড়াতাড়ি কমিয়ে আনছিলাম। আমাদের উভয়ের স্ত্রী—মার কথা কি আর বলবো—সরল মনে সব মা-ই যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি আমার মাও মনে করতেন যে এ্যালকহল বস্তুটা আমি কদাচ ঠোঁটে ছুঁইনি—সকলে, কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। আমাদের কথাবার্তা মোড় নিয়ে ন্যুরেমবার্গে পৌঁছে গেল।

"এটা সত্যিই একটা বিচার যার কোন পূর্ব নজীর নেই। ফাদেয়েভ বলে উঠল। আর তাঁর স্বভাবগত পদ্ধতিতে বলে চলল, "হ্যাঁ, এটা নিশ্চয়ই পূর্ব নজীর বিহীন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এই ধরনের ভয়ংকর পাপকে নিন্দা করার এই হল সব মানুষের পক্ষে প্রথম চেষ্টা। তলস্তয় যে তাঁর সেরা রচনাকে নাম দিয়েছিলেন-*ওয়ার এণ্ড পীস*, তা অকারণে নয়। আর এতদিন পর এই প্রথম মানুষ তার যুক্তিবুদ্ধি ও হঁসে ফিরে, নিজেদের মধ্যে নানা বাদ বিসম্বাদ ও পার্থক্য ভুলে, যুদ্ধের যেটা উৎস—তার ঘৃণ্যতম চেহারায় সাম্রাজ্যবাদ-যেটা হল ফ্যাসিবাদ, সেটাকেই দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে। মানুষের চরিত্রের মধ্যে এটাই হল একটা জঘন্য আর ভয়ঙ্কর দিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তারা ? তারা কি ? এই সমস্ত গোয়েরিং আর হেস্‌রা ব্যবহার করছে কেমন ?"

আমি যথাসাধ্য তাঁকে বলবার চেষ্টা করলাম। আমি যখন মৃত্যু শিবিরে নানা প্রসাধন সামগ্রী তৈরীর ব্যাপারগুলো বলছিলাম, যখন বলছিলাম

মানুষের চামড়া থেকে কি কি জিনিস তৈরী হয়েছে, ফাদেয়েভ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এমন উত্তেজনা তাঁর পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক।

"লিদা, লিদা, শোন ও কি বলছে", ফাদেয়েভ তাঁর স্ত্রীকে বললেন। "সেই বিকট প্রাণীটাকে, যেটাকে আমি রজেভে দেখেছিলাম, যেটার কোমরে ক্যানভাসের তৈরী বেল্ট, আর বেল্টে অনেকগুলো পকেট। পকেটে ঠাসা মুঠো মুঠো সোনার দাঁত, আর মুদ্রা—সেই প্রাণীটাই ছিল নাৎসীবাদের জীবন্ত প্রতীক। আমি তাকে আমার *দি ইয়ং গার্ড*-এ একটা চরিত্র করে এঁকেছিলাম, আর আমি এটা ঠিকই করেছিলাম। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। সে লোকটা সাদা মাটা হ্যানস বা ফ্রিটজ, বা কুর্ট নয়......। হ্যানস, ফ্রিটজ বা কুর্টরা খারাপ লোক না-ও হতে পারে। কিন্তু লোকটা ছিল স্বয়ং সাম্রাজ্যবাদ,—ওই লোকটা ছিল সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি, সাম্রাজ্যবাদের সারাৎসার। পৃথিবীর সমস্ত লোক যাতে এ কথাটা অনুভব করতে পারে, সে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সে তার দুই হাতে করে তার রূপালি চুলগুলোতে বিলি কাটার মত করে পিছন দিকে ঠেলে দিল। তারপর হঠাৎ তাকে তার কাছে টেনে নিলেন। যে ব্যাপারটা নিয়ে উনি চিন্তিত, সে রকম কিছু বলবার সময় এ রকম কাছে টেনে নেওয়া ওনার অভ্যাস।

"এই রক্তাক্ত যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে বলে আমি মনে করি, তা জানো? শান্তির জন্য জনসাধারণের আন্দোলন যার মধ্যে বিশ্বাস আর পার্থিব দৃষ্টিকোণ হেতু নানা পার্থক্যের কিছুই থাকবে না? এ ছাড়া, মানুষ নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে? পৃথিবীতে আবার জীবনের পুনর্জন্ম হবে এ্যামিবা থেকে আর নানা উভচর প্রাণী থেকে।"

ভরোবেভস্কায়া পাহাড়ে যেখানে কর্নেল আলেকজান্দার ক্রোনিকের সামরিক বাহিনীর চৌকি, সেখানে ফাদেয়েভ ও আমি এক সঙ্গে যে রাত্রি কাটিয়েছিলাম হঠাৎ সে কথা মনে পড়তে তাই নিয়ে কথা বলতে লাগল। ১৯৪২ সনের শীতকাল তখন। আমরা যে পাহাড়টায় আছি তার চুদিকে আগুন জ্বলছে। এটা ভেলিকিয়ে লুকির চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী লড়াইয়ের আগে। সে রাত্রে যা ঘটেছিল তা কেবল ছায়া ছবিতেই দেখা যায়। সেই সামরিক চৌকির ডিভিসনাল কমাণ্ডার আগে ছিলেন, তেজস্বী কিশোর যুবকের অশ্বারোহী বাহিনীর সারজেন্ট মেজর। আমাদের বাহিনীর

কমাণ্ডারের কাছে অকস্মাৎ পরিদর্শনে এলেন সেই ঝ্‌ুকভ, যিনি এখন উপ প্রধান সেনানায়ক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃথিবী বিখ্যাত মারশাল। সেই কমাণ্ডারের বাহিনীর ছাউনির বাইরে খুঁড়ে রাখা গর্ত মাঝে মাঝে গোলার বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। গোলা আসছিল কখনও পূব দিক থেকে, কখনো চারদিক থেকে অবরোধ করে রাখা ভেলিকিয়েলু কির নানা জায়গা থেকে। আবার কখনও আসছিল পশ্চিম দিক থেকে, যেখানে জার্মান হানাদার বাহিনী তাদের ফাঁদে পড়া সংরক্ষিত বাহিনীকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল। ফাদেয়েভ ও সেখানে সেই কমাণ্ড ছাউনিতে ছিল। দূর প্রাচ্যে যুদ্ধের সময় থেকে ফাদেয়েভের সঙ্গে ঝ্‌ুকভের আলাপ।

নানা পথের কাটাকুটিতে ভাগ্যের এমন গোলক ধাঁধার পরিস্থিতি হলিউডের কোন চিত্রনাট্যও দেবে কিনা সন্দেহ। তথাপি, এমনটি হয়েছিল। আমি নিজের চোখে তা দেখেছি। মার্শাল তাঁর পূর্বতন সার্জেন্ট-মেজরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চুমু খেলেন ফাদেয়েভের দুই গালে। তখন কার কি পদ, সামরিক মর্যাদায় কে কি তা তারা বেবাক ভুলে গেছে। গৃহযুদ্ধের সময় থেকে তারা তিনজনেই ছিল সৈনিক। বহুদিন বিচ্ছেদের পর তিন বন্ধু মিলেছে এক জায়গায়। তখন সেই ভয়ংকর, সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধের আগে সামান্য, সময়ের জন্য শান্তি। ছাউনির টেবিল পেতে তার ওপর রাখা হল সসেজের বড় বড় টুকরো, জমানো চীজের একটা চাঁই, রুটি। আর মাটির নীচে গর্তে সৈনিকদের যে রসুইখানা সেখান থেকে এল টিনে করে গরম খাবার। ডিভিসনাল কমাণ্ডারের মাপা খাদ্যভাণ্ডারের জরুরী ভাগ থেকে, অবশ্যই এলো, কগনাক। আর পুরনো বন্ধুরা এক জায়গায় মিলিত হলেই, রাশিয়াতে যেমন হয়ে থাকে, একটা গানও কিভাবে যেন শুরু হয়ে গেল।

মারশাল জানতে চাইলেন যে একটা এ্যাকোর্ডিয়ান আছে কি না। একটা পুরোনো এ্যাকোর্ডিয়ান, যেটা সদর দপ্তরের বিশেষ রক্ষী বাহিনীর একজন সৈনিকের কাছে রয়েছে, উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই পুরোন, জীর্ণ বাদ্যযন্ত্রটার চাবিতে ঝুকভ হাত দিলেন, আর সেই যন্ত্র যেন যৌবন দীপ্তিতে বেজে উঠল। পুরোন বন্ধুদের এই মিলনের মাঝখানে নিজেকে ফালতু মনে হওয়ায় আমি আমার কাঠের বিছানায় ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বড় বড় চোখে এদের ব্যাপার-স্যাপার

দেখতে লাগলাম। মার্শাল, যাঁর নাম শুনলে শত্রুরা কাঁপতো, তাঁর গলার সুর উদাত্ত ও গম্ভীর। আর ফাদেয়েভের গলা ছিল পরিষ্কার ও এক ধরনের সাধারণভাবে তীক্ষ্ণ। ডিভিশনাল কমাণ্ডার গাইছিল খাদে, ক্যাঁসকেঁসে গলায়। এই তিনটি গলা এক অসাধারণ ত্রয়ীতে মিলে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের জন্য আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা একটা অবরুদ্ধ শহরের কাছাকাছি আছি, আমাদের বাহিনী রাত্রির আড়ালে এগিয়ে চলেছে সেইদিকে যেখানে আচমকা যুদ্ধ শুরু হবে। ভুলে গিয়েছিলাম যে মাটির গর্তে বসে একজন যুবক ক্যাপ্টেন জার্মান ভাষায় লেখা এক বয়ান পড়ছে। সেই যুবক ক্যাপ্টেনকে বাছাই করা হয়েছে এক যুদ্ধ বিরতি দূত হিসেবে। জার্মান ভাষায় লেখা হয়েছে চরম পত্র। যুবক ক্যাপ্টেন সীমান্ত পার হয়ে, জার্মানদের অবরুদ্ধ সংরক্ষিত বাহিনীর অধিনায়ক লেফটানান্ট কর্নেল ব্যারণ ভন সাস্‌সের হাতে ওই চরমপত্র দেবে। ব্যারণ ভন সাস্‌স সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দীদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণের জন্য কুখ্যাত।

"সেই ক্যাপ্টেনের মুখ তোমার মনে আছে?" ফাদেয়েভ জিজ্ঞাসা করল। "তার মুখখানা ছিল পাণ্ডুর আর সে কেমন সবকিছু থেকে আলগা একলা হয়ে গিয়েছিল। যেন তার চারপাশের সব কিছুর সম্পর্কে যেকোন দাবী সে পরিত্যাগ করেছে।"

আমাদের পরিবারের সকলকে অবাক করে দিয়ে ফাদেয়েভ, সেই অবিস্মরণীয় রাত্রিতে, মাটির তলায় খোঁড়া গর্তে বসে, তারা তিনজন একসঙ্গে যে সব গান গেয়েছিল, তার একটা গাইতে আরম্ভ করল।

আজ লাইনে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখেছি সেই পঙ্গু লোকটি, সেই লেফটানান্ট জেনারেল, তাদের কথা আমি আমার অতিথিদের বললাম। গোড়ার দিকে সে একটু দ্বিধা নিয়ে শুনছিল, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "এই জেনারেল কি তার আ উচ্চারণগুলো, একটু গড়িয়ে বলছিল?"

"হ্যাঁ বলছিল।"

"সে কি লম্বা? পাকা চুল? খাড়া দাঁড়ায়?"

"ঠিক বলেছেন।"

"সে এমনভাবে হাঁটে যেন মনে হয় হাড় বেঁকে না?"

"হ্যাঁ..."

"লিমা, আমি জানি ও কে......"

"আমিও জানি" ফাদায়েভের স্ত্রী বলল এক টুকরো হেসে, "ইগনাতিয়েভ।"

"ঠিক বলেছ। ইগনাতিয়েভ, আমাদের সহকর্মী। ওই লিখেছিল *ফ্রিকটি ইয়ারস ইন দি আরমি* এবং এই বলে ফাদায়েভ আনন্দে হাসতে লাগল, "কাউন্ট ইগনাতিয়েভ।"

আমাদের অতিথিরা যখন বিদায় নিলেন, তখন রাত অনেকটাই গড়িয়েছে। রাতে শুয়ে শুয়ে আমি ভাবলাম: শান্তির চেয়ে সরলতর আর তার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান আর কি-ই বা হতে পারে? মানুষ অনেক অনেক যুদ্ধ করেছে আর প্রচুর রক্ত আর চোখের জল ঢেলেছে যুদ্ধের ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গোপন যন্ত্রটি এখন ফাঁস হয়ে গেছে। এই সমস্ত দানবেরা যারা যুদ্ধবন্দী ও অধিকৃত দেশের অসামরিক নাগরিকদের শিল্প কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতো, জমির সার বানাবার জন্যে, চামড়া, সাবান, ঝকঝকে চুলের কাঁটা ও নানা টুকিটাকি বানাবার জন্যে, তারা এখন পৃথিবীর তিরস্কার আর ভৎর্সনার সামনে উন্মোচিত। পররাজ্য ও অধিকারের উন্মত্ত স্বপ্নে কি ফল, তা হৃদয়ঙ্গম করে মনুষ্য জাতি কি চিরকালের জন্য যুদ্ধ ত্যাগ করবে না।

যাই হোক, ভাল বা মন্দ সব কিছুকেই শেষ হতে হবে। প্যানফিয়োরভ-এর সোৎসাহী মধ্যস্থতাকে ধন্যবাদ তার জন্য মস্কোর গ্রীষ্ম ঋতুর একটা কণাও আমি পেলাম। যাবার সময় এসে গেল কিন্তু সেই গল্প এখন প্রস্তুত, ছাপাখানায় তা চলে গেছে। যুদ্ধের সময়কার রীতি অনুযায়ী আমার স্ত্রী ন্যুরেমবার্গে অবস্থিত সব সাংবাদিকদের পরিবারের কাছে ফোন করে জানতে চাইল তারা কোন চিঠি, পার্সেল বা কোন স্মারক উপহার পাঠাতে চায় কিনা। অচিরে আমাদের বাসায় ঢুকতেই যে হল ঘর, সেখানে ঠাসা উপহারে ফেটে পড়ার উপক্রম একটি পুরো থলি বসে গেল। সন্ধ্যায়, সম্পাদকীয় দপ্তরে আমার সব সহকর্মীকে বিদায় সম্ভাষণ করে, আমি যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলাম, আমি দেখলাম, সেই প্রবাদ বাক্যে যেমন বলেছে, ঠাণ্ডা ভাত আর তপ্ত ফুটন্ত বৌ—তাই।

"তাহলে ন্যুরেমবার্গ-এ তোমাদের সকলেরই সময় বেশ ভালমত দিব্যি কাটছে। তাইতো?"

এ সব কি বলছে রে বাবা? কেন বলছে এসব? কোন গোলমেলে

হাওয়া এই খোড়ো মেঘ নিয়ে এল? উত্তরে যা বোঝা গেল তা নিম্নরূপ। আমার স্ত্রীর টেলিফোনের উত্তরে, গন্ধমুষিকের চামড়ার তৈরি জ্যাকেট পরা এক বাক্‌বাগীশ মহিলা আমাদের বাসায় এসেছিলেন, "আপনার স্বামী বিমানে কাল ন্যুরেমবার্গ যাচ্ছেন? দারুণ। আমার স্বামী—অমুক চন্দ্র অমুক—ওখানে আছেন।" সেই ভদ্রলোক, আসলে, আমাদের ন্যুরেমবার্গ-এর বিগ উইগদের একজন। "কি জানেন, ও, আমার স্বামী এই শুকনো খুবানি দারুণ ভালবাসে। এগুলো ছাড়া ও থাকতেই পারে না। আপনার স্বামীকে এই এক কিলোগ্রাম খোবানি ও একটা চিঠি দিতে চাই।" আমার স্ত্রী বেশ সশ্রদ্ধভাবেই এই পার্সেলটি গ্রহণ করলেন আর গন্ধমুষিকের চামড়ার জ্যাকেট পরা সেই মহিলা গলগল করে ধন্যবাদ জানাতে জানাতেই এলেন আর একজন মহিলা, তাঁর গায়ে কাঠবিড়ালির চামড়ার হাতাবিহীন কোট। "আমি অমুক চন্দ্র অমুকের স্ত্রী। আপনার স্বামী ন্যুরেমবার্গ যাচ্ছেন? দারুণ, ভালো ব্যাপার। আপনি নিশ্চয়ই আমার স্বামীর লেখার সঙ্গে পরিচিত, নিশ্চয়ই পড়েছেন—পড়েন নি? ও কি সুন্দর লেখে, তাই না? কিন্তু জানেন তো, ও, আমার স্বামী একেবারে মজ্জায় মজ্জায় হল গিয়ে খাঁটি রুশ। আর ওই ভয়ঙ্কর আমেরিকান খাদ্য খেয়ে খেয়ে ও একেবারে মরে গেল। আমাদের যে কালো রুশ রুটি, এগুলোর জন্যে সে কেমন করে ওখানে! তাই আমি নিয়ে এসেছি একটা চমৎকার রুটি। এটা এলিসেইয়েভেস্কির দোকান থেকে কেনা। আমি নিজে এটা কিনেছি। এটার কত দাম পড়ল জানেন? নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে এটা পৌঁছে দিতে আপনার স্বামী আপত্তি করবেন না। রুশীয় খাবার না পেয়ে ওর যে কত কষ্ট হচ্ছে!"

আমার স্ত্রী এটাও গ্রহণ করলেন, তবে উনি যেরকম ভদ্রতা দেখিয়ে থাকেন, এবার আর সেটা হল না। তারপর, আমি ঠিক ফেরবার আগেই, দরজায় আবার ঘন্টি বাজল। আর একজন মহিলা—ইনি বেড়ালের পশমের ডোরাকাটা একটা বড় কোট গায়ে দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে চেনেন। নোনতা নুন মাখানো খাবার ও পাগলের মত ভালবাসে। আরও ভালবাসে হেরিং খেতে। কিন্তু ন্যুরেমবার্গ-এ কেউ কি হেরিং বানাতে পারে? এই যে টিনটা দেখছেন, এতে হেরিং ভরা আছে, ও যেমনটি চায় আমি ঠিক তেমনটি

করে নিজের হাতে বানিয়েছি। জানেন এটা আমার বিশেষত্ব, পরিবারের গোপন ব্যাপার। দয়া করে আপনার স্বামীকে আমার এই টুকরো ছোট্ট আনন্দ পেঁৗছে দিতে বলবেন। বাড়ি থেকে অত দূরে থেকে ওর যে কত কষ্ট হয়।"

ঠিক এই কথায় আমার স্ত্রী—যে কিন্তু বেশ সদয় একজন মহিলা, অন্য লোকেদের দুর্বলতা নিয়ে বেশ হাসি মজা করে—আর স্থির থাকতে পারল না।

"আপনার স্বামী আসলে কি পছন্দ করেন ?" আমার স্ত্রী খুব কড়া করে জানতে চাইলেন। "দেখে শুনে মনে হচ্ছে শুকনো খোবানি না খেলে তিনি বাঁচতে পারবেন না, কালো রুটি না খেলে বাঁচবেন না, হেরিং না হলেও বাঁচবেন না। আসলে কোনটা তার পছন্দ ? তাঁর কটি স্ত্রী আছে ? আর এই সব মস্করার মানেই বা কি ?"

এক কথায়, সে এক দৃশ্য, যা আবার ভাবতে আমার দ্বিধা আছে। হেরিং তিনি নিলেন না। আর যে সব সাংবাদিক প্রতিনিধি ন্যুরেমবার্গ-এ আছেন তাঁদের সম্পর্কে সত্য, মিথ্যা ও কল্পিত নানা দুষ্কর্মের জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমার ওপর এক চোট বর্ষণ চলল।

এই দৃশ্যের ষোলকলা পূর্ণ হল যখন বিমানবন্দরে যাবার জন্যে আমি রওয়ানা হবার ঠিক আগে, আমার সম্পাদকদের স্ত্রী গালিনা নিকোলায়েভনা ফোন করলেন। এই মহিলা খুবই দয়ালু অন্তঃকরণের ও যুদ্ধের সময় যুদ্ধ সাংবাদিকদের ভালো মন্দ তিনি দেখাশোনা করতেন। তিনি আমায় ফোনে অনুরোধ করলেন বিড়ালের পশমের কোট গায়ে মহিলার কাছ থেকে হেরিংটা নিতে। কেননা তিনিই—জানা গেল—সেই প্রণয়শীল বিগ উইগের আসল স্ত্রী।

২৩। আবার ন্যুরেমবার্গে

আমি আবার ন্যুরেমবার্গে ফিরে এসেছি। কেবার পার্কে নেবু গাছগুলি ফুটন্ত ফুলে আর ভরা নয়। এখন গরম। শুকনো বাতাসের ঝলক তাড়া করছে—ধুলো আর বালির গোলাকে, ধ্বংসস্তূপ আর যেসব রাস্তার অস্তিত্ব নেই, তার ওপর দিয়ে। অল্প যে কজন যাওয়া আসা করছে, তাদের হাত

আর মুখ গরম হাওয়ার ঝলকে ঝলসে উঠছে। শরৎকালের রৌদ্রস্নাত প্রাচীন ন্যুরেমবার্গ নগরী দেখতে এখন বিশেষ ভীতিপ্রদ। শীতকাল ও বসন্ত ঋতুতে যেসব লোক ঘরবাড়ির মাটির তলার অংশ, লোকচক্ষুর আড়ালে সাধারণের জন্য মাটির তলায় স্নানকক্ষ ইত্যাদিতে বাস করত, তারা এখন হামা দিয়ে সেখান থেকে বার হয়ে এসেছে। তারা এখন নিজেরাই এখানে ওখানে তাঁবু খাটিয়েছে কিংবা নিজেরা তৈরী করে নিয়েছে ছোট ছোট কাঠের টুকরো আর মরচে পড়া লোহা দিয়ে কুঁড়ে ঘরের মতন। যখন তুমি এইসব রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবে, তখন মনে হবে তোমার যে সভ্যতা যেন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আর মানুষ জাতি আবার প্রথম থেকে চলা শুরু করেছে।

যাই হোক, শহরের শিল্পাঞ্চল ও বিশেষতঃ অভিজাত এলাকায়, যেখানে বিন্দুমাত্র ক্ষয়ক্ষতি হয় নি, সেখানে জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী ছোকরা পুলিশেরা লম্বা লম্বা শিরস্ত্রাণ মাথায় আর কব্জীর কাছে সাদা আচ্ছাদন লাগিয়ে রাস্তার সামান্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। বিজ্ঞাপন লাগানোর থামগুলোর ওপর নানা আমুদে পোস্টার। সেইসব পোস্টারে মেয়েদের ছবি। সেই ছবিগুলো বিপণনের সামগ্রীর কথা যত না প্রকাশ করছে, তার চেয়ে ওদের মোহময়ী শরীর দেখাচ্ছে বেশী। এরকম একটা জল্পনা অনেক দূর গড়িয়েছে যে একজন আমেরিকান অফিসারের সাপ্তাহিক বরাদ্দ করা খাদ্যের বিনিময়ে পাওয়া যেতে পারে সুপ্রাচীন, ফুলদানি, পুরনো কারুকার্যময় ঢাকনা, এমনকি পাওয়া যেতে পারে বিখ্যাত জার্মান চিত্রকর ও খোদাই শিল্পী ড্যুরেরারের খোদাইয়ের কাজ—অবশ্য খুব সম্ভবতঃ আসল জিনিস পাওয়া যাবে না, তবে তার ভালো প্রতিলিপি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

কেবল এক জায়গায় কোন কিছুই নড়ছে না, সবকিছু এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে জায়গাটা হল প্যালেস অফ জাসটিস, যেখানে খড়খড়ি লাগানো জানালার ফাঁক দিয়ে বিচারকক্ষে শরৎকালের সূর্যালোক কখনো প্রবেশ করে নি। সেখানে বিচারকরা ধীরে ধীরে ও ক্লান্তিহীনভাবে যে জঘন্যতম রক্ত ঝরানো অপরাধ আমাদের এই গ্রহে—যেটাকে অল্পবয়স্ক নবীন বলা যায় না—সংঘটিত হয়েছে তার জাল উন্মোচিত করছেন। সাংবাদিকদের এলাকায় আমার নির্দিষ্ট আসনে আমি আবার

বসে পড়েছি। কানে ফোন লাগিয়ে নিয়ে মন দিয়ে শুনছি লর্ড লরেন্সের শান্ত এবং কখনো সখনো সামান্য বিক্রপাত্মক গলা। আমি অকস্মাৎ বিশেষভাবে অনুভব করলাম যে ন্যুরেমবার্গের ওপর সূর্য এখন কি ধরনের তাপ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীতে এখন রাজনীতির হাওয়া বইছে কেমন, এসবে কিছু যায় আসে না, জানালার খড়খড়ি বন্ধ করা অণু-পরমাণু পরীক্ষার এই আবহাওয়ায়। এই বিচারকক্ষে অতি সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। হিটলারের জার্মানীর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ নানা মিত্রশক্তির সাজানো পতাকার তলায় যাঁরা বসে আছেন (এই বিচার কক্ষের বাইরে সেই একতা মৈত্রী নেই) আর নাজীদের সব অপরাধ উন্মোচিত করে এই প্রধান যুদ্ধ-অপরাধীদের শাস্তি দেবার চেষ্টা করছেন যাঁরা তাঁরা মহান ব্যক্তি। তাঁরা সৎভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আর তাঁরা সব দিক থেকে কাজ করছেন পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে।

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এই বিচারকক্ষে আবার এসে আমি ওই চারজন বিচারকের দিকে নতুন করে তাকালাম। এঁদের প্রত্যেকের পশ্চাৎপট আলাদা। এঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস আলাদা। এঁদের নিজ নিজ দেশে আইনের যে ঐতিহ্য ও ধারা তা-ও স্বতন্ত্র। এইসব স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, তাঁরা একসঙ্গে কাজ করে একটি আইনানুগ দৃষ্টান্ত সৃষ্টিতে সক্ষম, যা আগ্রাসী লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে চিহ্নিত করবে।

বিচার চলাকালীন আমরা তাঁদের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেছি এবং তাঁদের সম্পর্কে সাধারণ মত হল এই যে তাঁরা আইনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমি আগেই বলেছি যে সাংবাদিকদের মধ্যে লর্ড জিওফ্রে লরেন্স সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বোধ ছিল ও তারা নিজেদের মধ্যে তাঁকে মিঃ পিকউইক বলে সম্বোধন করতো।

সত্যি ওঁকে দেখাতো ডিকেন্সের নায়কের মত। মানুষটি মাথায় ছোট। মজবুত গড়ন তাঁর, যা দেখতে ভাল লাগে। পূর্ণ স্বাস্থ্যে আরক্তিম গাত্র বর্ণ তাঁর। মস্ত কপাল আর পাতের মত চকচকে। তাঁর একটা স্বাভাবিক পরিহাস বোধ ছিল যেটা তাঁর হাসিতে নয়, তাঁর সরু চোখের পিটপিট করে তাকানোয় ফুটে উঠত। কিন্তু সবার ওপর তিনি স্থির সংকল্প ধরনের মানুষ। আমাদের আইন বিষয়ক কর্মীদের মতে তাঁর ন্যায় বিচার সম্পর্কে বোধ ছিল, যেটা আইনজীবীদের আইন জানার মতই গুরুত্বপূর্ণ।

বাইরের দিক থেকে তিনি ছিলেন শান্ত ও অনুত্তেজিত, অনুদ্বিগ্ন। এমন কি, প্রতিবাদী আসামী পক্ষের আইনজীবীরা যখন মহা বিরক্তিকরভাবে নানা দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কৌশল অবলম্বন করত, তখনও তিনি জোর গলায় কিছু বলতেন না কিন্তু আত্মস্থ অটল ভঙ্গীতে কাজ করে যেতেন। এই সব সময় তাঁর অস্ত্র ছিল, ইংরেজী ভাষায় বলা স্বতোৎসারিত তাঁর পরিহাস কৌতুক। তিনি সব সময়ই ব্যস্ত ও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না। কেবল একবার, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী দিবসে আমি ও কনসতানতিন ফেদিন তাঁকে কিছুক্ষণ কোন মতে ঘরের এক কোণে ধরতে পেরেছিলাম ও সেদিন তিনি স্যামপেনের গ্লাস হাতে আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলেন।

আমার মনে আছে কনসতানতিন ফেদিন তাঁর কাছে খুব ভদ্র ও সশ্রদ্ধভাবে জানতে চেয়েছিল যে বিচারের কাজকর্ম খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বলে তিনি মনে করেন কিনা।

"এই বিচার, যা আমরা করছি, এর কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই", স্যার জিওফ্রে এই কথা বলে হেসেছিলেন, "আর ট্রাইবুনালে আইনের যে সব ধারা গৃহীত তার সঙ্গে তুলনীয়ও কিছু নেই। আমাদের চোখের তলায় নতুন আইনের সূত্রগুলি তৈরী হচ্ছে। আইনের আদবকায়দা ও চালচলন ঘটিত যে খসড়া আমরা তৈরী করছি আগামী দিনে আইনের ছাত্রদের কাছে তা পাঠ্যপুস্তক হবে। আর এই খসড়াগুলি পড়ে সেই ভবিষ্যতের আইনের ছাত্ররা আমাদেরও বিচার করবে। যেহেতু এই ধরনের এক অদৃষ্টপূর্ব মামলা আমরা পরিচালনা করব স্থির করেছি সুতরাং আমাদের কাজ হল শান্ত এবং নিরপেক্ষ থেকে, যে নতুন আইনগুলির ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে, সেইগুলিকে যথাসাধ্য বিচক্ষণতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করা। আমরা যে রায় দেব তা এই সব আইনের অনুসারী হওয়া চাই।"

ট্রাইবুনালে সোভিয়েত বিচারক ইওনা নিকিতচেনকো কিছু কম আকর্ষণীয় নন। আমাদের মত সকলের কাছে তিনি ছিলেন, যাকে বলে অনধিগম্য,, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাহলেও তাঁর সম্পর্কে যা কিছু শুনতাম, তাতে মনে হত তিনি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ট্রাইবুনালের রুদ্ধদ্বার সব অধিবেশনে যা কিছু হত আমরা কেবল তার একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনতে পেতাম। যাইহোক সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষের প্রধান অভিযোগকারীর

সহকারী, আইনজীবী ও লেখক লেভশেইনিন আমাদের বলেছিলেন যে নিকিতচেনকো হচ্ছেন এমন একজন মানুষ যাঁর আইন বিষয়ে জ্ঞান অপরিসীম আর এক অকল্পিত শান্ত মেজাজ তাঁর সব সময়ের সঙ্গী, এমন কি ভীষণ কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁর এই শান্ত মেজাজ অটুট ও অবিচল থাকে। গৃহযুদ্ধের সময় থেকে উনি একজন সামরিক বিভাগীয় আইনজীবী। ভসেভোলদ ভিসনেভস্কি যার স্মৃতি শক্তি বেশ প্রখর সে জানাল যে নিকিতচেনকোর বিষয়ে সে সেই সময় থেকে জানে ও তখনও সৈন্যদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের জন্য তাঁর প্রভূত সুনাম ছিল। ভিসনেভস্কি এমন দাবীও করল যে দিমিত্র ফুরমানভ তাঁর *মিউটিনি* গ্রন্থে বিচারক হিসেবে নিকিতচেনকোর নানা উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলেছেন। আমার প্রথম যৌবনে আমি অবশ্য এই বইটা পড়েছি, কিন্তু নিকিতচেনকোকে আমি মনে করতে পারলাম না। নুরেমবার্গ-এ ব্যাপারটা বই দেখে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা যে বিশাল পাঠাগার আমরা নুরেমবার্গ-এ এনেছি, যে পাঠাগার বিদেশী আইনজীবীরাও ব্যবহার করছেন, আমার আফশোস এই যে তাতে কোন উপন্যাস নেই।

আমেরিকান বিচারপতি, ফ্রান্সিস বিডল, তিনি বসতেন নিকিতচেঙ্কোর পাশে। বিড্‌ল ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। আন্তর্জাতিক আইনের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি আমেরিকাতে পরিচিত ছিলেন ও রুজভেল্ট যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তখন তাঁর শাসন কালে বিডল ছিলেন এ্যাটর্নী জেনারেল। বলা চলতে পারে যে তাঁকে ন্যুরেমবার্গে পাঠিয়ে আমেরিকানরা তাদের "তরুপের তাস চেলেছিল", কেননা তাদের আশা ছিল যে ট্রাইবুনালে তাঁকেই প্রধান বিচারপতি করা হবে। আমি আগেই জানিয়েছি যে রুজভেল্টের নামের সঙ্গে জড়িত এক পারিবারিক সম্পদ উনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন যেটা কেউ একজন নির্লজ্জের মত চুরি করে নিয়েছিল। তিনি প্রধান বিচারপতি হননি, কিন্তু বিচার চলাকালীন তিনি সব সময়েই সক্রিয় থাকতেন। তাঁর নানা প্রশ্ন ও মন্তব্য শুনে মনে হত যে সেগুলি মূল বিষয়ানুগ ও নিরপেক্ষ (অন্ততঃ সাংবাদিকরা তাই ভাবত)। এই দুটি গুণই একজন বিচারকের অবশ্য থাকা দরকার, কিন্তু এই দুটো ব্যাপার নিয়ে এত চূড়ান্ত করতেন যে ওঁকে সামলাবার জন্যে তারা একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পরিশেষে ছিলেন হেনরি ডোনেনেডিএউ ডি ভাবরেস। তিনি সমর্থ ও সুদেহী, সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়া বৃদ্ধ। তাঁর ঝুলে পড়া পাকা গোঁফ যেন সিন্ধু ঘোটকের বেরিয়ে থাকা দাঁতের মত। আইন বিষয়ে একজন সুপণ্ডিত গবেষকরূপে তাঁর ফরাসী সহকর্মীরা তাঁর উচ্চ প্রশংসা করতেন। আন্তর্জাতিক ও ফৌজদারী নানা আইন বিষয়ক গ্রন্থের তিনি প্রণেতা, যা ছাত্রদের অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত। বিচারকক্ষের বাইরে ডোনেনেডিএউ ডি ভাবরেস ছিলেন একজন হাসিখুশী সামাজিক মানুষ। তিনি বিচারকক্ষে আগত অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতেন, বিশেষতঃ সাংবাদিকদের সঙ্গে। অন্যান্ত পেগী ওঁর একটা সাক্ষাৎকার পর্যন্ত নিয়েছিল, যদিও বিচারকদের এমন সাক্ষাৎকার দেওয়ার কথা নয়। বিচারকক্ষে তাঁর আচরণ ছিল অন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা। তিনি একজন সচিবের বাগ্র উৎসাহে অনবরত নোট নিতেন। আর এই নোট নিতে নিতে, আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, তিনি মাঝে মাঝে কাগজ থেকে চোখ তুলে একদৃষ্টে তাকাতেন, আদালতে দর্শকদের আসনগুলোর দিকে, সেখানে প্রায়ই অনেক সুন্দরী মহিলা পর্যটকরা বসে থাকতেন।

কিন্তু সেদিন যেটা আমাকে আশ্চর্য করেছিল, আমায় বিশেষভাবে মনোযোগী করে তুলেছিল—আসলে আদালতকক্ষে অনেকদিন অনুপস্থিতির পর ফেরার জন্য তীব্রতর হয়েছিল আমার অনুভূতি—তা হল এই যে শারীরিক, চারিত্রিক, রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং সম্ভবতঃ নাজীবাদ সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত ও নাজীদের কৃত দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পর্কে তাঁদের এত আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও, মাসের পর মাস ধরে এই মানুষগুলি একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। একত্রে কাজ করে যাচ্ছে চারচিলের ফুলটন বক্তৃতা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, পুঁজিবাদী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই যেসব প্ররোচনামূলক নিবন্ধ ও বিজ্ঞপ্তি বার হচ্ছে, তা সত্ত্বেও, সবকিছু বিচার করে মনে হয় যে এই বিচার কাজকে শেষ পর্যন্ত একটা সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ও আগ্রহে একত্রিত হয়ে বিচারকেরা কাজ করছেন।

সুতরাং, এই বিচারকক্ষের সবকিছুই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। মনে হয় যেন আমি বেশ কদিন পুরো সময়ের জন্যে এখান থেকে চলে যাই নি, যেন মধ্যাহ্ন আহার করার জন্যে সামান্য সময় বাইরে গিয়েছিলাম।

প্যালেস অফ জাসটিসের বাইরে কিন্তু অনেক রদবদল হয়ে গেছে। কুর্ট আমার সঙ্গে বিমানবন্দরে দেখা করেছিল কিন্তু আমার বন্ধুদের উপস্থিতিতে সে ছিল অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ। সে আমায় কেবল এইটুকু জানাল যে এখন থেকে সে আমার কাছে আংশিক সময়ের জন্যে কাজ করবে কেননা এক পরিবহণ কোম্পানীর গাড়ি মেরামতির গ্যারাজে রাত্রে মিস্ত্রীর কাজ করবে। যখন কেবল সে আর আমি মাত্র আমরা দুজন হয়ে গেলাম সে তখন টুকরো টুকরো নানা খবর বলল যা আমার মনে হল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বৃদ্ধ ফেবার তার মজুতের অনেকখানিই আমেরিকানদের কাছে বেচে দিয়েছে আর আটলান্টিক মহাসাগরের ওই ধার থেকে সে মোটা মোটা অনেক বরাত পেয়েছে। তার মানে উৎপাদন শুরু করার কাজ করার জন্যে তার নতুন নতুন লোক দরকার। এ সবই নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু যে ব্যাপারটা খুবই খারাপ হল তা ওরা স্বেচ্ছায় সেইসব লোককে ভাড়া করে আনছে যারা নাজী দলের সভ্য ছিল, এমনকি অনেকে প্রাক্তন এস. এস.। শ্রমিক নিয়োগ ও আনুষঙ্গিক দপ্তরে ওদের আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা একজন এস. এস. যে নাজীদের গণ মিছিলের দিনে কালো ও ধূসর নাজী পতাকা বহন করেছে, সে নাজীদের এবং তার পরিবারের লোকেদের কাজ পেতে সাহায্য করছে। কুর্টে'র ভাইপো, যার বাবাকে নাজীরা মেরে ফেলেছিল সে কিন্তু সেখানে কাজ পায়নি। এটা খুবই খারাপ, কেননা এর মানে হল এই যে নাজীরা তাদের লুকোনো আস্তানা থেকে বুকে হেঁটে, হামা দিয়ে দিয়ে বার হয়ে আসছে। তাদের মধ্যে একজন, যে পেন্সিল কারখানার পরিবহণ কেন্দ্রের দায়িত্বে আছে সে তার জ্যাকেটের ওপর আবার পিনে করে সেই পদক গুঁজে নিয়েছে, যাতে লেখা "মস্কোতে শীতকালীন অভিযানের জন্য।"

সৌভাগ্য যে আমাদের প্রেসক্যাম্প তেমনটি রয়ে গেছে, যদিও সেখানে গোলমাল হৈ চৈ কমে গেছে অনেক। প্রেস ক্যাম্পে দুটি নতুন ছোঁয়া আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। প্রথমতঃ ঘরগুলিতে ও বড় হলে একটি ঘোষণা রয়েছে যাতে এই অট্টালিকার মালিকের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের জানানো হয়েছে যে অট্টালিকার স্মারকচিহ্ন হিসেবে যা কিছু রাখা আছে, তার কিছুই যেন সাংবাদিকরা না নেন। এটা লক্ষ্য করার মত ব্যাপার যে ঘোষণাটি ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান এই তিন ভাষাতে আছে, কিন্তু রুশ

ভাষাতে নেই। দ্বিতীয়তঃ পানশালায় যেখানে এখনো আনন্দে ও ক্ষিপ্রতায় ডেভিড রোজ করে যাচ্ছে, সেখানে পিছন দিকে টাঙানো পানীয় তালিকায় "স্যার উইনস্টন" ককটেলের নাম আর নেই, তার জায়গায় লাল অক্ষরে একটি নতুন ককটেলের নাম লেখা "মলোতভ"।

সেরগেই ক্রুশিনস্কি যে সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী যখন তার একটি ভাষণে আমেরিকার দেখানো জুজু, আণবিক যুদ্ধের ভয়ের উত্তরে বললেন, "অনতিকালের মধ্যেই আমরাও আণবিক বোমার অধিকারী হব, অধিকারী হব আণবিক বোমা ছাড়া আরও কিছুর", তখন মলোতভের নামে এই ককটেলটি আবিষ্কৃত হয়। এই বিবৃতি পাশ্চাত্য সংবাদপত্রের জগতে তুমুল হৈ চৈ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। আর তাই, কর্মতৎপরতায় উদ্যমী ও সাহসী ডেভিড এই নতুন ককটেলটি আমদানি করে। স্বাভাবিকভাবে নানা উপাদানে মিশ্রিত এই বস্তুটি য়ুরি করোলকভ, সেরগেই ক্রুশিনস্কি ও আমি চেখে দেখি। কি অনুপান মিশিয়ে এটি তৈরী হয়েছে তা অনুমান করতে না পারলেও আমাদের মুখ এমনই জ্বলে গেল যে আমরা ঠোঁট টেনে হুফ হুফ করে হাওয়া ছাড়তে লাগলাম।

"এই ককটেলটা নিয়ে প্রায় একটা আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে", হাসতে হাসতে বলল ক্রুশিনস্কি, "আমাদের একজন সাংবাদিক, আমি তার নাম বলবো না, এ ব্যাপারে দারুণ রেগে যায় আর ট্রাইবুনালের কাছে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদপত্র পাঠায়। আর তার স্বপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। সৌভাগ্যবশতঃ মিখাইল খারমালভ তার সব উৎসাহকে চুপসে দেয়।"

"অল্প কথায়, এই ককটেলটা আমাদের অন্য আরও কার্যকরী উপায়ে বাতিল করে দিতে হবে", করোলকভ বলল, তার গ্লাস তুলে, "তোমার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে! ভীষণ কড়া এটা! 'মলোতভে'র কাছে 'চার্চিল' —নস্যি।

আমি বিচারের কথা আলোচনা করতে চাইছিলাম। তাই বন্ধুদের সঙ্গে বিচারকদের ও তাদের রাজনৈতিক অবস্থিতি আলোচনা করতে করতে ডোনেনডিএউ ডি ভাবরেসের কথা উঠল, তখন আমার বন্ধুরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে হাসতে লাগল।

তারপর তারা একজন আর একজনের কথায় বাধা দিতে দিতে আর হো হো করে হাসতে হাসতে তারা আমাকে একটা কৌতূহলকর ঘটনার

কথা বলল, যেটা পরোক্ষে শ্রদ্ধেয় বিচারপতির পক্ষে বেমানান। আমি আগেই লিখেছি যে আদালতে দর্শক গ্যালারী বিচারকদের টেবিলের ওপর প্রায় ঝুলে থাকত। আর আমি একথাও লিখেছি যে ডি ভারবেল প্রায়ই ওই গ্যাল্যারীর দিকে তাকাতেন, যার মানে ওখানে ওপরে, কোন সুন্দরী যুবতী আছে। এরকম যখন হত তখন আমাদের মধ্যে কমবয়সী ও অত্যন্ত কৌতূহলী কোন সাংবাদিক মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির সময় ওপরে গিয়ে সেই লাস্যময়ী সতনুকাকে একবার চাক্ষুষ করে আসত।

একদিন খুব গরম। সেদিন বাতানুকুল ব্যবস্থাও ভিতরের গুমোট কমাতে পারছে না। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা হঠাৎ লক্ষ্য করল যে ডি ভাবরেস কিছু লিখছেন না, তিনি একদৃষ্টে পরিদর্শক গ্যালারী একটা বিশেষ বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর চোখের শিং-এর ডাঁটের ভারী চশমাটা ঠিকঠাক করে বসিয়ে নিচ্ছেন আর গোঁফে তা দিচ্ছেন। প্রত্যেকে ধরে নিল যে ওখানে ভূতলশায়ী করার মত কোন নারী বসে আছে—সুন্দর সুন্দর পায়ের কোন সাধারণ মেয়ে নয়, নিশ্চয়ই হলিউডের কোন নক্ষত্র হবে। লর্ড লরেন্স যেমন বলেন, "আপনাদের কি মনে না ভদ্রমহোদয়গণ, যে এখন বিরতি ঘোষণা করার সময় হয়েছে" সেই কথা সবটা শোনার জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত না করে সাংবাদিকরা হুড়মুড় হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ছুটল। ঠিক সেই জায়গাটিতে, যেখানে শ্রদ্ধেয় বিচারকের স্থির দৃষ্টি আকর্ষণীয় কোন কিছুর ওপর নিবদ্ধ ছিল, সেখানে বসে আছে গাঁট্টাগোট্টা, গোলাপী গালের এক স্কট সেনাপতি। স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্যাঞ্চলের পুরুষদের ঝালরওয়ালা খাটো ঘাগরা বিশেষের আড়াল থেকে দুটি মোটা সোটা লোমশ হাঁটু বার করে সামনে যে স্বচ্ছ কাঁচের আড়াল, তার ওপর সেই লোমশ জোড়া হাঁটু চেপে ধরা।

"প্রত্যেকেরই নিজ নিজ রুচি আছে", একজন সাংবাদিক অন্যদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত করে বলল।

ক্রুশিনস্কি তার গল্প শেষ করল, খুব গম্ভীরভাবে এই কথা বলে, "বিচারকদের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের মনে হয় সাংবাদিকদের সঙ্গে অন্যরকম আচরণ করা হচ্ছে। ওপরে গ্যালারীতে কি হচ্ছে তা আমরা দেখতে পারি না। হতে পারে, বোরিস, তুমি যদি কর্নেল আনড্রুসের

ওপর তোমার প্রভাব খাটিয়ে যদি আমাদের আশপাস দেখার জন্য একটা আয়না বসিয়ে দাও, তাহলে মঁসিও ভাবরেস যা দেখেন, তা আমরাও দেখতে পারি।"

২৪। নাজীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ রেখা

বিচার স্পষ্টতই এখন শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষের যে আইনজীবীরা, তাঁদের খুঁটিয়ে দেখতাম। তাঁরা বিচারকদের কাছাকাছি, আসামীদের কাঠগড়ার দিকে মুখ করে ও কাঠ-গড়ার সামান্য নীচে বসতেন। বাইরে থেকে দেখলে তাঁরা সকলেই সম্রান্ত ও শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক যাঁদের মাথায় সেই প্রথাগত সিলকের টুপি ও গায়ে কালো গাউন। সবাইকার গায়ে অবশ্য কালো গাউন ছিল না। দু চার জনের গায়ে বেগুনি লাল রঙের গাউন ছিল, যার অর্থ তাঁরা শুধু মাত্র উকিল নয়, আইন বিষয়ের অধ্যাপকও। অল্প কথায় বলা যায় যে আদালত কক্ষ জার্মান আইন ব্যবসায়ের সেরা লোকেতে ভর্তী ছিল।

শুরুতে আমরা সবাই মেপে জুপে বোঝবার চেষ্টা করেছিলাম যে কি কারণে এঁরা অভিযুক্ত আসামীপক্ষের হয়ে কাজ করাটা বেছে নিয়েছেন। এই সমস্ত নৃশংস বর্বর. যাদের দুষ্ট ক্রিয়াকর্ম যে কোন সৎলোককে কাঁপিয়ে দিয়েছে তাদের বাঁচানোর কাজ এঁরা নিলেন কি করে? তাঁরাও অবশ্য জার্মান, আর তাঁদের মক্কেলরা প্রথমে তাদের নিজেদের দেশকে ধ্বংস করেছে, তাদের নিজেদের দেশের লোকেদেরই বিরুদ্ধে গেছে, নিজের দেশের লোকেদেরই শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে হত্যা করেছে। এই সমস্ত নৃশংস বর্বদের বাঁচানোর দায়িত্ব যা কোনভাবেই পুরস্কৃত হতে পারে না, সেই দায়িত্বভার নেওয়ার উৎসাহ, কোন প্রণোদনা থেকে হতে পারে? নিজের পেশাগত জীবনে উন্নতি? মানতে পারা কঠিন। বিচার শুরু হওয়ার গোড়ার দিকে আমাদের বলা হয়েছিল যে গোয়েরিং-এর আইনজীবী ডাঃ স্ট্যাহ্মার—বড়, মজবুত শরীর, বয়স্ক লোক যাঁকে দেখলে মনে ছাপ থাকে, সাংবাদিকরা ওঁর ডাকনাম দিয়েছিল "জ্যামবো"—তিনি, তাঁর নিজের ও তাঁর সহকর্মীদের জন্য একটি নিরাপত্তা বা অনাক্রমাসূচক বিবৃতির জন্য অনুরোধ করেছিলেন;

যার উদ্দেশ্য হবে তাঁদেরকে, তাঁদের স্বদেশবাসীদের হাত থেকে রক্ষা করা। তাই যদি হয় তাহলে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী হিসেবে জীবনে পেশাগত উন্নতি করার ব্যাপারটা এক্ষেত্রে খুব দাঁড়াচ্ছে না,......সুতরাং তাঁদের উদ্দেশ্য কি ছিল? টাকা? এই সব আইনজীবীর দারুণ পসার ছিল কেবলমাত্র জার্মানীতে নয়, বিদেশেও। আর এরকম মনে করা ভুল হবে যে অন্যান্য মামলায় তাঁরা যা উপার্জন করতেন, এই মামলায় তার চেয়ে বেশী কিছু আয় তাঁদের হবে......খ্যাতি? কতকগুলো নৃশংস বর্বরের পক্ষ সমর্থন করে আইন ব্যবসায়ে একজন কতখানি খ্যাতি সংগ্রহ সম্ভব বলে আশা করতে পারে?

তাহলে, ব্যাপারটা কি? যে সমস্ত লোক শয়তানের উকিল হবার ভূমিকা চাননি, তাঁরা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই বিচারে তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই ডাঃ স্ট্যাহমার এইসব প্রশ্নের উত্তরের মাল মশলা দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আগ্রাসনকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে সাব্যস্ত করার যেসব চেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছে, সেগুলি সবই ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে এবং এই ধরনের বিচার কেবল ক্ষিপ্ত বা সাময়িক উন্মাদনাগ্রস্ত জনতার জন্য হতে পারে, দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতাদের জন্যে নয়।

অল্প কথায়, খুব সাদা মাটাভাবে খাড়া করা এই ভাষণ হল সেই রাগ বা রাগিনী যা কোন ব্যক্তি বা অবস্থা বা ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এই ভাষণের দ্বারা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চিরকাল ছিল, এখনও আছে ও চিরকাল থাকবে। এবং এইসব যুদ্ধের উচ্চ পর্যায়ের সংগঠকদের শাস্তি দেবার ইচ্ছা হল একটা দুদিকে সমান ধারসম্পন্ন ছুরি হাতে নেওয়ার মত, কেননা এমনও হতে পারে যে আর একটা যুদ্ধের শেষে, আজ যেসব জাতির নেতারা অভিযোগকারী, তাঁরাই নিজেদেরকে অভিযুক্ত আসামীর কাঠগড়ায় দেখতে পাবেন। সারা পৃথিবী যাতে এই কথা শুনতে পায়, এই বক্তৃতার সেটাই ছিল অভিপ্রায়। অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করা ও তাদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের অধিকার এবং এই বিশেষ বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীর আইনজীবীদের জনমত সংগ্রহ করা ইত্যাদি যা কিছু তিনি অনর্গলভাবে বলেছিলেন তা তাঁর ভাষণের একটা ছোট্ট অংশ। তাঁর ভাষণের মূল তত্ত্ব কথা সবাই বুঝতে পেরেছিল—ভদ্রমহোদয়গণ অন্য লোকেদের জন্য কবর খুঁড়বেন না। কেননা

আজ হোক বা কাল হোক আপনারা নিজেরাই সেই কবরে পৌঁছে যাবেন।

এইভাবে, ডাঃ স্ট্যাহমারের ভাষণ প্রতিবাদী আসামীদের মনে মিথ্যা আশা জাগিয়েছিল ও অভিযুক্ত পক্ষের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছিল।

এই বক্তৃতার পরেই, ক্রুশিনস্কি মজা করে এটাকে এই খেতাব দিয়েছিল যে এটাই হল নাজীদের আত্মরক্ষার শেষ রেখা। পাশ্চাত্যের সাংবাদিকরা অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের এই ভাষণ সম্পর্কে আরও নরম করে বলেছিল, "ন্যুরেমবার্গের মেইস্টারগায়ক," যারা ওয়েগনারের সুখ্যাত অপেরা সঙ্গে যোগাযোগ করে এই গান গাইছে। সেই কালো ও নীল বেগুনি গাউন পরা মেইস্টারগায়কেরা জেনে গেছে যে এই বিচারকে ভেঙে বা ডুবিয়ে দিতে পারবে না এবং এই নতুন আন্তর্জাতিক আইনকে অন্যভাবে বদলানোর চেষ্টা অথবা বিচারকদের মধ্যে পার্থক্য বা ভাঙন আনার চেষ্টা, কোন কিছুই সফল হবে না। সেই কারণ বিশেষতঃ চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতার পর তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যতদূর সম্ভব এই বিচারকে টেনে টেনে চালিয়ে নিয়ে যেতে। তাদের এই আশা যে পূর্বতন মিত্রপক্ষের শরিকরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হবে ও অপরাধীদের শাস্তি দেবার আগ্রহ তারা হারিয়ে ফেলবে।

এই রেখা ধরে তারা চলছিল একেবারে আদিম, চাঁছাছোলা এবং এমনকি নির্লজ্জ বেহায়ার মত আচরণ করে। সেই আগের মত আরও এবং আরও সাক্ষীর জন্যে অনুরোধ যা শেষই হয় না। প্রাকৃতিক কর্মের জন্য অধিবেশন বিরতির আবেদন, আরও সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য অধিবেশন বিরতি ঘোষণার অনুরোধ, আর এর ওপর আছে লম্বা লম্বা দীর্ঘ সব বক্তৃতা।

সম্ভবতঃ হিটলার নিজে ছাড়া মানুষের ও মনুষ্যজাতির ইতিহাসে হেরমান উইলহেম গোয়েরিং-এর মত ঘৃণ্য জঘন্য লোক খুব কমই থাকতে পারে।

যখন গোয়েরিং-এর সমস্ত অপরাধ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে তখনও কেউ কি গোয়েরিংকে বিচারকক্ষে যুদ্ধবিরোধী মানুষ, যুদ্ধের বিপক্ষের মানুষ বলে কল্পনা করে পেশ করতে পারে? ভাবলে, অবাক লাগে। তবু ডঃ স্ট্যাহমার একজন সাক্ষীকে আমদানী করলেন। সে জেনারেল বোডেনশ্চাটজ, যার কাজ হল এই তত্ত্বকে প্রমাণ করা। সে ছিল গোয়েরিং-এর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। সাক্ষীর পাটাতন থেকে সে বলল,

"আমি এ কথাটা যোগ করতে চাই যে হেরমান গোয়েরিং তার ভাবনায় ও স্বভাবে কখনও যুদ্ধের স্বপক্ষে ছিল না। যুদ্ধ চিন্তা তার মনের থেকে অনেক দূরে ছিল।" এই কথায় প্রচণ্ড হাসি ফেটে পড়ল আদালতে। কিন্তু তাতে ডঃ স্ট্যাহমার বা বোডেনশ্যাটজ আদৌ বিচলিত হল না। এই ধারণাকে আরও বিস্তারিত করে জেনারেল বলেই চলল। "গোয়েরিং ছিল ইহুদীদের একজন রক্ষক এবং তাদের জন্যে তার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব, সবই সে করেছে।"

এই কথায় আমেরিকার পক্ষের অভিযোক্তা জ্যাকসন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেন নি এবং নিম্নলিখিত কথোপকথন শুরু হয়ে গেল।

জ্যাকসন: "এখন, তুমি তোমার এজাহারে বলেছো যে ১৯৩৮ সালে ৯ই এবং ১০ই নভেম্বর রাত্রে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হয়, গোয়েরিং আগে ভাগে তার কিছুই জানতো না।"

বোডেনশ্যাটজ: "আমি তার কারণ জানতে পারলাম ও তার পরদিনই আমার কাছে এসেছিল ও তাকে আতঙ্কিত মনে হচ্ছিল।"

জ্যাকসন: "তাহলে ঘটনা ঘটে যাওয়ার মাত্র পরদিনই তাকে জানানো হয়?"

বোডেনশ্যাটজ: "পরদিন তো সেটা ছাপাখানায় চলে যায়, খবরের কাগজে ছাপা হয়…"

জ্যাকসন: "তাহলে তুমি আমাদের এই কথা বোঝাতে চাইছো, যে ইহুদীদের ওপর ১৯৩৮ সালের ৯ ও ১০ নভেম্বরের রাত্রে যা কিছু করা হয়, তার জন্যে গোয়েরিং আহত হয়, ব্যাথা পায় ও ক্ষুব্ধ হয়?"…

"তুমি কি একথা জানো, একথা কি তোমার জানা যে নভেম্বর ১২ তারিখে, সেই সংখ্যালঘুদের সুসংগঠিতভাবে হত্যা ও বিধ্বস্ত করার দুদিন পরে গোয়েরিং এক নির্দেশনামা জারী করে যাতে প্রত্যেক ইহুদীকে জরিমানা করা হয় শতকোটি রেইখ মার্ক, যে আদেশে তাদের জীবনবীমা বাজেয়াপ্ত করা হয়, যে আদেশে তাদের অর্থনৈতিক জীবন থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়?"

সাক্ষী চুপ। কাঠগড়ায়, গোয়েরিং তার ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর তার মস্ত মুখটাকে মোচড়াচ্ছে। আদালতে লোকেরা হেসেই চলেছে। তাঁর চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে লর্ড লরেন্স উচ্চহাস্যপরায়ণ দর্শকদের

দেখছেন ও সাধারণত তিনি যা কদাচ করেন, মাইক্রোফোন চালিয়ে আদালতে নীরবতা আনার জন্য বলছেন।

আমার নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু না, এটা হল একজন সাক্ষীর দেওয়া এজাহারের হুবহু প্রতিরূপ, ঘটনাচক্রে এই বিচারে সর্বাধিক অভিজ্ঞ আইনজীবী ডঃ স্ট্যাহমার যে সাক্ষীকে সামনে এনেছিলেন।

অভিযুক্তদের পক্ষে আর একজন সাক্ষী হল ফিল্ড মারশাল এরহারড মিলচ। সে সেইসব অধিনায়কদের একজন যারা শান্তিপূর্ণ সব শহরের ওপর নাজীদের বোমারু বিমান পাঠাত বোমা ফেলবার জন্য; আর নাজীদের নিজের মধ্যে যে কথাটা চালু ছিল "কনভারটাইজ" করা—তার একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা—এর অর্থ, একটা গোটা শহরকে ছোট করে ইঁট পাথরের ডাঁই করে দেওয়া, যেমন তারা কভেনট্রি নিয়ে করেছিল। এই কালো ও ঢেউ খেলানো চুলের লোকটি যে স্বপ্ন দেখেছিল যে তাদের ওপর অসন্তুষ্ট বা বিরূপ ইউরোপের সমস্ত শহর ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শহরকে সে জাহান্নমে পাঠাবে, যে লোকটা যুদ্ধবন্দীদের অমানবিকভাবে শোষণ করার ব্যাপারে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল, এখন তাকে অভিযুক্ত পক্ষের একজন সাক্ষী হিসেবে ডেকে পাঠান হল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বোকা হাঁদা হয়ে গেল লোকটা। তার বলবার কথা হল যে জার্মান অধিকৃত সব দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে যে উৎখাত করে তেড়ে জার্মানীতে কাজ করতে পাঠানো হচ্ছে, সে বিষয়ে গোয়েরিং কিছু জানতো না।

"কতজন যুদ্ধবন্দী কলে-কারখানায় কাজ করত?"

"কল-কারখানায়? তারা কলকারখানায় কাজ করত না। তার মাঝে মাঝে চাষবাসের কাজকর্ম করত।" এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য সেই ফিল্ড মার্শাল সৈনিকদের প্রতি নির্দেশনামা সম্বলিত বই টেনে বার করল আর সৈনিকদের পালনীয় "দশটি বিধান" উদ্ধৃতি দিয়ে শোনাতে লাগল "অসামরিক জনসাধারণের কাছ থেকে কোন কিছু লুটপাট করা বা তাদের আঘাত করা কখনোই চলবে না......যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ভাইয়ের মত আচরণ ও ব্যবহার করতে হবে।"

সৈনিকদের সম্পর্কিত সেই বিধান বইটি নিয়ে ফিল্ড মার্শাল এমন সব মজাদার কাণ্ড করছিল যে লর্ড লয়েলকে বারবার হাতুড়ি ঠুকতে হল। মিলচ

নিজেও মাঝে মাঝে বিচলিত হচ্ছিল কেননা এইসব বানানো কথা সামলাবার জন্যে সে মাঝে মাঝে হঠাৎ টান টান করছিল তার চোখ; কিন্তু ডঃ স্ট্যাহমার তাঁর তৈরী রাস্তায় তাকে বারবারই চালনা করতে লাগলেন। আলবার্ট স্পীয়র? রেইখ মন্ত্রিসভার যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সম্পর্কিত সরবরাহ মন্ত্রী? হ্যাঁ, এতো নিশ্চয়ই যে সামরিক দুর্গ, প্রতিরক্ষা ভবন এইসব গড়ে তোলার জন্যে, মাটির তলায় কারখানা, হাওয়াই আড্ডা এসব বানানোর জন্যে মাঝে মাঝে তাকে বিদেশী শ্রমিক নিয়ে আসতে হত। কিন্তু এ ছাড়া কি করতে পারা যায়? যুদ্ধ দাবী করেছিল আত্মত্যাগ। স্পীয়র খুবই শান্তিপ্রেমিক লোক ছিল, মনে মনে সে ছিল একজন শান্তিপ্রয়াসী। হিটলারের আদেশ অমান্য করে সে সামরিক উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কারখানাকে শান্তিপূর্ণ উৎপাদনের কাজে পরিবর্তিত করতে আরম্ভ করেছিল—জমির সার, কৃষিকাজের জন্যে যন্ত্রপাতি, আর সাধারণের ব্যবহারের নানা জিনিসের কারখানা।

মিলচ এবং ডঃ সারভাটিয়াস—অভিযুক্ত ফ্রিটজ সকেলের পক্ষের আইনজীবী-র মধ্যে কথোপকথন আদালতে কেবল ফিক ফিক হাসি নয়, হো হো অট্টহাস্য টেনে এনেছিল।

সারভাটিয়াস: "বিদেশী শ্রমিক ও কর্মীরা জার্মানীতে কিভাবে কাজ করত, তা বলো।"

মিলচ: "তারা খুব ভালো করে কাজ করত। একটা সুসভ্য দেশে নিজেদের দেখে তারা বেশ ভালো বোধ করত। তারা রুটি ও মাইনে পেত। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হত। একথা সত্যি, যে আমি একেবারে সঠিক জানি না, আমি একজন ফৌজী লোক, তবে তাদের মাত্রা নির্দিষ্ট খাবার দাবার যা তারা পেত তার পরিমাণ ছিল জার্মানদের চেয়ে বেশী… ডঃ সকেলে, যিনি এইসব ব্যাপারের দায়িত্বে ছিলেন তিনি নরম ধাঁচের, দয়ালু অন্তঃকরণের মানুষ। সে বাপের মত বিদেশী শ্রমিকদের ব্যাপারে যত্ন নিতেন।

মিলচের উদ্ভাবিত মিথ্যার জাল অভিযোগকারী পক্ষের কটি প্রশ্নে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল আর আদালতে একটা সত্যিকারের নাজী নেকড়ে, যে ফিল্ড মারশালের সামরিক উর্দিতে নিজেকে ঢেকে রেখেছে, তা ফাঁস হয়ে গেল। বিভিন্ন বন্দী শিবিরে মানুষ নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার সংগঠক ছিল

মিলচ। যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদক কারখানায় হাজারে হাজারে যুদ্ধবন্দী চালান দিয়ে পাঠান তার কাজ। যে সমস্ত যুদ্ধবন্দী যারা মান অনুসারে কাজ করতে অক্ষম ছিল তাদের "বিশেষ ব্যবস্থা" সে দাবী করেছিল। বিভিন্ন সাক্ষ্যের যে ভার, সেই ওজনের তলায় পড়ে মিলচ শেষ পর্যন্ত তার মাথা নামিয়ে নিল ও স্বীকার করল, "হ্যাঁ, সম্ভবতঃ এ বিষয়ে আমি জানতাম, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।"

অভিযুক্তপক্ষের এইসব হল যা ডঃ স্ট্যাহমার টেনে এনেছিলেন একটা জেল কুঠরি থেকে, জার্মানীর দুই নম্বর নাজীকে রক্ষা করার চেষ্টায়। রুডলফ হেস্‌স-এর পক্ষের আইনজীবী ডঃ সেইডলের তুলনায় ডঃ স্ট্যাহমারকে দেখতে যথেষ্ট ভাল ছিল, যদিও ডঃ সেইডলকে সাংবাদিকরা ডাকত "ইঁদুর ইঁদুর" বলে। সেইডল ছিল বেঁটে, আর সব সময় অস্থির, লম্বা নাক—সত্যি কথা বলতে কি, তাঁকে দেখতে সত্যিই একটা ইঁদুরের মত। নীল বেগুনী গাউন গায়ে শিক্ষক শ্রেণীর আইনবিদরা নিজেরা বেশ সশ্রদ্ধভাবে ব্যবহার ও আচরণ করার চেষ্টা করতেন, যাতে তাঁদের হাস্যকর না লাগে, কিন্তু "ইঁদুর ইঁদুর দেখতে"র এইসব বিবেচনা নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। অভিযুক্তদের জন্যে তার ব্যক্তিগত সহানুভূতি গোপন করার সে কোন প্রয়োজন বোধ করত না। আদালতে তিনি সমর্থন করছিলেন হেস্‌স এবং ফ্রাঙ্ককে, কিন্তু সব সময়ই গোয়েরিংকে সমর্থনকারী আইনজীবী স্ট্যাহমারের চারদিকে ঘুর ঘুর করে বেড়াতেন ও তার যেকোন পরামর্শ মত চলতে সব সময় প্রস্তুত। যখনই কোন প্ররোচনামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার মতলব হত অথবা যখনই সন্দেহজনক দলিল পেশ করার ব্যাপার হত তখনই স্ট্যাহমার সাধারণতঃ "এই ইঁদুর টাকে ট্রাইবুনালে খাড়া হওয়ার জন্যে পাঠাতেন।

যাইহোক, যদিও নাজী আত্মরক্ষার শেষ রেখা বেশ দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করে সামলানো হচ্ছিল এবং এই চেষ্টা যদিও তাদের পারস্পরিক সংযোগে বেশ সুসমন্বিত এবং যদিও অভিযোগকারী পক্ষের চেয়ে আত্মরক্ষাকারী অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা আদালতের কমপক্ষে *দ্বিগুণ* সময় নিচ্ছিলেন, যদিও অভিযোগকারী পক্ষের চেয়ে, আত্মরক্ষাকারী অভিযুক্ত পক্ষের হাজির করা সাক্ষীর সংখ্যা ছিল *তিনগুণ*, তাহলেও অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনে ফল লাভ ছিল অতি দুর্বল। অভিযোগকারী পক্ষের

যুক্তিপূর্ণ ও অকাট্য প্রমাণের কাছে অভিযুক্ত আত্ম সমর্থনকারী পক্ষকে একের পর এক সবকিছু অসহায়ভাবে সমর্পণ করে দিতে হচ্ছিল। যখন তারা তাদের আগে বলা কথা থেকে সরে পিছন ফিরে পালাচ্ছিল তখন অনেক ঘটনা ঘটছিল যা কৌতূহলোদ্দীপক। আর এক জঘন্য ঘৃণ্য অপরাধী আলফ্রেড রোজেনবার্গের সমর্থনকারী ছিলেন আইনজীবী ডঃ থোমা। তিনি ছিলেন ধীরগতি, অত্যধিক স্থূল একজন লোক, যিনি রোজেনবার্গের লেখা থেকে সব দীর্ঘ রচনাংশ পাঠ করে আদালতে নাজী তত্ত্বকথা সম্পর্কে দীর্ঘ সব আলোচনার অবতারণা করতেন। তিনি একটা স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে, অনুনাজী গলায় সেই সব দলিলকেই জোরের সঙ্গে অস্বীকার করলেন, যে দলিলগুলোকে তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর মক্কেলকে একেবারে ধুয়ে মুছে সব কলঙ্ক ঢেকে সাফ সুতরা করে দেবে। কখনও কখনও তিনি মাইক্রোফোন বন্ধ করে, তাঁর যে সহকারী তাঁর হাতে প্রয়োজনীয় দলিল তুলে দিয়েছিল, তাঁর সেই সহকারীকে নির্দেশ দিতেন।

একদিন, এক সময় হল কি এই সংকারীটি হয় ভুল শুনে কিংবা ঠিক মত বুঝতে না পেরে তার ওপরওয়ালা বড় কর্তার হাতে একটা ভারী তাগড়াই বই তুলে দিল, সেটা দেখা গেল রোজেনবার্গ রচিত জ্ঞান ও সংস্কারের প্রসারে বাধাদানকারী ব্যক্তি বিষয়ে রচিত গ্রন্থ, *"বিংশ শতাব্দীর গূঢ় অর্থপূর্ণ কাহিনী"*। তাঁর হাতে কি দেওয়া হল, আইনজীবীটি ততক্ষণাৎ তা ভাল করে দেখেন নি এবং যখন দেখলেন তখন রাগে তিনি মাইক্রোফোনটি বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন "হাঁদা, ভ্যাবারাম কোথাকার, এই আবর্জনাটা আমার হাতে দিচ্ছ কোন কম্মে?" যা গোটা আদালত শুনতে পেল।

জার্মান ভাষায় এই শব্দটা আরও জোরালো শুনিয়েছিল। কিন্তু যে মেয়েটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছিল, সে রোজেনবার্গ-এর সমস্ত দার্শনিক রচনার এই সঠিক মূল্যায়ন অনেক নরম আর মোলায়েম করে বলল। স্বাভাবিকভাবেই আদালতে এই কথায় তুমুল অট্টহাস্য উঠল, বরং এমন কি লর্ড লরেন্স যাঁর বাইরের দিক থেকে কোন আলোড়নই দৃষ্ট হত না, তিনিও তাঁর মাইক্রোফোন চালু করার আগে হেসে ফেললেন।

যদিও কখনো সখনো, এমন কি এই অভিজ্ঞ বিচারকও, যার অভিযুক্ত পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনের সূত্রে, নানা আক্রমণাত্মক অভিযানকে—হ্যাঁ,

সেগুলি তা-ই—তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন, তিনিও মাঝে মাঝে তাদের নোংরা কৌশলে হাঁপিয়ে উঠতেন। এই রকম সব ক্ষেত্রে, তাদের জায়গায় মেইসটটার নায়কদের বসিয়ে দেবার এক সুকৌশলী পন্থা বার করেছিলেন। একবার, ওঁদের একজন যিনি আদালতের দীর্ঘ সময় দখল করেছিলেন কিন্তু তখনও তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি, তিনি বললেন, "এবং পরিশেষে এই শেষ অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির প্রতি আমি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।" লর্ড লরেন্স উত্তর দিলেন, "আমি আপনাকে একথা মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে ইতিমধ্যে এটি আপনার সর্বশেষ চূড়ান্ত পঞ্চম সংখ্যক অতীব গুরুত্বপূর্ণ শেষ প্রশ্ন যার প্রতি আপনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছা করেন। আমি কিন্তু গুণে যাচ্ছি।"

খোলাখুলি বলতে কি, শুরুতে আমরা সাংবাদিকরা বিশেষত: সোভিয়েত দেশের সাংবাদিকরা লম্বা লম্বা গাউন পরা এইসব লোকের কথার ভোজবাজিতে অতিশয় উত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ বোধ করেছিলাম। শয়তানের জন্য ওকালতি করার পিছনে তাদের যে মতলব ও উদ্দেশ্যই থাক, বিচারকদের ও জনসাধারণের স্নায়ু নিয়ে এমন যা-তা খেলা করার তাদের কোন অধিকার নেই। বিচারকদের দেখে আমরা তাজ্জব হয়ে যেতাম—এই সমস্ত বুদ্ধিমান, সুগভীরভাবে অভিজ্ঞ মানুষেরা যাঁরা আইনের নাড়ি নক্ষত্র জানেন, তাঁরা এই সব বটতলার উকিলদের অনর্থক বাচালতা থামিয়ে দিয়ে তাদের সংযত করছেন না কেন? আমাদের পক্ষের বিচারকরাও—ইওনা নিকিতচেনকো ও আলেকজন্দার ভোলেহকভ—যাঁরা গাউন নয়, সামরিক পোশাক পরে বিচারকদের টেবিলে বসে আছেন, তাঁরাই বা কেন এমন চুপ চাপ শান্তভাবে এই সব কৌশলকে দেখে যাচ্ছেন?

অবশ্য ন্যুরেমবার্গ-এ বেশ কয়েক মাস অধিবেশন দেখে দেখে, আমাদেরও এখন কিছু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে। অভিযুক্ত পক্ষের নানা কৌশল দেখে আমরা আর অবাক বা তেমন অধৈর্য হই না। আদালতকে তাড়া দেওয়ার কোন অভিপ্রায় আমাদের পক্ষে ছিল না। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে ন্যুরেমবার্গ-এ যে আইনগত আদব কায়দা, রীতিনীতি তৈরী হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ইতিহাসের সেই মুহূর্তটির জন্যই নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। এবং আমরা বিশ্বাস করতাম যে ন্যুরেমবার্গ বিচার সারা পৃথিবীর

পক্ষে এক পূর্ব দৃষ্টান্ত হতে চলেছে এবং তাই সেই বিচারকে তাড়াহুড়া করে শেষ করা বা আবেগের বশীভূত হওয়া থেকে অবশ্যই সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে।

২৫। তাদের চূড়ান্ত এজাহার দান

হিটলারের ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফার, হফম্যান, তার উন্নতি হচ্ছিল। তার এক নতুন সহকারিণী হয়েছে—হাসিখুসী, আকর্ষণীয় এক স্বর্ণকেশী, নীলনয়না, যে ইভা ব্রাউনের জায়গা বেশ ভালভাবেই পূর্ণ করে দিয়েছিল—এবং তার মাধ্যমেই, হফম্যান তার সমৃদ্ধশালী মহাফেজখানার সংগ্রহ থেকে ছবি বিক্রী করে একবারে রমরমা ব্যবসা করে সতেজ হয়ে উঠছে। তার ব্যবসা বিশেষ লাভজনক হয়েছিল বিশেষভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আরও বিশেষভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, ন্যুরেমবার্গ বিচার যতই শেষের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল, ততই সেখানকার জনসাধারণ হিটলার ও তার সাঙ্গপাঙ্গোদের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবন সম্পর্কে বর্ধিত আগ্রহ আর কৌতূহল দেখাচ্ছিল। এটা আরও হচ্ছিল, বিশেষভাবে, চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতার পর রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। ওই ছবিগুলো নগদ চড়া দামে বিক্রী হচ্ছিল। হফম্যানের গাল এখন গোলাপী। তার একটু ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে। সে এখন ভাল দর্জির হাতে বানানো স্যুট পরে, যার কোটের ভাঁজে জার্মান আকাদেমী অফ আর্টসের চিহ্ন লাগানো।

হাসিখুসী নীলনয়না সেই ফ্রাউলেইন, তার মালিকের অপূর্ব মহাফেজখানার সঙ্গে আমায় পরিচিত করানোর নিমন্ত্রণ করল। ঠিক আছে, আমিই বা কেন সেটি একবার দেখবো না? এই সংগ্রহশালা চমৎকারভাবে বিন্যস্ত, বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত ও নানা ফাইলে আলাদা আলাদা করে রাখা। "ন্যুরেমবার্গ" নামের ফাইল দেখানোর জন্যে আমি অনুরোধ করলাম ও কয়েক ঘন্টার জন্য এই শহরের অদূর তথা সাম্প্রতিক অতীতে ডুবে গেলাম। *প্যারটেইফেলড*-র সেই সাদা পাথরের বক্তৃতার জায়গা থেকে ভয়ংকরভাবে চীৎকার করে হিটলার কিছু বলছে; আর তার সামনে শত শত হাজার হাজার ঝটিকা বাহিনীর সভ্যরা সুসংবদ্ধ

সারিতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে সমবেতভাবে দলগত জিগির তুলছে, নিশ্চয়ই তারা সমান ভয়ংকরভাবে বলছে "সেইগ হেইল।" এই সেই বিকারগ্রস্ত, অতিরিক্ত মাত্রায় অসৎ প্রাণী জুলিয়াস স্ট্রেইচার, যাকে আমরা দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি, যে সাধারণতঃ নীচের দিকে মুখ ঝুকিয়ে থাকত কিংবা নাক খোঁচাত। কিন্তু এই ছবিতে সে মোটা ও সতেজ। ছবিতে সে উপহাস করার মত চেঁচিয়ে বলছে কয়েকজন বালিকাকে, যে বালিকাদের মাথা ন্যাড়া ও তাদের ন্যাড়া মাথা কিছু দিয়ে গাধাদের সঙ্গে বাঁধা। মেয়েগুলির গলায় কার্ডবোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা "আমি একজন ইহুদীকে ভালবেসেছিলাম।" ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক ক্ষিপ্তমত্ত জনতা ঘুঁষি উঁচিয়ে ছুটে আসছে ওই মেয়েগুলির দিকে, আর বেশ পেশল চেহারার পুলিশরা সেই মত্ত ক্ষিপ্ত জনতাকে বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করছে না। এই একটা মশাল মিছিলের ছবি। মিছিল চলেছে প্রাচীন ন্যুরেমবার্গ শহরের সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে (এই রাস্তার এখন অবশ্য কোন অস্তিত্ব নেই)। মিছিলের নেতৃত্ব করছে হেস্‌স, গোয়েরিং আর বোরম্যান। তাদের গায়ে ঝটিকা বাহিনীর উর্দি আর দোলায়িত নিশানের তলে তাদের মাথায় গোলগাল-বেসিন সদৃশ শিরস্ত্রাণ।

বিশেষভাবে গোয়েরিং-এর নানা ধরনের অজস্র প্রতিকৃতি। ছবিতে ফিল্ড মারশাল পোশাকে, হাতে ব্যাটন, আর একটা ছবিতে তার পরণে অসামরিক সাদা পোশাক, আর একটা ছবিতে তার পরণে শিকারীর জ্যাকেট, মাথার টুপিতে জংলী হাঁসের পালক। আর একটা ছবিতে তার রাজমিস্ত্রীর পোশাক, হাতে কর্ণিক—এই ছবিতে সে একটা স্মৃতি সৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছে। শেষ একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে তার হাতে তীর ধনুক—যদিও এর সঠিক তাৎপর্য কি তা সেই ক্রাউলেইন, আমায় বোঝাতে পারল না।

ওরা সবাই ছবি তোলাতে ভালবাসত—এরা সবাই নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়, যুদ্ধ পরবর্তীকালে ওয়েমার সাধারণতন্ত্রে উৎকট স্বাদেশিকতার ঢেউ যাদের মাথায় টিকলির শোভার মত ওপরে তুলেছিল। তেরো বছর ধরে তারা ফুয়েরার, মন্ত্রী, রেইখ কমিশনার, গ্যালিয়েটার, এইসব ভূমিকা পেয়েছে। তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিপজ্জনক। তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অন্ধের মত ক্ষ্যাপা স্বপ্নের জন্য তারা পৃথিবীতে নরডিক সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিল "কমপক্ষে এক হাজার বছরের জন্য।"

আদালত ঘরে, এখন ওরা পাটাতনে দাঁড়িয়ে ওদের শেষ ও চূড়ান্ত বিবৃতি দিতে যাচ্ছে। আমি লক্ষ্য করলাম যে এইসব রেইখ ব্যবস্থা পরিষদের মন্ত্রীরা, রেইখমারশালরা, গ্র্যাণ্ড এ্যাডমিরালরা, আর গ্যালিয়েটাররা, যারা ইউরোপে অধিকৃত দেশসমূহের সরকারগুলির কাছে সম্প্রতি তাদের ইচ্ছাপত্র ঘোষণা করেছে, তারা আত্মপক্ষের সমর্থনে একটি কথাও উচ্চারণ করে নি, এমনকি যে নাজীবাদের তারা স্রষ্টা ও তাত্ত্বিক, তার স্বপক্ষেও তারা একটি কথা বলেনি। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। তারা তাদের নাজী-বিশ্বাসের যে প্রতীক সেটাকে সমর্থনের কোন চেষ্টা করে নি, কিংবা তাদের আচরিত পন্থা কিভাবে নৃশংস বর্বরতার জন্ম দিয়েছে তাও ব্যাখ্যা করে বলার কোন প্রয়াসই করেনি।

একের ভিতরে অপরে অটলভাবে অন্তর্ভুক্ত, একে অপরের সঙ্গে জড়ান এদের অস্পষ্ট সব কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে, এই বিচারকক্ষে আসার জন্য রওয়ানা হবার আগে বেলগ্রেডে যে মহান কমিউনিস্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তাঁর কথা আমার মনে পড়ছিল। জার্মানীর এই সমস্ত শাসকরাই তাঁকে বন্দী করেছিল, নির্জন জেল কুঠরিতে তাঁর ওপর অত্যাচার করে বিকৃত আনন্দ পেয়েছিল আর তাঁর বিচার করার জন্য মাসের পর মাস ধরে মাল মশলা তৈরী করেছিল। সেই বিচারে তিনি মাথা উঁচু করে সগর্বে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন আইনজীবী নিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি নিজেই মুখোমুখি নাজী বিচারকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং যে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি তিনি আজীবন উৎসর্গীকৃত সেই কমিউনিস্ট আদর্শকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। এরই ফলস্বরূপ লিপজিগের বিচারে যে ছিল অভিযুক্ত আসামী সে পরিণত হয়েছিল এক কঠোর অভিযোগকারীতে। সেই বিচারে সংগঠকদের বানিয়ে তোলা নির্লজ্জ সব দিক সে ফাঁস করে দিয়েছিল এবং সর্বশক্তিমান রেইখমন্ত্রী, প্রুসিয়ার চ্যান্সেলর ও জার্মানীর দুই নম্বর নাজীকে বাধ্য করেছিল অভিযোগকারী থেকে অভিযুক্ত আসামীর ভূমিকায় নেমে আসতে, আজ সে নিজেই তার পক্ষের সমর্থনকারী ও বিচার প্রার্থী।

লিপজিগ বিচারে, প্রধান আত্মপক্ষ সমর্থনকারী কেবলমাত্র তার গভীর বিশ্বাসের প্রত্যয় ও বুদ্ধির শক্তিতে কার্যতঃ নাজী বিচারকদের তার সম্পর্কে

এই রায় দিতে বাধ্য করেছিল যে, সে "নিরপরাধ।" পৃথিবীর আইনের ইতিহাসে, এই ঐতিহাসিক নিদর্শন যে মানবিক যুক্তি আজ মহৎ আদর্শের বিজয় বার্তাই ঘোষণা করে যা নাজীদের আইন যন্ত্রের সঙ্গে দারুণ সংগ্রামে জিওরজি দিমিত্রভকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

নিতান্ত করুণার পাত্র এইসব কাপুরুষ, স্বার্থপর আর মিথ্যাবাদীর দল যারা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আদর্শবাদের সৃষ্টি করেছিল আর খোয়াব দেখেছিল সেটাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার, তারা তাদের আদর্শবাদকে সমর্থন করার চেষ্টা পর্যন্ত করল না। তারা অনেকেই বুঝতে পারছিল, বুঝতে না পেরে তাদের কোন উপায় ছিল না, যে ইতিমধ্যেই আদালত কক্ষের বাইরে মৃত্যু তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এখনও তারা সাহসে বুক বেঁধে, নিজের আদর্শকে সমর্থন করতে পারত, আর কিছুর জন্যে না হোক, কেবলমাত্র ইতিহাসের মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু না, ঠিক আগের মতই তারা কপটাচারী ঝুরিভরা মিথ্যার অন্ধকারময় স্রোত উপুড় করে ঢালতে থাকল। ঠিক আগের মতই ভেঁশাতা একগুঁয়েমি নিয়ে তারা সব দোষ, যে তিনজন অনুপস্থিত, তাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে চলল। তাদের চূড়ান্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছু কিছু কথোপোকথনের অংশবিশেষ এখানে দেওয়া হল।

গোয়েরিং: "...আমি সাধারণভাবে যুদ্ধের বিরোধী...আমি যুদ্ধ চাইনি, এই যুদ্ধকে বাধিয়ে দেওয়ার জন্য আমি কোন সহায়তাও করিনি।"

রিবেনট্রপ: "...নিশ্চয়ই, পররাষ্ট্র নীতির জন্য যা কিছু দায়িত্ব তা অবশ্যই আমাকে বহন করতে হবে, কেননা আমি ছিলাম রেইখ মন্ত্রী, কিন্তু সত্য কথা ও ঘটনা ছিল এই যে পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে নির্দেশ আমি দিতাম না। অন্য আর কেউ এটা করত।"

ফ্রানক: "মানুষের জীবনে ভুল এবং দোষ হয়, সেসব নিয়েই মানুষের জীবন গঠিত। আমিও, অনেক অনেক ভুল করেছি, আমিও অনেক ব্যাপারে নিজেকে ফাঁকি দিতে দিয়েছি...আমি অকপটে স্বীকার করছি যে আমি অনেক কিছুই নিয়েই মাথা ঘামাইনি আর আমি, সহজেই ফাঁদে পড়ি ও প্রতারিত হই।

কালটেনব্রুনার: হ্যাঁ, এস.ডি. আর গেসটাপোরা ভয়ংকর সব অপরাধ করেছে। সেসব অস্বীকার করা নিছক বোকামি হবে, কিন্তু তাদের হুকুম আর নির্দেশ দিয়েছিল হিমলার। আমি কেবলমাত্র তার হুকুম, তার

আদেশ পালন করেছি…আমি চেয়েছিলাম যে আমাকে সীমান্তে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, আমি দেশের জন্য যুদ্ধরত একজন সাধারণ সৈনিক হতে চেয়েছিলাম। সেটাই আমার স্বপ্ন ছিল।"

কেইটেল: "আমার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, তা আমি দিতে পারতাম একজন সৈনিক হিসেবে—আমার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা—অন্যেরা ব্যবহার করতো এমন এমন উদ্দেশ্যে যা আমি পরিমাপ করতে পারতাম না, কেননা সামরিক কর্তব্যের আমি কোন সীমা দেখতে পেতাম না।"

আদালত এইসব একই কথা, এইসব ভদ্রলোকদের কাছ থেকে কয়েক মাস ধরে শোনার পর, আবার সেই একই কথা যথেষ্ট বাজে শোনাল। কিন্তু এইসব বক্তৃতায় কতকগুলো শব্দ আমার বিরক্তিতে হাসি এনে দিল।

পোল্যাণ্ডের কসাই, হানস ফ্রানক, যে মুসৌযানার সঙ্গে "জনহ্রাসকরণ" নীতি দেখাশোনা করত আর যার এলাকা যার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল সর্বাধিক দৈত্যাকার সব মৃত্যু শিবির—অসওয়েসিস, মাজডানেক এবং ট্রেবলিনকা—সে বেশ আড়ম্বরপূর্ণ শব্দে বলল, "জার্মানীর লোকেরা হতাশ হোক তা আমি চাই না। হিটলার তাদের জন্য যে পথ ঠিক করেছিল, সে রাস্তায় তাদের আর এক পাও নিশ্চয়ই চলা উচিত নয়।"

যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ মন্ত্রকের রেইখ মন্ত্রী, আলবার্ট স্পীয়র, হিটলারের পেয়ারের সাকরেদ যে যুদ্ধবন্দীদের শ্রমকে শোষণ করার পদ্ধতি আর *অসটারবেইটার* তৈরী করেছিল, মাটির তলায় গোপন সব কারখানা আর হাওয়াই আড্ডা তৈরী করার সময় সব মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী, সে তার ভাবব্যঞ্জক কালো চোখে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বিস্ফারিতভাবে ঘোষণা করল তার নিজের কাজ ও তার নিজের পদ্ধতির দেউলিয়াপনা: হিটলার জার্মান জনসাধারণের অসীম দুঃখ কষ্টের কারণ। এই বিচারের পর, জার্মান জনসাধারণ হিটলারকে ঘৃণা করবে, ধীক্কার দেবে জার্মান জনসাধারণের সব দুঃখ কষ্ট দেওয়ার অপরাধে দোষী ও দায়ী করে।

কিন্তু এই যথেষ্ট। সব বক্তৃতাই এক ধুয়োর নানা বৈচিত্র্য। সেই এক ধুয়ো হল যে সব কিছুর জন্য হিটলার, হিমলার ও গোয়েবলস্ দায়ী। আমরা হতভাগারা, যাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কম, আমাদেরকে তারা নানা

উচ্চপদে বসিয়েছিল, আমাদের দারুণভাবে ভুল পথে চালিত করেছিল, আমাদের ভাঁওতা আর ফাঁকি দিয়েছিল। আর জার্মানীতে যে কি হচ্ছে তা আমরা জানতাম না।

তাদের কথা শোনার সময় যে সমস্ত ফটো সেই নীল নয়না, বর্ণাভ গালে টোল পড়া কন্যাকাকে রমারমা ব্যবসার সুযোগ দিয়েছিল, হফম্যানের সংগ্রহশালার, সেইসব কিছু কিছু ফটোগ্রাফ করা আমার মনে পড়ছিল। মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে সেই মেয়েটি সাংবাদিকদের কাছে তার ছবির ভাঁড়ারের বিজ্ঞাপন দিত—এই সমস্ত শয়তানদের জীবনের ধরে রাখা কিছু কিছু মুহূর্ত, যারা এখন তাদের নৃশংস বর্বরতার কৈফিয়ৎ খোঁজার জন্যে অস্পষ্ট আধো আধো উচ্চারণে চেষ্টা করছে। এই সমস্ত ফটোয় তাদের কতই না দুর্বিনীত, পাশাপাশি সাজানো গোছানো আড়ম্বরপূর্ণ আর সামরিক উন্মাদনায় অত্যন্ত উত্তেজিত লাগছে। আর সেই তারা যখন প্যালেস অফ জাসটিস-এ তাদের চূড়ান্ত শেষ বিবৃতি দিল, তখন তাদের কতই না শান্ত, করুণাপ্রার্থী আর ক্রীতদাসের মত দেখাচ্ছে।

আবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি জিওরজি দিমিত্রভ আর লিপজিগ বিচারের কথা ভাবলাম। হফম্যানের সংগ্রহশালার মহাফেজখানায় সেই বিচারের কিছু কিছু ছবি রাখা আছে। একটা ছবি আছে, সাক্ষীর পাটাতনে দাঁড়িয়ে দিমিত্রভ তার শেষ বক্তৃতা দিচ্ছে, দুই হাত সামনের কাঠে রেখে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে বুকে চিতিয়ে সে বলছে—বিচারকদের দিকে নয়, ছবিতে তারা তো অন্ধকারে, ঘষা ঝাপসা সব মূর্তি—সে বলছে সমগ্র মানবতার কাছে। তাঁর পিছনে দাঁড়ান দুজন রক্ষী অবাক বিস্ময়ে আর অসীম আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে—একজন অভিযুক্ত আসামী, যিনি তাদের চোখের সামনে একজন আসামী থেকে অভিযোক্তা হয়েছেন, তিনি ফ্যাসীবাদকে তার দুর্গের ভিতর অপরাধী করার বুকের পাটা রাখেন।

পঁয়তাল্লিশ অকুপেশন মার্ক দিয়ে, এই একটি মাত্র ফটোই আমি কিনেছিলাম। অনেক দাম এটার, কিন্তু আমার কাছে এই ছবিটি, হফম্যানের মহাফেজখানায় আর যে সব ছবি আছে, সেই সবগুলির চেয়ে অনেক বেশী দামী।

২৬। মস্কোর বিষয়ে আরও কিছু

প্রতিবাদী আসামীরা তাদের শেষ বক্তৃতা শেষ করার পর, বিচারকেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার জন্য তাঁদের কামরায় গেলেন এবং বিচার অধিবেশনের এক মাসের বিরতি ঘোষিত হল। আমি যেন এই যথার্থ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কেননা *ওকটিয়াবর-এ* আমার গল্প ছেপে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল, তারা আমায় তার পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন যে বৈমানিককে নিয়ে আমি আমার কাহিনী লিখেছি, সেই বৈমানিক ওই পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে এসেছিল ও সে প্রত্যেকের মনে বিলক্ষণ দাগ ধরিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কি করে সে লড়াই চালিয়ে যায় সে গল্প সে তাদের কাছে করেছে। সম্পাদকরা চান যে গ্রন্থের শেষ দিক ও শেষের কথা আমি পুনরায় নতুন করে লিখি।

অন্যান্য সাংবাদিক ও সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা যারা এক মাসের বিলম্বে বসে পড়েছিল বলা যায়, তাদের থেকে ব্যতিক্রম হয়ে, আমি মিঃ পিকউইককে সানন্দে চুম্বন করে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে প্রস্তুত ছিলাম। পরদিন আমি বিমানে মস্কোতে উড়ে গিয়ে সম্পাদকীয় দপ্তরে গেলাম। তার পর দিন সকালে আমার বাসায় টেলিফোন বেজে উঠল, আর আমি ভাঙা ভাঙা এক পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলাম যা আমার কেমন যেন চেনা, পরিচিত মনে হল। "কমরেড পোলেভই? 'তোমাকে বাড়িতে অসুবিধা করলাম মাফ করো। আমি *ওকটিয়াবর-এ* জানতে পারলাম যে তুমি এসেছো। ওখান থেকেই তোমার টেলিফোন নাম্বার পেলাম।"

"কে কথা বলছেন। আপনি?"

"রক্ষী বাহিনীর মেজর মারেসিয়েভ। তোমার মনে আছে কুরস্ক বাল্জ-এ আমাদের দেখা হয়েছিল?"

এক ঘণ্টা বাদে, সে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। আমুদে জীবন্ত একজন মানুষ যার হাঁটার ধরন ভালুকের মত গড়িয়ে গড়িয়ে। সেদিন কে আমাদের লিফট খারাপ ছিল। আমার স্ত্রী যখন জানতে পারলেন যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তখন তিনি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে লিফট না থাকার জন্য ক্ষমা চাইতে লাগলেন। এটা তো বুঝতে হবে যে আমরা পাঁচ তলায় থাকি।

"আমাদের লিফটও প্রায়ই খারাপ থাকে।" ম্যারেসিয়েভ উত্তর দিল। "ওতে কি হয়েছে, আমার এসব অভ্যাস আছে। আমার এতে ভাল ব্যায়াম হয়।"

গত চার বছরে ওর কোন পরিবর্তন হয়নি বললে চলে। এখনো সে সেই আমুদে উৎসাহে ডগমগে লোক, যে তার শারীরিক চিকিৎসার বিষয়ে মনোযোগী হলে অপছন্দ করে। আমি তাকে বসতে বললাম। ভুলেই গিয়েছিলাম যে ডিভানটার নড়বড়ে অবস্থা যার ভেতর দিয়ে আলেকজান্দার ফেদিয়েভ গলে পড়ে গিয়েছিল। সেই বৈমানিকও স্বাভাবিকভাবেই গলে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু সে সোজা লাফ দিয়ে উঠল আর মজা করে বলল যে প্যারাসুট গায়ে দিয়ে তবেই একজনের এই ডিভানে বসা উচিৎ। সে নির্মল হাসল ও একটা কাঠের টুলে বসে বলল, "এইভাবে বাড়িতে বসে, আমি একটা কাগজ পড়ছিলাম। রেডিওতে বিড় বিড় করে কি বলছিল, আমি মোটেও তা কান করে শুনিনি। এমন সময় হঠাৎ আমার মা এসে বলল, 'খোকা, এ কি তোমাকে নিয়ে বলছে না?' আমি ভাল করে শুনলাম ও সুনিশ্চিত হলাম যে আমার জীবনের ঘটনাই তারা বলছে। নামটাও এক—কেবল একটা অক্ষর বদলে গেছে। আমাকে নিয়ে লেখার কথা কে ভাবতে পারে? সত্যি বলছি, আমি তোমাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। চার বছর তো মোটের ওপর পার হয়ে গেছে। ওরা রচনার অংশ বিশেষ পড়া শেষ করে বলল যে তার পরদিনও সেই কাহিনীর প্রকাশ কাগজটিতে চলবে। তারা লেখকের নামও বলল। তখন আমার মনে পড়ল যে ওরেল-এ আমরা দুজন একসঙ্গে এক রাত্রি কাটিয়েছিলাম। একটা খাবার-টিন থেকে আমরা সেই সামান্য টক টক ছোট ছোট র‍্যাসপবেরি কেমন করে খেয়েছিলাম, তোমার মনে আছে?......তাই আমি ওই গল্পের বাকীটা খুঁজে দেখার জন্যে ওই পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে গেলাম। তারপর আজ তাঁরা ফোন করে জানালেন যে তুমি এসে গেছো আর তাঁরা তোমার ফোন নাম্বারও দিলেন।"

সে যেমন সামান্য লাজুকে হেসে থাকে, তেমনি হাসিমাখা মুখে সে এক নিঃশ্বাসে এই সব বলে গেল।

দুজন সৈনিক, যাদের মধ্যে অনেক দিন দেখা হয়নি, তাদের মধ্যে

সাক্ষাত হলে যেমন হয়ে থাকে, আমরা যুদ্ধ ও যেসব অফিসারকে জানতাম তাদের নিয়ে গল্প করতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম যে, যখন সোভিয়েত ও মার্কিন সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করল, তখন আমরা দুজনেই জার্মান শহর টৈরগাউ-এর কাছে এলবেতে ছিলাম। আমি ছিলাম স্থলে মারশাল কোনেভের আজ্ঞাবাহী হয়ে। আর মারেসিয়েভ ছিল আকাশে, দুই বাহিনীর যোগাযোগের সময় যে আকাশে প্রতিরক্ষার বা সৃষ্টি করছিল।

গল্পটি বেতারে বেশ কয়েকদিন ধরে পড়ে শোনানো হচ্ছিল। এই অফিসারের বিস্ময়কর কাহিনী ক্রমশই বহুল পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। আমার পরিবারের সবাই অবশ্য এই কাহিনী জানতো তাদের অন্তর দিয়ে। আমার স্ত্রী, আমার মা, এমন কি আমার ছ বছরের ছেলেও বড় বড় চোখে অতিথির দিকে তাকিয়ে ছিল।

যেহেতু এইরকম ভাবা হয়েছে যে কাহিনীর শেষের কথা আমায় আবার নতুন করে লিখতে হবে, আমি একটা পেন্সিল নিলাম ও আমার নোট বই খুলে বসলাম। যেমন আমরা বসেছিলাম র‍্যাভিন অরণ্যের কিনারে মাটিতে খোঁড়া গর্তের আশ্রয়ে। মেজর যখন আমার বাণিজ্যের সব যন্ত্রপাতি দেখতে পেল তখন সে যেন কেমন চুপসে গেল আর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দেওয়ার বদলে সে এমনভাবে জবাব দিতে লাগল যেন কোন সাক্ষাতকারে সরকারীভাবে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। সে বলল যে আমাদের সেই লড়াই-এর পর সে রক্ষীবাহিনীর একজন বৈমানিক হিসেবে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাতে থাকে। আমাদের সাক্ষাতের পর ওরেলের কাছে সে গুলি করে তিনটে বিমান নামিয়েছে, আর এই তালিকায় সে আরও দুটো যোগ করেছে সোভিয়েত বালটিক সাধারণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে। তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর পদকে বিভূষিত করা হয়েছে। আর কি? এই হলো সব কথা। যেন এ ছাড়া আর কিছু তার বলার মত নেই।"

"ঠিক আছে, তোমার ব্যক্তিগত জীবনের খবর কি?"

"আমি এখন বিবাহিত......আমার একটি ছেলে আছে। তার নাম ভিক্টর। আমার মা মস্কোতে আমাদের সঙ্গে বাস করার জন্যে কামিশিন থেকে চলে এসেছেন।"

"আর তোমার দুই পা?"

"সে নিয়ে আর কি হবে? এখন এতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি মোটর গাড়ি চালাই। মোটর গাড়িতে আমি এখানে এসেছি। আমি বাইসাইকেল চালাতে পারি, বরফের ওপর স্কেট করতে পারি।"

"এটা কি সত্যিই সত্যি যে তোমার নাকি পা নেই?" সংশয় নিয়ে আমাদের ছেলে জানতে চাইল। ততক্ষণে সে সেই চমৎকার মেজরের হাঁটুর ওপর চড়ে বসেছে।

"তোমার বাবা যদি তা লিখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তা সত্যি", মারেসিয়েভ হাসল।

"তাহলে আমি কিসের ওপর বসে আছি?"

মারেসিয়েভ আবার হাসল।

"তুমি নিশ্চিতভাবে আমার জীবন কঠিনতর করে তুলেছো", মজা করার মত ও আমার কাছে যেন অনুযোগ করল। "শুধু পত্রিকায় লেখাটা বেরলে কিছু হত না কিন্তু যখনই ওরা রেডিওতে গল্পটা পড়তে আরম্ভ করেছে, আমার আর নিরিবিলি শান্তিপূর্ণ কোন মুহূর্ত বোধ হয় নেই। আমার বাসার সামনের দিকের দরজায় ছোট ছোট বাচ্চারা সব দলে দলে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমার পিছু পিছু যায়। কখনো সখনো, তোমার ছেলের মতো তারাও বলে, "মেজর, তোমার কি পা আছে? আমাদের একটু হাত দিয়ে দেখতে দাও।"

ও চলে গেল। বলশালী, পরিপূর্ণ জীবন। পিছনে রেখে গেল ও প্রাণ প্রাচুর্য আর উৎসাহের এক আবহাওয়া। আর আমি বুঝে গেলাম যে জীবন, মানুষের জীবন এক সহকারী জীবন রচয়িতা এবং এই মানুষটির বীরোপম জীবন কাহিনী, একটি গ্রন্থের দুটি প্রচ্ছদের বাইরেও লিখে যেতে পারে।

মস্কোতে থাকার সময় সেই চিত্রশিল্পী নিকোলাই ঝুকভের সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমাদের অধৈর্য "কোকা-কোলা" নুরেমবার্গে তিক্ত বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। গরমের গোড়াতেই সে মনে মনে স্থির করেছিল যে রিবেনট্রপ গোয়েরিং-এর ডাকাত দলের যথেষ্টর বেশী তার দেখা হয়ে গেছে। সে তার আঁকা নানা ছবি, প্রতিকৃতি আর চিত্ররেখের মোটা এ্যালবাম নিয়ে মস্কোতে ফিরে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ সংক্রান্ত চিত্রকরদের যে গ্রেকোভ স্টুডিও, যুদ্ধ চলাকালীন যার নির্দেশক ছিল সে, সেখানে সে ফিরে এসেছে।

অজস্র কথা বলার ছিল তার। ল্যারেনবার্গে আঁকা তার চিত্রমালা নিয়ে এক প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা করছে ঝুকভ। ছবিগুলো ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ, ধারালো, আগ্রহসঞ্চারী আর প্রেস ক্যাম্পে পৃথিবীর সব দেশ থেকে সাংবাদিক ও সাংবাদিক প্রতিনিধিরা ছবিগুলোর তারিফ ও প্রশংসা করেছে। আমার বই ছাপার কাজ চলছে—যে বইটির জন্ম মুহূর্তের ছটফটানির সে একজন সাক্ষী। ও অবশ্য পাণ্ডুলিপি অবস্থায় লেখাটা পড়েছে। তার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকে সে বলল, "তোমার গল্পের জন্যে আমার একটা প্রাতঃরাশ আর দুপুরের খাবার মাঠে মারা গেছে, জোটেনি। আমার স্ত্রী তোমার বইটা সন্ধ্যেবেলায় পড়তে আরম্ভ করে, সারারাত ধরে সেই বই পড়ে। সকালে আমার যখন স্টুডিও যাবার জন্যে বার হবার কথা, তখন তিনি রাত্রির পোশাক, বিছানায় বসে বসে চোখ মুচছেন। প্রাতঃরাশ? রান্নাঘর থেকে তুমি কিছু পেলেও পেতে পার আর দুপুরের আহার তুমি ভুলে যেতে পার। ক্যান্টিনে নোনতা কিছু খেয়ে নিও। তোমার ওই বৈমানিক আমার পারিবারিক জীবনে এই কাণ্ড করেছে।"

এটাকেই আমরা ল্যারেনবার্গে বলতাম বাজে বকবকানি, কিন্তু তারপরই সে গভীর আন্তরিকতায় বলে উঠল, "আমি কিন্তু নিশ্চয়ই গল্পের ছবিগুলো আঁকবো...ওই বৈমানিকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দাও। এইসব জিনিসের উপাদান সরাসরি জীবন থেকে সংগ্রহ করতে হবে, কল্পনা থেকে নয়।"

যুদ্ধের সময়কার দিনগুলি থেকে আমি ঝুকভের কাজ করার পদ্ধতির সঙ্গে ও তার সৃষ্টিশীল উৎসাহের সঙ্গে পরিচিত। আমার মনে পড়ল যে কালিনিনে পার্টিজান বাহিনীর সঙ্গে সে কিছুদিন কাটিয়েছিল। সে ফিরে এসেছিল এক গাঁজা ছবি নিয়ে। কোন কোন ছবি ইঁটের গায়ে আঁকা, কেননা যথেষ্ট কাগজ ছিল না। তখন মে দিবসের ঠিক আগে বসন্তকাল। পরদিন আমি যাব মস্কো, অধিকৃত এলাকার অপরাজিত নাগরিকদের পক্ষ থেকে স্তালিনকে একটা চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সেই চিঠির সঙ্গে ছিল এক বাক্স বোঝাই স্বাক্ষর। তখন ঝুকভ আর আমার একটা ধারণা খেলে গেল—চিঠির সঙ্গে পাঠানোর জন্যে একটা ছবি করতে হবে: "পার্টিজনদের সঙ্গে অরণ্যে সকাল।" ছবিটার ভাব ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে উৎসাহে ফুটতে লাগল ও কথা দিল

যে পরদিন সকালেই ছবি শেষ করে দিয়ে যাবে। সে খালি বলল যে তাকে যেন কোনভাবে বেগড়া দেওয়া না হয় আর "সৃষ্টিমূলক কাজ করার জন্যে যে পরিস্থিতি" তা ঠিক থাকতে হবে—তার মানে, "যাতে সে গরম রাখতে পারে নিজেকে সেরকম কিছু তাকে যোগাতে হবে।" আমি কি করতে পারি? আমি সৈন্যবাহিনীর ভাঁড়ার ঘরে গেলাম। সেখানে সরবরাহের দায়িত্বে যেসব কঠিন হৃদয় অফিসাররা আছেন তাদের বোঝাবার খুব চেষ্টা করলাম যে একথা ঠিকই "র‍্যাশন হচ্ছে র‍্যাশন", অর্থাৎ মাপা নির্দিষ্ট বরাদ্দ হচ্ছে, মাপা নির্দিষ্ট বরাদ্দই. তার বেশী পাওয়া যায় না, কিন্তু শিল্প কর্মের জন্যে কিছু ও কোন কোন ত্যাগ করা দরকার। তারা আমার কিছু ভোদকা নিতে দিল, কিন্তু কোন কারণে সেগুলো পাওয়া গেল ছোট ছোট বোতলে। আমরা যেখানে ঝ্‌কভ তার ছবি নিয়ে কাজ করছিল, সেই জানলার তাকে সেগুলো রেখে দিলাম। তারপর তাকে প্রশ্ন করে অথবা উৎসাহ দিয়ে বিব্রত করতে একজনও সেখানে যায়নি। যখন ভোর হল তখন ঝ্‌কভের ভিতরের জামা বার হয়ে পড়েছে, তার জামার হাতা গোটানো, পেন্সিল আর দাগ মোছার রবার তার মুখ থেকে অভিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। নবোদিত সূর্যের কিরণ ঝিকমিক করছে শিল্পীর ঘর্মাক্ত গালের আর তখনো বাকী দুটো বোতলের ওপর। তখনও সে এঁকে চলেছে, নিজের কাজে একেবারে বুঁদ। যে গাড়ি দেশ পার হয়ে অন্য দেশের বিমান বন্দরে আমাকে নিয়ে যাবে, সেই গাড়ি একটা বার্চ গাছের নীচে অপেক্ষা করছে আর মাঝে মাঝেই আমার জন্য অধৈর্য হয়ে ভেঁপু বাজাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জানলার তাক থেকে শেষ বোতলটি অদৃশ্য হয়ে গেল, আর সেই ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট জানালার কাঁচ দিয়ে আমি দেখলাম যে তার দুহাত লম্বা করে মেলে দিয়ে হাতে ধরে তন্ময় হয়ে ঝ্‌কভ তার আঁকা ছবিটা দেখছে। তারপর হাট করে জানালা খুলে গেল।

"এই নাও দেখো। আমি আবার বাজী মেরে দিয়েছি। কেমন লাগছে তোমাদের ছবিটা? এ্যা? ঠিক আছে তো, নাকি?"

ছবিটা সত্যি হয়েছিল দারুণ। মস্কো যাবার পথে কেবিনে যে হাওয়া সেঁধিয়ে যাচ্ছিল তার থেকে বাঁচিয়ে আমি একাধিকবার ছবির কাগজটাকে মেলে ধরে ছবিটা দেখেছি। প্রতিটি ছোটখাটো জিনিস পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তার আঁকা ছবিতে রয়েছে। এমনকি জার্মান শিরস্ত্রাণের মধ্যে আলু

রান্না করা, যা পার্টিজানদের রুক্ষ কঠিন জীবনের অঙ্গীভূত, তাও এক সূত্রে গাঁথা রয়েছে ছবিতে।

এখন, যখন এই উত্তোজত ও সৎ শিল্পী স্বেচ্ছায় আমার বইয়ের ছবি আঁকতে চাইল, তখন সেটাই এই সত্যের সেরা প্রমাণ যে আমার বৈমানিক এই শিল্পীর কল্পনাকে অধিকার করেছে এবং এই বৈমানিক এমন কেউ যাকে ভোলা যায় না, যে যথার্থই কিছু।

২৭। নিমেসিস তাঁর তরবারী তুললেন

প্যালেস অফ জাসটিসে, এক ভাস্কর্যের নিদর্শন নিমেসিসের মূর্তি সাজিয়ে রাখা ছিল। বড়, সুগঠিত এক নারীমূর্তি, ঠিক যেমনটি জার্মান রুচিতে দেখা যায়, নীচের দিকে নামানো এক তরবারী, তাঁর, হাতে ধরা। বিচার চলাকালীন এই দীর্ঘ কয় মাসে নিমেসিস-এর এই মূর্তি নিয়ে মজা করেনি, এমন বোধ হয় একজনও ছিল না। খবরের কাগজগুলোতে তাকে ব্যবহার করত ব্যঙ্গ কৌতুকের বিষয় বস্তু হিসেবে। আমার মনে আছে যে চারচিলের ফুলটন বক্তৃতার পর, ইংরেজী ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পত্রিকা *পানচ*-এর ছবিতে দেখা যায় যে ভাস্কর মূর্তির এই নারী সার উইননির বাহুতে বাহু জড়িয়ে কোথাও চলেছে। আমাদের ছোট কামরায় সেমিয়ন নারিনি-য়ানি আপাত আন্তরিকতায় বলেছিল—

"কেউ লক্ষ্য করেনি নিমেসিস অদৃশ্য হয়েছে। তার জায়গা এখন খালি।"

তার শ্রোতাদের স্বাভাবিক অবাক অবস্থার উত্তরেই যেন সে তেমনি গম্ভীর গলায় বলে চলছে—

"এই রকম শোনা যাচ্ছে যে মহিলা একজন *জি. আই*-এর সঙ্গে গিয়েছেন একজোড়া মোজা সংগ্রহ করতে। ওইভাবে খালি খোলা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে উনি তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেছেন।"

এই যে ধৈর্যশীল মূর্তি, অবশেষে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য তাঁর তরবারি তোলার সময় হয়েছে। ট্রাইবুনাল আবার তার অধিবেশন শুরু করেছে। সাংবাদিকদের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকা এমনি টইটুম্বুর যে সেখানে কোনমতে

শ্বাস নেওয়া সম্ভব। সেদিনই রায় পড়ার কথা। আমি জানি না যে সাড়া ঘোষণা করার জন্য সেদিন ওরা তিনটে সঙ্কেত বাজিয়ে ছিল কিনা, যদি বাজিয়েও থাকে, কেউ তা শুনতে পায় নি। কানে তালা ধরে যায় এমন শব্দ ছিল সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে, পানশালায় আর টেলিগ্রাফ অফিসে, কাউকে আদালতকক্ষে ডেকে পাঠাতে হয়নি। সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা এমন ভীড়ে ঠাসা ছিল যে যারা দেরী করে এসেছিল তাদের জায়গার জন্যে হুড়মুড় করে উঠতে হয়েছিল দর্শক গ্যালারীতে। বারন্দা আর অন্যান্য কাজের জায়গাতে অস্বাভাবিক কোলাহল ছিল ঠিকই কিন্তু বিচার কক্ষ এমন শান্ত ছিল যে বেতার কেবিনের লোকেরা যে তাদের যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করার জন্য যে সংখ্যা গুন ছিল তা-ও শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকত সেভাবে প্রতিবাদী আসামীদের একসংগে বিচার কক্ষে নিয়ে আসা হল না। তাদের আনা হল আলাদা আলাদা করে, দুজনকে আনার মাঝখানে কিছু বিরতি দিয়ে। তাদের মুখ চোখে চাপা উত্তেজনার পীড়ন। তারা একে অপরকে কোন সম্ভাষণ করল না। প্রায় যন্ত্রের মত তারা তাদের আসনে বসে পড়ল। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরাও বসে পড়লেন। দোভাষী, অনুবাদকেরা তাদের স্বস্থানে আসীন হল। চলচ্চিত্র তোলার জন্য ক্যামেরার গুণ গুণ শোনা যায়। নৈঃশব্দ্য কেবলই বেড়ে বেড়ে তীব্রতর হচ্ছিল যতক্ষণ না বেলিফ, যার বলা কথা কদাচ বোঝা যেত, বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল, "উঠে দাঁড়ান, আদালতের অধিবেশন শুরু হবে।"

বিচারকরা যখন সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করলেন তখন সকলে বিস্ফারিত চোখে তাঁদের দেখল। লর্ড লরেন্স তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় একটি ফোল্ডার ধরে আছেন। বিচার কক্ষে উপস্থিত সকলের—সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ক্যামেরামান—দৃষ্টি ফোলডারটির ওপর নিবদ্ধ। ওই ফোলডারের মধ্যে আছে রায়। যে রায় সম্পর্কে অক্লান্ত ও অদমনীয়া পেগীও, আবার সে ইউরোপের কোন শহর থেকে এসে হাজির হয়েছে, বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেনি।

বিচারের রায় পাঠ করা আরম্ভ হল। আমরা গভীর মনোযোগে তার অনুবাদ শুনছিলাম। বিচারকেরা পালাক্রমে সেটি দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়ছিলেন।

সাংবাদিকরা অস্বাভাবিক রকম ব্যস্ত। যদি সারাংশ হিসেবে যা দাঁড়াচ্ছিল ও বলে দেওয়া হচ্ছিল তা জানা সত্ত্বেও, প্রত্যেকে অধ্যবসায় সহকারে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের নিজের খাতায় লিখে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই বিচার কক্ষের বার্তাবহকে ডেকে এখানে ওখানে উঠে আসছিল হাত, টেলিগ্রাফ অফিসে তার পাঠাবার জন্যে। সান্ধ্য অধিবেশনের শেষেও বিচারের রায় পড়া সমাপ্ত হয়নি। লর্ড লরেন্স অধিবেশনের বিরতি ঘোষণা করে জানালেন যে বিচারের রায় পড়া আবার পরদিন সকালে আরম্ভ হবে। সব চেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ পড়া হবে পরদিন সকালে—প্রতিবাদী অভিযুক্ত আসামীদের স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের অপরাধ সম্পর্কে আলাদা করে আদালতের সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

অধিবেশন শেষ হল আর এক ধরনের আন্তর্জাতিক হৈ চৈ, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল যেন। দণ্ড কি হতে পারে সে সম্পর্কে ডাইনে বাঁয়ে সব রকম অনুমান সকলে করতে লাগল। ফাঁসি? গুলি? আজীবন কারাদণ্ড? মুক্তি?

প্রেস ক্যাম্পে যে কি পরিমাণ তর্জন গর্জন চলল, এমনটি আগে হয়নি। পানশালায়, লোকেরা যেমন ঘোড়ার বাজী ধরে সেই ভাবে পাশ্চাত্যের সাংবাদিকরা বাজি ধরছিল আর ডেভিড লিখে রাখছিল সেসব।

"হ্যাঁ, বিচারের রায়ের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে," র‍্যালফ বলল। এইবার র‍্যালফ ন্যুরেমবার্গে এসেছে অ-সামরিক পোশাকে। চারপাশে বহু রঙের পোশাক পরা মানুষের ভীড়ের মাঝখানে তার কালো জ্যাকেট, যেন কুয়াশা মাখা জ্যাকেট মনে হয়, আর ঝকঝকে চোখ ধাঁধানো কামিজ গায়ে তার দাঁড়িয়ে থাকা, চারপাশের নানা রঙের মধ্যে তাকে বিশেষভাবে আলাদা করে দেখিয়ে দিচ্ছিল যেন। তানিয়াও তার সামরিক পোশাক বদলে একটা উজ্জ্বল কালো পোশাক পরেছে তাতে তাকে চেকভের *থ্রি সিস্টারস*-এর এক বোনের মত দেখতে লাগছে—একান্ত ভাবে কৃশ মেয়ের মত লাগছে তাকে, খুব রুচিপূর্ণ আর গভীরভাবে কোন কিছুতে পূর্ব মনস্ক।

"কি ব্যাপার বলোত, তানিয়া?"

"ওঃ, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনি জানেন র‍্যালফ কি রকম সোজা আর অনমনীয়। আজকাল আমাদের কাগজে ওর মত চরিত্রের কোন লোককে নিয়ে চলা যে কি কঠিন।

একদল সাংবাদিক, তারা সংখ্যায় অনেক, তারা পেগীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে খুব হৈ চৈ করছিল। পেগী সম্ভ যে ঘোষণা করেছে যে রায়ের বয়ানে কি কথা লেখা আছে, তা যে বলতে পারবে, তা সে যেই হোক, তার সঙ্গেই পেগী বিছানায় শুতে যাবে।

"পেগী বলল, আমি একথা আইন বিষয়ক এক কর্মী যে অনেক খবর রাখে তাকে বলেছি। সে কদিনই আমার পিছনে পিছনে নাছোড়বান্দার মত ঘুরছিল।"

"সে কি বলল, পেগী?"

"সেই শূয়োর! সে বলল যে আগামী পরশু দিন সে আমারা ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহার করবে।"

পরদিন সকালে ওঁরা ঘোষণা করলেন যে আইনের ভাষায় ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র অভিযক্তদের কি বলা হয়। এর পরেও চাপা থমথমে উত্তেজনা যদিও একটু কমেনি। বিচারের রায় কি হবে, আর সেই শুনে অভিযুক্ত আসামীরা সেগুলিকে গ্রহণ করবে কিভাবে? গোয়েরিং দৃঢ় পদক্ষেপে তার আসনের দিকে এগিয়ে গেল। এমনকি সে এমন একটা ভাব করল যেন বেশ আরামে আরাম করার মত করে বসে আছে। অভিনয়? নিশ্চয়ই। তার নাম পড়া হল—হেরমান উইলহেলম গোয়েরিং—আর ইয়ারফোনটা কানের কাছে খামচে ধরে সে কেঁপে কেঁপে উঠল। কেইটেল আগের মতই অনড় থাকল। সে ভেতরে এল, বসে পড়ল, আর সেইভাবে সে বসেই থাকল যেন সে একখণ্ড নিস্পন্দ কাঠ। স্ট্রেইচারের চোখ জোড়া চারদিক ঘুরে ঘুরে গড়িয়ে গড়িয়ে কিছু খুঁজতে লাগল, যেন সে তার নিজের মনটাকেই হারিয়ে ফেলেছে। ফানক-এর মামা সামনে বেড়ার ওপর ঝুঁকে নামান, তার চোখ দুটি কুকুরের চোখের মত বিষণ্ণ। কেবলমাত্র হেস্‌স দেখে মনে হয় সে সম্পূর্ণ শান্ত, এ আত্মবিশ্বাস তার আছে যে তার কোন ভয় নেই, কেননা সে যুদ্ধের সময়টা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে কাটিয়েছে। তাকে দেখে মনে হয় ট্রামে বসে যাওয়া এক লম্বা পথের যাত্রীর মত, যে সময় কাটানোর জন্যে জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। হেস্‌সের ইচ্ছা শক্তি ছিল প্রচুর। সংবাদপত্র সংক্রান্ত অনেক লোক, বিশেষতঃ সংবাদপত্রের মহিলা কর্মীরা দাবী করত যে হেস্‌সের ডুবে থাকা, কালো চোখের যাদু করে দেবার ক্ষমতা ছিল।

সেদিন সাড়া পড়ে যাওয়ার মত ব্যাপার হল প্রতিবাদী আসামীদের

তিনজনের বেকসুর খালাস: ফ্রিটজসচে, প্যাপেন ও শ্চাচট্। বেলিকের ওপর নির্দেশ ছিল তাদের তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেওয়ার। তিনি তাই করলেন। আমরা আর একটি কৌতূহলকর ছোঁয়া লক্ষ্য করলাম। নিজের তীব্র পাশব আবন্দ লুকোতে না পেরে ফ্রিটজস্চে অন্যান্য প্রতিবাদী আসামীদের সঙ্গে করমর্দন করে গেল। প্যাপেন কেবল সামরিক ও নৌবাহিনীর অফিসার ও গোয়েরিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিল। লম্বা, রোগা শ্চাচট সকলের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। তার বুলডগের মত মুখে তাচ্ছিল্যের অভিব্যক্তি। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া নাজী রাজনীতিবিদদের বর্তমান অবস্থার প্রতি করুণা দেখানো প্রয়োজনীয় মনে করল "হিটলারের অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিভা" শ্চাচট।

খালাস পেয়ে যাওয়া প্রতিবাদী আসামীরা সরাসরি প্রেস রুমে গিয়ে তখনই সাক্ষাৎকার দিল। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের কোন কমতি ছিল না, যদিও আমরা এই লঘুচালের মিলনান্ত পালায় যোগ দিই নি। আমরা ঠিকই করেছিলাম, কেননা সেদিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শীঘ্রই শুরু হল। সোভিয়েত বিচারক, যার রায় ছিল অন্য বিচারকদের থেকে আলাদা, তিনি ওই তিনজন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেওয়ার বিরুদ্ধে বললেন। তাঁর নিজের মতামতের পরিষ্কার ভিত্তির ওপর রচিত তাঁর বিবৃতি মুদ্রিত করে বিলি করা হয়। সেই বিবৃতি আমাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের ও আমাদের বন্ধুদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে।

নিমেসিস তাঁর তরবারী তুলে নিয়েছেন, কিন্তু এখনো নামিয়ে আনেন নি। বিরতির পর সেই ব্যাপারটা ঘটবে, শুরু হবে এই ট্রাইবুনালের ৪০৭তম অধিবেশন।

২৮। তরবারী নেমে এল

আমরা সবাই নিজেদের নোট নেওয়ার খাতায় লিখলাম, "১লা অক্টোবর ১৯৪৬, বেলা ২-৫০ মিঃ, ইউরোপীয় সময়। শেষ ৪০৭-তম অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে।"

সেদিন তখনো কাঠগড়া খালি, আর সত্যিই এটা খুব অদ্ভুত দৃশ্য।

আমাদের পুরোন বন্ধু ট্রাইবুনাল কমাণ্ডাণ্ট, কর্নেল এ্যানড্রুস, যার প্রচারের মূল্য সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান ছিল, শেষ অধিবেশনের আগে সে হামেশা প্রেস রুমে হাজির হত। তার চকচকে সাদা শিরস্ত্রাণ, ডাণ্ডিবিহীন চেকোশ্লাভ চশমা, আর তার গোলাপী রঙের মুখে একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যেত প্রেসরুম, পানশালা, বারান্দা—সত্যি কথা বলতে কি, যেখানে সাংবাদিকরা জড়ো হত সেখানেই। ও খুব উত্তেজিত ছিল, খুব বকবক করছিল, আর অনেক কিছু গোপন করছিল, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রায় সম্পর্কে একটি কথাও সে বলবে না, যদিও দেখে শুনে মনে হয় ওটা ও জানত। সে কেবল এই ইঙ্গিতটুকু দিল যে শেষ অধিবেশনে আমরা অস্বাভাবিক কিছু দেখব।

আমাদের নোট বই খুলে, আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে, আমরা অপেক্ষা করছিলাম। বিচারকরা প্রবেশ করলেন। নিজের নিজের নোট লেখার খাতা প্রস্তুত অবস্থায় রেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। তাঁর চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে লর্ড লরেন্স আদালত কক্ষটা একবার দেখে নিলেন ও তারপর সামান্য মাথা নাড়লেন। সম্ভবতঃ এটা কোন সংকেত ছিল। কেননা শূন্য কাঠগড়ার পিছনের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল ও দেওয়ালের মধ্যে যে ফাঁক হল তা দিয়ে বার হয়ে এল গোয়েরিং, তার সঙ্গে ঝকঝকে সাদা শিরস্ত্রাণ মাথায় সামরিক পুলিশ। তাকে পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল তার মুখে গুঁড়ো গুঁড়ো কি লেগে আছে, কোন চূর্ণও হতে পারে।

"দেখো, গতকাল থেকে ও কেমন শিউরে উঠছে আর কুঁকড়ে আছে", পিছন থেকে কেউ মন্তব্য করল।

গোয়েরিং তার ইয়ারফোন লাগিয়ে নিল। লর্ড লরেন্সের পরিচিত কণ্ঠস্বর কথা বলল সেই ইয়ারফোনের মধ্য দিয়েও। লর্ড লরেন্স দণ্ড ঘোষণা করলেন, যদিও তাঁর স্বর যথারীতি শান্ত, তবু সেদিন তা শোনাল বজ্রের মত, "গোয়েরিং, ফাঁসিতে মৃত্যু"। এক মুহূর্তের জন্যে জার্মানী নাজী নং ২ তার হাল্কা মাছের মত চোখে আদালত কক্ষের দিকে নিশ্চল চেয়ে থাকল, ঠোঁট কামড়াতে লাগল, কিন্তু তারপরই সে সামলে নিল নিজেকে। তার মুখের ওপর যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল, সেটা সে মুছে দিল। ইয়ারফোন ছিঁড়ে ফেলল আর ঘর থেকে বার হয়ে গেল। আগের মতই তার পিছনে

দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কর্নেল এ্যান্ড্রুস যে "বিশেষ ব্যবস্থার" কথা বলেছিল, এটাই বোধ হয় সেটা হবে।

হেস্‌স ইংরেজী ভালই জানত। সে যুদ্ধের সময়টা কাটিয়েছিল ইংলণ্ডে, হ্যামিলটনের ডিউকের জমিদারীতে। প্রচার কার্য ও গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রেরিত এই লোকটি সম্পর্কে, যে লোকটি ডিউকের জমিদারীতে খানিকটা অসফল ভাবেই নামে, সেই লোকটির সম্পর্কে ডিউক প্রচুর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। হেস্‌স যখন শুনল "যাবজ্জীবন কারাদণ্ড", তখন তার একটা পেশীও নড়ল না, কেবল অন্ধকার কোটর থেকে তার দুই চোখ ঝলসে উঠল। সে সামরিক ভঙ্গীতে তার গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দ্রুত ফিরল—চলল উল্টো দিকে মুখ করে—বেশ দৃঢ় পদক্ষেপই সে দরজা দিয়ে চলে গেল।

রিবেনট্রপকে দেখাচ্ছিল হাওয়া বের করে নেওয়া চোপসানো একটা রবারের বলের মত—উদাস বিষণ্ণ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থেমে থেমে হাঁটা, তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টান টান, চোখ আধ খোলা। যখন সে জানল যে তাকেও ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তখন কেমন মাথা ঘুরে টালমাটাল হওয়ার মত সে আঁকড়ে ধরল পাটাতন। সে আদালত কক্ষ থেকে বার হল রক্ষীদের কাঁধে ভর দিয়ে, তার পায়ের পাতা মেঝের ওপর ছেঁচড়ে যাচ্ছিল।

কেইটেলকেও দেখাচ্ছিল পুতুলের মত, তবে শক্ত কাঠের পুতুল। সে এল দৃঢ় পদক্ষেপে, যেন কুচকাওয়াজ করছে, তার অতীব ঝকঝকে বুট তুলে পদক্ষেপ করে। একথা বলা যাবে না যে কিভাবে নিজেকে উপস্থিত করতে হয়, তা সে জানত না। "ফাঁসিতে মৃত্যু"। সে আলতো করে তার ঘাড় নাড়ল, যেন সে নিজের ধারণাটাকেই সমর্থন করছে। আর তারপর যেমন ভাবে সে প্রবেশ করেছিল তেমনি কাঠের পুতুলের মত হেঁটে হেঁটে সে বের হয়ে গেল। কেইটল, সত্যিই একজন খারাপ সৈনিক. আর বিচার চলাকালীনও তাকে দেখা গেছে দীন হীনের মত, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যা দেখা গেল, সে যেন নিজেকে অনেকটা সামাল দিতে পেরেছে। কাঠগড়ায় কেইটেলের প্রতিবেশী জোডল, কান খাড়া করে শুনল যে তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পড়া হল। সে ছিঁড়ে ফেলল তার ইয়ারফোন, আর আদালতের উদ্দেশ্যে সক্রোধে বিড়বিড় করে বলতে বলতে বার হয়ে গেল।

কিন্তু সেইসব নাজী আদর্শবাদীরা এবং রাজনীতিকরা যারা সব দেশের জনসংখ্যা হ্রাস আর সব জনসাধারণকে হত্যা করে ফুয়েরারের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল, দেখা গেল এই চরম মুহূর্তে তারাই ব্যবহার করল সবচেয়ে হীন বিপর্যস্তের মত। রোজেনবার্গ তো নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। হান্স ফ্রানক যে ফুয়েরারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে পোল্যাণ্ড থেকে পোলদেরই নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং এটা করবে আরও গতিশীল ও শক্তিমান জনসাধারণের স্বার্থে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে পোল্যাণ্ডে তার অধীনে যে জনসাধারণ আছে তাদের সে কুচি কুচি করে মাংসের কিমা বানাবে, সে দরজা দিয়ে স্খলিত পায়ে টলমল করতে করতে এলো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোন মানুষ যেমন হাঁটে, সে হাঁটছিল সে রকম করে। সে ধাক্কা খেল ডায়াসে। আর মৃত্যুদণ্ড শুনে সে নাটকীয় ভঙ্গীতে তার দুই হাত ছুঁড়ে দিল। পরে আমরা শুনেছিলাম যে আতঙ্কেও নিজের প্যান্ট ময়লা করে ফেলেছিল।

জুলিয়াস, স্ট্রেইচার, এ সেই দানব, যে সব মেয়ে ইহুদীকে ভালবাসার সাহস করেছিল, এই দানব সেই মাথা কামানো মেয়েদের ছুঁড়ে দিয়েছিল উন্মত্ত সামরিক উন্মাদনাগ্রস্ত জনতার হাতে। এই লোকই ছিল ন্যুরেমবার্গে ক্ষতিকর সব সমাবেশ আর মশাল মিছিলের সংগঠক ও নায়ক। কোটরের মধ্যে তার চোখ ঘুরছিল, তার কপালের ওপর দপ দপ করছিল শিরা-উপশিরা, আর তার ঠোঁট বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছিল। একেবারে নক্কারজনক।

বিচারকের রায় পড়া হয়ে গিয়েছিল। তার ফল হল এই যে গোয়েরিং রিবেনট্রপ, কেইটেল, রোজেনবার্গ, কালটেনব্রুননার, ফ্রিক, ফ্র্যানক স্ট্রেইচার, সকেল, জোডল, সিয়েসস-ইনকোয়ার্ট, আর অনুপস্থিত মারটিন বোরমান (যে সম্ভবতঃ এখনো লুকিয়ে আত্মগোপন করে আছে) এদের প্রতি ফাঁসির আদেশ হয়েছে। হেসস, ফানক আর রেইডারের প্রতি আদেশ হয়েছে আজীবন কারাদণ্ডের। নিউরাথ আর ডোয়েনিটজ-এর প্রতি আদেশ হয়েছে যথাক্রমে পনেরো ও দশ বছর কারাদণ্ডের।

এই হল পুরো হিসাব। যদিও এ ব্যাপারে হিটলারের অধীনস্থরাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, আসল গুরুত্বপূর্ণ ছিল নাজীবাদ ও নাজীবাদের ধ্যান ধারণা। নাজীবাদের সমস্ত আবরণ খুলে তার সমস্ত কুৎসিত দিককে

খুলে মেলে পৃথিবীর সামনে রাখা হয়েছে, সারা পৃথিবী দেখবে বলে। প্রধান বিচারপতি জ্যাকসন যেমন বলেছিলেন, বিগত নয় মাস সকলেই আহার নিদ্রা ভুলেছিল। তারা শুনছিল ইউরোপের অন্যতম সব নানা সুসভ্য দেশে তেরো বছরের নাজী শাসনের বিভীষিকাপূর্ণ সব গল্প। সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যমে এই উন্মোচন সারা পৃথিবী জেনে গেছে।

এই প্রশ্ন অবশ্য থেকেই গেল। নাজীবাদকে কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে? নাকি তাকে সাময়িকভাবে কারাদণ্ড দেওয়া হল? কেবল ভবিষ্যতই এ কথার উত্তর দিতে পারে।

ইতিহাসের গতিপথ যাই হোক না কেন, আজকের এই তারিখ নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। এবং এই তারিখ স্মরণীয় হওয়া উচিত। প্রধান যুদ্ধপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক আদালত তার দণ্ডাদেশ ঘোষণা করল বেলা ৩-৪০ মিনিটে, ইউরোপীয় সময়, ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬।

২৯। বিচারকদের রায় গৃহীত

সকালে আমরা জানতে পারলাম যে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ, জার্মানীতে অধিষ্ঠিত সম্মিলিত বাহিনীর নিয়ন্ত্রক কমিটি বার্লিনে এক সভায় মিলিত হয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিচারের ব্যাপার শেষ। এখানে করার মত আমাদের অর্থাৎ সাংবাদিক-দের আর কোন কাজ নেই। তবুও, আমরা নিজের নিজের আলাদা রাস্তায় চলে যাই নি। প্রেস ক্যাম্পে সব কটা ঘর ভর্তি, খাবার ঘরে একটা জায়গাও খালি নেই। পানশালা ভীড়ে ঠাসা। সেখানে প্রাপ্য ককটেলের যে তালিকা তাতে ডেভিডের নবতম অবদানটি লাল অক্ষরে দাগান "জন উড।"

আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর সার্জেন্ট জন উড, প্রেস ক্যাম্পের অধুনাতম একজন বিখ্যাত লোক। আর প্রেস ক্যাম্পে উল্লেখ্য কিছু হলেই তার একটা দ্রুত প্রকাশ সব সময় আছেই। উড পেশায় একজন সৈনিক। আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনালের আদালত কার্যকরী করার জন্য; সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেই 'কাজ করতে চাওযায রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে

গেছে। আমি উডকে দেখেছিলাম—ছোট খাটো, স্বাস্থ্য মজবুত বাঁধুনির লোক, নাকটা বঁড়শির মত আর থুতনির নীচে তিন জায়গায় মাংসল ভাঁজ। সে খুব চটপটে ভঙ্গীতে ডাইনে বাঁয়ে নিজের নাম সই দিচ্ছিল। সকলের দিকে তাকিয়ে সে বড় করে হাসছিল। ছবি তোলানোর জন্যে সে ক্যামেরার সামনে ভঙ্গী করে দাঁড়াচ্ছিল। একজন চতুর সাংবাদিক তার একটা ছবি তোলে—আমি জানি না, ঠিক কিভাবে এটা সম্ভব হল—পশমের মত কোন কিছু দিয়ে জট পাকানো, ভারী মোচড়ানো দড়ির জড়ানো।

ওর যা করণীয়, তা দরকারী। এমনও হতে পারে যে আদেশ মেনে নিয়ে ও হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই কাজ করতে রাজী হয়েছে। কিন্তু তাকে ঘিরে প্রচার এমন ধুঁইয়ে উঠল যে, সব মিলিয়ে সে এমন একটি নাম ও চেহারা হল, যা সুখকর নয়। "জন উড" ককটেলের জন্য খদ্দেররা মোটেই কাড়াকাড়ি করল না। বাজারের ওঠা নাম সম্পর্কে সদা স্পর্শপ্রবণ ডেভিড নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে সে ভুল করেছে। ডেভিড তাড়াতাড়ি তার বিজ্ঞাপিত ককটেলের তালিকা থেকে ওটাকে বাদ দিয়ে দিল।

ফাঁসির দিন ধার্য হল ১৬ই অক্টোবর। উত্তেজনায় ভন ভন করছিল প্রেস ক্যাম্প। যদি ইচ্ছে হলেই করা যেত, তাহলে প্রত্যেকে দৌড়ে চলে যেত, জেলখানার বিচার আঙিনায়। যাই হোক, জেলখানার এই উঠোন, যেখানে দণ্ডাদেশ দণ্ডিতের ওপর কার্যকরী হবে, সেটা খুব বড় ছিল না। ঘোষণা করা হয়েছিল যে আগে থেকে তৈরী করা তালিকা অনুসারে কয়েকজন সাংবাদিককে ভেতরে যেতে দেওয়া হবে। সোভিয়েত সংবাদপত্র-সমূহকে দুটি আসন দেওয়া হয়েছিল। একটি আসন একজন সাংবাদিকের ও অন্যটি একজন ফটোগ্রাফারের জন্য। আমরা একমত হয়ে স্থির করলাম যে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি বোরিস আফানাসিয়েভ—সুশিক্ষিত শ্রদ্ধেয় একজন সাংবাদিক, ন্যুরেমবার্গে সে গত নয় মাস কাটিয়েছে—যাবে আর যাবে *প্রাভদার* ফটোগ্রাফার ভিক্টর তিয়োমিন, যাকে বাদ দেওয়া অসম্ভব, কেননা তাকে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে সে তখুনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

যদিও আমি আমার সময়ে বেশ কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর ফটোগ্রাফারকে দেখেছি, এমন আর একজনকেও আমার জানা নেই যে প্রয়োজনে কঠিনতম পরিস্থিতির মধ্যে ছবি নিতে পারে ও ঠিক সময়ে কাগজে সে ছবি বার

করতে পারে। এমন এমন বাধা সে পার হয়ে যেতে পারে, যেসব বাধা নিজেদের মাথায় ডি'আরটাগানান বা থ্রি মাসকেটিয়ারসকেও প্রতিহত করত।

যুদ্ধের সময় তিয়োমিনের সাংবাদিক জীবনের কৃতি সমভাবে সার সার সাফল্য ও অসাফল্যের খতিয়ান। পালা করে তার পদোন্নতি ও পদাবনতি হয়েছে। *প্রাভদা* তাকে ছেঁটে ফেলেছে, আবার পুনর্নিয়োগ করেছে। সব জায়গায় তার সুখ্যাতি ছিল উৎসর্গীকৃত প্রাণ একজন সাংবাদিক হিসেবে, যে একটা গল্পের জন্য যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত। ভাগ্যের এই নানা ওঠা নামা, মোচড় সত্ত্বেও যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিয়োমিন *প্রাভদার* হয়ে কাজ করছে। নিজের কাগজের নিজস্ব ছবির জন্য সে সব সময় ঘাড় পেতে দিয়ে প্রস্তুত ছিল।

রেইখ শাসন পরিষদ ভবনে সোভিয়েত পতাকা তোলার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের ছবি বহু ফটোগ্রাফার নিয়েছিল কিন্তু কেবল ভিক্টর তিয়োমিনই পেরেছিল তার ছবি মস্কোতে ঠিক সময় পাঠাতে। যদিও এটা করার জন্য মারশাল ঝুকভ, যিনি খুবই কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ও অনড় ধরনের লোক ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে একটা বিমান পাওয়ার জন্য তাকে ধাপ্পার আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

তিয়োমিন হল একমাত্র ফটোগ্রাফার, যে ঘটনাস্থলের ছবি নেওয়ার জন্য বিধিবদ্ধ যে দূরত্ব রাখার কথা তা অগ্রাহ্য করে। দ্রুতগামী আমেরিকান রণপোতে 'দি মিশওরি'তে যখন শর্তাধীন আত্মসমর্পণ পত্রে জাপানীরা সই করছিল, তখন সেই ঘটনাস্থলের ছবি নেওয়ার জন্য সে বিধিবদ্ধ দূরত্ব থেকে ছবি নেওয়ার নিয়ম ভেঙে ফেলে। আমেরিকান নৌ বিভাগীয় অফিসাররা তাকে রণপোত থেকে প্রায় ফেলে দিয়েছিল আর কি! এমনও হতে পারত যে সেই সমুদ্রে সে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা লম্বা ডুব দিয়েছে। কিন্তু তার বদলে তার নেওয়া ছবি সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে আবার ছাপান হয়। এরকম একজন লোককে ন্যুরেমবার্গ বিচারের শেষ প্রত্যক্ষ করার অধিকার থেকে কে বঞ্চিত করতে পারে?

এর পর যে ঘটনা ঘটল তার বর্ণনা ভিক্টর তিয়োমিনের দেওয়া বিবৃতি অনুসারে। আমি কেবল তার অতি বাস্তব কোন কোন খুঁটি নাটির বর্ণনা বাদ দোব। আর তিয়োমিনের খুব রঙ চঙে, আর বড্ড বেশী নোনতা ভাষার

ঘরগ্রামের মাত্রা কিঞ্চিত কমিয়ে দেব। নীচে যেমন লেখা আছে, এভাবে তিয়োমিন জানাল কি ঘটল।

"মিত্র শক্তির চারপক্ষের প্রতি পক্ষ থেকে দুজন করে মোট আটজন সাংবাদিককে ফাঁসি চাক্ষুষ করার জন্যে নেওয়া হয়। আমরা এক জায়গায় হই, আর সেই কর্নেল এ্যানড্রুস বিচারালয়ে একটা বিশেষ ঘরে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, যে ঘরে যাওয়ার অনুমতি আমাদের আগে কোনদিনই দেওয়া হয়নি। এ্যানড্রুস আমাদের বলে দিল, যে ফাঁসি চলার সময় আমরা আমাদের যাকে যে জায়গা দেওয়া হবে, সেই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরতে পারব না আমরা যেন কোন কথা না বলি—সম্পূর্ণ ও অখণ্ড নীরবতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

"তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে, নীচে আমাদের কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি আমিও আগে সেখানে কোনদিন যাইনি। ব্যাপারটা খুবই আগ্রহকর। সেখানে একটা বারান্দা। বারান্দার দুপাশে দরজা! প্রতিটি দরজায় ভারী বড বড় তালা। ভেতরের কুঠরিগুলোতে আলোর জন্যে যেমন বাতি থাকে, জ্বলছে। ভেতরে দেখার জন্যে অবশ্য গর্ত আছে। "সংবাদপত্রের ভদ্রমহোদয়গণ, এখান দিয়ে দেখুন......" ওই এগারো -- লোক, তারা যে সেদিনই পটল তুলতে যাচ্ছে এই কথা ওই এগারোজন জানতো কিনা আমি জানি না, তবে জেল কুটরিতে ওরা একেবারে নেংটি ইঁদুরের মত শান্ত হয়েছিল। কেউ পড়ছিল। কেউ কিছু লিখছিল। রিবেনট্রপ মনে হল একজন পাদ্রীর সঙ্গে কথা বলছে। কেউ দাঁত মাজছিল, দেখে মনে হয় যেন সে শুতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।...

"আমরা হাঁটতে লাগলাম ও গর্তের মধ্য দিয়ে দেখতে লাগলাম দেখলাম। তারপর একটা সংকেত বেজে উঠল। আমাদের কর্নেল আমাদেরকে সেই জেলখানা থেকে বার করে নিয়ে খোলা হাওয়ায় নিয়ে এল। তারপর নিয়ে গেল একটা ছোট্ট বাড়িতে, কোন ব্যায়াম, মল্লক্রীড়া এ সবের জায়গায়, তাই মনে হল জায়গাটা দেখে...সেই ব্যায়ামাগার খালি। সেখানে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তিনটে সবুজ উঁচু মাচান করা, বড বড বাক্সের মত। সেগুলিতে ওঠবার ধাপ লাগানো। আমি গুনে দেখলাম, তেরো। সেগুলোর ওপর থেকে ফাঁসির ফাঁস ঝুলছে। ফাঁসীমঞ্চের সামনে চারটি দেশের সৈন্য-বাহিনীর প্রতিনিধিদের বসবার আসন, তাদের পিছনের আসন দোভাষীদের।

সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে। বোরিস আফানাসিয়েভ ও আমি নিজেদের জন্য চারটি টেবিলের একটি বেছে নিলাম। আমরা যখন চারদিকে সব কিছু ভাল করে দেখে নিয়েছি তখন কর্নেল আবার আমাদের বাইরে নিয়ে গেল ও অপেক্ষা করতে বলল। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে ভিতরে লোকেরা দৌড়োদৌড়ি করছে, আমরা তাদের গলাও শুনতে পাচ্ছিলাম। ওখানে কোন এক ধরনের হৈ চৈ হচ্ছে। আমরা অপেক্ষা করতেই থাকলাম। প্রায় ১টা বাজার সময় আমাদেরকে আবার পথ দেখিয়ে যেখানে ফাঁসির মঞ্চ, সেখানে আবার নিয়ে যাওয়া হল। কর্নেল স্পষ্টতই অত্যন্ত উত্তেজিত। আমরা অনেক গলা শুনতে পেলাম বলছে, 'গোয়েরিং, গোয়েরিং...' তার কি হয়েছে? সে কি পালিয়েছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করব এমন কেউ নেই। তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা হল রিবেন-ট্রপকে—পথ দেখিয়ে আনা ঠিক নয়, টেনে আনা হল। দেখে মনে হল ও পাগলা হয়ে গেছে। আতঙ্ক তার মনের মধ্যে কিছু করেছে। তাকে তোলা হল ফাঁসীর মঞ্চে, ফাঁসের তলায়। একজন পাদ্রী উঠে তার কাছে গিয়ে কানে কানে ফিস ফিস করে কিছু বলল। সার্জেন্ট জন উড তার মাথায় একটা ঢাকা পরিয়ে দিল, তারপর মাথার ওপরের ফাঁস লাগিয়ে দিল। তারপর টেনে দিল লিভার। ওরা ওদের ফাঁসিতে ঝোলাল দক্ষতার সঙ্গে, আমাদের লোকজনদের নাৎসীরা যেভাবে ফাঁসিতে লটকে ছিল সেভাবে নয়। ওরা ফাঁস লাগিয়ে লিভার টেনে দিলে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ফাঁসির মঞ্চের নীচে, পাটাতনের মধ্যে যে ফাঁক আছে তাতে চলে যায়, কেমন তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তা তুমি দেখতে পাবে না। তুমি কেবল দেখতে পাবে ফাঁসির দড়ি কেঁপে কেঁপে উঠছে। উড নিশ্চয়ই বেশ ভালমত অভ্যাস করে কাজটা মকসো করেছে, কেননা সে কাজটা করল যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে। দেড় ঘণ্টা সময়ে সে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দশ জনকে ফাঁসি দেওয়ার কাজ শেষ করল—সে একজন সত্যিকারের ওস্তাদ। যখন তারা পাটাতনের নীচে খাদের মধ্যে ঝুলে স্থির হয়ে গেল, তাদের গলার ফাঁস খুলে দেওয়া হল। একজন চিকিৎসক ঘোষণা করল যে তারা মৃত। তখন তাদের এক পর্দার আড়ালে কালো বাক্সে শুইয়ে দেওয়া হল। তাদের নাম লেখা একটা করে টিকিট রাখা হল তাদের বুকের ওপর। যখন

এইসব করা হয়ে গেল, তখন সাংবাদিকদের আবার দেখতে ও ফটো নিতে অনুমতি দেওয়া হল। আমরা দেখলাম যে যদিও দশ জনকে ফাঁসিতে ঝোলান হয়েছে, সেখানে শুয়ে আছে এগারো জন—গোয়েরিং সহ।"

ভিক্টর ভিয়োমিনের মুখের কথা দিয়ে গল্পটা আমি বললাম। এর সঙ্গে আর কি বা যোগ করা যেতে পারে? কেবল এটাই বলার যে সব সত্ত্বেও গোয়েরিং ফাঁসির দড়ির ফাঁসকে শেষ পর্যন্ত ঠিকই ফাঁকি দিতে পারল। কিভাবে যে এই ঘটনা ঘটল তা সঠিকভাবে কখনই জানা যায় নি। জানা যায় নি হিটলারের ডান হাত এই লোকটিকে ফাঁসি থেকে রেহাই পেতে কে সাহায্য করল। সারাদিন, প্রাতঃরাশের সময় থেকে নৈশ আহারের সময় পর্যন্ত নানা গুজবে ভন ভন করতে লাগল প্রেস ক্যাম্প। এই কেবল নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত লোকেদের কাছে কর্নেল এ্যানড্রুস যখন জানিয়ে দিল যে তাদের ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন না-মঞ্জুর হয়েছে, সে রাত্রে প্রায় ১০টার সময় যে রক্ষীটি গোয়েরিং-এর কুঠরির ওপর নজর রাখার কাজে ছিল সে লক্ষ্য করল যে বন্দী বড় বেশী স্থির ও অনড় হয়ে তার পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে। আপাত দৃষ্টিতে এতে বন্দীদের পালনীয় যেসব নিয়ম আছে তা লঙ্ঘিত হয়েছে বলা চলে না। বন্দীদের পালনীয় নিয়মে যেমন, বন্দীর হাত কম্বলের ওপরে রাখা। যাই হোক, সেই শান্ত্রী, সেই কুঠরি থেকে যেন শ্বাস কষ্টের গোঙানির মত শব্দ শুনতে পায়। সে তখন কর্তব্যরত তার ডিউটি অফিসারকে ডেকে পাঠায় ও তারা দুজন সরজমিনে দেখার জন্যে ভিতরে যায়। যা দেখে, তা একটা প্রাণহীন দেহ। বন্দীশালার চিকিৎসক সায়নাইড বিষের বড়ি খেয়ে গোয়েরিং-এর তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানান।

লি-র আত্মহত্যার পর যে বন্দীশালা এত কঠিন পাহারায় ঘিরে রাখা হয়েছে, সেখানে হাজত ঘরে চোরা পথে বিষ এল কি করে? ওই বিষের বড়ি কে এনেছিল? আপাততঃ এটা গোপন থেকে গেল। এরকম বলা হল যে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের কেউ একজন ওই প্রাণঘাতী বিষ বড়ি এনে দেয়। আবার এরকমও শোনা গেল যে তার স্বামীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে আসার সময় এমমি গোয়েরিং এটা নিয়ে আসে ও শেষ চুম্বন করার সময় সে তার নিজের মুখ থেকে এই বড়ি তার স্বামীর মুখে চালান

করে। এ অসম্ভব। তাছাড়া তাদের দুজনের মাঝখানে হাল্কা, স্বচ্ছ প্লেক্সি কাঁচের ব্যবধান ছিল। এটা সম্ভব যে গোয়েরিং-এর পাহারায় থাকা কোন সৈন্য তাকে ওই বিষ বড়ি দিয়েছে। গোয়েরিং-এর ধনী বন্ধুরা সেই সৈনিককে ঘুষ দিয়ে এই কাজ করাতে পারে। আসল ঘটনা যে কি ঘটেছিল তা গোপন থেকে গেল। ওই বিষাক্ত মাকড়সা কি করে মরল তাতে অবশ্য সত্যি সত্যিই কিছু যায় আসে না, যাই হোক, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে বিষাক্ত মাকড়সা আর কোনদিনই কাউকে আবার কামড়াতে পারবে না।

দণ্ডাদেশ কার্যকরী হয়ে যাওয়ার পর ন্যুরেমবার্গে এক ধরনের অদ্ভুত ব্যবসা শুরু হল। দণ্ডিতের ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে যে রজ্জু ব্যবহৃত হয়, সে দড়িগুলো বিক্রী করার জন্য আনা হল। মধ্য যুগ থেকে ন্যুরেমবার্গে নাকি এই ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ফাঁসির দড়ি সুখ নিয়ে আসে।

লোকেরা বলতে লাগল, যে তার ভাল কাজের বিনিময়ে জন উড, কর্নেল এ্যাড্রুসের কাছে অনুরোধ করে এই দড়িগুলো চেয়ে নেয়, আর সেগুলো নিয়ে ভালো ব্যবসা করে। দড়িগুলো টুকরো টুকরো করে বিক্রী করা হয়—বড়, মাঝারি, আর ছোট। দাম অনুযায়ী আর কি। সসেজের মত ভাগে ভাগে দড়ি টুকরো কাটা হয়। এই ব্যবসায়ে প্রচুর খরিদ্দার ছিল, বিশেষতঃ গ্রাণ্ড হোটেলের বাসিন্দারা যাদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকান—তারা। উডের নিয়োজিত দালালরা প্রেস ক্যাম্পেও ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরা যে দড়ি নিয়ে এসেছিল তার ব্যাস একেবারে আলাদা। ফটোতে উডের হাতে পশম ইত্যাদির জট পাকানো যে দড়ি দেখা যায় তার থেকে এ দড়ি অন্যরকম। সেই দালালদের ভাঁওতা ধরা পড়ে গেল। তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সাধারণভাবে দড়ির ব্যবসায় এমন বোল বোলাও হয়েছিল, যে ফাঁসীমঞ্চের ঘাতক একজন ধনী লোক হয়ে দেশে ফিরবে, আর আগামী অনেক দিন ন্যুরেমবার্গে আর কোন দড়ি থাকবে না। কিন্তু তাতে কি আমেরিকানদের প্রিয় কথাই হল "ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা।"

মস্কো ফিরে যাবার পথে আমি এই সব ভাবছিলাম। প্রেস ক্যাম্পে আমাদের যারা বিদেশী সহকর্মী, জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সকলকে

আমরা উষ্ণ বিদায় সম্ভাষণ করছিলাম। সুখ সম্পর্কে তাদের ধারণা আমাদের থেকে আলাদা। পৃথক আমাদের কাজ করার ধরনও। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গত নয় মাস আমরা ভালো বন্ধুর মত থেকেছি। সেই সুখী দার্শনিক, এরিখকের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার খারাপ লাগছিল। সেই বিষণ্ণ র‍্যালফ আর তার ঐ রুশ তানিয়া, যে রুশ ভাষার কেবল চারটি শব্দ জানতো—"হ্যালো", "ভাল," "ভোদকা" আর "বন্ধু" এদের কাছ থেকে বিদায় নিতে মন খারাপ লাগছিল। আর অবশ্যই পেগী, হল্লাবাজ, খরচে পেগী যে আমাদের সকলের গালে টকটকে লাল বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়েছে এবং উৎসাহী কনে'ল এ্যানড্রুস, যে গোয়েরিং-এর ফাঁসীর ফাঁস এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি, আর প্রেস-ক্যাম্পের অধিকর্তা, লম্বা ছিপ ছিপে মেজর ডীন, নিজে আমাদের কাছে বিদায় নেবার সময় সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে বললেন, "তোমাদের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়বে।" আর অবশ্যই কুর্ট। কুর্ট আমাকে তার মার হাতে তৈরী ছুঁচ সুতোর কাজ করা টেবিলে মুখ মোছার তোয়ালে দিয়েছিল, আমার নিজের কাছে রাখার জন্যে, তাতে সুতো তুলে লেখা "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন"। এই কথাগুলো তিনি হয়তো বুঝতে পারেননি, কিংবা ভুলে গিয়েছিলেন যে নাজী সৈন্যরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে তখন মস্কো যাবার পথে তাদের কোমর বন্ধনীতে, এই কথাগুলো লেখা ছিল। সাধারণ জার্মান মহিলা ক্লারা, তাঁর অবশ্যই নিজের ভগবান আছেন, যে ঈশ্বর ভালো যিনি শান্তি ভালোবাসেন, যিনি ঘর সংসারের ভগবান।

উড়ন্ত সামরিক পরিবহণ বিমান, যা আমাদের সাংবাদিকদের বাড়ি নিয়ে চলেছে তার ভিতরে, বাক্স আর আইনের দলিল পত্রের মধ্যে বসে আমি এখন গত নয় মাস আবার ফিরে দেখছি। যে বিচার হতে যাচ্ছে তার ভবিষ্যৎ ও সেই বিচারের শেষ সম্পর্কে যে দিন জিওরজি দিমিত্রভ অবতারের মত আগাম ঘোষণা করেন সেদিন থেকে, শেষ দিনের ঘটনা পর্যন্ত, যেমনটি আমাদের কাছে অক্লান্ত ও অদমনীয় ভিক্টর বিয়োমিন বলেছে।

হঠাৎ, আমার আবার স্তালিনগ্রাদকে মনে পড়ে গেল। বরফে ঢাকা একটা বাড়ি যা বোমার ঘায়ে বিধ্বস্ত, সেই বাড়ির শীতে জমে যাওয়া

সব চেয়ে নীচের তলা। বাড়িটা সেই জেলায়, যে জেলাকে রক্ষা করার লড়াই করেছিল, স্তালিনগ্রাদ হীরো, আলেকজান্দার রেয়াদিমত্‌সেভ-এর অধিনায়কত্বে গার্ডস ডিভিসন। তখন নভেম্বর মাসের শেষের দিক। ভোলগা থেকে বয়ে আসছিল উত্তুরে বাতাস। সেই বাড়ির নীচের তলার দেওয়াল-গুলোর ভিতর পর্যন্ত ভিজে হিম জমানো। অন্ধকারে দেওয়ালে লেগে জমানো কুয়াশা সাদা সাদা ঝকঝকে দেখাচ্ছে। দূরের কোণ থেকে ভেসে আসছিল আহত মানুষের গোঙানি। তাদের তখন সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। শীতের তুষার পাতে ভোলগা কেবলই পুরু হচ্ছে। তার চলমান বিশাল সব রকমের চাঁই ভেঙে কদাচিৎ দু একটি মোটর বোট যায়। সেই ঘরের এক কোণে, এক ধরনের মাদুরের ওপর শুয়ে আর আমার ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেটটা গায়ে দেবার চেষ্টা করে, আমি তখন ঘুমোবার চেষ্টা করছি। আমি ঘুমোতে পারছিলাম না। চারদিক ভীষণ, ভীষণ রকম নীরব। এই সরু জমির ফালি যা নদী ও অগ্রবর্তী জার্মান বাহিনীর মধ্যে পড়ে রয়েছে, যেখানে ক্রমাগত ও অবিরাম গোলা বর্ষণের আওয়াজে কান অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে এমন নিথর নীরবতা খারাপ ও বিচলিত হবার মত সংকেত।

শুয়ে শুয়ে সেই নীচেতলার ঘরের দূর কোণের দিকে আমি দেখছিলাম। সেটা কারুকার্য করা একটা বিরাট লেখবার টেবিল—কি করে যে ওটা এই নীচের তলার ঘরে এল তা যে কারুর অনুমানের ব্যাপার। ধোঁয়া উঠছিল *কাতিয়ুশা* থেকে—এটা হল বোমার খোলকে পিটিয়ে পাত করে নিয়ে করা এক ধরনের লম্ফ। টেবিলে একজন লোক কাজ করছে। লোকটি রোগা ও পাণ্ডুবর্ণ। তার বড, গভীর, কালো চোখ। কোট গায়ে সেই লোকটি অখণ্ড মনোযোগে লাল রঙের পার্টি কার্ডে কিছু লিখে যাচ্ছে। দুটি অসমান থাকে পার্টির লাল কার্ডগুলি তার সামনে রাখা। লেখা হয়ে গেলে সে এক একটা কার্ড এক থাক থেকে অন্য থাকে চালান করছিল। তারপর সে দুই হাতের পাতা ঘষে, তাতে জোরে ফুঃ দিল। ও ওর জমে যাওয়া আঙুল গরম করতে চাইছে। আমি জানতাম যে উনি হলেন পার্টি দলের সম্পাদক, রোগা আর সব মিলিয়ে খুবই অসামরিক দেখতে একজন মানুষ।

শেষ পর্যন্ত, উনি কাজ শেষ করলেন। তিনি তাঁর কার্ডগুলি গুছিয়ে নিলেন ও সামনে রাখা ধাতুর বাক্সের ঢাকা চাপড়ে বন্ধ করলেন। তাঁর

পায়ে কেন্টের জুতো, তিনি নিঃশব্দে হেঁটে আমার কাছে এলেন ও আমার কোট যেটা একপাশে পড়েগিয়েছিল সেটা ঠিকভাবে সোজা করে আমার গায়ে ঢেকে দিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কি ঘুমোচ্ছেন? কোন কারণে আজ সবকিছু বড় বেশী চুপচাপ। ওরা যদি গুলি গোলা বন্ধ করে থাকে, তার মানে ওরা কোন মতলবে আছে।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। কাশলেন। শুকনো কাশি। তার ফুসফুসে কোন গোলমাল হয়েছে। কিন্তু কি যে হয়েছে তা তিনি কাউকে বলবেন না। তবু যখনই তিনি কাশতেন তখনই তিনি ইচ্ছা করে তাঁর নিজের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতেন আর দূরের কোণে চলে যেতেন থুতু আর কাশির সঙ্গে বের হয়ে আসা শ্লেষ্মা ফেলার জন্যে। এর থেকে আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারতাম যে যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা উদ্বেগের।

"এই সপ্তাহে আমাদের বাহিনীর এগারো জন কমিউনিস্টকে পার্টি হারিয়েছে। আপনি জানেন, এ সপ্তাহে কতজন সভ্য হয়েছে পার্টির? ষোল জন। এগারো জন হারানো, ষোলজন পাওয়া—এই হচ্ছে ফল।" তিনি কাশির জন্যে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, উঠে দাঁড়ালেন, সেই নীচের তলার ঘর ছেড়ে বাইরে গেলেন থুতু কফ ফেলার জন্য। ফিরে এসে যেখানটিতে আগে বসেছিলেন, সেখানে বসতে বসতে বললেন, "নাগরিক জীবনে আমি একজন ঐতিহাসিক। সম্প্রতি, আমি প্রায়ই ভেবেছি যে প্রাচীনকাল থেকে কত নানা দল আর পার্টিরই না অস্তিত্ব দেখা গেছে। সেই সমস্ত দল বড় হয়েছে। সুসংহত হয়েছে, চড়চড করে বড হয়েছে, এইসব হয়েছে যখন সাফল্যের দোলায় আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে পার্টি এগিয়ে গেছে তখন। হয়েছে যখন সেই পার্টির সভ্য হওয়া মানেই জীবনে উন্নতি আর সাফল্য। যেই সাফল্যের খতিয়ান কমে সেদিক থেকে পতন আরম্ভ হল, অমনি সেইসব দলও ভেঙে পড়ল। ইতিহাসে এরকম কত অজস্র দৃষ্টান্তই না রয়েছে।

"আমাদের জন্যে অবশ্য যখন থেকে পৃথিবী শুরু হয়েছে, এর ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে—আমি একজন ঐতিহাসিক হিসেবে বলছি। আমরা এখন যে অবস্থায় আছি এর থেকে কঠিন ভাগ্য আর কোথায় হতে পারে: চারদিকে অবরুদ্ধ অবস্থায় লেনিনগ্রাদ ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছে। রাশিয়ার ঠিক হৃদপিণ্ডের মাঝখানে ভোলগার তীরে তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জার্মানরা। আমাদের শিল্প কারখানার অর্ধেক আর ছটা সাধারণতন্ত্র তারা দখল করে

করেছে। আমরা পেয়েছি উপবাস, শীত আর নিরানন্দ। তবু দল বেড়েই চলেছে। যুদ্ধে সসম্মানে মারা গেছেন এগারো জন কমিউনিস্ট, আর ষোলজন পার্টির সভ্য হবার জন্য আবেদন করেছে। তুমি এর থেকে কি বোঝ? আমাদের শুধু মাত্র অঙ্কের হিসেবে বা অঙ্কের ভাষায় নয়, এইসব লোকেদের নিয়ে আমাদের গান বাঁধা উচিৎ।"

এইসব কথোপকথন আমার মনে পড়ে গেল। সেই ভাষা, স্তালিনগ্রাদ বাড়ির নীচের তলায়, স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের অন্ধকারতম সেইসব দিন, ন্যুরেমবার্গ থেকে মস্কোতে বাড়ি যাবার পথে আমার মনে পড়ল। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই কুয়াশা-তুষার মাখা ন্যাড়া নীচের তলার ঘর। আহত লোকেদের গোঙানি আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। আর শুনতে পাচ্ছিলাম সেই পার্টি সম্পাদকের ভাঙা ভাঙা গভীর গলা। তার রোগা, প্রদীপ্ত মুখ, আর তার বড় বড় জলজলে চোখ আমার মনে আছে। আমার কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছিল কিভাবে আমরা সোভিয়েতের জনসাধারণ লড়াই করেছি আমাদের ভূমির জন্য, আদর্শের জন্য। কেবলই মনে পড়ছিল যখন আমাদের পার্টিকে ঘিরে দুর্ভাগ্যের ছায়া নেমে এসেছে, তখনই কিভাবে সৈনিকেরা যে মরণপণ যুদ্ধে মৃত্যুই একমাত্র নিয়তি, সেই যুদ্ধে যাওয়ার আগে আমাদের পার্টির সভ্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

আমার মনে পড়ে গেল যে পাঁচিলের গর্তে শত্রুর কামানের গোলা রাখার জায়গায়, নিজেদের শরীর পেতে শুয়ে পড়ে কিভাবে আমাদের সৈন্যরা পার্টির সম্মানে যুদ্ধনাদ তুলেছে। মনে পড়ে গেল মস্কোর সেই ছোট্ট স্কুলের মেয়েটিকে তার গলার চারদিকে ফাঁস বাঁধা অবস্থায় শত্রুর প্রতি তার ঘৃণা আর করুণার কথা বলে, শত্রুকে কালিমালিপ্ত করেছে। মনে পড়ে সেই স্কুলের মেয়েটি ঘোষণা করেছিল যে তার দেশের জনসাধারণের চূড়ান্ত ও চরম বিজয় হবেই।

ন্যুরেমবার্গ? জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী বিচারাধীন যে আঠারোটি সোপান বিশেষ মানুষ, তাদের একজনও তাদের আদর্শের সমর্থনে, যে আদর্শ নাজীদেরকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করার পথে চালিত করেছিল, যে আদর্শ পশ্চিম ইউরোপকে দিয়েছিল যুদ্ধের চাবুকের ভীষণ কষ্ট, সেই আদর্শবাদের পক্ষে একটি কথাও তারা কেউ বলল না। এমনকি মৃত্যু যখন তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে, তখনও

তাদের শেষ কথা ছিল মিথ্যা, আর কৌশলে সব কিছু এড়াবার চেষ্টা, এই দেখানোর জন্যে যে তাদের ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, তারা অজ্ঞান। তাদের পার্টি, তাদের দল, যার সামরিক শক্তি প্রতিবেশী দেশগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল একটা বিষাক্ত ধোঁয়া আর কুয়াশার মিশ্রণের মত তা উধাও হয়ে গেল। অন্ততঃ ব্যাপারটা এখানকার মত তাই। যদিও ইয়ারো-স্লাভ গ্যালান আমায় ঠিক কথাই বলেছিল যে একটা মন্দবীজ ধরিত্রীর মধ্যে কয়েক দশক ধরে শুয়ে থাকতে পারে, শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে পারে অনুকূল জল হাওয়ার……

মস্কো ফেরার পথে, যখন আমি এইসব ভাবছিলাম, ততই আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিলাম যে জিওরজি দিমিত্রভ—কমিউনিস্ট জগতের এই দর্পিত ঈগল যিনি বিচারের পথ, আয়তন ও ফল সব কিছুই আগে আগে দেখতে পেয়েছিলেন—কত ঠিক কথাই না বলেছিলেন। হিটলারের অর্থ-নৈতিক প্রতিভা, হ্যাজএলমাপ শ্চাচট্, যে ফুয়েরার শাক্তিতে আসার পথ তৈরী করে সেই শ্যাচট্, শক্তিশালী আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ফ্রানজ ভন প্যাপেন, ডঃ গোয়েবল্‌সের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী হ্যানস ফ্রিটশে, সংবাদপত্রে আর বেতারে অনর্গল মিথ্যা বলে জনতাকে বোকা বানাত। তারা সকলেই কিন্তু মুক্ত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিচারকদের রায়-এ তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তারা জীবিত।

এই বিচার, এর আইন, যুক্তিজাল, এর মালমশলা, এর সিদ্ধান্ত, এই সব মিলিয়ে এই বিচার নিজেই নাজীবাদের নীচতা, এর বিস্ফোরক বিভীষিকাময় চরিত্র ও স্বভাব খুলে মেলে ধরেছে, আর একই সঙ্গে মানুষ ও মানবতার সামনে উচ্চারণ করেছে এক জোরালো সাবধান বাণী……

শেষের এই কথাগুলি আমি আমার বাড়িতে বসে লিখছি। পাশের ঘরে আমার স্ত্রীর পায়ের গোড়ালির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার মা তাঁর নাতনীকে পরিজ খাওয়ানোর জন্যে চেষ্টা করছেন, নাতনীকে বোঝাচ্ছেন যে পরিজ খেলে, সে যত বড় হবে তত তার স্বাস্থ্য ভাল হবে আরও সে সুন্দরী হবে। আমার টেবিলের উল্টো দিকের শেষে আমার ছেলে বসে আছে। সে তার বাবাকে নকল করে তার নোট বই-এর পাতায় বড় বড় অক্ষর লিখছে। গত পাঁচ বছরে এই প্রথম আমার পায়ে বুট জুতো নেই।

আমার পায়ে আছে কারের আস্তরণ লাগানো নরম চটি। এই চটি আমার স্ত্রী যুদ্ধের গোটা সময়টা তার সঙ্গে বয়ে বেড়িয়েছে; যেন এটিই পরিবারের সৌভাগ্যের প্রতীক। মস্কোর ট্রাম-গাড়ির খট খট শব্দ, বাঁকের মুখে চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ, বাইরে থেকে ঘরে আসছে।

মস্কো, আমার মস্কো, জানলার বাইরে। সেই দূরের জার্মান শহরে গত নয়মাস ধরে আমি যা কিছু দেখেছিলাম, যা কিছু শুনেছিলাম, তা একটা বিভীষিকাপূর্ণ দুঃস্বপ্ন, যা লোকে ভুলে যেতে চায়—কিন্তু আমরা ভুলব না।

না, কোনভাবে কখনোই এ ভোলা উচিৎ নয়।

নুরেমবার্গ, ১৯৪৫-১৯৪৬
মস্কো, ১৯৬৭-১৯৬৮